পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

প্রথম খণ্ড

বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া

বিনয় ঘোষ

প্রকাশ ভবন
কলিকাতা ৭০০০১২

সূচীপত্র

বর্ধমান

বাঁ কু ড়া

পু রু লি য়া

চিত্রসূচী

অন্যান্য চিত্রাবলী পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭ এর মধ্যে সন্নিবেশিত

সোনামুখী। বাঁকুড়া ৩৩। সুকুল গ্রামের পথে, দূরে সরকারবাড়ি। বীরভূম ৩৪। আরস্কিন সাহেবের ভাঙাকুঠি, ইলামবাজার। বীরভূম ৩৫। বাহুলাড়ার মন্দির। বাঁকুড়া ৩৬। বোড়াম-দেউলঘাটা। পুরুলিয়া ৩৭। সুশুনিয়ার শিলালিপি। বাঁকুড়া ৩৮। রামাই পণ্ডিতের আশ্রম, ময়নাপুর। বাঁকুড়া ৩৯। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ। ৪০ পুরুলিয়ায় জৈনমূর্তিসংগ্রহ।

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রথম সংস্করণের (১৯৫৭) প্রকাশক খুবই দুঃসাহস করে কিঞ্চিদধিক ৩৫০০ কপির মতো বই ছেপেছিলেন, বাংলাভাষায় এরকম গুরুবিষয়ের বই যা কেউ এত সংখ্যা ছাপার কথা তখন চিন্তা করতে পারতেন না। তৎসত্ত্বেও বছর তিনেকের মধ্যে বইটি বিক্রি হয়ে যায়। তারপর প্রায় পনের বছর বইটি 'দুষ্প্রাপ্য' হয়ে থাকে। বহু পাঠকের কাছ থেকে পুনর্মুদ্রণের অনুরোধ আসে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে লেখার চাপ এত বেশি ছিল (যেমন 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' ইত্যাদি) যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই কাজটিতে মনঃসংযোগ করতে পারিনি। কিন্তু এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণের জন্য ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর দশকের কয়েক বছর পর্যন্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি, নানারকমের সাংস্কৃতিক তথ্যের সন্ধানে, বিশেষ করে বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া বর্ধমান নদীয়া মুর্শিদাবাদ চব্বিশ-পরগণা জেলায়। অন্যান্য জেলায় এইসময় খুব বেশি যাইনি, যেমন হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর জেলায়, তবে মেদিনীপুর সদর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে অনেক গ্রামে গিয়েছি একাধিকবার, কাঁকড়াঝোড় থেকে গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম পর্যন্ত, ঘাটাল-তমলুক অঞ্চলে বিশেষ যাইনি। এই দ্বিতীয় পর্বে পরিভ্রমণকালে কয়েকজন তরুণ উৎসাহী বন্ধু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং তাঁদের যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও আমার ভ্রমণসঙ্গী হয়ে বহুরকমের অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্যের অংশীদার হয়েছেন। তাঁদের কাছে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' (পৃষ্ঠা ৭)

করেছি। প্রথম খণ্ডে কেবল তাঁদের কথাই বলেছি যাঁরা বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলার অনেক স্থানে ভ্রমণকালে আমার সঙ্গী হয়েছেন। অন্যান্যদের কথা যথাস্থানে পরবর্তী খণ্ডগুলিতে বলব।

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নূতন সংস্করণের 'প্রথম খণ্ডে চারটি জেলার সাংস্কৃতিক বিবরণ দেওয়া হল—বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া। 'প্রথম' সংস্করণে পুরুলিয়ার কথা আদৌ ছিল না, কারণ মানভূমের কতকাংশ নিয়ে 'পুরুলিয়া' তখনও পশ্চিমবঙ্গের স্বতন্ত্র একটি জেলা হয়নি। 'দ্বিতীয়' খণ্ডে থাকবে মেদিনীপুর হুগলি হাওড়া চব্বিশ-পরগণার সাংস্কৃতিক বিবরণ। এই চারটি জেলার বিবরণ প্রথম সংস্করণেও ছিল, নূতন সংস্করণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে থাকবে। বিশেষ করে মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণা জেলার অনেক নূতন বিবরণ দেওয়া হবে। 'তৃতীয়'খণ্ডে থাকবে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কথা, যা প্রথম সংস্করণে ছিলই না বলা চলে। কিন্তু 'তৃতীয়' খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে, এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডে আলোচিত সমস্ত জেলার উৎসব-অনুষ্ঠান, লোকশিল্প, দেব-দেউল ইত্যাদি বিবিধ সাংস্কৃতিক বিষয়ের বিশদ তুলনামূলক আলোচনা ও তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ। কাজেই, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের জেলাগত বিবরণ থেকে একথা ভাববার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে এইসব জেলার কথা বলা শেষ হয়ে গেল। বস্তুত, অনেক কথাই বলা হল না যা 'তৃতীয়' খণ্ডের তত্ত্বীয় আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হবে। যেমন পুরুলিয়ায় লোকোৎসব লোকসংস্কার লোকসঙ্গীত লোকশিল্প ইত্যাদির গুরুত্ব অত্যধিক। এইসব বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনাই প্রথম খণ্ডে করিনি এইজন্য যে এগুলি তৃতীয় খণ্ডের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের দিক থেকে গুরুত্ব আছে এরকম অনেক বিষয় অন্যান্য জেলা প্রসঙ্গেও 'প্রথম' খণ্ডে আলোচনা করিনি, 'দ্বিতীয়' খণ্ডেও করব না, 'তৃতীয়' খণ্ডে সমগ্রভাবে আলোচনা করব এবং তাতে তুলনামূলক (comparative) আলোচনার সুবিধাও হবে। এরকম বিষয়বিন্যাস বিজ্ঞানসম্মত মনে করেই করেছি, কারণ তাতে তত্ত্বীয় আলোচনা পাঠকদের কাছেও সহজবোধ্য হবে। যেমন গাজন-উৎসব, অথবা বাংলার মন্দির। অথবা অন্য যে-কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমস্ত জেলার বিভিন্ন গাজন-উৎসব, নানারকমের মন্দির দেবদেবীর কথা এবং আচার-অনুষ্ঠানাদির কথা জানা থাকলে, শেষে তার তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ পাঠকদের পক্ষে বিচার করা সহজ হবে, তা না হলে হবে না। অন্যান্য বিষয়

সম্বন্ধেও এই কথা বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গত বলছি, এই বইয়ের পুরাতন পাঠকদের একটি অনুরোধ ছিল যেন নূতন সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বর্ণনার আস্বাদ যতদূর সম্ভব (ভুলত্রুটি সংশোধন অথবা সংযোজন ছাড়া) না বদলাই। তাঁদের অনুরোধ যথাসম্ভব রক্ষা করেছি, যদিও যেখানে যেটুকু বদলেছি তা সামান্য হলেও তার গুরুত্ব অধিক।

প্রত্যেক খণ্ডে জেলাগত বিন্যাসের ধারা লক্ষ্য করলে পাঠকরা দেখতে পাবেন, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় অঞ্চল থেকে ক্রমে দক্ষিণ-রাঢ়ের দিকে অগ্রসর হওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। উত্তর-রাঢের কেন্দ্রস্থল হল বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া, সেইজন্য 'প্রথম খণ্ডে' এই চারটি জেলার কথা বলেছি। মেদিনীপুর জেলারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, বিশেষ করে মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম মহকুমার সঙ্গে নিষাদ-সংস্কৃতির এবং কাঁথি-তমলুকের সঙ্গে উড়িষ্যার সংযোগ বিশেষ উল্লেখ্য। তাই 'দ্বিতীয় খণ্ডে' মেদিনীপুর জেলা থেকে আরম্ভ করে হুগলি-হাওড়ার ভিতর দিয়ে চব্বিশ-পরগণা পর্যন্ত আলোচনা বিস্তৃত হবে। তারপর 'তৃতীয় খণ্ডে' থাকবে নদীয়া মুর্শিদাবাদ এবং মুখ্যত অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ। কিন্তু জেলাগত আলোচনাতে যদি কারও মনে 'জেলাত্মতাবোধ' জাগে তাহলে সেটা খুবই দুঃখের বিষয় হবে ('পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ও সংস্কৃতি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। তার কারণ, জেলার সীমানা পরিবর্তনশীল। অতীতে ব্রিটিশ আমলে একাধিকবার তার পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানেও হতে পারে। যেমন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিন্তা করছেন, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণা জেলাকে একাধিক জেলায় বিভক্ত করবেন কি-না। মনে হয়, প্রশাসনিক সুবিধার জন্য করতে হবে। 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটিরও হয়ত পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু জেলার সংখ্যা বাড়ুক অথবা পশ্চিমবঙ্গ নামের পরিবর্তন হোক, তাতে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বইয়ের নাম যে-অর্থে প্রযুক্ত অথবা বইতে সাংস্কৃতিক বিষয় যেভাবে আলোচিত, তার কোনো পরিবর্তন কোনদিন আবশ্যক হবে না।

সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি, তরুণদের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় এই ধরনের সাংস্কৃতিক কাজকর্মের প্রতি উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এটা শুভলক্ষণ। এঁদের মধ্যে অনেকে আমাকে এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণে আমার গ্রাম-পর্যটনের অভিজ্ঞতার কথা এবং সাংস্কৃতিক তথ্যাদি অনুসন্ধানের 'রীতি-পদ্ধতি' সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। 'দ্বিতীয় খণ্ডে'র 'পরিশিষ্টে'

আমার 'Field diary' ও 'Notes' থেকে উদ্ধৃতি-সহ এইবিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করব। 'উত্তরবঙ্গ' নিয়ে এই ধরনের কাজ করার অনুরোধ অনেকে জানিয়েছেন। ইচ্ছা আছে খুব, কিন্তু জানি না সম্ভব হবে কি না। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই গ্রন্থের পরিপূরক হবে 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি'।

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি গ্রন্থতালিকা (bibliography) 'তৃতীয় খণ্ডে' দেওয়া হবে, কিন্তু সেটি গতানুগতিক রিপোর্ট, গেজেটিয়ার অথবা সুপরিচিত গ্রন্থাদির তালিকা নয়। স্থানীয় ইতিহাসের (local history) যে-কোনো বিষয় নিয়ে প্রধানত সেই অঞ্চলের কোনো লেখক অথবা অন্য কেউ যে-সব ছোট-বড় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং যেগুলি বাইরের পাঠকদের দৃষ্টির অন্তরালেই রয়েছে, সন্ধান করে সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করে দেওয়া হবে। বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকালে এরকম অনেক পুস্তক-পুস্তিকা আমি সংগ্রহ করেছি, পত্রিকায় আবেদন করার ফলে আরও কতকগুলি আমার হাতে এসেছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের (ভৌগোলিক) আঞ্চলিক ইতিহাস-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ যা পুরাতন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির একটি সুনির্বাচিত তালিকা করে দেবার ইচ্ছা আছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে কেবল গ্রামের নামের একটি করে 'নির্দেশিকা' (index) দেওয়া হবে। তৃতীয় খণ্ডে, বিষয়বস্তুসহ (subject-index) তিনখণ্ডের একত্রে একটি নির্দেশিকা থাকবে।

বিনয় ঘোষ

ীতি বঙ্গসংস্কৃতি

"...any good history book is saturated with anthropology".

Claude Levi-Strauss

নক্রুমার বসার ঘরের পাশের কক্ষে বিরাট একটি ছবি দেয়ালে ঝুলনো থাকত। ছবির মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি নক্রুমার নিজের। আফ্রিকার উপনিবেশতার (colonialism) শৃংখল ছিন্ন কবার জন্য তিনি প্রাণপণে সংগ্রাম করছেন, শৃংখল ছিঁড়ছে, বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়ের মধ্যে। তার ভিতর থেকে তিনটি মানুষের ক্ষুদ্র মূর্তি দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকে পলায়মান। তিনজনই সাদা-চামড়াব সাহেব। একজন 'ক্যাপিটালিস্ট', হাতে একটি 'ব্রিফকেস'। একজন মিশনারি, হাতে একটি বাইবেল। তৃতীয়জন সকলেব পশ্চাতে, হাতে একখানি বই *African Political System.* তিনি হলেন 'অ্যানথ্রোপোলজিস্ট'। এই হল ছবির বিষয়।[১]

লেভি-স্ত্রাউজ বলেছেন : "Sequels to colonialism, it sometimes said of our investigations. The two are certainly linked··· What we call the Renaissance was a veritable birth for colonialism and for Anthropology. Between the two, confronting each other from the time of their common origin, an equivocal dialogue has been pursued for four centuries···Our science arrived at maturity the day that Western man began to see that he would never understand

১ Tohan Galtung : 'Scientific Colonialism', *Transition*, 30, 1967, Adam Kuper-এর *Anthropologists and Anthropology* গ্রন্থে (London 1975) চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ধৃত।

himself as long as there was a single race or people on the surface of the earth that *he treated as an object.* Only then could anthropology declare itself in its true colours : as an enterprise reviewing and atoning for the Renaissance, *in order to spread humanism to all humanity.*"[২]

(Italics লেখকের)

ইতিহাসে আমরা যাকে 'রেনেসাঁস' বলি তার সঙ্গে উপনিবেশতা ও নৃবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা লেভি-স্ট্রাউজ স্বীকার করেন। মানব-কেন্দ্রিক (homocentric) চিন্তার উন্মেষ হয় রেনেসাঁসের যুগে, একথা সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হল অতঃপর ধনতন্ত্রের বিকাশ এবং তারপর সাম্রাজ্যবাদের অভিযান, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য লেভি-স্ট্রাউজ মনে করেন যে তাঁদের বিজ্ঞান, অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান, এই 'shameful ideology'-র (তাঁর ভাষায়) যুগ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে এবং নৃবিজ্ঞানীরা এখন বুঝতে শিখেছেন যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 'অসভ্য' 'আদিম' 'অনুন্নত' মানুষ, জাতি বা জনগোষ্ঠীকে নিরেট 'বস্তু' মনে করে গবেষণা করলে তাঁদের বিজ্ঞানের যত না উন্নতি হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হবে সাম্রাজ্যবাদীদের। লেভি-স্ট্রাউজ নিজের আয়নায় সকলের মুখ দেখেছেন, যদিও নৃবিজ্ঞানীরা সকলে লেভি-স্ট্রাউজ নন, এমনকি লেভি-স্ট্রাউজের সমকক্ষ বর্তমানে কেউ আছেন কিনা সন্দেহ নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে। কেবল প্রতিভা অথবা চিন্তার দুঃসাহসের দিক থেকে বলছি না, বলিষ্ঠ মানবমুখী প্রগতিশীল চরিত্রের দিক থেকেও বলছি। ১৯৬০ সালে লেভি-স্ট্রাউজ, সামাজিক নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক-পদ গ্রহণের অভিষেক-বক্তৃতা যখন দিয়েছিলেন, তখনও তিনি 'neocolonialism'-এর বর্তমান বিকট রূপ প্রকট হতে দেখেননি এবং 'multinationals'-এর বিশ্বব্যাপী ব্যাদানও দেখতে পাননি। যদি দেখতেন তাহলে হয়ত বলতেন যে নৃবিজ্ঞান পুরনো উপনিবেশতার দাসত্ব ছেড়ে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নব্য-উপনিবেশতার পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছে।

২ Claude Levi-Strauss : *The Scope of Anthropology* : Inaugural lecture, Chair of Social Anthropology, College de France, January 5th, 1960.

নৃবিজ্ঞানের (এবং সমাজবিজ্ঞানেরও) প্রসার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার সমান্তরাল। এটা ইতিহাসের একটি বড় সত্য। ১৮৫৬ সালেই দেখা যায়, লণ্ডনের Ethnological Society-র জর্নালে জনৈক বিজ্ঞ ইংরেজ লেখেন: "Ethnology is now generally recognized as having the strongest claims to our attention...especially in this country, whose numerous colonies and extensive commerce bring it into contact with so many varieties of the human species differing in their physical and moral qualities both from each other and from ourselves." অতএব কালা আদমিদের দেশে, আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে, সাদা-চামড়া নৃবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের অভিযান আরম্ভ হল বিচিত্র সব 'মানবসদৃশ' জীবের সমাজ-সংস্কার আচার-ব্যবহার রীতিনীতি-অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রে। ব্রিটিশ অফিসারদের প্রথমে উৎসাহ দেওয়া হত যাতে তাঁরা নৃবিজ্ঞানের চর্চা করেন, "more in the nature of a pleasurable pursuit than that of a duty", এবং এবিষয়ে তাঁদের ট্রেনিংও দেওয়া হত।[৩] তাঁদের সঙ্গে মিশনারিরাও আসতেন এবং খ্রীস্টভজনসহ নৃবিজ্ঞানের চর্চাও করতেন। আফ্রিকায় যেমন Rattray, Meek, Seligman, Schapera, ভারতবর্ষে তেমনি Dalton, Risley, Hutton, Mill প্রমুখ প্রশাসকরা নৃবিজ্ঞানের প্রথম পর্বের উৎসাহী গবেষক। ভারতবর্ষে Buchanan-Hamilton এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Cunningham, Beglar ও অন্যান্যরাও নানাদিকে এই গবেষণা করেছেন। তাতে নৃবিজ্ঞানের 'তথ্য' অবশ্য অনেক সংগৃহীত হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সমস্ত তথ্য মথিত করে যেসব 'তত্ত্ব' (theroy) উদ্‌গীর্ণ হয়েছে তার অধিকাংশই অসম্ভব রকমের আজগুবি। তাই হবার কথা, কারণ অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-লণ্ডনে যে নৃতত্ত্ব বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও শিক্ষা দেওয়া হত তা "largely mistaken and misguided. It was full of diffusionist and evolutionist assumptions, and confused by doses of physical anthropology, still racialist in orientation, technology, and preposterous theories of religion"[৪] 'অসভ্য' 'বর্বর' ভারতীয় ও

৩ H. G. Barnett: ***Anthropology in Administration***, Evanston 1956.

৪ Adam Kuper: ***Anthropologists and Anthropology***, Peregrine Book 1975, p. 129.

আফ্রিকানদের দেখে সাহেব নৃবিজ্ঞানীরা ভাবতেন যে তারা 'হোমো ইরেক্টাসে'র মতো সোজা হয়ে দুপায়ে চলে বেড়ায় কি করে, যাদের এরকম বিচিত্র ধর্ম শিল্পকর্ম ধ্যান-ধারণা উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি ! তাদের আবার 'সংস্কৃতি' কি ? আর এই যদি 'সংস্কৃতি' হয়, তাহলে সংস্কৃতি-ই বা কি ? অতঃপর সংস্কৃতি বা Culture-এর তত্ত্বাভিযান। সেকথা পরে বলছি। অথচ শিক্ষিতমহলে প্রচলিত কিংবদন্তী হল, এই সাহেবরাই নাকি পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান আর রেলগাড়ি টুপি হ্যাটকোট আমদানি করে এদেশে 'রেনেসাঁস' নামে একপ্রকারের 'নবকম্পন' কয়েকজনের দেহেমনে সঞ্চার করেছিলেন, যে কয়েকজনের বংশধররা ইংলিশ-মিডিয়ামলব্ধ বিদ্যার জোরে বর্তমান ভারত-বর্ষকে ঠেলে প্রগতি-উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। এই কিংবদন্তীকে আমরাও (অর্থাৎ আমি নিজেও) একদা চালু করতে সাহায্য করেছি, যতদিন অবশ্য গুরুজনদের শিক্ষার ঠুলি ছিল চোখে এবং মন থেকে তার বিভ্রম কাটে নি।

তাহলে ভূমিকার প্রারম্ভেই কেন নৃতত্ত্বের সাড়ম্বর অবতারণা, একথা মনে হতে পারে। যেহেতু লেভি-স্ত্রাউজ বলেছেন "any good history book is saturated with anthropology" (ভূমিকা-শীর্ষে উদ্ধৃত) এবং লেখক মনে করেন যে তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসের একখানি 'ভাল বই' অতএব তাকে নৃতত্ত্বে জারিত করতে হবে, তাই ? অথবা যেহেতু লেভি-স্ত্রাউজ একথাও বলেন—"the famous statement by Marx, 'Men make their own history, but they do not know that they are making it', justifies, first history and second Anthropology. At the same time, it shows that the two approaches are inseparable"[৫] সেইজন্যে ? প্রকাশ থাকে, লেভি-স্ত্রাউজ তাঁর 'structural dialectics' (যা তাঁর 'myth' 'totem' প্রভৃতি বিশ্লেষণের পদ্ধতি) সম্বন্ধে বলেন, "Structural dialectics does not contradict historical determinism, but rather promotes it by giving it a new tool"[৬]—এইজন্য কি

৫ Claude Levi-Strauss : *Structural Anthropology* : Penguin University Books 1972, p. 23.

৬ Ibid, p, 240.

নৃতত্ত্ব ও লেভি-স্ত্রাউজ দিয়ে ভূমিকার সূত্রপাত? এবং লেভি-স্ত্রাউজের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন?

এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ১৯৫৭ সালে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনকার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মনে কি যে পড়ে মানুষের আর কি যে পড়ে না ভাবা যায় না। মনে পড়ছে মানে ভুলে যাইনি, যদিও অনেক ঘটনা অনেকের এবং অনেক কথা ভুলে গিয়েছি। একদিন বিকেলে গোলদীঘির বিদ্যাকেন্দ্রে একটি বইয়ের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' প্রকাশিত হবার মাস তিনেক পরে, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজ থেকে একজন সুদর্শন পণ্ডিতমশায় ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন এবং কে যেন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর পরিচয় শুনে আমি চমকে উঠলাম, এবং বয়স যেহেতু তখনও চল্লিশ হয়নি, তজ্জনিত চালশেও ধরেনি চোখে তাই, একবার চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, পৌরাণিক যুগের পণ্ডিতদের মতো তিনি রূপবান পুরুষ। তিনি, অর্থাৎ পণ্ডিতমশায়, স্মিতমুখে আমাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "বেশ ভাল বই, অনেক পরিশ্রম করেছেন, তবে একটু-মানে-এই-আর কি"! কঁৎ করে ঢোক গেলার শব্দ শুনলাম। আমি মূক এবং মুখ রাস্তার দিকে হেঁট। মানে উনি, অর্থাৎ যিনি বিচক্ষণ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতমশায় তিনি, আমাকে একটু পাশে আবডালে ডেকে নিয়ে গি বললেন, "বলছি কি যে এত ভাল বইটাতে একটু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়"। আমার মুখ নয় শুধু, ঘাড় পর্যন্ত তখন নিচে পথের দিকে ঝুলে গিয়েছে। উনি, মানে যিনি বিদ্যাসাগব মশায়ের উত্তরাধিকারী তিনি, আমাকে বললেন, "বড্ড বেশি 'ছোটলোকদের' কথা বলেছেন, মানে বাগদি বাউরি হাড়ি ডোম সাঁওতাল, যেন সংস্কৃতিটা তাদের। আপনার বইটা পড়লে তাই মনে হয়। কিছু মনে করবেন না। আশীর্বাদ করছি, আপনি দীর্ঘজীবী হন। বইটা আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। আরও একটা bias আপনার আছে। মুসলমান-প্রীতিটা আপনার অত্যধিক। সেটা কি ... ? মানে সংস্কৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের সম্বন্ধে অত কথা বলার দরকার কি? আপনি নৃতত্ত্বের কথা অনেক বলেছেন, কিন্তু 'ইতিহাস' তো নৃতত্ত্ব নয়। আমি কলেজের

অধ্যাপকদের বলছিলাম, আপনার বই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, সকলেই প্রশংসা করছিলেন, তবে এইসব bias-এর কথাও বলছিলেন। তাই বলছি, কিছু মনে করবেন না। কথাগুলো একটু ভাববেন। আমার যা মনে হয়েছে তাই বললাম।”

মানুষের কি যে মনে হয় আর কি যে মনে হয় না ভাবা যায় না তথাপি কত মানুষের না-জানি কত-কি যে মনে হয়! যেমন সুদর্শন পণ্ডিতমশায়ের মনে হয়েছে আমার ‘বায়াসে’র কথা, আদিবাসী ও অনুচ্চবর্ণদের প্রতি আমার বিসদৃশ পক্ষপাতিত্বের কথা, তৎসহ মুসলমানপ্রীতির আতিশয্যের কথা। যেমন তিনি আমাকে পৈতে তুলে আশীর্বাদ করেছেন যাতে আমি দীর্ঘজীবী হই, কারণ আমি নাকি অনেক কাজ করতে পারব বেঁচেবর্তে থাকলে, কেবল ‘বায়াস’-টা ছাড়লেই হয়। এইটা ছাড়লেই ঐটা হবে মনে করে মানুষ কত-কি যে ছাড়ে আর কত কি যে করে অথচ অবশেষে কিছুই ছাড়ে না, কিছুই হয় না! যেমন হ্যাবা হলে আলু দেখে মনে হয় পটল, পটল দেখে মনে হয় ঝিঙে, সেইরকম। যেমন বিখ্যাত functionalist নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনাউস্কি অথবা তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন মনে করেন এইটাই ঠিক এবং লেভি-স্ত্রাউজ মনে করেন ঠিক নয়, সেইরকম। যেমন ‘পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি’ নামক গ্রন্থের লেখক মনে করেন যে ‘বঙ্গসংস্কৃতি’ মানে মোটেই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি নয় এবং তার স্তরে স্তরে আদিজনগোষ্ঠীর এবং অনুচ্চবর্ণের সংস্কৃতি, বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই bias বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগের কথাটা ভুলিনি কোনদিন, তাই নৃতত্ত্ব দিয়ে নতুন ভূমিকার সূত্রপাত এবং তার মধ্যেই অভিযোগের উত্তর দেবার প্রচেষ্টা। যদিও bias-টা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল এবং আরও স্পষ্টরূপে সেটা প্রকট হবার সম্ভাবনা পাঠকদের কাছে, অতএব পণ্ডিতমশায় এবং তাঁর জ্ঞাতিবর্গ মার্জনা করবেন।

ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। লেভি-স্ত্রাউজ যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য: [৭]

> They have undertaken the same journey on the same road in the same direction; only their orientation is different. The anthropologist goes forward, seeking to attain, through

৭. Ibid, p. 24.

the consensus, of which he is always aware, more and more of the unconscious ; whereas the historian advances, so to speak, backward, keeping his eyes fixed on concrete and specific activities from which he withdraws only to consider them from a more complete and richer perspective. A true two-faced Janus, *it is the solidarity of the two disciplines that makes it possible to keep the whole road in sight.* (Italics লেখকের)

ক'জন নৃবিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিক একথা জানেন অথবা উপলব্ধি করেন অথবা তাঁদের অনুশীলনক্ষেত্রে এই বোধের মর্যাদা রক্ষা করে কাজ করেন, জানি না। যদি করতেন তাহলে ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানী উভয়েই দেখতে পেতেন যে তাঁরা একপথের যাত্রী, তাঁদের লক্ষ্য এক, কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। তাঁরা বুঝতে পারতেন যে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন অচ্ছেদ্য থাকলে, মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের দিগন্তবিস্তৃত সমগ্র পথটি উভয়ের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।[৮] অতঃপর 'সংস্কৃতি' বা 'কালচার' অর্থাৎ সংস্কৃতিতত্ত্বের পণ্ডিতি বিতর্কের মহারণ্যে প্রবেশ, যা লেখকের পক্ষে অতি-পরিমিত বিদ্যার পুঁটলির ভরসায় দুঃসাধ্য। বনবিবির পুজো দিয়ে কাঠুরেরা যদি সুন্দরবনের অরণ্যে প্রবেশ করে তাহলে তারা নাকি পথ হারিয়ে ফেলে না। কিন্তু শিক্ষাগত বিদ্যার যে-কোনো দেবদেবীর পুজো দিয়ে সংস্কৃতি-তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলেও পথ হারিয়ে যাবার সম্ভ না। যত পণ্ডিত ততরকমের তত্ত্ব, যদিও evolutionist, diffusionist, functionalist, structuralist, মোটামুটি এইভাবে এ বিষয়ের পণ্ডিতদের একটা চলনসই শ্রেণীভেদ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্ডিতকে আবার অনেক উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু তাঁদের সকলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সারকথাটুকুও সংকলন করা এই গ্রন্থের সমগ্র পরিধির মধ্যে সম্ভব নয়, ক্ষুদ্র 'ভূমিকা'তে তো নয়ই। তৎসত্ত্বেও স্বল্পকথায় যেটুকু বলা যেতে পারে, বলছি।

৮ বাংলা দেশে এরকম দু'একজন creative scholar ও ঐতিহাসিকের মধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দ অন্যতম, যিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের B. A., রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাচীন ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, শিল্পভাস্কর্য সম্বন্ধে যাঁর প্রতিটি লেখা সৃজনশীল প্রতিভায় উজ্জ্বল। একালের বিদ্বানরা তাঁর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছেন বলা চলে .

উনিশ শতক থেকে 'কালচার' বা সংস্কৃতির প্রত্যয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, আজও শেষ হয়নি। বিশ শতকের গোড়া থেকে নৃবিজ্ঞানীরা culture-এর বদলে 'cultures' কথা ব্যবহার করা সঙ্গত বলেছেন এবং একটি 's' যোগ করার ফলে 'কালচার' আরও বেশি ধোঁয়াটে হয়ে গিয়েছে। 'trait' 'complex', 'pattern', 'cultures as wholes' ইত্যাদি প্রত্যয়ের ঠেলাঠেলিতে অবশেষে সংস্কৃতি একটি অনিয়তাকার পদার্থ হয়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানীরা তার সঙ্গে ব্যক্তিতা ব্যক্তিত্ব গোষ্ঠীত্ব প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়ে বিষয়টিকে প্রায় মনোবাজ্যে স্থানান্তরিত করেছেন। ভাষা তো বটেই, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষা (local dialect) সংস্কৃতি-বিচারে যে অতিশয় মূল্যবান, তা স্বীকৃত সত্য, এবং পশ্চিমবঙ্গেব বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণকালে আমি তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছি। ভাষার ধ্বনি, ভাষার উচ্চারণরীতি ইত্যাদির সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে এইকারণে যে এগুলির সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীভেদ মর্যাদাভেদ জাতিবর্ণভেদ প্রভৃতির সম্পর্ক প্রায় প্রত্যক্ষ। এই বিষয়টিকে বর্তমানে 'Socio-linguistics' বলা হয় এবং সংস্কৃতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই 'সামাজিক ভাষাতত্ত্ব' নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে, যদিও পথটি আদৌ সুগম নয়। ইদানীং সংস্কৃতির বিচারে 'জৈব-নৃতাত্ত্বিক' (bio-anthropological) দৃষ্টিভঙ্গিব কথাও উঠেছে। যেমন একজন নৃবিজ্ঞানী বলেছেন: "Culture-traits are analogous to genes···In the gene and further in the chromosome, the information is encoded chemically ; in the trait the information is encoded culturally"—ইত্যাদি।[১] এর পর সংস্কৃতিতত্ত্বকে একটি বিচিত্র হিংটিংছট্‌তত্ত্ব ছাড়া আর কি বলা যেতে পাবে জানি না এবং প্রধানত একশ্রেণীর আমেরিকান নৃবিজ্ঞানীরাই (অবশ্য সকলে নন) আজ সংস্কৃতির তত্ত্বীয় ব্যাখ্যাকে এই বীটনিকসুলভ ব্যাখ্যার স্তরে নিয়ে এসেছেন, একেবারে ক্রোমোসোম পর্যন্ত। প্রকাশ থাকে, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে আলোচ্য ও বিবেচ্য যে 'সংস্কৃতি' তা এরকম কোনো সংস্কৃতি নয় যা এইজাতীয় কোনো সংস্কৃতিতত্ত্বের বাখ্যাধীন, এবং তার প্রথম কারণ হল, পূর্বোক্ত সংস্কৃতিতত্ত্বের প্রতি লেখকের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, দ্বিতীয় কাবণ হল, এতগুলি বিদ্যা আয়ত্ত

---

১ Paul Bohannan : 'Rethinking Culture : A Project for Current Anthropologists,' *Current Anthropology*, Chicago, October. 1973.

করে সংস্কৃতির ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডে বিচরণ করার মতো অ্যালিস-সুলভ উৎসাহও নেই লেখকের। প্রসঙ্গত বীরভূমের বাঁশপুত্র মহলিদের কথা মনে পড়ছে (পৃষ্ঠা ৩২৩-২৪) তাই বলছি। পুরুলিয়ার ভূমিজদের কথা মনে পড়ছে (পৃষ্ঠা ৪২৩-৩৪) তাই বলছি। আর বাগদি বাউরি ডোম সাঁওতাল মুণ্ডা জেলে কর্মকার কুম্ভকার চিত্রকর ভাস্কর সূত্রধর সকলের কথা মনে পড়ছে তাই বলছি। প্রসঙ্গত ককাসয়েড পণ্ডিতমশায়ের কথাও মনে পড়ছে, একবার দু'বার নয়, অনেকবার, তাই বলছি। মানুষ কি যে বলে আর কি যে বলে না, কি যে বলতে চায় আর কি যে বলতে চায় না তা জানি না এবং জানতেও চাই না।

বিবর্তনবাদীরা (evolutionists) মনে করেন, মানবসমাজের রৈখিক (linear) বিকাশ হয়েছে, বর্বরতার যুগ থেকে আধুনিক সভ্যতার যুগ পর্যন্ত। সংস্কৃতি হল কতকগুলি উপাদানের (traits) যান্ত্রিক যোগফল। কোনো একটি উপাদান বিযুক্ত হলে সংস্কৃতির অবক্ষয় ও অবনতি হতে পারে, আবার কোনটি যুক্ত হলে সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও উন্নতি হতে পারে বিস্তারবাদীরা (diffusionists) এই তত্ত্বটাকেই আরও খানিকটা টান দিয়ে লম্বা করে বললেন, বর্বর ও অসভ্যদের 'সংস্কৃতি' বলে কিছু ছিল না কোনকালে। পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে কিছু বিশিষ্ট ভাগ্যবান জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতির বিকাশ হয় এককালে, তারপব তাদের সেই সংস্কৃতির উপাদানগুলি সংস্কৃতিহীন অঞ্চলগুলিতে বিচরণের ঐতিহাসিক সুযোগ পায়। বিচরণকালে সংস্কৃতির উপাদানগুলি বর্বর-অসভ্যদের অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করে (কতকটা খ্রীস্টান মিশনারিদের মতো) এবং তাদের 'সভ্য' ও 'সংস্কৃতিবান' করে তোলে। এরকম উপাদানের মধ্যে কয়েকটি হল—ঘোড়া রথ চাকা, গরুমোষ-উটের গাড়ি, লাঙ্গল, ফসলের বীজ, মৃৎপাত্র, লোহার হাতিয়ার, অন্যান্য ধাতুর হাতিয়ার প্রভৃতি পার্থিব বস্তু এবং তৎসহ নানাপ্রকারের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ধ্যানধারণা বিশ্বাস-সংস্কার, শিল্পকলা, পুরাণকথা (myth), দেবদেবী, উৎসবপার্বণ ইত্যাদি। এরকম যাবতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান, পার্থিব অপার্থিব, বস্তুগত ভাবগত সব, কয়েকটি 'বিশেষ অঞ্চল' থেকে অন্যান্য 'অসভ্য' অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। একে 'বিকীরণতত্ত্ব'-ও

(Radiation theory) বলা হয়। এই সাংস্কৃতিক বিকীরণতত্ত্বের মর্ম হল— জ্যোতির কনকপদ্মের মতো সংস্কৃতিসূর্যের উদয় হয় কয়েকটি ভাগ্যবান জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং সেই সূর্যের কিরণ যখন প্রসারিত হয় পৃথিবীর অন্যান্য বর্বর-অসভ্য অঞ্চলে তখন তাদের বর্বরতা-অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং ভোরের আলোয় অবগাহন করে তারা সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোক-রাজ্যে প্রবেশ করে। এ-হেন সাংস্কৃতিক তত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রসারকালে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের গোড়ায়, কতটা যে তার সহায় হতে পারে তা যে-কোনো বালকও বুঝতে পারে। ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের কোনো-কোনো দেশে সংস্কৃতির সূর্যোদয় হয় এবং সেই সংস্কৃতির একএকটি রশ্মিতুল্য উপাদান বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছুরিত হয়, যে-সমস্ত স্থানে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা 'উপনিবেশ' স্থাপন করে, যেমন আফ্রিকায় এসিয়ায় লাটিন-আমেরিকায় ভারতবর্ষে চীনে। নক্রুমার ছবির কথা মনে পড়ে। উপনিবেশতার শৃংখল ছিন্ন করছেন নক্রুমা, প্রতিরোধের ঝড়-জল-বজ্রপাতের মধ্যে, তিনজন ব্যক্তি তার মধ্যে পলায়মান—একজন ক্যাপিটালিস্ট, একজন মিশনারি, আরএকজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট।
অবশ্য তাঁরা কেউ এখনও পলায়ন করেননি। যেমন ক্যাপিটালিজ্‌ম-এর ভোল পাল্টেছে, তেমনি তাঁরাও তাঁদের মুখোস পাল্টেছেন, দাসত্বের ছদ্মবেশটি বদলেছেন মাত্র।

উপযোগবাদীরা (functionalists) বিবর্তন-বিকীরণ উভয়তত্ত্বের কঠোর সমালোচনা করে নৃবিজ্ঞানের মঞ্চে প্রবেশ করেন। কিন্তু উভয়তত্ত্বের মধ্যে 'সত্য' বেশ কিছুটা আছে এবং তার গুরুত্বও অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির বিবর্তনও আছে এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের বিকীরণও হয়। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) যথার্থই বলেছেন :[১০]
"Diffusion is a fact. The transfer of materials from one territory to another is archaeologically demonstrated from the Old Stone Age onwards. But if material objects can thus be diffused, so can ideas—inventions, myths, artistic designs, institutions.

১০ Gordon Childe : *Social Evolution*, Fontana 1963, p.25

Evolutionists have never denied this." কথাটা অত্যন্ত সত্য। বিভিন্ন দেশের কথা অথবা পৃথিবীর কথা অনেক বড় কথা, আমাদের নাগালের বাইরে, কিন্তু আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য-বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে পর্যটনকালে বিবর্তনের স্তর এবং বিকীরণের দৃষ্টান্ত একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। এমন অনেক অতিকথা লোককথা আছে যা বিভিন্ন জেলায় গ্রামে গ্রামে বিহার করে দেখেছি, অনেক উৎসব-অনুষ্ঠান আছে একএকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে যার সাদৃশ্য চোখে পড়ে অথচ সেই একই উৎসবের রূপ অন্যত্র অন্যরকম (যেমন গাজন-উৎসবের), একই লোকশিল্প একই জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্নরূপে দেখা যায় (যেমন বাঁকুড়ার মৃৎশিল্প), একই অতিকথা বা লোককথা একজন বিশিষ্ট গ্রামদেবতার উৎপত্তি কেন্দ্র করে স্বচ্ছন্দে একটি অঞ্চলে সঞ্চরমাণ (যেমন শিবের উৎপত্তি), এক-একশ্রেণীর লোকদেবতার একএকটি অঞ্চল জুড়ে আধিপত্য, জনপ্রিয় লোকদেবতাদের গোত্রান্তরের রীতি (বর্ধমান জেলার জামালপুরের বুড়োরাজের মতো) অর্থাৎ সাধারণত ব্রাহ্মণীকরণের (Brahmanization) পদ্ধতি সর্বত্র প্রায় একরকম। এই ধরনের আরও অনেক বিষয় আছে যার মধ্যে বিবর্তনবাদী ও বিকীরণবাদীদের অনেক কথা সত্য প্রমাণিত হয়।[১১] কিন্তু বিবর্তন-বিকীরণের তত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত এমন একটি স্তর পর্যন্ত প্রসারিত করা হয় যে একদিকে সেটা উপনিবেশতার পোষক হয়ে ওঠে, অন্যদিকে অস্বাভাবিক বাতিকে পরিণত হয়। যেমন একদা 'প্রাচীন মিশর'কে সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র মনে করা হত, যেখান থেকে নাকি সূর্যকিরণের মতো সংস্কৃতির আলোক এসিয়া অনেক স্থানে বিচ্ছুরিত হয়েছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গের কোনো স্থানের কাঠের পুতুলের সঙ্গে মিশরের পুতুলের সাদৃশ্য দেখে এখনও অনেক বাতিকগ্রস্ত বিকীরণবাদী মনে করেন মিশর থেকেই এই লোকশিল্পের এখানে আমদানি হয়েছে। এমন অনেক লোকোৎসব লোকাচার লোকপ্রথা পশ্চিমবঙ্গে আছে যেগুলির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উৎসব-অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাই বলে সেগুলি বাইরে থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে, একথা বলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল। অথচ মাথায় 'হ্যাট' নামক শিরাভরণ, অঙ্গে কোট-পাতলুন নামক পোশাক দেখে বলতে কোনরকম বাধা নেই যে সংস্কৃতির এই উপাদানগুলি ইয়োরোপ থেকে এদেশে আমদানি হয়েছে। তেমনি আমাদের দেশের আধুনিক যুগের

১১ এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' এইসব বিষয়ের তত্ত্বীয় আলোচনা করা হবে।

উচ্চশিক্ষিতদের 'ইংরেজি ভাষা' যে ব্রিটিশ শাসকদের দান, রেলগাড়ি মোটর-গাড়ির মতো, তা স্বীকার না করার কোনো কারণ নেই। এগুলি উপনিবেশ-তার যুগের বিকীরণের দৃষ্টান্ত। কালীঘাটের কালীদর্শন করে 'গুড্‌মর্নিং ম্যাডাম' বলাও তাই। কিন্তু মনসাপূজার মতো সর্পপূজা কাম্‌চাটকায় চলিত আছে বলে সেখান থেকে এখানে এই পূজানুষ্ঠান আমদানি হয়েছে একথা বলাও যা আর সুন্দরবন অথবা আফ্রিকার অরণ্য থেকে বাংলায় ভারতে চীনে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে 'সাপ' নামক ভয়াবহ সরীসৃপের বিস্তার হয়েছে বলাও তাই।

টুপি রেলগাড়ি ইংরেজিভাষা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক উপাদানের আমদানির ফলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি 'উন্নত' হয়েছে, একথা মেকলে অথবা নৃবিজ্ঞানী এলিয়ট স্মিথের মুখে মানালেও, কোনো কাণ্ডজ্ঞানীর মুখে মানানো উচিত নয়, যেহেতু যে-দেশ থেকে এই বস্তুগুলি এদেশে এসেছে, সেদেশ যখন 'অসভ্যতার' অন্ধকারে নিমগ্ন তখন ভারতের (এবং চীনের) সভ্যতা অনেক উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত। একথা ঐতিহাসিক সত্য এবং পণ্ডিত-অপণ্ডিত বহুজনবিদিত। রেলগাড়িতে দ্রুত চলা যায়, কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন বা পৃথক উপাদান (isolated trait) হিসেবে কোনো 'সংস্কৃতি'তে তার বিশেষ কোনো মূল্য নেই, যেহেতু কোনো সংস্কৃতিকে রেলগাড়ি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। যেহেতু রেলগাড়িতে মানুষ চড়ে, সংস্কৃতি চড়ে না। যেমন আন্দামান দ্বীপটা (দ্বীপপুঞ্জ) যদি গোটা ভারতবর্ষের মতো বড় হত এবং ভারতবাসীরা যদি আন্দামানীদের সংস্কৃতিস্তরে থাকত, তাহলে ভারতবর্ষে রেলগাড়ি চালালে কি হত ? যদি কল্পনা করা যায়, কয়েককোটি আন্দামানী কোট-পাত্‌লুন হ্যাট্‌ পরে রেলগাড়িতে চড়ে বেড়াচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে 'yes no very well good morning' ইংরেজি বলছে, তাহলেই বা কি হত ? আন্দামানীরা কি সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নত হত, কেবল এই উপাদানগুলির গোঁত্তায় ? হত না। তার প্রমাণ ১৯৭৬ সালেও পশ্চিমবঙ্গেই অনেক আছে। দেড়শো বছরের উপর এখানে রেলগাড়ি চলছে, ইংরেজিশিক্ষিত বাবুজনেরা হ্যাট-কোট পরছেন, ইংরেজি বলছেন, তথাপি রেললাইনের দশ-পনের মাইল দূরে এমন অনেক অ নে ক গ্রাম আছে যেখানকার শতকরা নব্বইজন মানুষ আজ পর্যন্ত একবারও রেলগাড়িতে চড়েনি, তিরিশ মাইল দূরের তাজ্জব শহর কলকাতাও

দেখেনি, নিজেদের 'সনাতন' উৎসব-পার্বণ-ধ্যান-ধারণা-অশিক্ষা-দারিদ্র্য নিয়ে যে 'সংস্কৃতি' তাই নিয়েই থিতিয়ে রয়েছে, থিতোতে থিতোতে 'থ' হয়ে গিয়েছে, দ ধ ন পর্যন্ত এগিয়ে চলার ইচ্ছেও নেই, রেলগাড়িতেও চড়ে না এবং এইভাবে তাদের দিন যাচ্ছে রাত যাচ্ছে ভোর হচ্ছে রাত হচ্ছে উৎসব হচ্ছে অনুষ্ঠান হচ্ছে জন্ম হচ্ছে মৃত্যু হচ্ছে যেন একটা গরুর গাড়ি ক্যাঁচক্যাঁচক্যাঁচোরক্যাঁচ শব্দ করে চলছে আর গাড়োয়ান অঘোরে ঘুমুচ্ছে আর তার সঙ্গে ইংরেজের রেলগাড়িও চলছে 'উন্নত সংস্কৃতি'র বাষ্প উড়িয়ে এবং তারা দেখছে দূর থেকে অবাক হয়ে আর ভাবছে 'মান্ষিতি না গরুতি না তা ওকি ভূতি ওড়ায়ে নে জাচ্ছে' আর কাদা ছুঁড়ছে মধ্যে মধ্যে উলঙ্গ মনুষ্যশাবকরা রেললাইনের ধারে পাঁকভরা এঁদোপুকুরখালে মাছ ধরতে ধরতে কিংবা খেলা করতে করতে। কাঁদা ছুঁড়ছে কাকে? মনে হবে রেলগাড়ির যাত্রীদের, কিন্তু রেলগাড়ির 'সংস্কৃতি'র মুখে। এইধরনের বিচিত্র বিকীরণতত্ত্বের বিরুদ্ধে, গর্ডন চাইল্ডের ভাষায়, "the Functionalists rightly inveigh"[১২]।

সংস্কৃতি হল "organic whole"—তার কোনো উপাদান বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না, করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। এইটাই হল উপযোগবাদী বা Functionalist-দের মূল বক্তব্য। Diffusion তাঁরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু বহিরাগত উপাদান যদি মূল-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিযোজিত না হতে পারে এবং তার সঙ্গে অভিন্নসত্তা না হয়ে যায়, তাহলে তার উপযোগ থাকে না। প্রথা সংস্কার সংস্থা বিশ্বাস আচার-অনুষ্ঠান, জীবিকার যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, পোশাক শিল্পকলা প্রভৃতি প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক উপাদানের একটা বিশেষ উপযোগ (function, utility) আছে এবং তা আছে বলেই বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নানারকমের সমাবেশের মধ্যে তারা "hang together," অভিন্নসত্তায় সুস্থিত হয়ে থাকে। সংস্থানবাদীরাও (Structuralist) অনেকটা এইকথাই বলেন, সংস্কৃতির অখণ্ডতার উপর তাঁরা গুরুত্ব দেন এবং বলেন যে তার সংস্থানবেধ (infrastructure) সমগ্রভাবে না দেখলে ও বিচার করলে, তার স্বরূপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উপযোগবাদীদের গুরু ম্যালিনৌস্কি (B. Malinowski) থেকে আধুনিক সংস্থানবাদীদের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত লেভি-স্ত্রাউজ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানের অভিযান বাস্তবিকই রোমাঞ্চকর। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে ম্যালিনৌস্কির অন্বেষণ আরম্ভ এবং লেভি-স্ত্রাউজের অন্বেষণ আরম্ভ প্রধানত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

১২ Ibid, p. 26

পরবর্তীকাল (১৯৫০ ও ৬০-এর দশক) থেকে। মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য, মানুষের মানসলোকের চিন্তাভাবনা, চিন্তার (thought) স্বরূপ ও ধারাবিচার ইত্যাদি বিষয়ে ম্যালিনৌস্কি ও তাঁর ছাত্রশিষ্যদের (র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, রেমণ্ড ফার্থ এবং অন্যান্যরা), এবং লেভি-স্ত্রাউজ ও তাঁর অনুগামীদের অন্বেষণের ফলে নৃবিজ্ঞানের বিস্ময়কর সমৃদ্ধি হয়েছে। যাঁরা এঁদের অনুগামী নন, অথবা এঁদের অন্বেষণরীতি ও অভিমতাদি পুরোপুরি সমর্থন করেন না, তাঁরাও তাঁদের এই দানের কথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। নৃবিজ্ঞানে (অথবা সমাজবিজ্ঞানে) সরেজমিনে অনুসন্ধানের (field study) অন্যতম প্রবর্তক ম্যালিনৌস্কি এবং ১৯১৫-১৬, ১৯১৭-১৮ সালে ত্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপপুঞ্জে (off New Guinea) তাঁর অন্বেষণ অভিযান এইদিক দিয়ে নতুন পথপ্রদর্শনের কাজ করে বলা যায়। ম্যালিনৌস্কির মৃত্যুর পর তাঁর 'Field diaries'-এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে এবং যে-কোনো রোমান্টিক উপন্যাসের চেয়েও তা বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়, কারণ এই ডায়েরির মধ্যে অন্বেষকের বৈজ্ঞানিক সত্তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁর ব্যক্তিসত্তার নিবিড় স্পর্শ পাওয়া যায়।[১৩] 'ফিল্ড ডায়েরি' আর পর্যবেক্ষণের 'নোট্‌স'-এর মধ্যে প্রভেদ অনেক। বস্তুত ম্যালিনৌস্কির বক্তব্য ছিল যে ডায়েরিতে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত ভাবানুভাব, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি থাকবে এবং সেটা 'diversion' হবে, যাতে আসল পর্যবেক্ষণকালীন তথ্য সংগ্রহের সময় এইরকম ব্যক্তিগত কোনো মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ছায়াপাত তাতে না হয়। অর্থাৎ 'ফিল্ড ডায়েরি' 'মানুষ' অন্বেষকের এবং 'নোট্‌স' 'বৈজ্ঞানিক' অন্বেষকের তথ্যপঞ্জী। যাই হোক, উপযোগতত্ত্বের শেষ সিদ্ধান্ত হল, 'সংস্কৃতি' মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনসিদ্ধির একটি কৌশল বিশেষ এবং প্রয়োজন মূলত ঔদরিক ও যৌন, তৎসহ সেই সংস্কৃতি-সম্ভূত কতকগুলি অতিরিক্ত প্রয়োজন। এক-একটি প্রয়োজন থেকে এক-একটি প্রথা এবং সংস্থার উৎপত্তি, যদিও প্রত্যেক সংস্থা-প্রথার মধ্যে নানাস্তরের বিন্যাস দেখা যায়। অবশেষে সংস্থা-প্রথাগুলিকে সমাজসম্মত বা বিধিসম্মত করার জন্য (legitimize) নানারকমের অতিকথার সনদ (mythical charter) দিয়ে সেগুলিকে প্রলেপ দেওয়া হয় এবং তার ফলে সংস্কৃতি অখণ্ডরূপে স্থিত হয়।

১৩ **B. Malinowski : *A Diary in the Strict Sense of the Term*, London 1967.**

উপযোগবাদীদের এইসব কথাবার্তার মধ্যে যৎকিঞ্চিত মার্ক্‌সবাদের (Marxism) গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা পচাগন্ধ। যেমন ম্যালিনৌস্কি নিজেই বলেছেন :[১৪]

> It is one of the remarkable paradoxes of social science that while a whole school of economic metaphysics has erected the importance of material interests—which in the last instance are *always food interests*—into the dogma of materialistic determination of all historical process, neither anthropology nor any other serious branch of social science has devoted any serious attention to food. *The anthropological foundations of Marxism or anti-Marxism are still to be laid down.*
> (Italics লেখকের)

তরুণ নৃবিজ্ঞানী কুপার (জন্ম ১৯৪১) মার্ক্‌সবাদ বিষয়ে ম্যালিনৌস্কির এই মন্তব্য সম্বন্ধে বলেছেন : "Of all the triumphs of Malinowski's reductionist impulse, this must surely be the greatest, *the reduction of Marxism to a sort of dietetics*" (Italics লেখকের)। ম্যালিনৌস্কির উপযোগতত্ত্বের তরলীকরণের এইটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত—মার্ক্‌সবাদকে এক-ধরনের খাদ্যতত্ত্বে দ্রবীভূত করা। আজ যদি ম্যালিনৌস্কি জীবিত থাকতেন তাহলে 'anti-Marxism'-এর সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপনে, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ক্ষেত্রে, 'functionalism'-এর বিজয় অভিযান লক্ষ্য ক'র, বিশেষ করে আমেরিকায়, তিনি চমৎকৃত হতেন। অধিকন্তু মার্ক্‌সবাদের নৃতাত্ত্বিক ভিত্তি যে যথেষ্ট দৃঢ়, একথাও তিনি ইচ্ছা থাকলে বুঝতে পারতেন।

সংস্থানবাদী (Structuralist) নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ত্রাউজ মনে করেন তিনি মার্ক্‌সইস্ট, অস্তিবাদী (Existentialist) দার্শনিক সাহিত্যিক জঁ-পল সার্ত্র ও মনে করেন তিনি মার্ক্‌সইস্ট, যদিও উভয় মনীষীর মার্ক্‌সইজম আমাদের কাছে অতিশয় দুর্বোধ্য এবং উভয়েরই মার্ক্‌সইজম-এর মধ্যে পার্থক্য বিস্তর, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্কও হয়েছে অনেক। লেভি-স্ত্রাউজের 'স্ট্রাক্‌চারাল

১৪ **Malinowski, *The Sexual Life of Savages*, 3rd ed, London 1932, Special Preface, p. XXXV.**

১৫ **Adam Kuper : Ibid, p. 45**

ডায়েলেকটিকস্' অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের অতিসামান্য বিদ্যাবুদ্ধির অগম্য। তৎসত্ত্বেও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে সমাজবিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস অনুশীলনের ক্ষেত্রে এবং ইতিহাসের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সংযোগ স্থাপনে লেভি-স্ত্রাউজ অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, অনেক অন্ধকার অলিগলিতে আলোকসম্পাত করেছেন, যদিও আদিজনগোষ্ঠীর অতিকথা (myth), টোটেমিজম্ প্রভৃতি তাঁর অনুশীলনের নির্বাচিত বিষয়। তাই ভূমিকায় একাধিকবার তাঁর কথা উল্লেখ করেছি, তাঁর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর তত্ত্বকথা দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও। মার্ক্সইজম্-এর কথা জানি না, বুঝি না, ইদানীং যেহেতু সকলেই আমরা মার্ক্সইস্ট বা সোশ্যালিস্ট, এবং তার ব্যাখ্যা-টীকা ইত্যাদি ব্যক্তিভেদে পর্যন্ত স্বতন্ত্র। একই আলখাল্লা নির্বিবাদে সকলে পরলে যা হয় তাই। অর্থাৎ সেটা জোড়াতালি-দেওয়া একটি বিচিত্র পোশাকে পরিণত হয়, বিশেষ করে বিদ্যাবুদ্ধিব ব্যবসায়ীদের কাছে। কাজেই তা নিয়ে মাথাঘামানো অনাবশ্যক।

প্রশ্ন হল 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' সম্বন্ধে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং আদিজনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি নয়, 'সর্বজনগোষ্ঠীর' সংস্কৃতি। তাহলে নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বকথার এত কচকচানি কেন ভূমিকাতে? এর সহজ-সরল উত্তর হল, নৃবিজ্ঞানের প্রচুর উপকরণ এর মধ্যে আছে এবং যেহেতু আছে সেইজন্য তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রয়োজন আছে। সংস্কৃতির বিবর্তন আছে, তার নানাবিধ উপাদানের বিকীরণ, উপযোগ সবই আছে। কিন্তু কোনো একটা-কিছু ধরে সবটা বোঝা যায় না। যেমন বোঝা যায় না, মন্তেশ্বরের (বর্ধমান, পৃঃ ২১৩-১৮) চামুণ্ডাপূজার 'function' কি, অথবা পাঁচালের গাজনের (বাঁকুড়া পৃঃ ৪০০), বীরভূমের অধিকাংশ ধর্মপূজার (পৃঃ ৩১৫-২২) এবং আরও অনেক উৎসব-পার্বণের আচার-অনুষ্ঠানের। বোঝা যায় না, দেবী যোগাদ্যার অথবা শিবের আবির্ভাবের কিংবদন্তী অতিকথা কেন পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে প্রচলিত! কেন জমিদার ও সামন্তরাজারা অধিকাংশই (শতকরা অন্তত ৯৫ জন) বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী, এমনকি মানভূম-পুরুলিয়ার আদিজনগোষ্ঠীর সর্দাররা 'রাজপুত' হয়ে বৈষ্ণবধর্মেরই পোষক। উপযোগ বা

স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেটা কেবল বিকীরণতত্ত্ব অথবা উপযোগতত্ত্বের মানদণ্ড দিয়ে পরিমাপ করা যায় না, বোঝা যায় না। ম্যালিনৌস্কি আফ্রিকার কোনো-কোনো অঞ্চলে নতুন ধরনের ঘরবাড়ি গির্জা মোটর লরি পোশাক-পরিচ্ছদ চালচলন ইত্যাদি দৃশ্য বিমানে উড়তে উড়তে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন, এটা আফ্রিকার ঐতিহ্যগত (traditional) সংস্কৃতিও নয়, আবার ঠিক ইয়োরোপের সংস্কৃতিও নয়, "a new type of culture, related both to Europe and Africa, yet not a mere copy of the either"[১৬]—সেরকম অনেক দৃশ্য বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বিমানে উড়তে উড়তে অথবা 'অ্যাম্বেসেডার' গাড়িতে যেতে যেতে তিনি দেখতে পেতেন, কিন্তু তাঁর functionalism দিয়ে নিশ্চয় ব্যাখ্যা করতে পারতেন না কেন রেলপথ মোটরপথের পাঁচ-দশ মাইলের মধ্যে এখনও গ্রাম্য পরিবহন পালকির ব্যবহার আছে, কেন গির্জার কাছেই কোনো চণ্ডী বা কালীপূজায় পাঁঠাবলির রক্তস্রোত বয়ে যায়, কেন এরকমের পাশবিক দারিদ্র্যের স্তরে এদেশের অধিকাংশ মানুষ নির্বিকার হয়ে থিতিয়ে আছে, কেন রেলগাড়ির দিকে গ্রামের লোক হাঁ করে চেয়ে থাকে এবং নগ্ন-অর্ধনগ্ন বালকবালিকারা মুখ ভ্যাংচায় আর কাদা ছোঁড়ে। কেন? মোটকথা functionalism দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যায় না এবং যাতে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট বোঝা না যায় তার জন্যই এই ফাংশানালিজম্-এর কাঁদুনে-গ্যাস দিয়ে সংস্কৃতির স্বরূপ-অন্বেষকদের চোখ ঝলসে দেওয়া। অর্থাৎ function তো প্রত্যেক উপাদানেরই একটা-না-একটা কিছু আছে।

তথাপি সংস্কৃতির অন্তঃস্থলের সুসংহতি (internal coherence) বজায় থাকছে কি করে? এবং আমাদের দেশ ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে? বাংলা দেশ বা পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র ভারতেরই প্রতিচ্ছবি, অবশ্যই তার বিশেষত্ব-বৈচিত্র্য নিয়ে। একথাও ঠিক যে 'সংস্কৃতি' কতকগুলি বস্তুগত (material) ও ভাবগত (ideological) উপাদানের একটি 'সমূহ' (aggregate) বিশেষ। কিন্তু দার্শনিক ভাষায় বলা যায়, এই 'সমূহ' কখনই 'যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ' (mechanical aggregate) নয়। তাহলে কিপ্রকারের 'সমূহ'? অযান্ত্রিক বা 'অযুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ'। তারই বা প্রকৃত স্বরূপ কি?

---

১৬ ***Methods of Study of Culture Contact in Africa***, International African Institute, Memo. XV, London 1938, p. VIII.

লেভি-স্ত্রাউজও এক্ষেত্রে কাণ্ডারী নন, যদিও তাঁর 'totemism' ও ভারতীয় 'caste system'-এর বিশ্লেষণ অসাধারণ এবং তার দ্বারা 'প্রকৃতি' (Nature) ও 'সংস্কৃতি'র (Culture) পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক বুঝতে অনেক সুবিধা হয়। সমগ্র প্রকৃতির শ্রেণীভেদ করে কেন মানুষ 'টোটেম'-এর সাহায্যে ? "Why do men go to such lengths to classify out the universe ?" মানুষের নিজেদের মধ্যে যখন শ্রেণীভেদ দেখা দিতে থাকে তখন প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃতির প্রতীকের সাহায্যে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিভেদের সীমা টানে। সেই প্রতীক হল টোটেম, অর্থাৎ তোমরা বাজপাখি, আমরা ময়ূর, তোমরা খরগোস, আমরা বাঘ, তোমরা হাতি, এরকম অগুণতি বিভেদ-বিভাগ, এবং টোটেম থেকে বর্ণবৈষম্য (caste) হল culture-এ প্রবেশ। আমাদের জাতীয় পতাকা এইরকম, তোমাদের জাতীয় পতাকা ঐরকম, ওদের জাতীয় পতাকা সেইরকম, যুক্তিক্রম অনেকটা এই ধরনের। "The differences between animals, which man can extract from nature and transfer to culture···are adopted as emblems by groups of men in order to do away with their own resemblances" এবং "Castes picture themselves as natural species while totemic groups picture natural species as castes"—উভয়েরই সাহায্যে মানুষ চেষ্টা করে "to overcome the opposition between nature and culture and think of them as a whole."[১৭]

পশ্চিমবঙ্গে বর্ণবিভেদগত যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য এখনও দেখা যায়, বিশেষ করে রাঢ় অঞ্চলে, লেভি-স্ত্রাউজের এই বিশ্লেষণরশ্মিতে তার মর্মস্থল অনেকটা আলোকিত হয়ে ওঠে কিন্তু আরও অনেক আনাচ-কানাচ অন্ধকার হয়ে থাকে। একবৃত্তের গণ্ডির মধ্যে সংস্কৃতির স্থিতি এবং দীর্ঘস্থিতির নিমিত্ত-কারণ কি ? সেকথা বারংবার মনে হয়।

প্রধান কারণ, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের একই জীবনবৃত্তে অবস্থান। কোনো বহিরাগত উপাদান-কারণ (material cause) অথবা ভাবগত-কারণ (ideological cause) এই জীবনবৃত্ত থেকে তাদের বিকেন্দ্রিত করতে পারেনি, অথবা এই বৃত্তের পরিধিও তেমন প্রসারিত করতে পারেনি। তাই

১৭ Claude Levi-Strauss : *The Savage Mind*, London 1966, Ch. IV.

একই সংস্কৃতিবৃত্তে চক্রাকারে আবর্তন এবং দীর্ঘকাল আবর্তনের ফলে জীবনবৃত্তের নিয়ন্ত্রক হিসেবে অনেক বেশি প্রভাবশালী সংস্কৃতিবৃত্ত। আমাদের দেশে তাই ইয়োরোপ-আমেরিকার মতো urbanization অথবা proletarianization হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সমগ্র সমাজ-জীবনকে প্রভাবিত করার দিক থেকে সামান্য বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে তার বিকাশ আরও উৎকট হয়েছে। বাঙালী শ্রমিক, কারখানার বাইরে গৃহস্থ অথবা চাষী, আধা-চাষী, গ্রামের মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো জেলায় যে-কোনো কারখানার বাঙালী শ্রমিকদের জীবনবৃত্ত পর্যালোচনা করলে এ-সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাভাবনা মানসতা আজও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বেশ দৃঢ়মূল রয়েছে, এমনকি কবচমাদুলিধারী (গ্রহরত্ন তো বটেই) বাঙালী বায়োকেমিস্ট ফিজিসিস্টদের মধ্যেও। তাই কলকারখানার চৌহদ্দির মধ্যে অথবা ময়দানে যে বাঙালী হিন্দু মজুর মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে মার্ক্‌স-লেনিনের নামে বিপ্লবের স্লোগান দেয়, সেই বাঙালী মজুর নিজের ঘরে ফিরে এসে (মজুরদের কোয়ার্টারে নয়) হাতজোড় করে নারায়ণশিলার পুজো করে, গ্রামের লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে গিয়ে মজুরিবৃদ্ধির জন্য মানত করে।[১৮] এটা কিন্তু মার্ক্‌সীয় অর্থে মোটেই contradiction নয়, কারণ এরকম আচরণ হল ঘরে ফিরে এসে আফিসের পোশাক ছেড়ে ফেলার মতো, অর্থাৎ মার্ক্‌স-লেনিন, ফিজিক্স-কেমেস্ট্রি, এগুলি আজও আমাদের কাছে আফিসের পোশাকের মতো, ঘরোয়া পরিবেশে অস্বস্তিকর, তাই পরিত্যাজ্য। আসলে এটা হল সংস্কৃতিবৃত্তের পূর্ণগ্রাস জীবনবৃত্তকে। সংস্কৃতিবৃত্তকে 'ideological superstructure' এবং জীবনবৃত্তকে 'material base' বলা যায়। সংস্কৃতিবৃত্তের প্রাধান্য পশ্চিমবঙ্গে অত্যধিক এবং জনসাধারণের জীবনবৃত্তকে তা যে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। গোড়াতে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা গত পঁচিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘুরে, একই গ্রামে একই অঞ্চলে একাধিকবার গিয়ে, একই উৎসব একই মেলা একই অনুষ্ঠানকর্ম আচার-বিশ্বাস-দেবদেবী মন্দির দেখে দেখে একেবারে দূর হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃতিবৃত্ত নিয়ন্ত্রণ (control) করছে জীবনবৃত্তকে এবং জীবনবৃত্তের অর্থনীতিকেও। সংস্কৃতিবৃত্ত এখানে 'manipulator',

১৮ পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া-হুগলি জেলার কারখানা-অঞ্চলে এরকম দৃশ্য অনেক দেখেছি এবং লোকবল অর্থবল না থাকাতে আমার সাধ্যমতো একসময় খানিকটা সমীক্ষার কাজও করেছিলাম। ইচ্ছা আছে এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' এবিষয়ে আলোচনা করব।

জীবনবৃত্ত তার দ্বারা 'conditioned', কাজেই এমন যদি কাম্য হয় যে জীবন-বৃত্তকে স্থিরশান্ত রাখতে হবে, মধ্যে মধ্যে তার মধ্যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলে তাকে প্রশমিত করতে হবে, তাহলে সংস্কৃতিবৃত্তকে 'ম্যানিপুলেট' করে তা সহজেই করা সম্ভব হতে পারে। মার্ক্‌সইজমকে যাঁরা 'dogma' বা বদ্ধসংস্কার মনে করেন, বিজ্ঞান মনে করেন না, তাঁদের কাছে এরকম কথা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। যদি হয় তো নাচার। বিভ্রমের (illusion) কুয়াশায় বাস্তবকে (reality) আচ্ছন্ন করে রাখাব এটা একটা বড় কৌশল, এবং আমাদের সংস্কৃতিবৃত্তের বিন্যস-রচনাব এই কৌশল কত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ তা রীতিমত অনুধাবনের বিষয়। প্রথম খণ্ডেব 'ভূমিকা'তে সংস্কৃতির তত্ত্বীয় আলোচনা এইখানে শেষ কবছি, তৃতীয় খণ্ডেব শেষ অধ্যায়ে এর সমাপ্তি হবে।

'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' পুরাকীর্তিব বিবরণ নয়। বিভিন্ন জেলার নানারকমের লৌকিক উৎসব আচার-অনুষ্ঠান প্রথা-সংস্কার দেবদেবী দেবালয় শিল্পকলা জনগোষ্ঠী প্রভৃতির বিবরণ, যার সমগ্র রূপকে 'বঙ্গজনসংস্কৃতি' বলা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে (পূর্বাঞ্চলের) পুরাকীর্তির তালিকাবদ্ধ বিবরণ আছে এবং সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্যেক জেলার পুরাকীর্তির আরও বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করছেন। এই সমস্ত বিবরণের সঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'র একটা মৌল পার্থক্য আছে। এই গ্রন্থে প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক বিষয়ের যথাসম্ভব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য ও পশ্চাদভূমি উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে, কেবল প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা বা রিপোর্ট দিয়েই কোনো বিষয়-পরিচয় শেষ করা হয়নি। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সেটা যতদূর সম্ভব সমাজবিজ্ঞানসম্মত। এর বেশি কিছু বলা অনাবশ্যক।

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে যখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির তথ্যান্বেষণের কাজে গ্রামে গ্রামে পর্যটন আরম্ভ করি, তখন 'প্রগতিবাদী'দের মধ্যে অনেকে আমার শোচনীয় পরিণামের কথা ভেবে রীতিমত দুশ্চিন্তিত হয়েছিলেন, কোথায় গেল আমার 'মার্ক্‌সবাদ' এবং আমার 'সমাজতন্ত্রনিষ্ঠা'! ওসব নিশ্চয় তরুণ বয়সের উচ্ছ্বাস। কেউ কেউ কাগজপত্রে লিখে অভিযোগ করেন: 'বিনয় ঘোষ এখন বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পুরনো মন্দির মস্‌জিদ দেখছেন,

নানারকমের লোকশিল্প সন্ধান করছেন, দেবদেবীর পুজো দেখছেন, উৎসব-অনুষ্ঠান দেখছেন, গাজন দেখছেন মেলা দেখছেন, পুতুলনাচ দেখছেন, সং দেখছেন। অথচ গ্রামে গ্রামে চাষীরা যে নিদারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করছে এবং অনাহারে মরছে, মন্দির উৎসব ইত্যাদি দেখে তা দেখার অবসর তিনি পাচ্ছেন না'। একথার তখন কোনো উত্তর দিইনি, কারণ উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। এখন এই অভিযোগের বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে ভূমিকাটি শেষ করব।

সংস্কৃত কলেজের সুদর্শন পণ্ডিতমশায়ের অভিযোগ একরকম এবং এবম্প্রকার প্রগতিবাদীদের অভিযোগ আরএকরকম। পণ্ডিতমশায়ের কথা আগে বলেছি, এখানে প্রগতিবাদীদের কথা বলছি। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (Cultural revolution) সময় (১৯৬৬-৭১) অত্যুৎসাহী তরুণের দল আবেগে অন্ধ হয়ে ইতিহাসের সমস্ত পুরাতন নিদর্শন—ঘরবাড়ি রাজপ্রাসাদ মন্দির মূর্তি শিল্পকলা ইত্যাদি—ধ্বংস করার অভিযানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের মুখের বুলি ছিল, সেকালের রাজারাজড়া-সামন্তদের যুগের, অথবা পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি থেকে আমদানি কোনো সাংস্কৃতিক নিদর্শনের চিহ্ন, জনগণতান্ত্রিক চীনের মাটিতে থাকবে না, সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে। নিশ্চিহ্ন করার অভিযানও দুরন্তগতিতে আরম্ভ হয়েছিল। 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক' ধ্বনির এক উন্মত্ত জোয়ার এসেছিল তখন। জীর্ণ পুরাতন সামাজিক আদর্শ-নীতি অবশ্যই ভেসে যাওয়া উচিত, কিন্তু জীর্ণ পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক নিদর্শন নিশ্চয় ভেসে যাওয়া অথবা ভাসিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেন নয়?

চীনের তরুণদের পুরাতনবিরোধী অভিযানের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করার জন্য এইসময় মাও সে-তুঙ তাঁদের আহ্বান করে বলেন: "রাজামহারাজা বা সামন্তপ্রভুদের রাজকীয় প্রাসাদ-অট্টালিকা, তাঁদের মূল্যবান সব রেশমের মণিমুক্তাখচিত বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্তর, লোকশিল্পের নিদর্শন—এগুলো কি রাজারা নিজেরা তৈরি করেছিলেন? তাঁরা তৈরি করেননি। তৈরি করেছিলেন চীনের অসাধারণ কলাকুশলী মিস্ত্রী মজুর কারিগর-শিল্পীরা। তারা চীনের জনসাধারণ। তাঁদের দক্ষতা, তাঁদের কুশলতা, তাঁদের মেহনত, রাজারাজড়া-সামন্তরা শোষণ করে নিজেরা উপভোগ করেছেন, চূড়ান্ত বিলাসিতা করেছেন। এই কথাটাই মনে রাখা দরকার। পুরাতন

প্রত্নতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলি ধ্বংস না করে সেগুলিকে চীনের লোক-প্রতিভার ও লোককৃতির স্মৃতিচিহ্ন-রূপে রক্ষা করা কর্তব্য।"[১৯]

তরঙ্গ রুদ্ধ হল। এবং ধ্বংসের অভিযান শান্ত হল। কারণ মাও-এর আবেদন তরুণদের মর্মে পৌঁছল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, "that the treasures of the past demonstrated the ageless skill and genius of the working class who made them, not the genius of the emperors who had enjoyed them."[২০] প্রাচীন লোককীর্তি সম্বন্ধে চীনের প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গি 'The Institute for the Preservation of Yunkang Antiquities' থেকে প্রকাশিত (১৯৭৩) 'ইউনকাঙ গুহামন্দির' সম্বন্ধে বিবরণের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়: "The Yunkang cave temples spread the message of religious superstition which helped to bolster the feudal regimes. However, as great works of sculpture, they occupy an important position in the history of Chinese art. They reflect the superb creative talents of the harbouring people of ancient China and remain priceless relics for critical study and assimilation."

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সন্ধানে বছরের পর বছর গ্রামের পর গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর এইটাই একমাত্র যুক্তি। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টিভঙ্গি নেই, দ্বিতীয় কোনো যুক্তি নেই, দ্বিতীয় কোনো দার্শনিক তত্ত্বও নেই। বড় বড় রাজা-মহারাজা জমিদারদের বিশাল বিশাল অট্টালিকা প্রাসাদ, অথবা সাহেবদের বাণিজ্যকুঠি-নীলকুঠি, বহুরকমের দেবদেবীর নানারকমের দেবালয়ের স্থাপত্য, পোড়ামাটির ও পাথরের আশ্চর্য কারুকার্য, অসংখ্য বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি-ভাস্কর্য, লোকশিল্পকলার বৈচিত্র্য এবং এরকম আরও অনেককিছু যা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে দেখেছি, তা কখনও আমার কাছে রাজারাজড়াদের অথবা জমিদারদের কীর্তির চিহ্ন বলে মনে হয়নি, বরং আমাদের বাংলা দেশের অসাধারণ লোক-প্রতিভাজাত লোককীর্তি বলে মনে হয়েছে। বিশাল রাজপ্রাসাদ, বিরাট মন্দির, পাথরের অপূর্ব দেবমূর্তি, কাঠের আসবাবপত্র, চণ্ডীমণ্ডপ, লোহা-

---

১৯ **William Watson : Ancient China : The Discoveries of Post-Liberation Archaeology, New York 1974.**

২০ **Watson : Ibid, p. 9.**

পিতল-কাঁসার নানারকম জিনিসপত্র ইত্যাদির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে এগুলি তো রাজারা করেননি, তাঁদের প্রজারা করেছে, অর্থাৎ বাংলার স্থপতি সূত্রধর ভাস্কর চিত্রশিল্পী মৃৎশিল্পী কর্মকার তন্তুবায় প্রভৃতি লোকসাধারণ করেছে। অধিকাংশই মধ্যযুগের রাজকীয় বিলাসিতা এবং ধর্মীয় মনোভাব চরিতার্থের জন্য তাঁরা করেছেন, কিন্তু কীর্তিগুলির মধ্যে ধর্মও নেই, বিলাসিতাও নেই, আছে লোকপ্রতিভার স্বাক্ষর, যা দেখে ভবিষ্যতে বাংলার জনসাধারণ তাদের নিজেদের কীর্তি-সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে, গর্ববোধ করতে পারে। লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত লোকাচার লোকসংস্কার ইত্যাদিও লোককীর্তির অমূল্য নিদর্শন, কেবল লোকাচার ও লোকসংস্কারের মধ্যে যে-কোনো জন-গোষ্ঠীর সামাজিক ক্রমবিকাশের অতীতের স্তরগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মূল্যও এদিক থেকে কম নয়। "Each social stratum, as well as the young people and children, have many folk poems···We can collect large numbers of old folk songs, and next time publish a collection. The future of Chinese poetry is folk songs first and the classics second."[২১] সঙ্গীত-নৃত্য বাংলার অধিকাংশ উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ এবং লোকসঙ্গীত-লোকনৃত্যের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের সংগ্রাম-দুঃখকষ্ট-বেদনা-হতাশা-আশা-আনন্দের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়।

সংস্কৃতি আর সমাজের মধ্যে, সংস্কৃতি আর জীবনের মধ্যে, · ারণ জনস্তরে সংঘাত ও সংযোগের স্তর-সূত্রগুলি কোথায়, উচ্চস্তরের সঙ্গে জনস্তরের ব্যবধানের বিশেষত্ব কি, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' তারই খানিকটা পরিচয় পাঠকদের দিতে পারবে মনে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ তিনটি খণ্ডের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করার আগে কোনো পাঠকের এই পরিচয় সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করা সম্ভব হবে না।

বিনয় ঘোষ

---

২১ Mao Tse Tung : Talks at the Chengtu Conference, March 1958, in *Mao Tse-Tung Unrehearsed, Talks and Letters,* 1956-71, ed. by Stuart Schram, Penguin 1974, p. 123.

বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস

দশাবতাব তাস
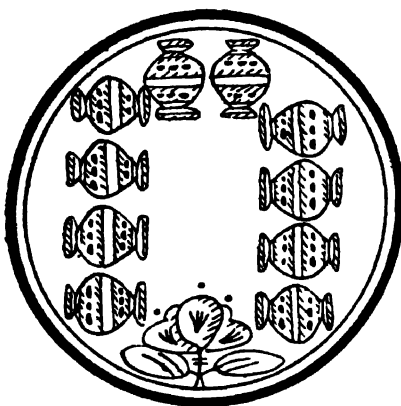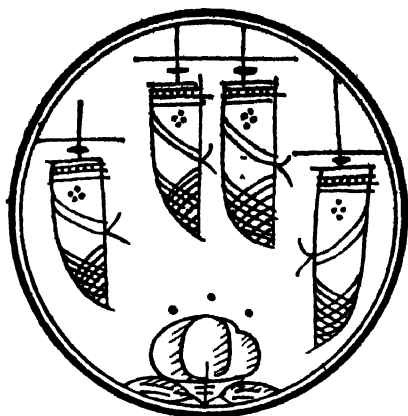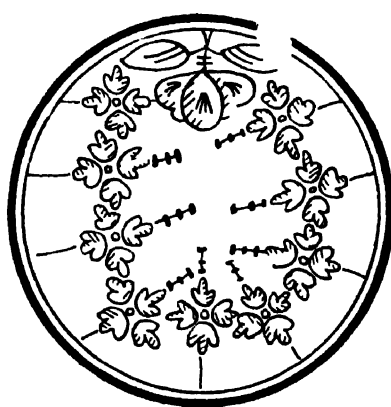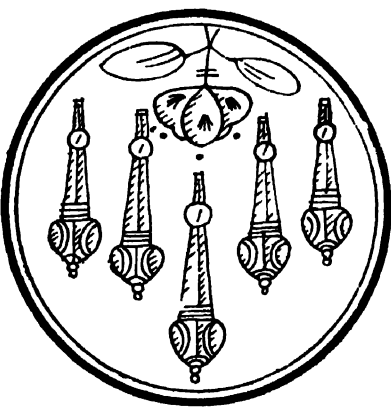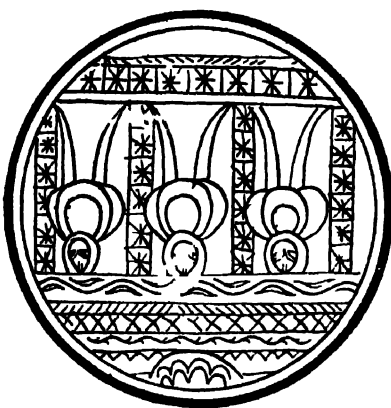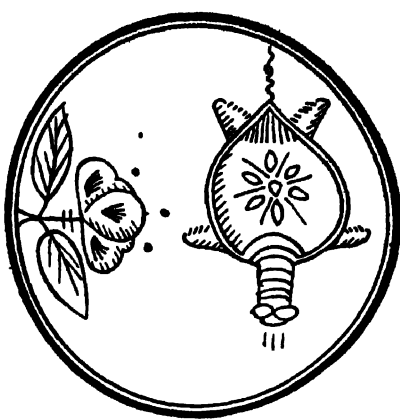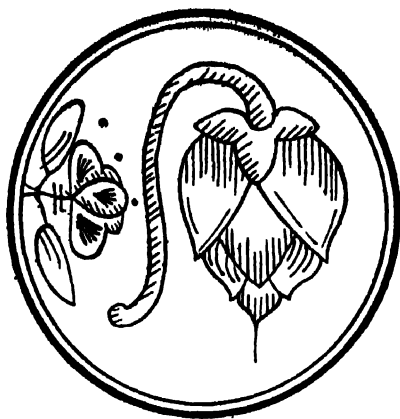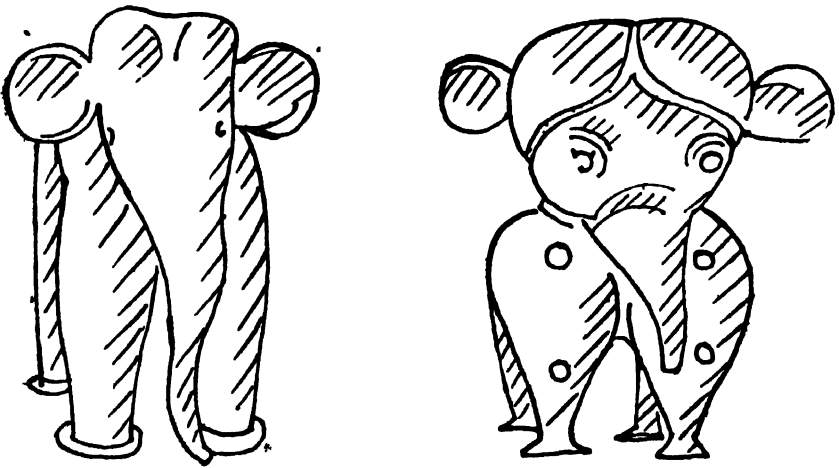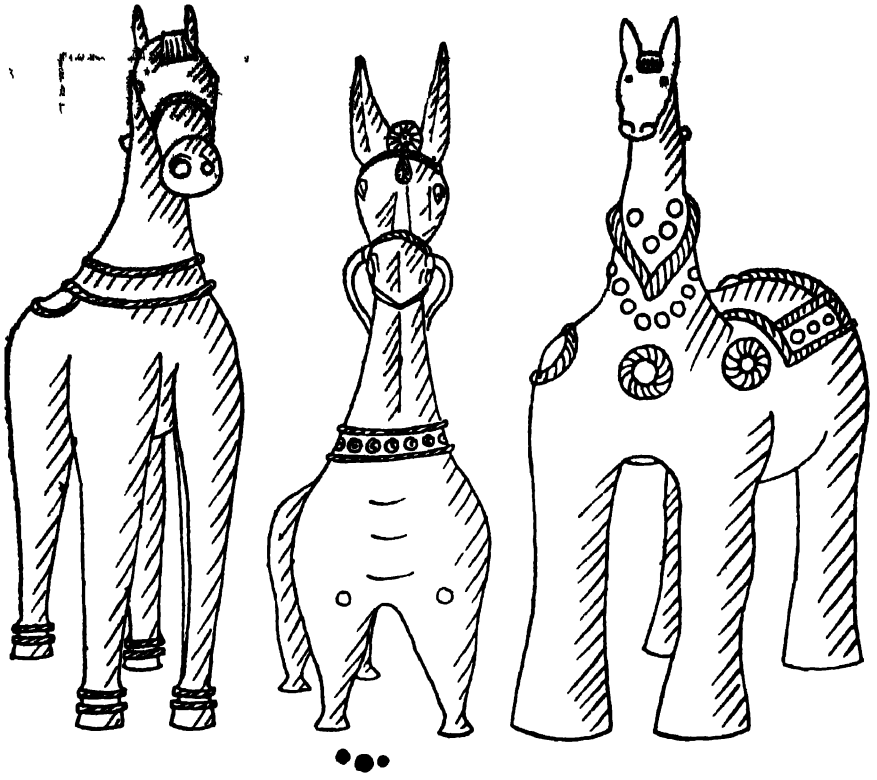
বাঁকুডাব মৃৎশিল্প
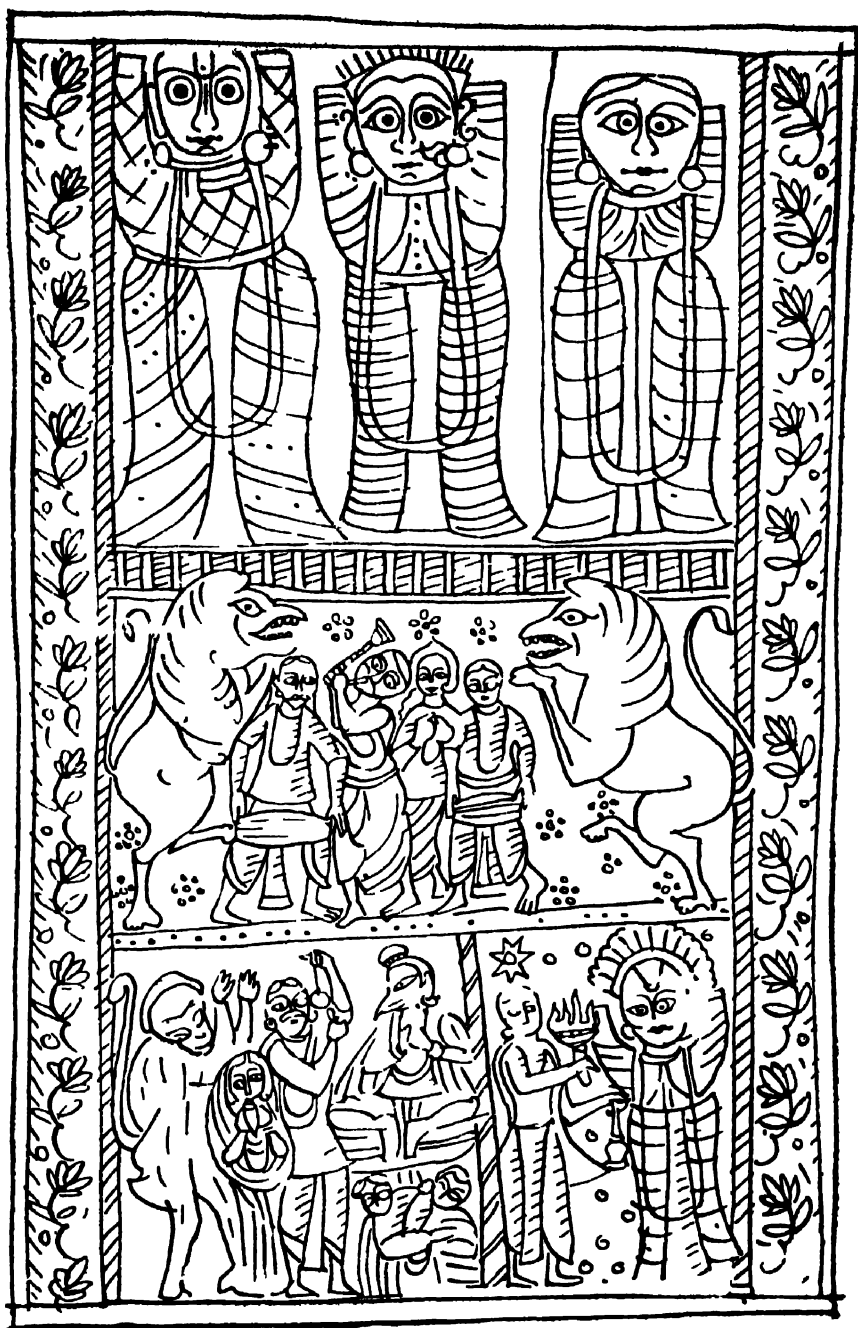
পটুয়াদের পট।

বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণ

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি সাধারণভাবে বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গীভূত এবং ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে তার সংযোগও অনস্বীকার্য। পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ভারতের বহু সাংস্কৃতিক উপকরণ ও গড়নের সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির যে রূপসাদৃশ্য দেখা যায়, তা সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই ভিত্তির মূল প্রাগিতিহাসের কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সেইজন্য ভারতসংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গসংস্কৃতির রূপমণ্ডন বিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতসংস্কৃতির সাগর অভিমুখে যাত্রাপথে বহু জানপদসংস্কৃতির বিচিত্র স্রোতস্বিনীধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহু জাতিউপজাতির ও জনগোষ্ঠীর দান আছে তাতে। বঙ্গসংস্কৃতি, বাঙালী জাতি এবং তার অন্তর্ভুক্ত বহু বর্ণ-গোষ্ঠী তাদের মধ্যে অন্যতম।

ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন জানপদ-সংস্কৃতির যে সম্পর্ক, এক-একটি জানপদ-সংস্কৃতির সঙ্গে সেই জনপদান্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের সম্পর্কও কতকটা অনুরূপ বলা চলে। আধুনিক জাতিবিজ্ঞানের অর্থে 'বাঙালী' একজাতি বলে গণ্য হলেও, বহু উপজাতি সম্প্রদায় ও বর্ণের সংমিশ্রণে তার উদ্ভব হয়েছে। তারও আগে, মৌল ও সঙ্কর মানবজাতির শাখাপ্রশাখার মিলনমিশ্রণ ঘটেছে বাংলাদেশে। নৃতত্ত্ববিদ্ ও জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা তার বিচারবিশ্লেষণ করেছেন। জাতিশুদ্ধতা বিজ্ঞানীদের কাছে 'মিথ' বা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বর্ণকৌলীন্যের বিবেচ্য কোনো বাস্তব ভিত্তি থাকলে, তা কৃষ্টিগত ও কুলাচারগত, জৈবিক শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার সঙ্গে তার তেমন কোনো

সম্পর্ক নেই। বরং দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণের মধ্যে যতটুকু অসবর্ণ-মিলনের উদার সুযোগ থাকে, তথাকথিত অনুচ্চবর্ণের মধ্যে তাও থাকে না। আদিবাসীদের স্তরে পৌঁছলে দেখা যায়, ক্ল্যান্ (clan) বা 'সিব্' (sib)-এর বন্ধন রীতিমত কঠোর। অনেকক্ষেত্রে এই কঠোরতা এত বেশি যে উচ্চবর্ণের কুলীনদের গোত্রগোঁড়ামিও তার তুলনায় উদার মনে হয়। সুতরাং জৈবিক শুদ্ধতার দাবিতে বর্ণাভিমান বা উচ্চানুচ্চভেদ সঙ্গত নয়। বৃত্তি আচার ও সংস্কারের পার্থক্যের জন্যই কালক্রমে এই ব্যবধান ঘটেছে। সামাজিক গড়ন ও কর্মব্যবস্থাই তার জন্য দায়ী, কোনো জাতিকর্মা বিধাতাপুরুষ দায়ী নন। বৃত্তি আচার সংস্কার ধ্যানধারণা অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান নিয়েই যখন 'সংস্কৃতি', তখন তাতে সকল জাতির ও বর্ণের দান যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে বিচার্য। শ্রেণীভেদে বা কুলভেদে সাংস্কৃতিক দানের তারতম্য নেই বিজ্ঞানীর কাছে। এক-একটি জনপদের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে, বিশেষ ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবিন্যাসের জন্য এক-একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির রূপায়ণ হয় এবং ক্রমে সেটি তার স্বকীয় সুষমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের একটি সাংস্কৃতিক 'ব্যক্তিত্ব' গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ হল বাংলাদেশের এইরকম এক-একটি অঞ্চল। এই সব আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে বঙ্গসংস্কৃতির সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা, দুয়েরই বিকাশ হয়েছে। তাদের বিস্তারিত অনুশীলন বঙ্গসংস্কৃতির সামগ্রিক রূপোপলব্ধির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' এই ধরনের অনুশীলনের একটি 'নমুনা' মাত্র।

অনুসন্ধানের রীতি ও অন্তরায়

কিন্তু অনুশীলনের পথে অন্তরায় অনেক। প্রথম ও প্রধান অন্তরায় হল, চিরাচরিত 'অ্যাকাডেমিক' পদ্ধতিতে এ-অনুশীলন কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়। তার জন্য সরজমিনে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। দ্বিতীয় অন্তরায় হল, কেবল একটি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধান করলে, তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ বিভিন্ন জ্ঞাতি-বিদ্যার (allied disciplines) আলোক নানাকোণ থেকে প্রক্ষিপ্ত করতে না পারলে, জনমানসের জটিলতা ভেদ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ইতিহাস নৃতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব, এই ধরনের পরস্পর-নির্ভর জ্ঞাতি-বিদ্যা বলে সুধীজনমহলে ক্রমেই স্বীকৃত হচ্ছে। প্রত্যেক বিদ্যার ক্ষেত্রসীমাও প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। একজন ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদ্যায় সুরক্ষিত হয়ে প্রত্যবেক্ষণকার্যে অগ্রসর হওয়া এবং তাতে সাফল্যলাভ করা সাধনাতীত ব্যাপার। সকল শ্রেণীর জ্ঞানীগুণীদের

সহযোগিতা ভিন্ন একাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়। এসব জেনেশুনেও, এই অনুশীলনের দুরূহ সংকল্প গ্রহণ করার একমাত্র যুক্তি হল, ভবিষ্যতে একাজ করবার ইচ্ছা থাকলেও কারও পক্ষে করা বোধহয় আর সম্ভব হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের দ্রুত রূপান্তর ঘটছে। ভবিষ্যতে আরও দ্রুতগতিতে ঘটবে। ব্রিটিশযুগে যেসব কারণে গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি স্থিতিশীল ছিল, বর্তমানে স্বাধীন পরিবেশে সেই কারণগুলি ক্রমেই অপসারিত হচ্ছে। গ্রাম্যসমাজের গড়নের (social structure) এবং সেই সঙ্গে মানুষের আচারঅনুষ্ঠানের ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটছে। ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন ইতিহাস রচনার জন্য আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেটুকু যাবে তার মধ্যে কৃত্রিম ও বিকৃত নিদর্শনই থাকবে বেশি। এই অনুসন্ধান ও অনুশীলনের আশু আবশ্যকতা তাই এত বেশি। কারণ আজকের পরিবর্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শুভলক্ষণ হল, আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যমান, [illegible]গুণ ও ঐতিহ্য জানবার অদম্য আগ্রহ। এই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আজ কেবল শহরনগরের শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেও সক্রিয়ভাবে সঞ্চারিত। গ্রামে গ্রামে এই ঔৎসুক্যের প্রকাশ আমি দেখেছি এবং অনুভব করেছি। উনিশ শতকে যে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের (cultural renaissance) সূচনা হয়েছিল বাংলাদেশে, তা ছিল মহানগরজীবী উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ। আজ তার নাগরিক উচ্চশ্রেণীগত সীমানাপ্রাচীর ভেঙে পড়ছে। সত্যকার নবজাগরণের লক্ষণগুলি আজ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। এই নবজাগ্রত ঐতিহ্যচেতনাই এই দুঃসাহসিক অনুশীলনকার্যের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি।

আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন ভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈচিত্র্য কেন বোঝা যায় না, সে সম্বন্ধে একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন[১]:

> ...যেখানেই হউক না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভাল করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।...
>
> আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnologyর বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম...

১ রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা', ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, ১৩১২ সন।

রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের সেই প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া, গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোন বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে…

রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধ যে কত গভীর ছিল তা তাঁর পঞ্চাশ বছর আগেকার এই উক্তি থেকে বোঝা যায়। পুঁথিসর্বস্ব ইতিহাসচর্চার ত্রুটি কোথায় তাও তিনি আভাসে উল্লেখ করতে ভোলেননি। কেবল পুঁথি না পড়ে, পুঁথি ছেড়ে সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে 'পড়বার' চেষ্টা করা দরকার, কারণ 'তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না।' সন্ধানীদের শব্দভাণ্ডারে 'প্রাইমারি সোর্স' বা প্রাথমিক আকর বলে যে কথা আছে তা সাধারণত অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা ছাড়িয়েও সজীব মানুষকে সরজমিনে প্রত্যক্ষ করাকে রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানের আদিনিকেতনে' প্রবেশ করা বলেছেন। দেশের বিভিন্ন অংশের ও অঞ্চলের সাংস্কৃতিক তথ্য সন্ধান ও সংগ্রহ করার আবশ্যকতা আছে, কারণ 'স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে'। এই বিভিন্নতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সাংস্কৃতিক অভিন্নতার ভিত্ কোথায় তার খোঁজ পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিককালে ইতিহাসচর্চা ও এষণা তাই নির্জীব পুঁথিপত্রের গণ্ডি ছেড়ে সজীব মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শলাভের জন্য উৎসুক হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করেছেন, রাজবংশানুক্রমের ইতিহাস আলোচনায় পক্ষে একদা যে অনুশীলনরীতি নির্ভরযোগ্য ছিল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমায়াত ধারা বিশ্লেষণের পক্ষে তা আদৌ পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য প্রত্যেক দেশের ছোট-ছোট অঞ্চলের জনপ্রকৃতির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ

করা প্রয়োজন। ইতিহাস রচনার এই রীতিকে বলা হয়েছে—'the process of writing history 'from the bottom up', through the use of local materials and a local focus.'[২] ইতিহাস যদি প্রকৃত সংস্কৃতির ইতিহাস হয়, তাহলে সে-ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টি 'from the bottom up' প্রসারিত না হলে তার সত্যকার রূপোপলব্ধি বা বিশেষত্ব ব্যাখ্যান সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এই অনুশীলনরীতির প্রাথমিক পরীক্ষালব্ধ ফল হল 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'।

সমাজতাত্ত্বিক ও মার্ক্সবাদী ইতিহাস-বিচার

সমাজবিজ্ঞানীরা ইতিহাসচর্চার এই বিশেষ পদ্ধতিকেই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস-বিচার বলেন। আমেরিকান ইতিহাস-সভা 'from the bottom-up' অনুশীলনের যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানীরা তাকেই ইতিহাসচর্চার 'sociological technique' বলেন। অ্যাকাডেমিক পদ্ধতি এবং এই সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য হল এই যে কেবল অধীত বিদ্যার আলোকে যে-সব সামাজিক ঘটনা ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, ঘটনাক্রমের অন্তর্লীন সূত্রটির সন্ধান পাওয়া যায় না, দ্বিতীয় পদ্ধতিব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোকে তা ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যুগেব অন্যতম বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম (Karl Mannheim) এই সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে তাই বলেছেন[৩]:

> The study of intellectual history can and must be pursued in a manner which will see in the sequence and co-existence of phenomena more than mere accidental

২ The Cultural Approach to History: Edited for the American History Association, by Caroline F. Ware (Columbia University 1940). এই সংকলন-গ্রন্থে এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল: Sources and Materials for the Study of Cultural History, এবং The Value of Local History. গভীর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যানে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা Karl Mannheim-এর Essays on the Sociology of Culture (London 1956) গ্রন্থের The False and the Proper Concepts of History and Society অধ্যায়টি পড়তে পারেন। আর্মীয় ইতিহাস বিচারপদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে ম্যানহাইমের উক্তি তর্কাতীত নয়। তা না হলেও 'History conceived without its social medium is like motion perceived without that which is moving' (P. 37)—ম্যানহাইমের এই স্বীকৃতি স্মরণীয়।

৩ Karl Mannheim: Ideology and Utopia—An Introduction to the Sociology of Knowledge (London 1936), P. 83.

relationships, and will seek to discover in the totality of the historical complex the role, significance and meaning of each component element. It is with this type of sociological approach to history that we identify ourselves. If this insight is progressively worked out in concrete detail, instead of being allowed to remain on a purely speculative basis, and if each advance is made on the basis of available concrete material, we shall finally arrive at a discipline which will put at our disposal a sociological technique diagnosing the culture of an epoch.

তথ্যসংগ্রহের এবং সেই তথ্য বিশ্লেষণের প্রয়োজনের সমান গুরুত্বের কথা ম্যানহাইম উল্লেখ করতে ভোলেননি। ম্যানহাইম-বর্ণিত ইতিহাসচর্চার এই সমাজ-তাত্ত্বিক পদ্ধতির আবশ্যকতাবোধ আধুনিকযুগের মার্ক্সবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যানের পরোক্ষ স্বীকৃতি ছাড়া কিছু নয়। মার্ক্সবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় মধ্যে-মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতির অর্থনৈতিক বাস্তবভিত্তির উপর অত্যধিক অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলে তা যান্ত্রিক হয়ে ওঠে, জীবন্ত সত্য হয় না। যান্ত্রিক বাস্তবতায় সত্যের সমগ্রতা প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত মার্ক্সবাদ (তা নিয়ে অবশ্যই মতভেদ হতে পারে) কোনো ঘটনার ও সমস্যার যান্ত্রিক বিশ্লেষণ সমর্থন করে না। নানাবিধ পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ইতিহাসের রথচক্র ঘর্ঘরিয়ে চলে। তাতে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব স্বীকার করলেও, নীতি-আদর্শের ও অন্যান্য উপাদানের প্রভাব অস্বীকার্য নয়। সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে, তার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়েই ইতিহাসের, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, স্বরূপটি ফুটে ওঠে। কেবল মুদ্রিত গ্রন্থের ভিতর থেকে এই উপাদান আহরণ করা সম্ভব নয়, মানুষের ও জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকেই সম্ভব। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি'তে সেই বিরাট সম্ভাবনার আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসচর্চায় তথ্য ও তত্ত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ও মতানৈক্যের অবসান আজও হয়নি। সংস্কৃতি সমাজ বা রাষ্ট্র, যারই ইতিহাস হোক না কেন, নির্ভুল তথ্য অবশ্যই তার প্রাথমিক ভিত্তি। একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তথ্যতারিখের নির্ভুলতার স্বাভাবিক আবশ্যকতাবোধ যদি অস্বাভাবিক বাতিকে পরিণত হয়, তাহলে ইতিহাসচর্চার আসল লক্ষ্য অন্তর্ধান করে। ইতিহাসের

আনুপূর্বিক ধারা আবিষ্কার করা এবং সেই ধারার তরঙ্গায়িত গতির ছন্দটি খুঁজে বার করাই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে, তথ্যের মহারণ্যে প্রবেশ করে তালকাণা হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তথ্যতারিখের হাজার নোঙরের বন্ধন ছিন্ন করে ইতিহাস-তরণি অকূল সমুদ্রে ভেসে যায়। তথ্যান্তর্নিহিত তত্ত্বের ও তাৎপর্যের সন্ধান না পেলে ঐতিহাসিক অন্বেষণও অনেকখানি ব্যর্থ হয়।[৪] তথ্যসংকলনের সঙ্গে তত্ত্বীয় ব্যাখ্যানের অত্যাবশ্যকতার কথা উল্লেখ করে কার্ল ম্যানহাইম বলেছেন :

> The transition to an evaluative point of view is necessitated from the very beginning by the fact that history as history is unintelligible unless certain of its aspects are emphasized in contrast to others. This selection and accentuation of certain aspects of historical totality may be regarded as the first step in the direction which ultimately leads to an evaluative procedure and to ontological judgments. (op. cit. Ibid)

পুঁথিপত্র বা সজীব মানুষ, যেকোন ক্ষেত্র থেকে আহৃত তথ্য সম্বন্ধে একথা সত্য। সামান্যীকরণের (generalisation) দায়িত্ব নেওয়া তাই একান্ত প্রয়োজন। তার

৪ A. F. Pollard. Honorary Director, London Institute of Historical Research : Factors in Modern History (London, 3rd edition, 1932) : "The facts and dates are the merest framework of historical study. They have no value in themselves ; mere lists of facts convey the impression that history is a fortuitous collocation of inconsequential events, instead of a coherent sequence of causes and effects ; and dates by themselves obscure the nature of historical evolution. They are useful and necessary solely as means of determining sequences, and without the careful observance of sequences we cannot arrive at causes. But it is the causes which the historical student has ultimately in view ; he seeks in the study of history an explanation of how mankind reaches its present state of development as individuals, as societies, as nations···It is only when we penetrate the outer husks of facts that we can reach the kernal of historical truth. A fact of itself is little value unless it conveys a meaning. There is a meaning behind all facts if one can only discover it···" (P. P. 3,4, 14).

জন্য চাই ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি। কার্লাইল ঐতিহাসিক গবেষকদের 'dryasdust' বলেছিলেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক কল্পনার সঙ্গে কবিকল্পনার ও সৃজনপ্রতিভার আত্মরূপ্যের কথা মনে করে, কার্লাইলের উক্তির প্রতিবাদে, বিখ্যাত সামাজিক ইতিহাসবিদ্ ট্রেভেলিয়ান বলেছেন: 'Dryasdust at bottom is a poet'. সুপ্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ অ্যালফ্রেড হ্যাডন তাঁর সারাজীবনের অনুসন্ধান-অভিজ্ঞতা থেকে সামান্যীকরণের আবশ্যকতা অস্বীকার করতে পারেননি। হ্যাডন বলেছেন, বিস্তারিত তথ্যান্বেষণ তখনই সার্থক হয় যখন তা সামান্যীকরণে পরিণতিলাভ করে। তাঁর মতে, 'অবজার্ভার' ও 'জেনারালাইজার' একই ব্যক্তি হলে একাজ সুন্দররূপে সম্পাদিত হওয়া সম্ভব।[৫] কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে তা হওয়া খুব কঠিন। অন্যান্য আরও অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ একথা স্বীকার করেও তথ্যান্তর্গত সূত্রসন্ধানে পশ্চাৎপদ হননি। এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তাই সামান্যীকরণের দুঃসাহস আমাকে সঞ্চয় করতে হয়েছে এবং পদে-পদে ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা মেনে নিয়েও কেবল যান্ত্রিক তথ্যাবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

তথ্যাহরণের সঙ্গে তথ্যনির্বাচনের সমস্যাও জড়িত। যতগুলি গ্রাম দেখেছি এবং যে-পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার প্রয়োজন হয়নি। কারণ তাতে পুনরাবৃত্তিদোষ ঘটত এবং একই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রামের বিবরণ একঘেয়ে হয়ে উঠত। ভ্রমণকাহিনীর জন্য তার আবশ্যকতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিবিজ্ঞানের আলোচনায় তা একেবারে অনাবশ্যক। প্রায় ২০০ গ্রাম প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান করেছি, তার মধ্যে প্রায় ৯০টি গ্রামের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি এবং প্রসঙ্গত প্রায় ৩০০ গ্রামের কথা উল্লেখ করেছি। অনেক গ্রামের অনেক কথা বলা হয়নি, প্রতিপাদ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে। সামান্যীকরণের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয় অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের, যা 'টিপিক্যাল', কিন্তু যা

---

৫ A. C. Haddon: History of Anthropology (London, Reprint 1945): "Detailed investigations, however valuable and interesting, are after all but material to be merged into generalisations···The most valuable generalisations are made, however, when the observer is at the same time a generaliser; but 'doubtless,' as Maharbal said to Hannibal after the battle of Cannae, 'the gods have not bestowed everything on the same man. You, Hannibal, know how to conquer; but you do not know how to use your victory.'—(Preface)

সত্যের সবটুকু জটিলতা প্রকাশ করতে অক্ষম।[৬] এই ধরনের 'টিপিক্যাল' দৃষ্টান্ত হিসেবেই 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের স্থানগুলি নির্বাচন করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতিবিচার

এই গ্রামকেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের প্রধান উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক রূপায়ণের রীতিবিচার করা। তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট-বড় সাংস্কৃতিক উপকরণগুলি সংগ্রহ করে শ্রেণীবদ্ধ করেছি এবং তার ভিতর থেকে রূপায়ণের ঐতিহাসিক গতি ও রীতি বিচার করার চেষ্টা করেছি। সাংস্কৃতিক উপকরণের (Culture-traits) সংস্থান ও বিস্তারণ-ক্ষেত্রটি (distribution) জরিপ করতে পারলে তার আকরের আভাস পাওয়া যায় যেমন, তেমনি তার ধারাবাহিক ইতিহাস, মিলন-মিশ্রণ, পরিবর্তন-বিবর্তন, বিকাশ ও ক্ষয় ইত্যাদি সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন উপকরণ কি কারণে ক্রমে স্তবকিত হয়েছে (cluster of culture-traits) এক-একটি অঞ্চলে এবং তার ফলে অভিনব মিশ্র-সংস্কৃতির (Culture-complex) উদ্ভব হয়েছে, তারও আভাস পাওয়া যায়। এই সব মিশ্র-সংস্কৃতির আদান-প্রদানে ও উপকরণ-বয়নে এক-একটি সংস্কৃতিমণ্ডল (Culture-area) গড়ে ওঠে। সারা বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের একাধিক সংস্কৃতি-মণ্ডল গড়ে উঠেছে। জনসংস্কৃতির এই অনুশীলনরীতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। খুব বেশি হলে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরা এই রীতি মাত্র গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে অনুসরণ করেছেন।[৭] অন্ধকারে ঢিল না ছুঁড়ে এবং বাঁশবনে ডোমকাণা না হয়ে,

৬ G M. Trevelyan : English Social History (London, 194. "The generalisations···must necessarily be based on a small number of particular instances, which are assumed to be typical. but which cannot be the whole of the complicated truth." (Introduction)

৭ সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থে জনসংস্কৃতির এই আধুনিক অনুশীলনরীতির আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসুদের জন্য এখানে কয়েকটিমাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম করছি : (১) Clark Wissler : Man and Culture (N. Y. 1923); (২) A. L. Kroeber : Anthropology (London. Revised ed, 1948); (৩) Kroeber and Clyde Kluckhohn ; Culture, a Critical Review of Concepts and Definitions (1952); (৪) Melville J. Herskovits : Man and his Works (N. Y. 19··); (৫) Ruth Benedict ; Patterns of Culture (Pelican Books, 1946); (৬) B. Malinowski : The Dynamics of Culture-Change (1945) ; A. Scientific Theory of Culture and other Essays (1944) ; (৭) R. H.

খোলা চোখ ও মন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত এই রীতি সন্ধানক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে, আর কিছু না হোক, জনসংস্কৃতির বাস্তব রূপ ও গতিধারা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকে এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

সংস্কৃতির 'ট্রেট্-কমপ্লেক্স-প্যাটার্ন' সম্পর্কিত প্রত্যয়গুলির (concepts) ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করব। 'কালচার ট্রেট্' হল সংস্কৃতির প্রত্যেকটি মৌল পদার্থ ও উপাদান, যার নানারকমের সমাবেশে সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপমণ্ডন হয়। যেমন শিকার, চাষবাস, ঘরবাড়ি, দেবদেবী, দেবালয়, আচার-ব্যবহার, প্রথা-সংস্কার ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান। ক্রোবের এইজন্য 'কালচার-ট্রেট'কে 'minimal definable element of culture' বলেছেন। স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি মৌল উপাদানের উদ্ভব ও বিস্তারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যায়, কিন্তু এই অনুসন্ধানের সার্থকতা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে হার্স্কোভিট্স বলেন—'methodologically its use as an end in itself is applicable only to the investigation of specialised problems. Frequently, not the single trait, but a grouping of traits found to exist in close relationship within a given culture must be the object of study', অর্থাৎ সংস্কৃতির মৌল উপাদান নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে অনুশীলন করার সময়। যেমন বিবাহ, সৎকার ও সমাধি-প্রথা, দেবালয়স্থাপত্য, বিশেষ দেবদেবীর পূজার্চনা, বিশেষ শিল্পকলার রীতি। কিন্তু সংস্কৃতির রূপবিচারে এই ধরনের এক-একটি উপাদানের স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে, বহু উপাদানের বিশিষ্ট সমাবেশ-পদ্ধতির ও বিন্যাসরীতির অনুশীলনেরই সার্থকতা বেশি। মৌল উপাদানের এই বিশিষ্ট সমাবেশ ও বিন্যাসকেই সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা 'কালচার-কমপ্লেক্স' বলেছেন। বাংলায় 'মিশ্র-

---

Lowie : Culture and Ethnology (N. Y. 1929) : The History of Ethnological Theory (N. Y. 1948) ; (৮)· W. H. R. Rivers : Psychology and Ethnology (London 1926) ; (৯) David Bidney : Theoretical Anthropology (N. Y. 1958) : (১০) Felix M. Keesing : Culture Change : An Analysis and Bibliography of Anthropological Sources, upto 1952 (Stanford University Press).

আমাদের দেশে এবিষয়ে অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে এই অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে তিনি যে ফললাভ করেছেন তা তাঁর দুইখানি বাংলা বই—'হিন্দু সমাজের গড়ন' (বিশ্বভারতী), 'নবীন ও প্রাচীন'—এবং ইংরেজি 'Cultural Anthropology and other Essays' (Revised edition 1958) বইতে সংকলিত হয়েছে।

সংস্কৃতি' বা 'যৌগ-সংস্কৃতি' বলা যেতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের বিন্যাসের ধরন সর্বত্র একরকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর কাছে সেগুলি যে প্রাধান্য-ধারায় গৃহীত হয়, এক-একটি 'কম্‌প্লেক্সে'-এ মৌল উপাদানের বিন্যাসও হয় সেই ধারায়। যেমন ক খ গ ঘ উপাদান ক-খ-গ-ঘ, ক-গ-খ-ঘ, ক-ঘ-খ-গ, ঘ-খ-গ-ক, ঘ-ক-গ-খ ইত্যাদি নানা-ক্রমে (sequence) বিন্যস্ত হতে পারে এবং সেই ক্রম অনুযায়ী সাংস্কৃতিক মনোভাবের তারতম্য হয়, বিভিন্ন যৌগ-সংস্কৃতির পার্থক্য ঘটে। বিন্যাসের এই ক্রমটি আবিষ্কার করতে পারলে, সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা ও আঞ্চলিক স্বকীয়তা সম্বন্ধে ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাদান-বিন্যাসের এই ক্রমটি আবিষ্কার করাই আমার অনুসন্ধানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি।

দক্ষিণবঙ্গে (চব্বিশপরগণায়) গ্রাম্য দেবদেবীর সমাবেশ হয়েছে এইভাবে—দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ, পীর সাতবিবি বনবিবি, শাক্তদেবী, শিব-রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। ভাগীরথীর পশ্চিমে হাওড়া-হুগলি থেকে সমাবেশের প্রাধান্য-ধারা বদলাতে আরম্ভ করেছে। হাওড়া-হুগলি পর্যন্ত পঞ্চানন্দ আছেন, কিন্তু দক্ষিণরায় ও বনবিবি-সাতবিবিরা অন্তর্হিত। আরও উত্তরে ও পুবে-পশ্চিমে পঞ্চানন্দ প্রায়-অন্তর্হিত এবং শিব সুপ্রতিষ্ঠিত। গ্রামে গ্রামে শিবের নতুন প্রতিযোগী ধর্মরাজের আবির্ভাব এই অঞ্চল থেকে। শিব-ধর্মরাজ অন্যান্য দেবদেবী, এই প্রাধান্য-ক্রম ধীরে ধীরে ধর্মরাজ শিব ইত্যাদি ক্রমে পরিণতিলাভ করেছে বীরভূম-বিষ্ণুপুর-ঘাটাল-আরামবাগ অঞ্চলে। ধর্মরাজের সহচরদেরও আঞ্চলিক ভেদ আছে, যেমন পঞ্চানন্দের আছে। দক্ষিণবঙ্গে পঞ্চানন্দ বনদেবতা ও বনদেবীর সঙ্গে অধিষ্ঠিত ও পূজিত হন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তিনি শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে পূজ্য। বীরভূম-বিষ্ণুপুরে ধর্মরাজ প্রধানত চণ্ডী-মনসার সঙ্গে বিরাজ করেন, অন্যত্র (ঘাটাল-আরামবাগ) তাঁর সঙ্গিনীদের বিচিত্র সব নাম আছে।[৮] বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা-উৎসবের এই বিন্যাসক্রম থেকে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলিকে বর্জন করলে এক-একটি লোকোৎসবের ও ধর্মাচারের উৎপত্তিকেন্দ্র (origin) ও বিস্তারণক্ষেত্র (distribution) সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। শুধু তাই নয়, বিন্যাসের বিশেষ ক্রমও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা যায়, কারণ মৌল উপাদান-বিন্যাসে এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির উদ্ভব হয় ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

---

৮ 'গ্রাম প্রদক্ষিণ' বিভাগে বিষ্ণুপুর, ময়নাপুর, বীরভূমের ধর্মপূজা, ঘাটালকেন্দ্রের ধর্মরাজ উৎসব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণ

আনুষঙ্গিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায়, বনদেবতার পূজা পশ্চিমবঙ্গের বনময় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমের 'জঙ্গল মহল' থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন পর্যন্ত। আদিকাল থেকে এইসব বনদেবতার পূজা-উৎসবের সঙ্গে স্থানীয় বনবাসীদের বাস্তব জীবনযাত্রার গভীর ও প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব-পার্বণ বা ধ্যানধারণা আর্য-বৈদিক আচারভুক্ত নয়। উত্তর ও মধ্যভারত (আর্যাবর্ত) থেকে ধীরে ধীরে পূর্বভারতে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে অনেক পরে এবং পূর্বভারতের অন্তর্গত বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এককালে একভাবে হয়নি।[১] নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ থেকে এবিষয়ে যতটুকু আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয়, বিদেহ বা মিথিলা (আধুনিক উত্তর-বিহার) অঞ্চলে প্রথম পূর্বভারতের আর্যবসতি গড়ে ওঠে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে আর্য-সংস্কৃতির বিকীরণ হয় বাসুদেবের পুণ্ড্রবর্ধনে (উত্তরবঙ্গ) এবং জরাসন্ধ রাজার মগধদেশে (দক্ষিণ-বিহারে)। পুণ্ড্রদেশের ভিতর দিয়ে ভগদত্ত রাজার প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে (আধুনিক আসাম) আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার ঘটে। পাটলিপুত্র থেকে (আধুনিক পাটনা) নন্দবংশ ও মৌর্যবংশের রাজারা যে বাংলাদেশেও রাজত্ব করতেন (খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী), তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর, চব্বিশ-পরগণা বেড়াচাঁপা) প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে এ-অনুমান সত্য বলে বনে হয়। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে (আঃ খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী) উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রজনদের 'দস্যু' বলা হয়েছে এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ ও বগধ (মগধ) দেশের মানুষকে 'অসুর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলায় এখনও 'অসুর'-সূচক একাধিক গ্রামের নাম আছে, যেমন অসুরগড়, বনঅসুরিয়া ইত্যাদি। বৈদিক-সাহিত্যের এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে পুণ্ড্র বঙ্গ ও মগধ আর্যসান্নিধ্য লাভ করলেও, আর্যসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার তখনও এসব অঞ্চলে তেমন হয়নি। 'বৌধায়ন ধর্মসূত্রে' (আঃ খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্গ ও

---

১ পূর্বভারতে ও বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা করেছেন। এ-সম্বন্ধে প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থও অনেক আছে। আমার প্রতিপাদ্যের আলোচনায় তার পুনরাবৃত্তি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক। সাধারণত যে অভিমত এখন ঐতিহাসিক মহলে গৃহীত, তারই ভিত্তিতে আমি আলোচনা করেছি। বাংলাদেশে আর্যসংস্কৃতির ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'Spread of Aryanism in Bengal' (J.A.S., Vol. 18, No. 2, 1952) নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন।

মগধদেশকে 'সঙ্কীর্ণযোনি' বা আংশিক আর্যীকৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু পুণ্ড্র,বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশ আর্যবহির্ভূত অঞ্চল বলে উপেক্ষিত হয়েছে। এই সব উক্তি থেকে মনে হয়, দক্ষিণ ও পূর্ব-বিহার প্রদেশ অনেকটা আর্যীকৃত হলেও, বাংলাদেশে ও উড়িষ্যায় কেবল আর্যসংস্পর্শ ঘটেছে, প্রকৃত আর্যীকরণ দীর্ঘকাল সম্ভব হয়নি। তার মধ্যে আবার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে প্রথমে আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে, অন্যান্য অংশে অনেক পরে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে। কেবল 'সাহিত্যে'র নয়, শিলালিপি ও মুদ্রাদির প্রমাণ থেকেও বঙ্গসংস্কৃতির ক্রমিক আর্যীকরণের এই আভাস পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে, অর্থাৎ সুহ্ম বা রাঢ়দেশে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার খ্রীস্টপূর্ব যুগে এইভাবে হয়েছিল কিনা, তার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি এখনও পাওয়া যায়নি। সুপ্রাচীন আর্যসাহিত্যে পুণ্ড্র ও বঙ্গের মতন সুহ্ম বা রাঢ়দেশের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলালিপি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ের চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের লিপি। তাতে মনে হয়, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত আর্যীকরণ আরম্ভ হয়েছে। চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' সর্বপ্রথম সুহ্ম ও রাঢ়ার নাম পাওয়া যায় যখন, তখন তার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে সেখানে বন্যবর্বর সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। সিংহলী 'মহাবংশ' গ্রন্থেও দেখা যায়, রাঢ়দেশ দুর্গম বনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল এবং বনময় রাঢ়ের সিংহরাজা বঙ্গদেশের রাজকন্যাকে জোর করে বিবাহ করে যে সন্তানের জন্ম দেন, সেই রাজপুত্র রাঢ়দেশের 'সতযোজন বিস্তৃত' জঙ্গল হাসিল করে গ্রাম বসতি গড়ে তোলেন।[১০] ই আখ্যানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাসটি 'রূপকে'র ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে কি না, ভাববার বিষয়। কেবল আর্যধর্মসংস্কৃতির নয়, বৌদ্ধধর্মসংস্কৃতিরও প্রসার বাংলাদেশে এই ধারায় হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন, প্রথমে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে, পরে পশ্চিমবঙ্গে। প্রায় ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আর্যসংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর্যসংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠার আগে পশ্চিমবঙ্গের অনার্যসংস্কৃতির একটা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। তার দিগন্তরেখা আদিপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রস্তর-যুগের বিভিন্ন পর্বের নানারকমের আয়ুধ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভৌগোলিক

১০ Mahavamsa, Chapter 6 ; Geiger's translation, PP. 51-54

১১ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগ দ্রষ্টব্য।

সীমানার মধ্যেও পাওয়া গেছে। মনে হয়, ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের উচ্চভূমিসীমা পর্যন্ত প্রধানত আদি-অস্ট্রাল (Proto-Australoid) বা নিষাদজাতির বিভিন্ন শাখার সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। শিকার, পশুপালন, কৃষি প্রভৃতি নানাস্তরভুক্ত ছিল এই সংস্কৃতি। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। শিকার ও পশুপালনের ঐতিহ্য আজও পশ্চিমবঙ্গের বহু উপজাতির মধ্যে জীবন্ত রয়েছে। এমন কি বন্য ফলমূল সংগ্রহের (food-gathering) ঐতিহ্য পর্যন্ত ('মেদিনীপুরের আদিবাসী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।[১১] ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের লোধারা প্রধানত বন্য ফলমূল সংগ্রহ করেই জীবনধারণ করত। সাঁওতালরা এখন কৃষিজীবী হলেও, শিকার তারা বর্জন করেনি। শিকার-উৎসব তাদের অন্যতম উৎসব। বর্ধমানে 'গোপভূম' নামে পরগণা ছিল, প্রধানত আসানসোল মহকুমার বনময় অঞ্চল নিয়ে।[১২] মহেন্দ্ররাজা, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি গোপভূমের সব বিখ্যাত রাজা। এখন গো-পালন করেন যাঁরা, তাঁরাই গোপ বলে পরিচিত। একদা এঁরা অন্যান্য বন্য পশুও পালন করতেন। গরুর বিশেষ মর্যাদা পরে আর্যরা দিয়েছেন বলে, এঁরা কেবল গো-পালক বলে পরিচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়। পশুপালন ও কৃষিকর্ম যে প্রায় একই খাদ্যোৎপাদন (food production) স্তরভুক্ত, তাও অনেকের মতন, এঁরাও জানেন না। তাই কৃষিকর্মী যাঁরা তাঁরা 'সদ্‌গোপ' এবং পশুপালকরা 'গোপ' বলে পরিচিত। বন্য পশুর স্বভাব দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ্য করে, তাকে পোষ মানিয়ে, তার বংশবৃদ্ধি (breeding) করার কৌশল উদ্ভাবন করা (দুধ, মাংস প্রভৃতি খাদ্য উৎপাদনের জন্য) সভ্যতার ইতিহাসে কৃষিকর্মের তুলনায় কম যুগান্তকারী ঘটনা নয়। মর্যাদা দুয়েরই সমান। কিন্তু কৃষিকর্মের উন্নত মর্যাদা আর্যসংস্কৃতির দান। ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদা-চেতনাও আর্য-বর্ণবৈষম্যের প্রভাব। সমাজের উপরতলার এই বর্ণবৈষম্যের প্রভাব সমাজের অন্যান্য স্তরেও বিস্তৃত হয়েছে। বোঝা যায় সদ্‌গোপ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতি বাংলার সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠী এই বর্ণকৌলীন্যকে স্বভাবতঃই স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধও প্রবল ছিল, তাই আর্যসংস্কৃতির পরবর্তী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন এবং অবশেষে তার নিষ্পত্তি করেছেন সেই পেশাগত বর্ণবৈষম্যের বিষ নিজেদের মধ্যে সঞ্চারিত করে। কৃষিকর্মের ও ক্ষত্রিয়ত্বের উন্নত মর্যাদা মেনে নিয়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।

১২ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগে 'অমরাগড়' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু দীর্ঘকালের ঐতিহ্য বা সংস্কার যে বহিরারোপিত নব্যসংস্কারের চাপে সহজে লুপ্ত হয় না, তার প্রমাণ সকল জাতির আচার-অনুষ্ঠান থেকে আজও পাওয়া যায়। গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়ের মহেন্দ্ররাজার বংশবিবরণ স্থানীয় কবির 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর' কাব্যে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
কহি মহেন্দ্রের বংশ বিবরণ,
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।...
জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়,
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়,
মৃগয়া করিত শ্বাপদ বধিত
বনের বরাহ করিয়া বিজয়...।

স্থানীয় কবি অমরাগড়ের সদ্গোপ-রাজবংশের বংশধরদের মুখে তাঁদের ঐতিহ্যের কথা শুনেই এই কাব্য রচনা করেছিলেন। সমস্ত বিবরণের মধ্যে 'পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার' ঠিকই যোগ করা হয়েছে। নিজেদের ঐতিহ্য ত্যাগ করে আর্যদের ক্ষত্রিয়ত্বের মর্যাদালাভের এই প্রচেষ্টা 'ইনফিরিয়রিটি-কম্প্লেক্স'-এর প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু 'জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়' বলে যে বর্ণনা আছে, তা থেকে গোপভূম অঞ্চলে পশুপালকদের প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজবংশের এক প্রবীণ বংশধর আমাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ভল্লুক মরলে তাঁদের অশৌচ পালন করতে হত। এক-একটি মৌল সাংস্কৃতিক উপাদান বা 'কালচার-ট্রেট' কিভাবে পরিবর্তিত যৌগ-সংস্কৃতির বা 'কালচার-কম্প্লেক্স'-এর মধ্যে উদ্বৃত্ত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে, এটি তার একটি উল্লেখনীয় দৃষ্টান্ত। বোঝা যায়, ভল্লুক ছিল পালিত পশুদের মধ্যে অন্যতম, এবং পশ্চিমবঙ্গের পশুপালকদের একটি শাখার বা ক্ল্যানের 'টোটেম'ও ছিল ভল্লুক। সুতরাং খাদ্যসংগ্রহ ও খাদ্য-উৎপাদন-পর্বে নানাস্তরভুক্ত জনগোষ্ঠীর যে বাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং তাদের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। জৈন ও সিংহলী গ্রন্থের রাঢ়দেশ-বিবরণ ই দৃষ্টিতে বিচার্য।

আর্যসংস্কৃতির প্রসার পশ্চিমবঙ্গে আরম্ভ হবার পরেও সর্বত্র সমান ব্যাপকভাবে হয়নি। বড় বড় বনময় অঞ্চলগুলি (যেমন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বীরভূম, উত্তর মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা ইত্যাদি) কতকটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন ছিল।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীপতিরা এইসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। উপরের সিংহাসন-বদল হলে তাঁরা নামমাত্র আনুগত্য-বদল করতেন। হিন্দুযুগ ছাড়িয়ে মুসলমানযুগে, এমনকি ব্রিটিশযুগের প্রথম পর্ব পর্যন্ত, এই বিচ্ছিন্নতা প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে অনার্য-সংস্কৃতির প্রচুর উদ্বৃত্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এবং কয়েকটি অঞ্চলে তার প্রাধান্যও অনুভব করা যায়। চণ্ডী ভৈরব কুদ্রা বড়ম প্রভৃতি নানারকমের বনদেবতার উৎসবের প্রচলন তাই আজও এই সব অঞ্চলে বেশি।[১৩] 'বাগ্দীরাজা' 'গোপরাজা' প্রভৃতির কিংবদন্তীর প্রাচুর্যও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষণীয়।

এই ধরনের দুটি নিদর্শনের কথা বলব, দুটিই অনার্যযুগের উদ্বৃত্ত নিদর্শন—**বীরস্তম্ভ** ও **ময়লা উৎসব**। 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে' এ সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আরও কয়েকটি কথা বলব। 'বীরস্তম্ভ' যে 'মেগালিথিক' বা প্রস্তর-স্মৃতিস্তম্ভযুগের নিদর্শন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। একদা নিষাদ-জাতির কোনো-কোনো শাখার মধ্যে এই স্তম্ভাচারের প্রচলন ছিল। রমাপ্রসাদ চন্দ সম্রাট অশোকের শাসনস্তম্ভ সম্বন্ধে বলেছেন যে অশোকপূর্ব যুগেও এই প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপনের প্রথা ছিল এবং স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালের বিষ্ণুর গরুড়ধ্বজ, মকরধ্বজ এবং শিবের বৃষধ্বজ, এই প্রথারই প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। পারস্যদেশে অশোক-প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভের প্রেরণা খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। এ-দেশের বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজাই ক্রমে, রমাপ্রসাদের মতে, জন্তুশীর্ষ স্তম্ভাচারে পরিণত হয়েছে[১৪]:

> The existence of pillars crowned by animal figures before Asoka turned them into Dharma pillars by engraving edicts on them indicates that such pillars were originally intended for some other purpose, evidently for worship···
>
> The cult of the pillars crowned by such figures was evidently an element of the primitive religion of Eastern India. It was probably an offshoot of the tree-cult, of the cult of the tree like the palm-tree...

---

১৩ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগ দ্রষ্টব্য। 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগে 'বনদেবতা' ও 'রঙ্কিণী' দ্রষ্টব্য।

১৪ R.P.Chanda: The Beginnings of Art in Eastern India, A.S.I. Memoir No.30, P.31,P.33. এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের 'Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley' নিবন্ধ (A. S. I, Memoir No 41) দ্রষ্টব্য।

রমাপ্রসাদ চন্দ বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজার কথা বলেছেন এবং এই আদিম ধর্মাচারের সঙ্গে স্তম্ভপূজার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর ইঙ্গিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বৃক্ষপূজার সঙ্গে তিনি যদি মেগালিথিক গোরস্থানের স্তম্ভাচারের কথা উল্লেখ করতেন, তাহলে শিলাস্তম্ভপূজা-প্রথার কৌলিক সম্পর্ক আরও প্রত্যক্ষভাবে জানা যেত। প্রাগৈতিহাসিক অনার্য স্তম্ভপূজা ও স্তূপপূজা, বৃক্ষপূজা ও জন্তুপূজা বৌদ্ধযুগেও গৃহীত ও প্রচলিত হয়েছিল। মেগালিথিক সংস্কৃতির শিলাস্তম্ভপূজা ক্রমে অনার্য শিব-রুদ্রদেবতার প্রতীকপূজায় পরিণত হয়েছে এবং তা থেকেই মনে হয় অনাদিলিঙ্গ শিবপূজার প্রবর্তন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিবের সঙ্গে শ্মশান-মশানের সাহচর্যের পৌরাণিক কাহিনীর গভীর তাৎপর্য আছে কি না চিন্তা করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গে অনাদিলিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে গোপদের প্রায়-অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে অনুমান করা যায়, কিভাবে আর্যীকৃত শিব পরবর্তীকালে পশুপালক ও অন্যান্য অনার্যসমাজে প্রবেশলাভ করেছিলেন।

সয়লা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব। বন্ধুত্ব হল দুজন বা তারও বেশি অজানা ও অনাত্মীয় ব্যক্তির মনোবন্ধন। এ-বন্ধন সামাজিক বন্ধনও, কারণ বন্ধুর সামাজিক কর্তব্য আছে, কর্তব্যপালনের নৈতিক বাধ্যতাও আছে। সমাজবিজ্ঞানীরা এই বন্ধুত্বকে সামাজিক জীবনের আদি সংগঠন বা 'ইনস্টিটিউশন' বলে মনে করেন। সম্প্রতি হার্স্কোভিট্স পশ্চিম-আফ্রিকার ডাহোমি (Dahomey) প্রদেশে এই বন্ধুত্বের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে যেসব তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন, তাতে মানবসমাজের ক্রমবিকাশে বন্ধুত্বের দান সম্পর্কে পূর্বধারণা অনেক বদলে গেছে। সাধারণত সমাজবিজ্ঞানীরা এতদিন বন্ধুত্বের তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে এসেছেন বলা চলে—'The most fundamental of these non-relationship groupings, and the most immediate, is one which is most neglected by anthropologists—friendship.'[১৫] এই উপেক্ষার কারণ হচ্ছে, হার্স্কোভিট্সের মতে, বিজ্ঞানীরা বন্ধুত্বকে সামাজিক 'ইনস্টিটিউশন' বলে মনে করেননি। কিন্তু প্রাচীনতম সমাজ-সংগঠনের মধ্যে 'বন্ধুত্ব' অন্যতম এবং সামাজিক বন্ধনের মধ্যে (বৈবাহিক, কৌলিক প্রভৃতি) বন্ধুত্বের বন্ধন আদিমতম। আমাদের দেশের রাখিবন্ধন উৎসবের মধ্যে এবং সই-পাতানো, মিতা-পাতানো প্রভৃতি প্রথার মধ্যে এই সুপ্রাচীন বন্ধুত্ব-উৎসবের স্মৃতি সেদিন পর্যন্ত জাগরূক ছিল। পশ্চিমবঙ্গের একটি

১৫ M. J. Herskovits : Dahomey, an Ancient West African Kingdom (2 vols.), N. Y. 1938 : Vol. I. Chapter 18.

সংকীর্ণ অঞ্চলে (ঘাটাল-আরামবাগ কেন্দ্র করে) এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক ও লৌকিক রূপ এখনও অনেকটা বজায় আছে। স্থানীয় লোকের কাছে আজ তার কোনো তাৎপর্য না থাকলেও, সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এই লোকোৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য গভীর। প্রধানত ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতার জন্যই এই ধরনের একটি প্রাচীন মৌলিক উৎসবের উদ্বর্তন সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়।

সাংস্কৃতিক উপাদানের তাৎপর্য-বদল

প্রত্যেক মৌলিক উপাদানের স্বাতন্ত্র্য এক-একটি যৌগ-সংস্কৃতির বিন্যাসের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। এক-একটি 'কালচার-কম্প্লেক্স'-এর বিশিষ্ট বিন্যাসের মধ্যে প্রত্যেক ট্রেট্-এর বা উপাদানের একটা বিশেষ তাৎপর্য থাকে। একটি 'কমপ্লেক্স' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য 'কম্প্লেক্সে' যখন কোনো 'ট্রেট্' গ্রথিত ও বিন্যস্ত হয়, তখন সেই ট্রেট্-এর তাৎপর্যও বদলে যায়, অনেকটা অজ্ঞাতসারে। রাসায়নিক 'কম্পাউণ্ড'-এর সঙ্গে কতকটা এই যৌগ-সংস্কৃতির তুলনা করা চলে। ক-খ-গ কম্প্লেক্স-এ খ-এর যে তাৎপর্য থাকে, চ-খ-ট কম্প্লেক্স-এ সেই একই খ-এর আর সেই তাৎপর্য থাকে না। বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতির বিন্যাসে এক-একটি মৌলিক সাংস্কৃতিক উপাদানের এই তাৎপর্য-বদলের অনেক উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিক্ষেত্র থেকে দেওয়া যায়।

নরবলি বা উৎসর্গ-প্রথা (human sacrifice) একটি সুপ্রাচীন আদিম প্রথা। নিষাদ ও কিরাত (Indo-Mongoloid) জাতির সংস্কৃতিতে এই প্রথাব গভীর তাৎপর্য ছিল। বিজয়োৎসব ও নানারকমের কামনা-উৎসবেব অঙ্গ ছিল নরবলি ও নরমুণ্ডনৃত্য (শবর, নাগা প্রভৃতি জাতির মধ্যে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল)। আর্যদের মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রথা 'অধর্ম' বলে নিন্দা করলেও, ক্ষত্রিয় রাজারা দীর্ঘকাল এই প্রথা পালন করেছেন। বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে তার অনেক উপাখ্যান-উদাহরণ আছে।[১৬] ক্রমে এই প্রথা আর্যীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে তার তাৎপর্যও বদলে গেছে। যে-কোনো হিন্দু শাক্ত দেবীর উৎসবে (যেমন দুর্গোৎসব, কালীপূজা ইত্যাদি) বলিদান অন্যতম অনুষ্ঠান। দীর্ঘকাল ধরে, একশতাব্দী আগে পর্যন্ত (যেমন রঙ্কিণী দেবীর পূজায়)

১৬ R. P. Chanda: Survival of the Prehistoric Civilisation of the Indus Valley, A. S. I. Memoir No 41. 'Human Sacrifice' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিচ্ছিন্ন নরবলিপ্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রমে নরবলির বদলে পশুপক্ষীর বলি প্রবর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তার বদলে শাকসব্জি ফলমূল বলিদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছে আরও পরে। বলিদানপ্রথা, এমন কি নরবলিপ্রথা পর্যন্ত, প্রতীকাকারে (মাটির পুতুল) আজও উদ্বৃত্ত রয়েছে। কিন্তু মৌলিক প্রথার আসল তাৎপর্য প্রায়-অন্তর্হিত। ভিন্ন কালচার-কমপ্লেক্স-এ একই উপাদানের এইভাবে তাৎপর্য বদল হতে থাকে।

তন্ত্রাচার ও তান্ত্রিক সংস্কৃতি আর একটি দৃষ্টান্ত। তন্ত্রের অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানই আদিম ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। জাদুবিদ্যা বা শবরীবিদ্যা, মারণ-উচাটন-বশীকরণ ইত্যাদির আদিম মানবসমাজে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল, পরবর্তী বৌদ্ধতন্ত্রে বা হিন্দুতন্ত্রে ঠিক তা ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের সম্পূর্ণ ভিন্ন 'কালচার কমপ্লেক্স'-এ আদিম সমাজের এই সব ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা গ্রথিত হয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। জীবন ও সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র থেকে ছিন্ন হয়ে এই সব উপাদান ক্রমে যান্ত্রিক আচার-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তার ফলে ব্যভিচার ও অবনতি ঘটেছে। এই দৃষ্টান্ত থেকে সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি 'সূত্র' আবিষ্কার করা যায়। জীবন ও সমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মৌলিক সাংস্কৃতিক আচার ক্রমে অনাচার ও ব্যভিচারে পরিণত হয় অন্তত হবার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশের তন্ত্রাচার তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

নরমুণ্ডনৃত্যও অন্যতম আদিম ধর্মানুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান পরে ধর্মঠাকুরের ও শিবের গাজনোৎসবের অঙ্গ হয়েছে। ধর্মঠাকুর রাঢ়ের অন্যতম গ্রামদেবতা এবং 'গাজন' (গা=গ্রাম, জন=জনসাধারণ) গ্রামের জনসাধারণের উৎসব।[১৭] ধর্মের গাজন গ্রামদেবতার লোকোৎসব। ধর্মঠাকুরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বিচিত্র লোকধর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তার সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মেরও অনেক উপাদান মিশেছে। ধর্মঠাকুরের ধ্যানধারণায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বৌদ্ধমূর্তিপূজা ও স্তূপ-প্রতীকপূজা রাঢ়ের একাধিক স্থানে দেখেছি। কূর্ম-প্রতীকও কোনো নিষাদ-জাতির কূর্ম-টোটেমের চিহ্ন বলে মনে হয়। বিষ্ণুর পৌরাণিক অবতার বলে 'কূর্মের' ব্যাখ্যা করার আগে ভাবা উচিত, এই অবতার-কল্পনারই (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি) বা উৎস কোথায়? পুরাণকারদের এই কল্পনার প্রয়োজন হয়েছিল কেন? টোটেম-সংস্কৃতির

১৭ ১৮২৯ সালে রামকমল সেন এসিয়াটিক সোসাইটিতে 'চড়কের গাজন' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। তাতে 'গাজন' শব্দের তিনি এই ব্যাখ্যা করেছেন (J. A. S., Vol. 2. 1833)।

ধারক ও বাহক বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য নয় কি ? রাঢ়দেশে টোটেম-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বহু জনগোষ্ঠীর বাস ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 'বাঘ', 'হাতি', 'ঘোড়া' ইত্যাদি কৌলিক উপাধি আজও তার সাক্ষী। এই সব জাতি আর্যসংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ও প্রভাব-বহির্ভূত ছিল। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাদের উপর পড়া স্বাভাবিক। হিন্দুধর্মের প্রভাব থেকেও পরে তারা একেবারে মুক্ত হয়নি। এই সব ধর্মাচার ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর রাঢ়দেশে গ্রামদেবতারূপে রূপায়িত হয়েছেন। তাঁর গ্রাম্য জনোৎসবের নাম হয়েছে গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই 'গাজন'কে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রামদেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে।

গ্রামদেবতার সঙ্গে গ্রামদেবী থাকতেন, পুরুষ-দেবতার সঙ্গে একজন স্ত্রী-দেবতা। রাঢ়ের গ্রামদেবতা ধর্মের সঙ্গে থাকতেন তাঁব কামিন্যা। কামিন্যাদের নানারকমের নাম আছে। এই কামিন্যারাই ক্রমে শাক্ত ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাবে গ্রামদেবতা কালী হয়েছেন মনে হয়। তার সুন্দর আভাস পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের সংযোগ-স্থল থেকে। বীরভূমের কীর্ণাহার লাভপুর অঞ্চলে একাধিক গ্রামে হাড়ি-ডোম পূজিত বিখ্যাত সব 'কালী' আছেন। এ-অঞ্চলে ধর্মপন্থী ও তান্ত্রিকদের প্রাধান্য ও মিশ্রণ খুব বেশি। কীর্ণাহার থেকে মাইল দুই দূরে বেণেপাড়ায় এক বিখ্যাত কালী আছেন, সেবায়েৎ ডোম। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমা ও বীরভূমের প্রায় শতাধিক গ্রাম জুড়ে এই 'বেণেপাড়ার কালী' গ্রামদেবতারূপে বিরাজ করেন। পাণপাড়ায় এক কালী আছেন, সেবায়েৎ হাড়ি। কালকেপুরের কালীর দেয়াশী ডোম। কীর্ণাহারের গ্রামদেবতা ভদ্রকালী। লাভপুর তো ফুল্লরাদেবীর তান্ত্রিক পীঠস্থান বলে খ্যাত। বোঝা যায়, রাঢ়ের এই অঞ্চলে ধর্মনিরঞ্জনপন্থীদের সঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছিল। গ্রামদেবতারা তার সাক্ষী হয়ে রয়েছেন এবং শিলালিপি বা তাম্রশাসনের সাক্ষীর চেয়ে তাঁদের সাক্ষী কম নির্ভরযোগ্য নয়।

নরমুণ্ডনৃত্য বা মড়াখেলা ধর্মের গাজনের অঙ্গ ছিল রাঢ়দেশে। এই নিষাদাচার সহজেই রাঢ়ের জনসাধারণ কর্তৃক ধর্মদেবতার উৎসবে গৃহীত হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার অনেক স্থানে, বর্ধমানের একাধিক স্থানে, ধর্মঠাকুরের উৎসবে মৃতের পচা-গলা নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্যগীত হত। 'কালিকার পাতারা' নৃত্য করত, কাল্‌কে-পাতারি নাচ বলা হত। এই উৎসব সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের বিবরণের মধ্যে লিখেছেন: "কালিকার পাতারা আস্ত মড়া—মনুষ্যের শবদেহ—

অনেক সময় গলিত শব—আনিয়া মন্দিরের উঠানে উপস্থিত হয় ও ঢাকের বাদ্য ও ধূপের ধোঁয়া সহ বিকট পৈশাচিক নৃত্যের অভিনয় করে। পূর্বে শব সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়, গলিত দুর্গন্ধ শব হইলেই বিশেষ বাহাদুরি, অভাবে গোটাকতক শুকনা মাথা। শ্মশানবাসী মহাদেবের কালাগ্নিরুদ্রমূর্তির সম্মুখে এই পৈশাচিক অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু ইহার অনার্যত্বে সংশয় নাই।"[১৮] কান্দীর রুদ্রদেবের গাজনে এই নৃত্যানুষ্ঠান হয়। কান্দীতে বুদ্ধমূর্তি রুদ্রদেব বলে পূজিত হন এবং কান্দী অঞ্চলের ধর্মের গাজনের নরমুণ্ডনৃত্য রুদ্রের গাজনেও অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমানের কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বের শিবের গাজনে এই নরমুণ্ডনৃত্য হয়। এই অনার্য অনুষ্ঠানের আসল তাৎপর্য বহুকাল লোপ পেয়েছে এবং ধর্মের গাজন থেকে শিবের গাজনে গৃহীত হয়ে ক্রমেই তার বাহ্য বীভৎসতা বেড়েছে মাত্র।

শিল্পকলার রীতিবিচার

সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আমরা স্থানীয় শিল্পকলার রীতি ও ভঙ্গি-স্বাতন্ত্র্যের বিচার করতে পারি। বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক ও মানসিক পরিবেশে, বিশেষ ধ্যানধারণা ও আদর্শের প্রেরণায় শিল্পকলার বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়। সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এবং তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলে, কিভাবে শিল্পকলার ক্রমাবনতি ঘটে, সে সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের পটশিল্প ও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্পপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।[১৯] এখানে কলারীতি বা 'আর্ট-স্টাইল' সম্বন্ধে কিছু বলব। ঝাড়গ্রামের 'ওতাল-প্রধান এলাকা থেকে বিষ্ণুপুর-আরামবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে অধিকাংশ গ্রামদেবতার স্থানে যেসব পোড়ামাটির হাতিঘোড়ার মূর্তি দেখা যায়, স্থানীয় মৃৎশিল্পী কুম্ভকাররা সেগুলি তৈরি করেন। এই সব হাতি-ঘোড়ার গড়ন লক্ষ্য করলে (চিত্র দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, বাস্তব বা 'রিয়ালিস্টিক' গড়ন থেকে ক্রমেই যেন একটা ভঙ্গিপ্রধান অবাস্তব গড়নের দিকে এই মৃৎশিল্পের অগ্রগতি হয়েছে। ঝাড়গ্রামের অনুন্নত অঞ্চলের হাতি-ঘোড়া 'সলিড' ও অনেকটা বাস্তব (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ঝাড়গ্রামেরই উন্নত গ্রামাঞ্চলের হাতি-

১৮ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী "গ্রামদেবতা" প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদের (কান্দীর) এই উৎসবের চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩১৪ সন)।

১৯ 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' বিভাগের বিবরণ ছাড়াও, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। 'লোকধর্ম ও শিল্পকলা', 'দশাবতার তাস', 'পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ঘোড়া ভঙ্গিপ্রধান বিশেষ রূপ ধারণ করেছে এবং তারই পরিণতি হয়েছে বিষ্ণুপুর পাঁচমুড়োর ফাঁপা বৃত্তাকার গড়নে। তাহলে কি শিল্পকলার রীতিবিকাশের স্বাভাবিক ঝোঁক, বাস্তব-চিত্রণ (Realism) থেকে প্রতীকী-চিত্রণের (Symbolism) দিকে? প্রকৃতি আগে, প্রতীক পরে? বাস্তবতা আগে, ভঙ্গিপ্রধান স্বাতন্ত্র্য পরে? না দুইয়েরই যুগপৎ বিকাশ হয়েছে?

কলারসিকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তর্কের শেষ হয়নি আজও। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এবিষয়ে প্রত্যক্ষ গবেষণা করেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে হ্যাডন, বাফুর, বোয়াস প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। হ্যাডন স্তূপীকৃত শিল্পকলার নিদর্শন সংগ্রহ করে, তাদের ক্রমবিকাশ ও ক্রমানবতির ধারা অনুসন্ধান করে, এবিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে কলারীতির বিকাশের ধারা হল বাস্তবতা থেকে প্রতীকের দিকে, 'representational' রূপায়ণ থেকে 'conventionalised' ভঙ্গি ও রীতিপ্রাধান্যের দিকে। তিনি বলেছেন:[২০]

> The vast bulk of artistic expression owes its birth to realism; the representations were meant to be life-like, or to suggest real objects; that they may not have been so was owing to the apathy or incapacity of the artist or to the unsuitability of his materials. Once born, the design was acted upon by constraining and restraining forces which gave it, so to speak, an individuality of its own. In the great majority of representations the life-history ran its course through various stages until it settled down to uneventful senility; in some cases, the representation ceased to be—in fact, it died.

হ্যাডনের এই মত বোয়াস, হার্স্কোভিট্‌স প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা আংশিক সত্য বলেছেন। আংশিক সত্য হলেও, হ্যাডনের এই সূত্রটি এত বেশি তথ্যনির্ভর যে সহজে তা খণ্ডনীয় নয়। কিন্তু অন্যান্য আরও অনেক আদিম জাতির (যা হ্যাডন দেখেননি) শিল্পকলার মধ্যে প্রথম থেকে প্রতীকী রূপায়ণের এমন প্রাধান্য দেখা যায় যে,

২০ A. C. Haddon: Evolution in Art (London. 1914), p. 7; এই প্রসঙ্গে H. Balfour-এর The Evolution of Decorative Art (London, 1895) দ্রষ্টব্য।

কলারীতির বিকাশের ধারা সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু নির্দেশ করা যায় না। আদিম শিল্পীর দৃষ্টিতেও এক-একটি প্রত্যক্ষ বস্তুর বিশেষ কোনো অংশ এমনভাবে কল্পনামণ্ডিত হয়ে ওঠে যে সেই বিশেষ অংশের রূপায়ণই তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয় এবং তাই থেকে প্রতীকী শিল্পের বিকাশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মাটির হাতি-ঘোড়া প্রসঙ্গেও এ-উক্তি প্রযোজ্য। বড় বড় হাতি-ঘোড়া ছাড়া ক্ষুদ্রাকার মাটির হাতি-ঘোড়াগুলি সবই প্রায় প্রতীকী রূপায়ণের নমুনা। কাঠের রঙিন পুতুল ও পোড়ামাটির পুতুলের ক্ষেত্রেও একথা সত্য, কিন্তু কৃষ্ণনগরের (নদীয়া) মৃৎশিল্প প্রধানত 'representational', বাস্তবধর্মী। সুতরাং অঞ্চলভেদে রীতিভেদ আছে। একটা নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ছক্ ধরে কলারীতির যান্ত্রিক বিকাশ হয়নি। আঞ্চলিক সামাজিক-মানসিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্য তার মধ্যে বৈচিত্র্যের বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

শিল্পকলার বিকাশ ও অবনতি

অর্থনৈতিক সামাজিক প্রাকৃতিক বা নৈতিক-মানসিক পরিবেশের পরিবর্তনের জন্য শিল্পকলার ক্রমাবনতি ও বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[২১] পশ্চিমবঙ্গের শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ হয়েছিল বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে। বাঢ়ের সূত্রধর ও গৃহশিল্পীরাই মনে হয় দো-চালা চার-চালা আট-চালা গড়নের ইটের বাংলা মন্দিরের রূপ দিয়েছিলেন। বাঁকা-চাল খড়ের মাটির ঘরের প্রায় হুবহু অনুকরণে বাংলা মন্দির গড়ে উঠেছে। যতরকমের বাঁকা-চালের খড়ো ঘর পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় (একতালা, দোতালা), ততরকমের বাঁকাচালের ইটের মন্দিরও পাওয়া যায়। মনুষ্যালয়ের সঙ্গে দেবালয়ে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের সূত্রধর-শিল্পীরা। দেবতার সঙ্গে মানুষের পারিবারিক আত্মীয়তার নিদর্শন হল বাংলা মন্দির। দেবতাকে 'সম্রাট' মনে করে, প্রাসাদতুল্য মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠানের কথা বাংলার শিল্পীরা কল্পনা করেন নি। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকা-চালের গৃহের গড়ন ও বিস্তারণ থেকে মনে হয়, রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থল থেকেই বাংলার এই বিশিষ্ট দেবালয়-স্থাপত্যের বিকাশ ও বিস্তার হয়েছিল। প্রথমে হয়ত কাঠের ও খড়ের ঘরই দেবালয় ছিল, যেমন গ্রামে গ্রামে এখনও অনেক আছে। পরে ইটের গড়নে তাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এবং কাঠের কারুকার্য (দরজা, খুঁটি ইত্যাদির) মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্যে পরিণত হয়েছে। তার জন্য

২১ W. H. R. Rivers : 'The Disappearance of Useful Arts', reprinted in 'Psychology and Ethnology' (London, 1926).

স্থানীয় জমিদার ও সামন্তরাজার আর্থিক পোষকতা প্রয়োজন হয়েছে। ইটের দেবালয়ের যেসব নিদর্শন এখনও আছে, তা থেকে মনেহয়, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এই দেবালয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। মন্দিরের সংলগ্ন লিপি থেকে তাব পূর্বের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। কোনো নিদর্শনও নেই। সামন্তপোষকতা ক্রমে যত কমেছে, স্থাপত্যেরও তত অবনতি হয়েছে দেখা যায়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই দেবালয়-স্থাপত্যের চরম বিকাশ হয়েছে মনে হয় এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে দ্রুত অবনতি ঘটেছে, মন্দিবেব গডন পর্যন্ত বিকৃত হয়েছে। দেবালয় গডতে পারেন, এরকম সুদক্ষ সূত্রধরশিল্পী এখন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুর্লভ বলা চলে। চিত্রকব-পটুয়াদের মতন, তাঁরা জীবিকার জন্য ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন কবেছেন।

সংঘাত ও সমন্বয়

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংস্পর্শেব (Culture-contact) ফলে অ ঞ্চলিক সংস্কৃতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটে, ঘাত-প্রতিঘাতেব ভিতব দিয়ে নতুন সমন্বয় (integration) হয়, সে-সম্বন্ধে 'গ্রাম-প্রদক্ষিণ' ও 'সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' বিভাগের একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা কবেছি। সংঘাত ও সংস্পর্শ দুদিক থেকে বিচার কবা যায়। আভ্যন্তবিক সংঘাত—যেমন আর্য-অনার্য, হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ণব ইত্যাদি সংস্কৃতি-ধারার সংঘাত। বহিরাগত সংস্কৃতিব সংঘাত—যেমন ভাবতীয়-হিন্দু-মুসলমান-ইয়োরোপীয় ইত্যাদি। সংঘাতেব তীব্রতা দুই দিকেই সমান হতে পাবে। আর্য-অনার্যের সংঘাত, হিন্দু-বৌদ্ধেব সংঘাত, শাক্ত-বৈষ্ণবেব সংঘাত এবং হিন্দু-মুসলমান বা ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিব সংঘাতের তীব্রতা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। সমন্বয়ের বিভিন্ন স্তর আছে, সামাজিক জন-স্তব। সর্বস্তবে সমন্বয়েব গভীবতা বা একাত্মীকরণ (assimilation) সমান নয়। জনমানসের বিভিন্ন স্তবের গ্রহণ-প্রবণতার উপর সমন্বয়ের গভীরতা প্রধানত নির্ভরশীল।

সমাজবিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনরীতি প্রয়োগ করে বঙ্গসংস্কৃতিব রূপায়ণেব ধাবা এইভাবে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের পরিচয় না পেলে, তার অন্তর্নিহিত ঐক্যের আভাস পাওয়াও সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্র্যের মিলনেই বৃহত্তর ঐক্য গডে ওঠে। ভারত-সংস্কৃতির ঐক্য বহু জাতি-উপজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈচিত্র্যের বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক অনুসন্ধান ও অনুশীলন প্রয়োজন। অনুশীলনের ফলাফল সম্বন্ধে যেটুকু আভাস দিয়েছি, পরবর্তী আলোচনায় তারই তথ্যভিত্ রচনা করেছি।

পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল ও সংস্কৃতি

মানচিত্র কেবল ভূচিত্র নয়, সামাজিক জীবনেরও চিত্র। মানচিত্র সমাজের প্রতীক ('The map is a social symbol')।[১] সমাজের মতো মানচিত্রেরও পরিবর্তন হয়। এরকম পরিবর্তন বাংলা দেশে হয়েছে, হিন্দুযুগে মুসলমানযুগে ব্রিটিশযুগে এবং বর্তমান ব্রিটিশোত্তর যুগে। প্রশাসনিক কারণে, ভাষাগত ও অন্যান্য কারণে এই পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু মানচিত্রই ভূগোলের সবটুকু নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের কারণ ও ধারা অনুসন্ধান করা ভৌগোলিকের অন্যতম লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানবসভ্যতার সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য ভূবিজ্ঞানীরা কৌতূহলী হয়েছেন। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের পদ্ধতি ক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে এবং বহু বিজ্ঞানীর অনুশীলনের ফলে পরিবেশবিদ্যা ও মানবিক ভূগোল (Human Geography) নামে ভূগোলের একটি পৃথক শাখার বিকাশ হয়েছে।[২] পাহাড়-পর্বত সমুদ্র-নদ-নদী বন-উপবন-উপত্যকা মরুভূমি-জনপদ ইত্যাদির পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারাই সভ্যতার ইতিহাসের ধারা। কিন্তু কেবল প্রাকৃতিক কারণে এগুলি বদলায়নি বা

১ J. M. Mogey : The Study of Geography (London. 1950) ; Introduction.

২ এবিষয়ে উল্লেখ্য কয়েকখানি বই : E. C. Semple Influence of the Geographical Environment (1911)—বইখানি বিখ্যাত বিজ্ঞানী F. Ratzel-এর Anthropogeographie (1882-91) গ্রন্থের ইংরেজি ভাবানুবাদ। T. Griffith Taylor : Environment and Nation (1936) ; E. Huntingdon : The Pulse of Asia (1909) ; P. V. Blache : Principles of Human Geography (1926) ; J. Brunhes : Human Geography (1920) ; C. D. Forde : Habitat, Economy and Society (1934).

বদলায় না। বন-উপবন কেটে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে মানুষের প্রচেষ্টায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন করেছে মানুষ নিজের স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্য। কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) বলেছেন, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি সেই পরিবর্তনকালীন মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস এবং সংগ্রামের ফলে মানুষের নিজের পরিবর্তনের ইতিহাসও সত্য। প্রকৃতি ও মানুষ, উভয়েরই সংগ্রাম ও পরিবর্তনের ধারা মিলিত হয়েছে সভ্যতার ইতিহাসের ধারায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর আগে, নদ-নদীর ধারা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা-প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা মানুষের অনায়ত্ত ছিল। তার জন্য মানুষের সংগ্রামের বিরতি হয়নি বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের কাছে মানুষ অনেক সময় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক কারণে, উপেক্ষা ও অদূরদর্শিতার জন্যও অনেক সময় ভৌগোলিক পরিবর্তন (যেমন নদ-নদীর খাত মজা বা খাত-বদল) অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ইতিহাসও এই ভৌগোলিক প্রভাবমুক্ত নয়।

ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ও সংস্কৃতির যে মৌল সম্পর্ক আছে, সেদিক থেকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক বিশিষ্টতার কথা উল্লেখ করা উচিত। বাংলা দেশ বলতে আমরা সাধারণত মনে করি যে নদনদীর পলিমাটি দিয়ে তৈরি একটি দেশ। কিন্তু সমগ্র বাংলার ভূভাগ নদনদী-বাহিত পলিমাটি দিয়ে তৈরি নয়। পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অনেকটা ভূভাগ বৃষ্টিবায়ু ও হিমবাহ-বাহিত মাটি দিয়ে তৈরি। পলিমাটির দান যা আছে, তাও হিমালয়-দুহিতা নদীর প্রাথমিক দান নয়। হিমালয়-নির্গত নদীধারার আগে দক্ষিণের বিন্ধ্যপর্বত ও ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় উৎপন্ন প্রাচীন নদনদীর পলি দিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন আর্যাবর্তের (উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের) ও পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ। পশ্চিমবঙ্গ বয়সে অনেক প্রবীণ, ভূতাত্ত্বিক দিগন্ত পর্যন্ত তার জীবনের লীলাক্ষেত্রের সীমানা। দক্ষিণভারতের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক সংযোগ আদিপ্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত।

বাংলার নদনদী

ভাগীরথী-হুগলির পশ্চিমতীরে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেক নদনদীর উৎস হল ছোটনাগপুরের মালভূমি, কেবল **সরস্বতী নদী** ছাড়া। সরস্বতীর মজা খাতের চেহারা দেখলে আজ মনেই হয় না যে একদা এই নদী বেশ বড় সুনাব্য ঐতিহাসিক নদী ছিল। এমন কি, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও হুগলি নদীর চেয়ে সরস্বতীর

খাতই ছিল গভীরতর প্রশস্ততর। ডাচ পর্তুগীজ ফরাসী ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যপোত এই সরস্বতী দিয়ে ত্রিবেণী ঘুরে কাশিমবাজার ব্যাণ্ডেল হুগলি চন্দননগর শ্রীরামপুর যাতায়াত করত। তারপর সরস্বতীর উপরের অংশ ক্রমে মজে আসতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে সরস্বতীর নিম্নাংশের সঙ্গে কলকাতার ভাগীরথী-হুগলির সংযোগের উন্নতিসাধন করা হয়, মজা খাতে খাল কেটে। ক্রমে সরস্বতীর নাব্যতা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচীনকালে ভাগীরথীর এইটাই ছিল আদিপথ, নতুন আদিগঙ্গার পথে তার প্রবাহের আগে।

ছোটনাগপুরের মালভূমিতে উৎপন্ন নদনদীর মধ্যে প্রধান হল ময়ূরাক্ষী অজয় দামোদর দ্বারকেশ্বর রূপনারায়ণ কংসাবতী বা কাঁসাই হল্‌দি ও সুবর্ণরেখা। **ময়ূরাক্ষী** ছোটনাগপুরের রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশের উৎস থেকে নেমে হাসদিয়া পর্যন্ত গিয়েছে, তারপর দক্ষিণপ্রবাহে ডুমকায় পৌঁচেছে। সেখান থেকে আবার দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সীমানা অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দি শহরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। সাঁওতাল পরগণায়, মেসাঞ্জোরে উঁচু বাঁধ এবং বীরভূম জেলায় সিউড়ির কাছে তিলপাড়া ব্যারাজ, এই দুটিই হল ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্যতম পৌর্তিক কাজ। **অজয়** নদের উৎসও রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, ময়ূরাক্ষীর উৎসের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে। অজয় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণকূলে কুনুর হল এর প্রধান উপনদী। গতি আঁকাবাঁকা হলেও, অনেকটা সমতলভূমিতে এর মধ্য ও নিম্নাংশ প্রবাহিত বলে অনেক দূর পর্যন্ত অজয়ের নাব্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমানা এই অজয় নদের দ্বারা নির্দিষ্ট। অজয়ের তীরে কবি জয়দেবের জন্ম ও সাধনস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রাম। পৌষসংক্রান্তিতে এই কেঁদুলিতে যে মেলা হয় তা খুবই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এবং মেলার অন্যতম বিশেষত্ব হল বিরাট বাউল সমাবেশ (বীরভূমের গ্রামবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

মানভূমের উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে **দ্বারকেশ্বর** (ঢলকিশোর) শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছ দিয়ে বাঁকুড়ায় প্রবেশ করেছে এবং পূর্বগতিতে বাঁকুড়া শহরে পৌঁছে দক্ষিণপূর্ব গতি নিয়েছে। তারপর হুগলি জেলায় আরামবাগ মহকুমার ভিতর দিয়ে দ্বারকেশ্বর ক্রমে দক্ষিণমুখী হয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে এবং ঘাটালের কাছে নাম নিয়েছে **রূপনারায়ণ**। মানভূম পুরুলিয়ার মালভূমিতে উৎপন্ন **শিলাবতী** বা **শিলাই** নদী এই ঘাটালের কাছেই রূপনারায়ণের সঙ্গে মিশেছে। ছোট ছোট অনেক উপনদী আছে শিলাবতীর। রূপনারায়ণের উপরেই বাংলার প্রাচীন বন্দর

ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের
নদনদী
০ ৩২ ৬৪
কিলোমিটার
মালদহ
পদ্মা
দামোদর
অজয়
রাঁচী
কংসাবতী
সিংভূম
ধলভূম
মেদিনীপুর
ময়ূরভঞ্জ
উ ড়ি ষ্যা
ব ঙ্গো প সা গ র
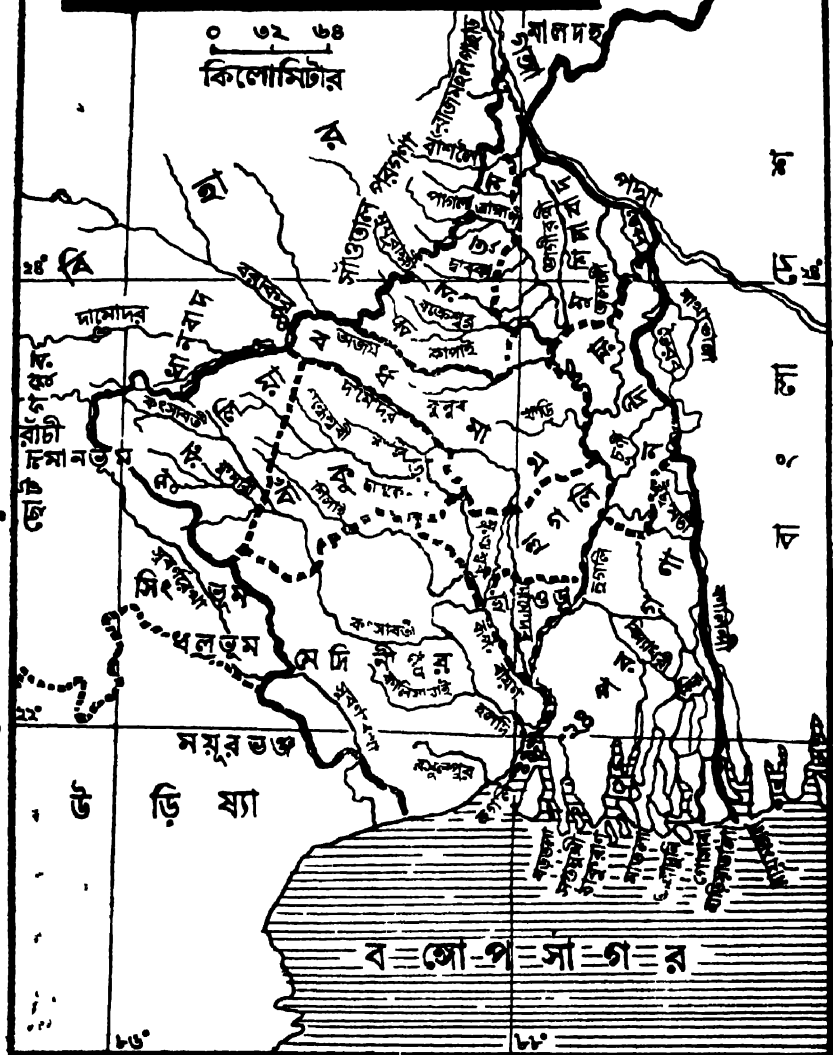
তাম্রলিপ্তের ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে বর্তমান তমলুক শহর। নদীতে চর পড়ার ফলে রূপনারায়ণ থেকে তমলুকের দূরত্ব ক্রমেই বেড়ে গিয়েছে। মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার সীমানা নির্দেশ করে নিচের দিকে রূপনারায়ণ দামোদরের মূলপ্রবাহ গ্রহণ করেছে এবং পরে মহিষাদলের কাছে হুগলি নদীর নিম্নাংশে পরিণত হয়েছে। **কংসাবতী** বা কাঁসাইয়ের উৎপত্তি মানভূম পুরুলিয়ার উপত্যকায়। পুরুলিয়া শহরের কাছে কাঁসাই খুব লোকপ্রিয় নদী। কাঁসাইয়ের কূলে পুরুলিয়ার অনেক লোকোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, তার মধ্যে টুসু উৎসব অন্যতম। কাঁসাইয়ের নিম্নাংশের নাম হলদি।

পশ্চিমবঙ্গের বাকি দুটি প্রধান নদী হল দামোদর ও সুবর্ণরেখা, এবং এই দুটি নদীরই উৎপত্তি হয়েছে পালামৌ জেলা থেকে। পালামৌ জেলায় টোরির কাছে **সুবর্ণরেখা** নদীর উৎপত্তি। এর উচ্চাংশের অববাহিকা বেশ বিস্তীর্ণ, সমগ্র দক্ষিণ ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার উচ্চভূমি। প্রধানত বিহার ও উড়িষ্যার নদী সুবর্ণরেখা এবং উড়িষ্যার সমুদ্রেই এর মোহানা। কিন্তু সুবর্ণরেখার খানিকটা অংশ মেদিনীপুর জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, ঝাড়গ্রাম মহকুমায়। ঝাড়গ্রাম থেকে গোপীবল্লভপুর নয়াগ্রাম অঞ্চলে পৌঁছতে হলে সুবর্ণরেখা পার হয়ে যেতে হয়। এখানে সুবর্ণরেখা বেশ প্রশস্ত। পালামৌ জেলার টোরির কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫০০ ফুট উঁচু খামারপৎ পাহাড়ের শৃঙ্গে যে বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টি থেকে **দামোদরের** উৎপত্তি। ছোটনাগপুরের পার্বত্য উপত্যকায় দামোদরের রূপ ঝরনার মতো। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে ঝরনা-প্রস্রবণগুলি ২০০০ ফুট উঁচু উপত্যকায় পড়ে ক্রমে নদীর আকার নিয়েছে। যে মূল ঝরনা থেকে দামোদরের উৎপত্তি তার স্থানীয় নাম 'সোনাসাথী'। প্রথম নদীর রূপধারণ করার পর দামোদরের স্থানীয় নাম 'দেউনদ'। কতকগুলি গিরিখাতের মধ্যের উপনদী এসে দেউনদে মিশেছে। অনেক জলপ্রপাতও আছে। উত্তরেও অনেক উপনদী মিশেছে এবং তারা আয়তনে বড়। এদের মধ্যে বরকার্গাও-এর কাছে ১১০ ফুট জলপ্রপাত উল্লেখ্য। হাজারিবাগ জেলায় ১০০০ ফুট উঁচু উপত্যকা থেকে দামোদর নামের প্রচলন হয়েছে। রামগড় পাহাড়ের সীমানার মধ্যে তার প্রবাহ। মুড়ী জংশন-স্টেশন থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে (এখন অবশ্য তেমন গভীর নয়) নদীগর্ভস্থ পর্বতশিলার উপরে **রাজরপ্পায়** যে বিখ্যাত **ছিন্নমস্তার মন্দির** আছে, তার কাছে ভেরা নদীর সঙ্গে দামোদরের সঙ্গম হয়েছে। তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত দামোদরের প্রবাহ উত্তরমুখী। বোরমোর কাছে বোকারো ও কোনার নদী দামোদরে মিশেছে।

বোকারোতেও বেশ উঁচু জলপ্রপাত আছে। দামোদর নদের উত্তরে হাজারিবাগ উপত্যকা ক্রমে প্রায় ২০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়েছে এবং তার জন্য এদিকের উপনদী অনেক জল অতিক্রত দামোদরে বয়ে নিয়ে আসে। আরও নিচু উপত্যকা মানভূমে পৌঁছলে দামোদরের প্রধান উপনদী বরাকর দিশেরগড়ের কাছে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। তারপরেই দামোদর পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে পূর্বমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমান শহরের কাছাকাছি পর্যন্ত এসেছে। এই প্রবাহপথটিকে দামোদরের মধ্যপ্রবাহ বলা যায়। এখানে বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলাব সীমানা নির্দিষ্ট করেছে দামোদর। বর্ধমানের কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর সহসা সমকোণ বাঁক নিয়ে দক্ষিণমুখী হয়েছে। এখান থেকেই তাব শাখাবিস্তার ও খাত পরিবর্তন আরম্ভ। খাড়ি বাঁকা বেহুলা নদী দামোদরেরই প্রাচীন পরিত্যক্ত খাত বলে নদীবিদরা মনে করেন। নদীগুলি পশ্চিম থেকে পুবে প্রবাহিত। মূল দামোদরের পূর্বাঞ্চলের শাখাগুলিও উত্তর থেকে দক্ষিণে অথবা পূর্ব-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে। ঘেয়া, কাণানদী, কাণা দামোদর, রাণাবাঁধ খাল, কাণা খাল, দুটি মিলে মাদারিয়া খাল, কেদোখাল প্রভৃতি হয় দামোদবের বর্জিত খাত অথবা কাটা খাল। নিম্নপ্রবাহে মূল দামোদরের পশ্চিমাঞ্চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত শাখাগুলিব মধ্যে **মুণ্ডেশ্বরীর** পথে দামোদর বর্তমানে রূপনারায়ণে এসে মিলিত হয়। এখানে একটি কাণা নদী ও কাণা দ্বারকেশ্বব মুণ্ডেশ্বরীব উপশাখাব মতো। মুণ্ডেশ্বরীর পথ সবচেয়ে আধুনিক পথ, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় স্থাপিত, কিন্তু প্রবল হয়েছে ১৯১৪-১৫ সাল থেকে।

পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর এই উৎস ও প্রবাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতিধারার চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। নদীপথ ধরেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়। তাই একথা বলার প্রয়োজন হয় না যে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সংযোগ ছোটনাগপুরের নিষাদসংস্কৃতির সঙ্গে কত প্রত্যক্ষ ও গভীর। কেউ কেউ বলেন 'দামোদর' নাম মুণ্ডাদের। 'দা-মুণ্ডা' (Dah-Moondah) থেকে 'দা-মুদা' (Damuda), 'দামোদর' নাম হয়েছে। দা-মুণ্ডা কথার অর্থ হল, মুণ্ডাদের জল।* এই দামোদরের তীরে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির আঞ্চলিক উত্থান-পতন হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দামোদরের প্রবাহের পরিবর্তনে গ্রাম্যসমাজের বিকাশ ও বিলোপ হয়েছে।

* **Dalton: The Kols of Chotanagpore, J. A. S (L) XXXV, 1866, Part II, PP. 158-200.**

দামোদরের পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রবাহপথে অনেক একদা-সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, যেমন দেখা যায় সরস্বতীর প্রাচীন তীরবর্তী অঞ্চলে। ছোটনাগপুরে উৎপন্ন নদনদীর প্রবাহ দেখে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিতে যেমন নিষাদসংস্কৃতির প্রভাবের ও দানের কথা মনে হয়, তেমনি তাদের গঙ্গার প্রবাহে মিলনের কথা ভেবে আর্যসংস্কৃতির মিলনের ও সমন্বয়ের কথাও মনে পড়ে। কেবল সুবর্ণরেখা পশ্চিমবঙ্গে এবং কর্ণফুলি পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে সমুদ্রে মিশেছে। তা ছাড়া বাংলার অন্য সব নদনদীর মিলন হয়েছে গঙ্গা-ভাগীরথী-পদ্মার প্রবাহে। ছোটনাগপুর-জাত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নদনদীও গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলিতে এসে মিশেছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সমন্বয়ের চিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে তার নদনদীর এই উৎস থেকে সঙ্গমের ধারার মধ্যে।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

বাংলাদেশের প্রাচীন জনবিভাগ ও জনপদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে বঙ্গসংস্কৃতির রূপায়ণের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন সুহ্ম বা **রাঢ়দেশই পশ্চিমবঙ্গ**। জৈন 'আচারাঙ্গ সূত্রে' (খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক) লাঢ়-রাঢ় দেশের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের জন্য অর্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক জয় করেছিলেন। ভীম পূর্বদিকে বহু রাজ্য জয় করে 'বৈদেহক ও জগতীপতি জনক'কে পরাজিত করেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাতরা বাস করত। তাদের বশ করে, স্বপক্ষে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের নিয়ে, মগধ-গিরিব্রজে জরাসন্ধপুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি কর্ণকে ও পর্বতবাসীদের পরাজিত করেন। সেখান থেকে মোদাগিরি, তারপর মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনোজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরতীরবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করেন।

মহাভারতের এই বিবরণের মধ্যে একটি প্রাচীন ভৌগোলিক চিত্র পরিস্ফুট। **বিদেহ** রাজ্যের উত্তরসীমা হিমালয়, পূর্বসীমা কৌশিকী, দক্ষিণসীমা গঙ্গা ও পশ্চিমসীমা গণ্ডকী। এখনকার দ্বারভাঙ্গা (দ্বার-বঙ্গ) জেলা। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করত। এই শক, আর বিদেশী শকজাতি অভিন্ন নয়। যে-শকজাতি বিদেহ রাজ্যের উত্তরে বাস করত, গৌতমবুদ্ধ সেই শকজাতীয়। দূরে বাস করত কিরাতরা। কিরাতরা 'ইন্দো-মঙ্গোলীয়' (Indo-Mongloid), শকরা তাদেরই শাখা। সুহ্মদেশের আগে যে দেশ, তার নাম প্রসুহ্ম। ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ

ও প্রাচীন রাঢ়ের উত্তর-পূর্বাংশ **সুহ্মদেশ**। তার আগে বা দক্ষিণে **প্রসুহ্ম**, **মগধ** গঙ্গার দক্ষিণে, তার উত্তরে ও পুবে ভাগলপুর, কর্ণের **অঙ্গরাজ্য**। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি, তার উত্তরে ও পুবে পূর্ণিয়া জেলা, **পুণ্ড্রদেশের** আরম্ভ এখান থেকে। পুণ্ড্রদেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত। পুণ্ড্রের দক্ষিণে **বঙ্গ**। সমুদ্রসেন সমুদ্রপতি, পরে সমুদ্রের নাম **সমতট** বা সমুদ্রের তট-অঞ্চল হয়েছে। তাম্রলিপ্ত তমলুক। কর্বট দেশ কোথায়? বঙ্গের দক্ষিণে বোধহয়। 'ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল' (অর্থাৎ যে সমুদ্রতটে বাঘ বাস করে) **সুন্দরবন** অঞ্চল মনে হয়।

বায়ুপুরাণে ও মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে, গঙ্গানদী অন্যান্য দেশ ছাড়াও 'মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত' এই সব আর্যজনপদ পবিত্র করে, বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হয়ে, দক্ষিণ-সাগরে মিলিত হয়েছে। এখানে ব্রহ্মোত্তব দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হয়েছে। যখন যবন ও হূনেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস কবত, তখন পুবদিকে ছিল মগধ বিদেহ ব্রহ্মোত্তর পৌণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম), প্রবঙ্গ বঙ্গেয় (দক্ষিণবঙ্গ), মালদ (মালদহ)। মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে বৈতবণী নদী বিন্ধ্যপাদ থেকে প্রসূত। **উৎকল** এই নদীর দেশ, **কলিঙ্গ** দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ প্রাচীনকালে ছোটনাগপুরের দক্ষিণের দেশকে বলত কলিঙ্গ, পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্বভাগেব নাম হয় উৎকল। উত্তর-কলিঙ্গ থেকে উৎকল। কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘু দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে সুহ্ম দিয়ে, কপিশা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন। কপিশা নদীকে কংসাবতী বা কাঁসাই বলা হয়েছে, কিন্তু সুবর্ণরেখাও হতে পারে। কালিদাসের বর্ণনা থেকে মনে হয়, রঘু বঙ্গ থেকে সুহ্মে ফিরে এসে পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হয়ে উৎকলে গিয়েছিলেন।

গ্রীক লেখকরা পূর্বভারতের দুটি দেশের নাম করেছেন—**গঙ্গারিডি** (Gangaridae) ও **প্রাসী** (Prasi)। 'প্রাসী' হল 'প্রাচী' বা প্রাচ্যদেশ। 'গঙ্গারিডি' নাম মনে হয় সংস্কৃত 'গঙ্গারাষ্ট্র', 'গঙ্গারাঢ়া' বা 'গঙ্গাহৃদয়' নামের গ্রীক বিকৃতি। গঙ্গারিডি ও প্রাচী স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ, তাদের রাষ্ট্রিক ও জানপদ-স্বাতন্ত্র্য তখন অস্বীকার্য ছিল না। মগধের মৌর্য রাজারা গঙ্গারিডি ও প্রাচী উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) বলেছেন যে গঙ্গার মুখের সমস্ত অঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল এবং তাদের রাজধানীর নাম ছিল **গাঙ্গে** (Gange)। **গঙ্গানগর** বলে কোনো নগর ছিল বোঝা যায়। দক্ষিণবঙ্গের ব-দ্বীপাঞ্চল জুড়ে গঙ্গারিডিদের বাস ছিল। দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দেই তাদের নিজেদের

রাজধানী ছিল গঙ্গা নামে। টলেমি এই গঙ্গানগরের অক্ষাংশ (Latitude) ও দ্রাঘিমার (Longitude) যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, তাতে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। মনে হয়, বর্তমান **গঙ্গাসাগর** বা গঙ্গা-সাগরসঙ্গমের কাছে এই গঙ্গানগর ছিল।[৪] চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গাসাগর-তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। মহাভারতের (বনপর্বে) তীর্থযাত্রা বিবরণে গঙ্গাসাগরকে বিখ্যাত তীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রিক ও ভৌগোলিক অবনতির ফলে গঙ্গাসাগরযাত্রা ক্রমে বিঘ্নবহুল হয়ে ওঠে এবং সমুদ্রের ভাঙাগড়ায় গঙ্গানগরও ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৭১-৪২ সাল পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে যে প্রাচীন দু-একটি দেবালয় ও অন্যান্য নিদর্শন ছিল, তাও পরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।[৫]

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভুক্তি

দণ্ডভুক্তি। বাঢ়দেশ ও সুহ্মদেশ পরে উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ে বিভক্ত হয় এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভুক্তি ও মণ্ডলেরও সীমানা-বদল হয়। সব ভুক্তি ও মণ্ডলের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। এখানে কয়েকটি ভুক্তি সম্বন্ধে কিছু বলব। বর্ধমানভুক্তির উত্তরসীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণসীমা ভাগীরথী। কিন্তু বর্ধমানভুক্তির পশ্চিমসীমা কি ছিল? অটবী বা অরণ্য। এই অরণ্যের খানিকটা ছিল রাঢ়ে, খানিকটা কলিঙ্গে। রাঢ়দেশ থেকে কলিঙ্গে যাবার পথও অবশ্য ছিল। সেই পথকে বলা হত 'দণ্ড'। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড থেকে যেমন শাখা হয়, তেমনি বড় পথের (দণ্ডের) পাশ দিয়ে শাখা-পথ বেরোয়। ওড়িয়া ভাষায় এই অর্থে 'দাণ্ড' বা দণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। দাঁতন-মেদিনীপুর-গড়বেতার পথ মেদিনীপুর জেলাকে 'দণ্ড'-রূপে পূর্ব-পশ্চিম দুইভাগে ভাগ করেছে। মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত। এই শিব দণ্ডপথের দেবতা বা ঈশ্বর। গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া হয়ে পথটি উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এই পথ বা এর পশ্চিমের চাইবাসা-পুরুলিয়ার পথ দিয়ে রাঢ়ে যাওয়া যেত না। উত্তররাঢ় থেকে দণ্ডভুক্তি যাবার চারটি পথ ছিল—রানীগঞ্জ-গঙ্গাজলঘাটি-বাঁকুড়া, কাঁকসা-সোনামুখী-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-গড়বেতা, বর্ধমান-উচালন-শ্যামবাজার-ক্ষীরপাই-

৪ Dr. Dinesh Chandra Sircar: 'The City of Ganga', The Proceedings of the Indian History Congress, 1947.

৫ ১৮৪১ সালে "Friend of India" পত্রিকায় (Vol. VII) গঙ্গাসাগর মেলার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাতে এই ধ্বংসের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গা নদী
সাঁওতাল পরগণা
কঙ্কগ্রামভুক্তি
পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি
মুর্শিদাবাদ
দ্বারকা নদ
বালুটী
নগর
সিউড়ি
মোর নদ
সিধনগ্রাম
বালুটিয়া
ভাগীরথী নদী
অজয় নদ
দামোদর নদ
কাটোয়া
মানভূম
পুরুলিয়া
বর্ধমানভুক্তি
নবদ্বীপ
বাঁকুড়া
কাঠসঙ্গা
বর্ধমান
বিষ্ণুপুর
দামিনগর
হুগলি
ভুরসুট
দণ্ডভুক্তি
হাওড়া
বেতড়
মেদিনীপুর
কলিকাতা
রূপনারায়ণ নদ
সিংভূম
ময়ূরভঞ্জ
ভাগীরথী নদী
০ ১৬ কি.মি.

মেদিনীপুর। এই চারটি পথের একটি ছিল আসল 'দণ্ডে'র অংশ এবং প্রাচীন দণ্ডভুক্তির মধ্য দিয়ে 'দণ্ড' বিসর্পিত ছিল। তার পশ্চিমে ছিল কলিঙ্গদেশ। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধহয় দ্বারকেশ্বর এবং দক্ষিণ সীমা সুবর্ণরেখা ও সাগর ছিল।* বর্ধমান শহরের দক্ষিণে দামোদর পার হয়ে এক 'উড়ের গড়' ছিল, কবি ঘনরাম লিখে গিয়েছেন। উড়ের গড় হল উড়িয়া রাজার গড়। এই রাজা মনে হয় রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ। একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় উত্তর-দক্ষিণরাঢ় জয় করে তিনি বর্ধমান থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত ট্যাক্স আদায় করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কালকেতু যে 'গুজরাট' নগর পত্তন করেছিলেন, এখন সেটি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, খানাকুল-কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বরের তীরে অবস্থিত। ধর্মমঙ্গলে লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন। বোধহয় বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলাপালের রাজবংশের কন্যা (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। এই বংশ উড়িয়া। তাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম এবং মেদিনীপুরের উত্তর একদা 'কলিঙ্গ' বলে বিবেচিত হত। অর্থাৎ দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম থেকে কলিঙ্গ, অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ থেকে কলিঙ্গে যাবার প্রাচীনপথের পশ্চিম থেকে কলিঙ্গ। পশ্চিমে খাড়ি-মণ্ডল বিস্তৃত ছিল। পূর্ব-খাড়ি ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় এবং পশ্চিম-খাড়ি হাওড়া জেলায়। এই হাওড়া জেলায় 'বেতড্ড' বা বেতড় গ্রাম। কলকাতা শহরের পত্তনের আগে বেতড় একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বেতড় ও বালুটিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে বোঝা যায়, ভাগীরথী ছিল বর্ধমানভুক্তির পূর্বসীমা। উত্তরে ও দক্ষিণে এই ভুক্তির সীমানা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত শাসন থেকে একটা ধারণা হয়। বোঝা যায় যে বর্ধমানভুক্তিই ছিল প্রকৃত প্রাচীন রাঢ় দেশ। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণ রাঢ়ের সম্পূর্ণ ভূভাগ বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল না।

কঙ্কগ্রামভুক্তি। লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসনে কঙ্কগ্রামভুক্তি নামে একটি নতুন ভুক্তির নাম পাওয়া যায়—'কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢ়ায়াং'। দক্ষিণবীথী দক্ষিণমার্গ, দক্ষিণ দিকে যাবার পথ। নৈহাটি-শাসনে পেয়েছি, উত্তররাঢ়-মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথীর স্বল্লান্তরে অবস্থিত গ্রামের কথা। দুই বীথি এক না হতে পারে, তবে আরম্ভে এক হবার কথা। লোকচলাচলের পথ ধরে গ্রামনির্ণয়ের রীতি আজও প্রচলিত। উত্তর থেকে মঙ্গলকোট, বর্ধমান আসবার পথ আছে। এটা দ্বিতীয় বীথী। কঙ্কগ্রাম থেকে কাঁকগ্রাম, কাঁকগ্রাম থেকে কাগ্রাম। মুর্শিদাবাদ

* যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি: 'বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ'—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৪০।

জেলার দক্ষিণ ও বর্ধমান জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। কাগ্রামে নদী নেই, তার চারপাঁচ মাইল পুবে ভাগীরথী, আট-নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। কান্দি মহকুমায় কান্দড় নদীর পথ মনে হয় ভাগীরথীর লুপ্ত পথ। 'কান্দি' নামও মনে হয় এই কান্দড় থেকে হয়েছে। যাই হোক, কঙ্কগ্রাম যে ভাগীরথীর কূলে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তৎকালে কাটোয়া মহকুমায় কান্দড় নদী ছিল অজয়। পরে ভাগীরথী ও অজয় দুই-ই অনেক সরে গিয়েছে। আগেকার ভূ-ভাগ পরে বর্ধমান জেলার ঈশান কোণে একটা খোঁচের মতো হয়ে রয়েছে। অনেককাল আগেকার কথা। দামোদর বধমান শহর থেকে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহুলা নদী নাম নিয়ে দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, এই বেহুলা নদীর উত্তরভাগ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম, উত্তররাঢ়। এর দক্ষিণে গঙ্গা পর্যন্ত প্রাচীন প্রসুহ্ম, দক্ষিণরাঢ় (যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন, পুবে ভাগীরথী, দক্ষিণে অজয়, পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা এবং উত্তরে বিহারের সীমানা হল উত্তররাঢ়ের চতুঃসীমা। আর পুবে ভাগীরথী, উত্তরে অজয়, পশ্চিমে পুরুলিয়া-মানভূম এবং দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর ও তার দক্ষিণাংশ রূপনারায়ণ হল দক্ষিণরাঢ়ের চতুঃসীমা। উত্তররাঢ়ের অধিকাংশ নিয়ে কঙ্কগ্রামভুক্তি, সমগ্র দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ়ের কতকাংশ নিয়ে বর্ধমানভুক্তি। দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ দ্বারা বিভক্ত বর্ধমান-বিভাগের অবশিষ্ট ভূভাগ, অর্থাৎ বাঁকুড়ার দক্ষিণার্ধ, হুগলির পশ্চিমাংশ এবং সমগ্র মেদিনীপুর জেলা নিয়ে দণ্ডভুক্তি গঠিত ছিল।[৭]

পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। গুপ্তসম্রাটদের আমলের পাঁচখানা তাম্রশাসনে পৌণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির মধ্যে কোটিবর্ষ-বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। শাসনগুলি দামোদরপুরে পাওয়া গিয়েছে। দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় আঠার মাইল দক্ষিণে 'বাণগড়' নামক স্থানই প্রাচীন কোটিবর্ষ। পৌণ্ড্রবর্ধন নগর বর্তমানে 'মহাস্থান' নামে পরিচিত এবং বগুড়া শহরের প্রায় আট মাইল উত্তরে করতোয়ার শীর্ণ খাতের উপর অবস্থিত। করতোয়ার উপরে পৌণ্ড্রবর্ধন নগরের অবস্থান দেখে মনে হয়, পুবে

৭ প্রাচীন ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় প্রভৃতি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আলোচনা: নলিনীকান্ত ভট্টশালী: চন্দ্রসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৯; যোগেশচন্দ্র রায়: বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ: সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০; ননীগোপাল মজুমদার: Inscriptions of Bengal: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি।

বোধহয় লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত এই ভুক্তির প্রসার ছিল। এই ভুক্তির উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র। কিন্তু পশ্চিম সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল? তীরভুক্তি (মিথিলা) ও পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির মধ্যে কৌশিকী বা কুশী নদী ছিল সীমানা। বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসনদত্ত ভূমি ভাগীরথীতীরবর্তী কাটোয়া থেকে মাত্র ছয় মাইল পশ্চিমে এবং বর্ধমানভুক্তির মধ্যে ছিল। পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পশ্চিম সীমা এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায়। প্রথম সীমানা কুশী নদী, কুশী গঙ্গার সঙ্গমস্থল থেকে ভাগীরথীর উৎপত্তি স্থল পর্যন্ত গঙ্গা নদী। ভাগীরথীর উৎপত্তি থেকে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পশ্চিম সীমানা। বিজয়সেনের বারাকপুর শাসনে ভূমিদান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—'পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতিখাড়ীবিষয়ে' 'ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়া' গ্রাম। গ্রামের নাম বড়া, জলা জায়গা, প্রচুর ঘাস জন্মাত, সেই ঘাস যারা ভোগ করত তারা তার জন্য খাজনা দিত। এই গ্রামটি খাড়ি-বিষয়ের মধ্যে ছিল। চব্বিশ-পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত খাড়ি গ্রাম (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৪-পরগণা দ্রষ্টব্য)। লক্ষ্মণসেনের বকুলতলা শাসনেও (জয়নগর মজিলপুর শাসনও বলা যায়) খাড়ির উল্লেখ আছে—'পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃসতি খাড়ী মণ্ডলে'। কাজেই খাড়ি-সুন্দরবন পর্যন্ত যে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির দক্ষিণ পশ্চিম সীমানা বিস্তৃত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

বর্ধমানভুক্তি। বল্লালসেনের নৈহাটি-শাসন থেকে বর্ধমানভুক্তির কথা প্রথম জানা যায়। তাতে 'বাল্লহিট্‌ঠা' গ্রাম প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—'শ্রীবর্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং'। বাল্লহিট্‌ঠা হল বালুটিয়া গ্রাম। বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানায় ভাগীরথী থেকে চার পাঁচ মাইল পশ্চিমে বালুটিয়া গ্রাম। এই অঞ্চলটি উত্তররাঢের 'স্বল্প-দক্ষিণ বীথিতে' অর্থাৎ প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই তথ্য থেকে উত্তররাঢ ও দক্ষিণরাঢের সীমানার নির্দেশ পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর শাসনে (চব্বিশ-পরগণার দক্ষিণে বারুইপুরের কাছে গোবিন্দপুর গ্রাম) ভূমিদান প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে: 'বর্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিম-খাটিকায়াং বেতড্ড চতুরকে'। 'খাড়ি' কথা সংস্কৃতে 'খাটিকা'। বোঝা যায় যে গঙ্গা তখন দুইভাগে খাড়িমণ্ডলকে বিভক্ত করত। পূর্বতীরের নাম ছিল পূর্বখাড়ি। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় 'খাড়ি' গ্রাম আছে। পশ্চিমতীরে ছিল পশ্চিম-খাড়ি। 'খাড়ি' শব্দই সংস্কৃতে 'খাটিকা' হয়েছে।

জনপদ বিভাগের এই প্রাচীন ইতিহাস থেকে মনে হয়, প্রধানত শাসনব্যবস্থার সুবিধার জন্য, হিন্দুযুগেও ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন করা হত। দশম শতাব্দীতে

দেখা যায়, বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল দণ্ডভুক্তি (ইর্দা তাম্রশাসন)। পরে দণ্ডভুক্তি অধিকাংশই উৎকলভুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে উৎকলরাজাদের আধিপত্য বিস্তারকালে দণ্ডভুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বর্ধমানভুক্তি থেকে। লক্ষ্মণসেনের আমলে কঙ্কগ্রামভুক্তির নাম পাওয়া যায় এবং মনে হয় সেই সময় কোনো প্রশাসনিক কারণে এই নতুন ভুক্তি গঠিত হয়। হিন্দুযুগের ভুক্তি মণ্ডল বিষয় মুসলমানযুগে সরকার মহল পরগণা চাকলা প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হয়। ইংরেজযুগে জেলা মহকুমা থানা ইত্যাদি বিভাগ হয় এবং জেলা-সীমানার একাধিকবার পরিবর্তন করা হয় প্রশাসনিক কারণে। কাজেই বর্তমানে জেলাগত ইতিহাস ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব প্রদর্শনের যে প্রবণতা কারও কারও মধ্যে দেখা যায়, তার কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি নেই।

ইংরেজযুগে জেলাসীমানার পরিবর্তন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) সমগ্র বঙ্গদেশ (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙলাদেশ) ষোলটি জেলায় বিভক্ত ছিল, হিজলির নিমকমহল (Salt Agency) সহ। পরে কলকাতা নিয়ে আটাশটি জেলায় বিভক্ত হয। জেলার 'ইউনিট' হয় 'থানা' এবং চারটি বা তার বেশি থানা নিয়ে এক-একটি 'মহকুমা' গঠিত হয়। দু-একটি জেলায়, যেমন দার্জিলিঙে, চারটির কম থানা নিয়ে মহকুমা গঠিত হয়। জেলা-সীমানার পরিবর্তন করা হয় অনেকবার, প্রশাসনিক কারণে। এখানে সংক্ষেপে তালিকাকারে এই পরিবর্তনের বিবরণ দেওয়া হল, কোন্ সময় কোন্ অংশ যুক্ত অথবা বিযুক্ত হয়েছে তারও উল্লেখ করা হল। সংলগ্ন তিনটি মানচিত্রে অংশগুলিতে 'সংখ্যা' দেওয়া আছে এবং তালিকাতে + চিহ্ন দ্বারা যুক্ত এবং − চিহ্ন দ্বারা বিযুক্ত অংশগুলি সূচিত হয়েছে।[৮]

বর্ধমান

১৭৬০ সালে মীরকাশিম বর্ধমান ইংরেজদের হস্তান্তর করেন। তখন বর্ধমান জমিদারীর সীমানা ছিল, বর্তমান বর্ধমান (সাতসৈকা ছাড়া), হুগলি ও হাওড়া (সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল ছাড়া), মেদিনীপুর (ঘাটাল, সদরের গড়বেতা, শালবনি ও কেশপুর থানার উত্তরাংশ), বাঁকুড়া (রায়পুর থানা) এবং বীরভূম (অজয়ের উত্তরে

৮ Monmohan Chakrabatti : A Summary of the Changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916 : Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1918. For Official Use only.

খানিকটা অঞ্চল) পর্যন্ত বিস্তৃত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, মাত্র একশো বছরের মধ্যে, বহুবার বর্ধমানের সীমানার পরিবর্তন হয়, মধ্যে পশ্চিম-বর্ধমান ও পূর্ব-বর্ধমান নামে দু'টি জেলাও হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ প্রশাসনিক, রাজস্ব আদায়, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি। পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১৭৯৩ সালে ছয়টি জঙ্গলমহল (রায়পুর শ্যামসুন্দরপুর ফুলকুসুমা সিমলাপাল প্রভৃতি) বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (−১৮)। ১৭৯৪ সালে সাতসৈকা ও সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল নদীয়া থেকে বর্ধমানে যুক্ত হয় (+২, +৫, +৬, +৭)। ১৭৯৫ সালে হাওড়া-সহ হুগলি পৃথক হয় এবং বগড়ি পরগণা মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (−৪ অধিকাংশ, −৫ থেকে −৮, −১০ থেকে −১৪, −১৭)। ১৭৯৫-১৮০৭ সালের মধ্যে পাণ্ডুয়া পরগণা, অন্যান্য মহলসহ, হুগলিতে যুক্ত হয় (−৪ আংশিক)। ১৮০৫ সালে সেনপাহাড়ী শেরগড় বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলে যুক্ত হয় (−২১, −২২)। ১৮০৬ সালে অজয় নদ হয় বর্ধমানের উত্তর সীমানা (−১)। ১৮৩৩ সালে সেনপাহাড়ী শেরগড় ও বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ জঙ্গলমহল বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৬, +২১, +২২)। ১৮৪৮ সালে আউসগাঁ ও ইন্দাস বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৬, +৩ আংশিক) এবং ১৮৫১ সালে ইন্দাস থানা পুনরায় বাঁকুড়াতে যুক্ত হয় (−১৬)। ১৮৭২ সালে বাঁকুড়া থেকে সোনামুখী ও কোতলপুর থানা এবং হুগলি থেকে জাহানাবাদ ও গোঘাট বর্ধমানে যুক্ত হয় (+১৫, +১২)। ১৮৭৯ সালে বুদবুদের মহকুমার মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং কোতলপুর ও সোনামুখী-সহ ইন্দাস থানা বর্ধমান থেকে পুনরায় বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (−১৫, −১৬)। ১৮৭৯ সালে গোঘাট ও জাহানাবাদ থানা বর্ধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত হয় (−১২)।

বীরভূম

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর বীরভূম ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন বীরভূম-জমিদারীর সীমানা ছিল বর্তমান বীরভূম (সদর), সাঁওতাল পরগণা (দেওঘর, জামতাড়া ও সদরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে, ১৭৮৭ সালে যুক্ত বিষ্ণুপুর, বর্ধমানে স্থানান্তরিত হয়। তখন বীরভূমের এলাকা ছিল বর্তমান সদর মহকুমা এবং সাঁওতাল পরগণা (সদরের উত্তরভাগ ছাড়া)। পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের ২৫০ গ্রাম বীরভূমে যুক্ত হয় (+৪ আংশিক)। ১৭৯৯ সালে পঞ্চকোট ও ঝালদা (রামগড় জেলা) যুক্ত হয় বীরভূমে (+৫

বর্ধমান· বাঁকুড়া· হুগলি· হাওড়া
আসানসোল
রাণীগঞ্জ
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
রায়পুর
ঘাটাল
বর্ধমান
কালনা
জামালপুর
পাণ্ডুয়া
চুঁচুড়া
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
বালি
আমতা
উলুবেড়িয়া
বামনগর
কিলোমিটার
০
২৫
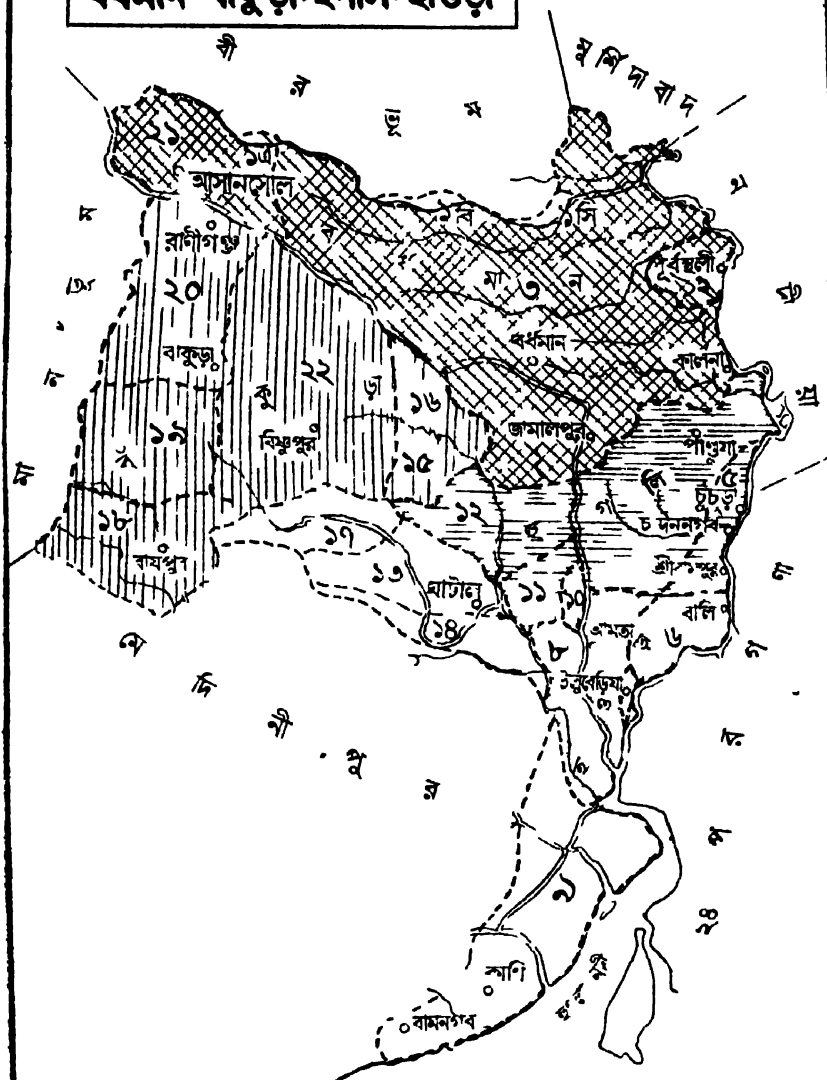
আংশিক)। ১৮০৫ সালে ষোলটি জঙ্গলমহল (পঞ্চকোট বাঘমুণ্ডি ঝালদা ঝরিয়া জয়পুর পাতকুম প্রভৃতি) নতুন জঙ্গলমহল জেলায় যুক্ত হয় (−৫ আংশিক)। ১৮০৬ সালে দক্ষিণের সীমানা হয় অজয় নদ, এবং ভাগীরথীর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ বীরভূমে যুক্ত হয় (+৮ আংশিক)। ১৮৫৪ সালে ভরতপুর থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (−৮ আংশিক)। ১৮৫৫ সালে নতুন সাঁওতাল পরগণা জেলা গঠিত হলে বীবভূমের আগেকার অনেকাংশ তার সঙ্গে যুক্ত হয় (−১)। ১৮৭২ সালে রামপুরহাট নলহাটি ও পলসা থানা মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (−২), তারপর ১৮৭৯ সালে পুনরায় এই অংশ বীরভূমে যুক্ত হয় (+২)।

বাঁকুড়া

প্রথমে বর্ধমান ও মেদিনীপুবের সঙ্গে আংশিকভাবে (১৭৬০) এবং বীরভূমের সঙ্গে আংশিকভাবে (১৭৬৫) ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। সেই অবস্থা বজায় থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত জঙ্গলমহল জেলাভুক্ত হয় (রেগুলেশন ১৮, ১৮০৫)। ১৮৩৩ সালে বিষ্ণুপুর বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং জঙ্গলমহল হয় দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সি (South-West Frontier Agency)। ১৮৩৩ সালে বাঁকুড়া পৃথক জেলা হয়। পববর্তী পরিবর্তনেব মধ্যে উল্লেখ্য হল:

১৮৩৭ সালে কোতলপুর থানাসহ বিষ্ণুপুর একটি পৃথক জেলা হয়, 'পশ্চিম বর্ধমান' নামে (+২২, +১৫)। ১৮৪৭ সালে মানভূম থেকে ছাতনা থানা বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (+২০ অধিকাংশ)। ১৮৪৮ সালে আউসগ্রাম ইন্দাস পোথনা থানা 'পূর্ব বর্ধমান' জেলায় যুক্ত হয় (−১৬ আংশিক, −৩ আংশিক)। ১৮৭২ সালে কোতলপুব সোনামুখী ও ইন্দাস থানা বর্ধমানে যুক্ত হয় (−১৫, −১৬), ১৮৭৯ সালে পুনরায় বাঁকুড়ায় যুক্ত হয় (+১৫, +১৬)।

মেদিনীপুর

মীরকাশিমের আদেশে ১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে মেদিনীপুরও ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন মেদিনীপুরের আয়তন ছিল প্রায় ৬১০২ বর্গমাইলের মতো এবং তার সীমানার মধ্যে ছিল: বর্তমান মেদিনীপুর (হুগলির অন্তর্গত হিজলি মহিষাদল ও তমলুক ছাড়া; মারাঠাদের শাসনাধীন কামারডিচর পটাশপুর ও ভোগরাই ছাড়া; বর্ধমানভুক্ত ঘাটাল মহকুমা, গড়বেতা থানা এবং শালবনি ও
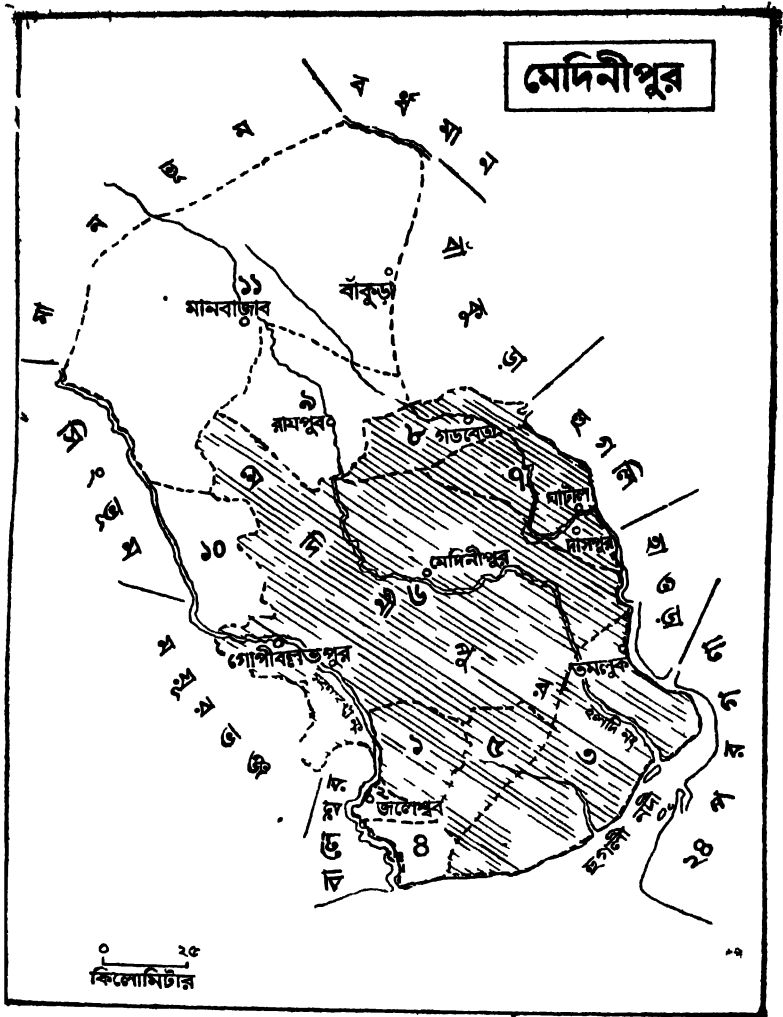
কেশপুর থানার কিয়দংশ ছাড়া), সুবর্ণরেখার উত্তরে বালাসোরের কিয়দংশ, সিংভূমের ধলভূম মহকুমা, বরাভূম মানভূম, মানভূমের জঙ্গলমহল এবং বাঁকুড়ার ছাতনা ও অম্বিকানগর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হিজলি মহিষাদল ও তমলুক স্বতন্ত্র নিমকমহলের অধীন ছিল এবং ঘাটাল মহকুমা ও সদরের উত্তরভাগ বর্ধমানভুক্ত ছিল। তার পরের পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১৭৯৩ সালে ছয়টি জঙ্গলমহল বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (+৯)। ১৭৯৫ সালে বগড়ি বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরভুক্ত হয় (+৮)। ব্রাহ্মণভূম

পরগণা, বগড়ির খানিকটা অংশ, পরগণা চেতুয়া ও তরফ দাসপুর ১৮০০ সালে হুগলি থেকে মেদিনীপুরে যুক্ত হয় (+৭)। ১৮০৫ সালে সাতটি জঙ্গলমহল (ছাতনা বরাভূম মানভূম শ্রীপুর সিমলাপাল প্রভৃতি) স্বতন্ত্র জঙ্গলমহলভুক্ত করা হয় (–৯, –১১)। ১৮৩৩ সালে ধলভূম দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত এজেন্সিভুক্ত হয় (–১০)। ১৮৩৪ সালে হিজলি মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয (–১০)। ১৮৩৭ সালে পরগণা ভোগবাই কামারডিচর ও শাহবন্দর বালাসোবের সঙ্গে যুক্ত হয় (–২, –৪)। ১৮৭২ সালে ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা থানা হুগলি থেকে মেদিনীপুরের সঙ্গে যুক্ত হয় (+৭)।

হুগলি

১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে হুগলি ইংবেজদের অধিকারে আসে। ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভেব পর ইংরেজরা সরস্বতীর পূর্বতীবাঞ্চলের মালিক হন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময এই পুর্বাঞ্চল নদীযাভুক্ত ছিল এবং হুগলি প্রধানত ছিল বর্ধমানের মধ্যে। সরস্বতীর পূর্বতীবাঞ্চল ১৭৯৪ সালে বর্ধমানের সঙ্গে যুক্ত হয। তার পরবর্তী পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১৭৯৫ সালে হুগলি জেলা পৃথক কবা হয বর্ধমান থেকে। ১৭৯৫-১৮০৭ সালের মধ্যে পরগণা পাণ্ডুযা ও সংলগ্ন কযেকটি অঞ্চল বধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত করা হয় (+৪ আংশিক)। ১৮০০ সালে ২৪-পরগণার সমস্ত মহল (কলকাতা ছাড়া) হুগলি জেলাতে যুক্ত হয়। এই সময রূপনাবাযণেব দক্ষিণে পবগণা ব্রাহ্মণভূম, চেতুয়া ও দাসপুর মেদিনীপুরেব সঙ্গে যুক্ত হয (–১৩, –১৲)। ১৮০৬ সালে ২৪-পরগণা জেলা পুনবায স্থাপিত হয (কেবল দেওয়ানী আদালত)। ১৮১৯ সালে উলুবেড়িয়া থানা ও সংলগ্ন এলাকা কলকাতা থেকে হুগলিতে যুক্ত হয় (+৭, +৮ আংশিক)। ১৮২৪ সালে চুঁচুড়া ডাচদের কাছ থেকে দখল করা হয়। ১৮৪৩ সালে সালকিয়া আমতা বাগনান প্রভৃতি থানা নিযে হাওড়া পৃথক করা হয় (–৬, –৭, –৮)। ১৮৪৫ সালে শ্রীরামপুব দখল কবা হয়। ১৮৭২ সালে জাহানাবাদ ও গোঘাট থানা বর্ধমানে, এবং ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা মেদিনীপুবে যুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ সালে গোঘাট ও জাহানাবাদ পুনরায় বর্ধমান থেকে হুগলিতে যুক্ত হয।

হাওড়া

১৭৬০ সালে বর্ধমানের সঙ্গে এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর হাওড়া ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৯৫ সালে যখন পৃথক হুগলি জেলা গঠিত হয়,

বীরভূম • মুর্শিদাবাদ • নদীয়া • ২৪পরগণা
রামপুরহাট
সিউড়ি
কান্দি
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
কৃষ্ণনগর
কলিকাতা
গঙ্গা নদী
রাজসাহী
মেদিনীপুর
কিলোমিটার
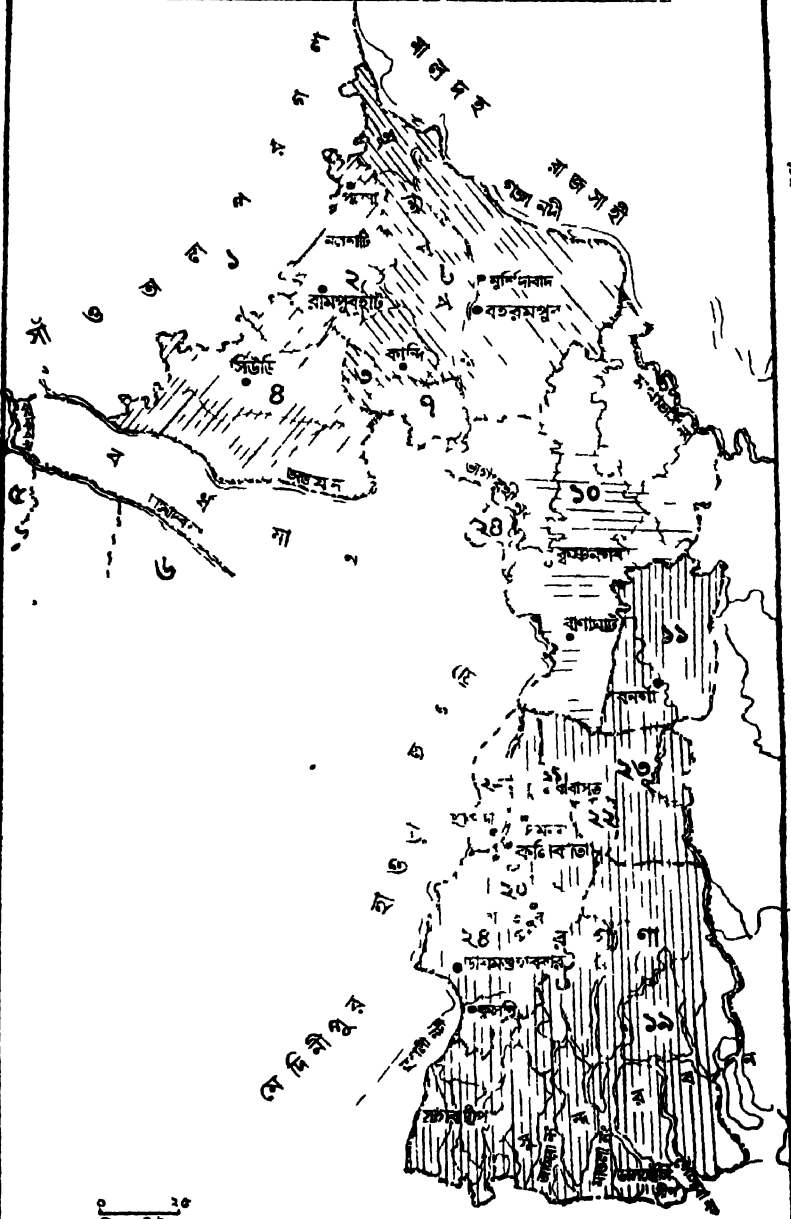
তখন হাওড়া তার মধ্যেই ছিল। ১৯১৭-১৮ সালেও হুগলি থেকে হাওড়া পৃথক ছিল কেবল ফৌজদারী বিচারের ব্যাপারে, রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচারের ব্যাপারে হুগলির অধীন ছিল।

চব্বিশ-পরগণা

১৭৫৭ সালে মিরজাফর ক্লাইভকে ২৪-পরগণা জায়গীর হিসেবে দেন। সেই সময় তার আয়তন ছিল প্রায় ৮৮২ বর্গমাইল এবং সদর মহকুমা, বারাকপুর ও ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা তার মধ্যে ছিল। সুন্দরবন অঞ্চল ছিল হুগলির সঙ্গে যুক্ত এবং বারাসাত ও বসিরহাট মহকুমা ছিল নদীয়ারাজের অধীন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সুন্দরবন অঞ্চল ২৪-পরগণার সঙ্গে যুক্ত হয়, কিন্তু বারাসাত ও বসিরহাট তার বাইরেই থাকে। কলকাতার পুরাতন সীমানার বাইরের এলাকা বর্তমানে ২৪-পরগণার মধ্যেই আছে, এবং বারাসাত ও বসিরহাট অঞ্চলও এই জেলার সঙ্গে যুক্ত।

নদীয়া

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজদের অধিকারে আসে। নদীয়ারাজের এলাকা ছিল তখন ৩১৫১ বর্গমাইল। বর্তমান নদীয়ার সদর ও রাণাঘাট মহকুমা দক্ষিণ-মেহেরপুরের সামান্য অংশ, যশোহরের বনগাঁ ও সদরের দক্ষিণ-পূর্বাংশ, খুলনার পশ্চিম-সাতক্ষীরা অঞ্চল নিয়ে ছিল নদীয়ারাজের সীমানা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সাতসৈকা পরগণা ও সরস্বতীর পূর্বতীরাঞ্চল নদীয়ারাজভুক্ত হয়। ১৭৯৬ সালে নদীয়া ও যশোহরের সীমানা নির্দিষ্ট হলেও, পরে একাধিকবার তার পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ১৭৯৯ সালে মির্জানগর যশোহরে যুক্ত হয়েছে (–১২ আংশিক)। ১৮০২ সালে আনওয়ারপুর জমিদারী ২৪-পরগণায় যুক্ত হয় (–২১ অধিকাংশ)। ১৮০২ সালে টাকী ও সুখসাগর থানা যশোহর থেকে নদীয়ায় যুক্ত হয় (+২৩ আংশিক) এবং কোটচাঁদপুর থানা যশোহরে যুক্ত হয় (–১২ আংশিক)। ১৮৬৩ সালে পাবনা থেকে কুষ্টিয়া এবং ১৮ সালে কুমারখালি নদীয়ায় যুক্ত হয় (+৯)। ১৮৮৩ সালে বনগাঁ মহকুমা যশোহরের সঙ্গে যুক্ত হয় (–১১)। বর্তমানে বনগাঁর একাংশ ২৪-পরগণার অন্তর্ভুক্ত এবং নদীয়ার কিয়দংশ নতুন রাষ্ট্র বাঙলাদেশভুক্ত।

মুর্শিদাবাদ

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর মুর্শিদাবাদ ইংরেজদের অধিকারে আসে। তখন মুর্শিদাবাদ বলতে বোঝাত, রাজশাহী ও নদীয়ার জমিদারীর কিয়দংশ এবং ফতেসিং ও চুনাখালির জমিদারীসহ বেশ বড় একটা অঞ্চল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এবং ১৯১৭-১৮ সাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলা বেশ বড়ই ছিল, বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমা ও সদরের খানিকটা অংশ মুর্শিদাবাদের মধ্যে ছিল। ১৮৭২ সালে রামপুরহাট, নলহাটি থানা ও সংলগ্ন অঞ্চল বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে যুক্ত হয় (+২), ১৮৭৯ সালে এই থানাগুলি পুনরায় বীরভূমের সঙ্গে যুক্ত হয় (−২)।

ইংরেজযুগে বাংলার জেলাসীমানার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে (১৭৯৩) প্রায় একশো বছর ধরে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নানা কারণে বিভিন্ন জেলার আয়তন ও সীমানা অদলবদল করেছেন। তার মধ্যে প্রধান কারণ হল প্রশাসনিক সুব্যবস্থা। তার জন্য তাঁরা যখনই মনে করেছেন যে তাঁদের শাসনের, রাজস্ব আদায়ের অথবা বিচারব্যবস্থার সুবিধা হবে তখনই জেলাগুলিকে ভেঙেছেন গড়েছেন, এক জেলার কতকাংশ অন্য জেলার সঙ্গে জুড়েছেন, আবার সেই একই অংশ পুরাতন জেলার সঙ্গে পুনরায় যুক্ত করেছেন। বিংশ শতাব্দী থেকে মোটামুটি বলা চলে জেলাগুলির বর্তমান সীমানা অনেকটা স্থায়ী হয়েছে। কাজেই জেলাগত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিচারকালে, একথা মনে রেখে, আমাদের বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। জেলাগত সংস্কৃতির অবশ্যই বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা অথবা স্বাতন্ত্র্যের প্রলেপ দেওয়া বৈজ্ঞানিক কারণেই সঙ্গত নয়। একথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির এক-একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হল বিভিন্ন জেলার সংস্কৃতি। জেলার মধ্যেও দেখা যায়, এক-একটি মহকুমার বেশ উল্লেখ্য সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, মেদিনীপুর জেলায় তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার সঙ্গে সদর ও ঝাড়গ্রাম মহকুমার সাংস্কৃতিক উপাদানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেই রকম বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর ও সদর মহকুমার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের পার্থক্য বেশ লক্ষণীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের, থানার মহকুমার এবং জেলার সংস্কৃতির উপাদানগত বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যের মিলনমিশ্রণে সমগ্র বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে পাপড়িমেলা পদ্মফুলের মতো।

বর্ধমান

বর্ধমান

বর্ধমান জেলাকে রাঢ়দেশের মধ্যমণি বলা যায়। বর্ধমানের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনাকালে এই জেলার বর্তমান ভৌগোলিক সীমানার সঙ্গে উত্তরদিকের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণার সংলগ্ন এক বিস্তৃত অরণ্যময়পার্বত্য ভূমির দৃশ্য অতীতের অন্ধকার থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্রিটিশ আমলে জেলাসীমানাব অনেক পরিবর্তনের পর বর্ধমানের বর্তমান ভৌগোলিক সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-কথা আগেই বলেছি। বাঁকুড়া থেকে বীরভূম পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার যে উত্তরাঞ্চল, তারই অন্তর্ভুক্ত হল বর্তমান বর্ধমানের ··কর আসানসোল দুর্গাপুর পানাগড কাঁকসা মানকর অমরাগড় ভাল্কি বুদবুদ গৌরাঙ্গপুর রাজগড় গুস্করা মঙ্গলকোট। এই অঞ্চলের অরণ' ও পাথুরে মাটির সঙ্গে রাঢ়ের মানুষ সুপরিচিত। একসময়, সুদূর অতীতে, এই অঞ্চলে বন্য শিকারীরা বাস করত। দুর্গাপুরে পাথুরে মাটির কয়েক ফুট নিচে তাদের ব্যবহারের আয়ুধ পাওয়া গিয়েছে। আরও খুঁড়লে ভবিষ্যতে আরও পাওয়া যাবে। কিন্তু খোঁড়াখুঁড়ির মতো শ্রমসাধ্য প্রত্নতাত্ত্বিক কর্ম করবে কে? বাঘ-ভাল্লুকের উপদ্রব পঞ্চাশ বছর আগেও এইসব অঞ্চলে যথেষ্ট ছিল। দুর্গাপুরের শালবনের আঁকবাঁকা পথ ধরে চললে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত। ··র্মানে অদূরদর্শী বনোৎপাটন-নীতি (de-forestation) ও দুর্গাপুরের মতো শিল্পনগরের বিকাশের ফলে সেই রোমাঞ্চ প্রায় লোপ পেয়েছে।

১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে গৌরাঙ্গপুর রাজগড় শ্যামারূপার গড় অঞ্চলে ভ্রমণের সময় গ্রামবাসীরা হাতে দা-কুঠার নিয়ে সামনে চলার পথ তৈরি করে দিয়েছেন, আমি তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য শিকারীরাই যে এখানে বাস করত, পশু শিকার করে, অরণ্যের ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত, তা কল্পনা করতে আজও বিশেষ কষ্ট হয় না। দুর্গাপুরে প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারে স্তম্ভিত হবার কিছু নেই। এ-অঞ্চল পলিমাটির তৈরি নয়, পাথুরে মাটির তৈরি এবং ভূতাত্ত্বিক যুগ পর্যন্ত তার অতীত ইতিহাস। এই বন্য শিকারীরাই পরে পশুপালন এবং চাষবাস করতে শিখেছে। হয়ত একদল পশুপালন করেছে, এবং আর-একদল কৃষিকাজে মন দিয়েছে। বর্ধমান জেলার বর্তমান 'গোপদের আদিপুরুষ তাবাই যারা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রথম পশুপালন করে স্থায়ী উন্নত সভ্যতার স্তরে অগ্রসর হয়েছিল। কৃষির পত্তন করেছিল যারা, তারাই বর্তমান সদ্‌গোপদের আদিপুরুষ। আর বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলের নাম আজও তো পরগণা **গোপভূম**। পশুপালন ও কৃষিকাজ দুই-ই খাদ্য-উৎপাদন (food production)। সুতরাং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে খাদ্যসংগ্রহ করার যাযাবর স্তর থেকে প্রকৃতিকে জয় করে খাদ্য-উৎপাদন করার স্থায়ী সভ্য স্তরে উন্নত হওয়ার পথে আদিম পশুপালক ও কৃষক—উভয়েরই দান সমান, মর্যাদাও সমান। যাঁরা আর্যশ্রেষ্ঠতার মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদেব আর্যোৎপত্তি প্রমাণ করতে চান, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে, আর্যরা প্রধানত পশুপালক ছিলেন এবং কোনো উন্নততর সভ্যতা তাঁরা বহন করে আনেননি। পশুপালনের চেয়ে কৃষিই উন্নততর স্তর, এ-ধারণা ভুল, নৃবিজ্ঞানীরা এমত সমর্থন করেন না। দীর্ঘকাল ধরে বন্য হিংস্র পশুর আচরণ ও স্বভাব লক্ষ্য করে তাকে বন্দী করা, পোষ-মানানো ও পালন করার কৌশল আয়ত্ত করা এবং তার বংশবৃদ্ধি করে তার মাংস দুধ ইত্যাদি খাদ্যের সংস্থান করা, চাষ করে ফসল ফলানোর চেয়ে কম যুগান্তকারী নয়। পশুপালনের তুলনায় কৃষিকে উন্নততর স্তর মনে করা ভুল। কৃষি যেমন, পশুপালনও তেমনি স্থায়ী গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছে। পার্বত্য অঞ্চলের কৃষককে যেমন ক্ষেত পুড়িয়ে নতুন ক্ষেতের সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়েছে, পশুপালককেও তেমনি চারণ ও পালনের জন্য মধ্যে মধ্যে বাসস্থান ছাড়তে হয়েছে। যাই হোক, গোপ ও সদ্‌গোপরাই পশ্চিমবাংলার পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার অন্যতম ধারকবাহক বলে মনে হয়। কে বড়, কে ছোট তাই নিয়ে তর্ক করা কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের পরিচয় দেওয়া ছাড়া কিছু নয়। জাতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর কাছে কোনো জাতির ছোট-

বড়ত্বের বা বিশুদ্ধতায় অস্তিত্ব নেই। বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে সদ্‌গোপ ও গোপদের পূর্বপুরুষদের যে প্রতিপত্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বন্য যাযাবরের স্তর থেকে তাঁরা এই অঞ্চলের সভ্যতাকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে উন্নত করেছিলেন। দলপতি গোষ্ঠীপতি কৌমপতি থেকে তাঁদের মধ্যে অনেকে পরে 'রাজা'ও হয়েছিলেন। গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশের ইতিহাস বর্ধমান তথা রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ভাল্কি অমরাগড় কাঁকসা রাজগড় গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্‌গোপদের দানের গুরুত্ব আজও নির্ণয় করা হয়নি। গোপভূম অঞ্চলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আমার মনে হয়েছে, বাংলার শৈবসাধনার অন্যতম প্রবর্তক তাঁরাই। শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে একই কিংবদন্তীর বিচিত্র বিস্তার দেখেছি এই অঞ্চলে ও তার আশেপাশে। সর্বত্রই গোপদের সঙ্গে শিবের উৎপত্তি জড়িত। গরু দুধ দিয়ে আসে জঙ্গলে, তারপর সেই জঙ্গল থেকে শিবের আবির্ভাব হয়। গরুর মালিকই সেই শিব আবিষ্কার করেন। এই কিংবদন্তীর তাৎপর্য গভীর মনে হয়। শৈবসাধনার প্রতিপত্তি গোপভূমে খুব বেশি। শিবের সঙ্গে শক্তিও আছেন। ধর্মঠাকুরেরও অভাব নেই। মোটকথা, রাঢ়ের সংস্কৃতির এই অন্যতম বিশেষত্ব বর্ধমানে বেশ প্রকট।
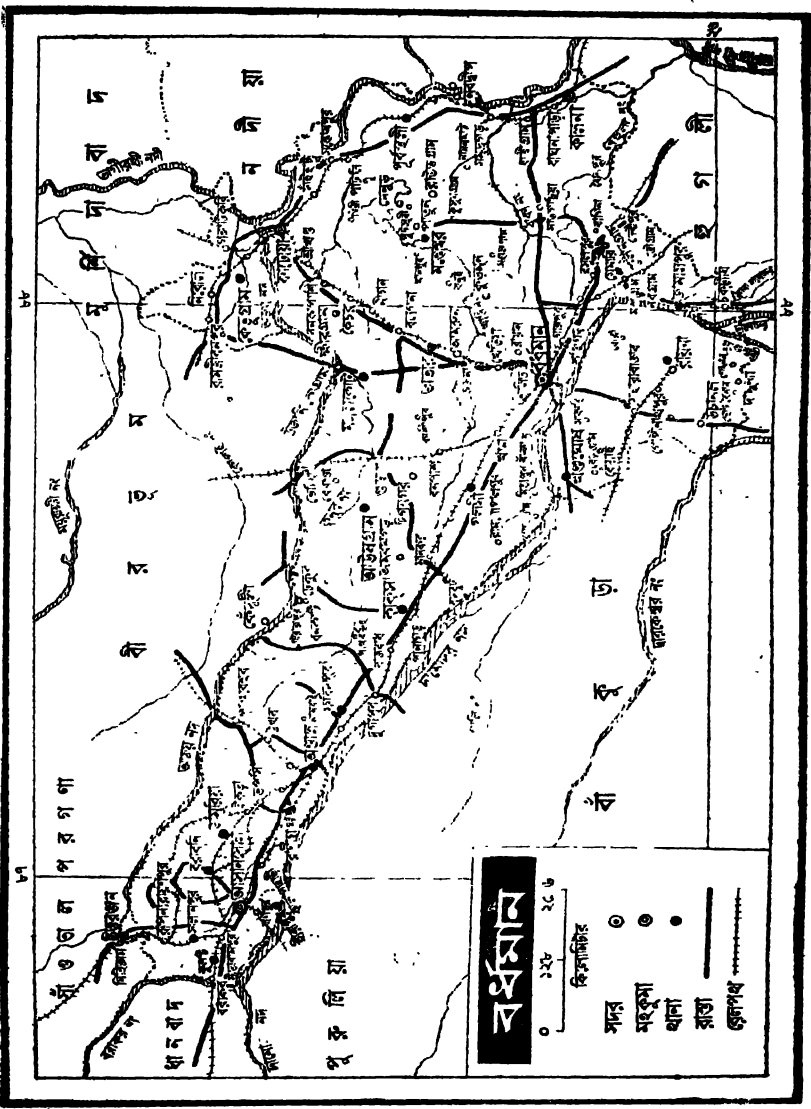
বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দেরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। অনেকে মনে করেন, উগ্রক্ষত্রিয়রা বাংলার বাইরে থেকে অভিযাত্রী রাজাদের সঙ্গে যোদ্ধা হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এই ধরনের যুক্তি অনেকটা অর্থহীন, কারণ বাইরে থেকে সকলেই প্রায় এদেশে এসেছেন, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত—নেগ্রিটোরা থেকে আরম্ভ করে আদিঅষ্ট্রাল বা নিষাদজাতির পূর্বপুরুষরা, দ্রাবিড় আর্য শক হুন পাঠান মোগল সকলেই। কথাটা তা নয়। উগ্রক্ষত্রিয়রা সম্পূর্ণ বাঙালী এবং বাংলা দেশেই তাঁদের বিকাশ হয়েছে। তাঁরা প্রধানত কৃষিজীবী ছিলেন এবং প্রাচীনকালে শৌর্যবীর্যে তাঁদের সমকক্ষ জাতি খুব বেশি ছিল না। আজও তার প্রভাব তাঁদের মধ্যে রয়েছে। গোষ্ঠীপতি ও দলপতি থেকে তাঁরাও বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। হিন্দুযুগে আঞ্চলিক সামান্তরাজা ছাড়াও 'অগ্রহারিক' ও জমিদার ছিলেন, পরবর্তীকালের জায়গীরদারদের মতো। বৈদেশিক অভিযান ও যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁরা নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে সংগ্রাম করেছেন। তখনকার দিনে সামন্তরাই ছিলেন স্বাধীন রাজার মতো। দেশরক্ষার ভার ছিল তাঁদের উপর। বাংলা দেশে অভিযান হয়েছে অসংখ্য এবং পশ্চিমবাংলার উপর দিয়েই তার

বেশির ভাগ চোট গিয়েছে। সদ্‌গোপ মাহিষ্য ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে হিন্দুযুগে প্রায়-স্বাধীন সামন্তরাজা অনেকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে—বাঁকুড়া মেদিনীপুর বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে। বর্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়রাও তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আজও দেখা যায়, এঁরা অনেকেই শক্তির উপাসক—শাকম্ভরী চণ্ডী চামুণ্ডা মহিষমর্দিনী প্রভৃতি দেবীর। মুসলমানযুগেও এঁদের মধ্যে অনেক রাজস্ব-আদায়কারী ছিলেন, স্থানীয় জমিদার ছিলেন। 'রায়' 'চৌধুরী' ইত্যাদি উপাধির মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে।

বর্ধমানের প্রশস্ত বদ্বীপাংশে ব্যগ্রক্ষত্রিয়দেব প্রাধান্য উল্লেখ্য। বাংলার ইতিহাসে মাহিষ্য ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দেব দান অপরিসীম। বাংলার ধীবর ও বাংলার চাষীদের পূর্বপুরুষরাই বাঙালীর সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি রচনা করেছেন। বাংলার লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের মধ্যে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন, বর্ধমানের ব্যগ্রক্ষত্রিয় বাউরি প্রভৃতিদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডীর প্রতিপত্তি খুব বেশি এবং মনসা ও চণ্ডী নিয়ে বাংলার মঙ্গলকাব্য সমৃদ্ধ হয়েছে। ধর্মঠাকুরের ধর্মমঙ্গলও আছে। মনসামঙ্গল সম্বন্ধে উল্লেখ্য হল বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত ছাড়া অধিকাংশ মনসামঙ্গলের রচয়িতা রাঢ়ের লোক। বিপ্রদাসকেও রাঢ়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব-সীমানার বাইরে ধরা যায় না। রাঢ়ের সাধারণ লোকেব মধ্যে ক্ষেমানন্দ প্রভৃতির মনসার গান প্রচলিত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে যেসব স্থানের উল্লেখ আছে তা সবই প্রায় বর্ধমান জেলার মধ্যে এবং দামোদরের প্রাচীন প্রবাহপথের চিহ্নাবশেষ বাঁকা বেহুলা বল্লুকা গাঙ্গুরের তীরে তীরে অবস্থিত। এখনও এগুলি মনসাপূজার অন্যতম পীঠস্থান। যেমন জুঝাটি গোবিন্দপুর বর্ধমান গাঙ্গপুর দেপুর নেয়াদা কেজুয়া আমদপুর হাসনহাটি বৈদ্যপুর [illegible] প্রভৃতি। নৃবিজ্ঞানীরা জানেন, কোনো 'কাল্ট্' বা কোনো 'টেকনিক' তার উৎপত্তিস্থল থেকে ক্রমে তরঙ্গায়িত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন জলে পাথরখণ্ড ফেললে তার ঢেউ চারিদিকে ছড়ায়। উৎসকেন্দ্রের কাছে সবচেয়ে তার প্রাধান্য বেশি। বিশেষজ্ঞের ভাষায়ঃ

> It is an axiom of anthropology that a given technique will spread normally, in a widening circle like the ripples caused by pebble dropped into a pool. It will appear earliest, and its influence will be strongest near its point of origin.

এই কারণে মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা, জাগুলি ও বিষহরির পূজা মনসাপূজার রূপ নিয়েছিল। সেন-

আসলে যদি 'মনসা' নাম হয়ে থাকে, তাতেও অনুমান সত্য হবার সম্ভাবনা, কারণ সেনরা পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম থেকে ছিলেন। প্রাগার্য যুগ থেকে হিন্দুযুগ পর্যন্ত মনসার ইতিহাস। বর্ধমানেরও তাই।

যাযাবর শিকারীর স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষিসভ্যতার স্তরের নিদর্শন বর্ধমানে পাওয়া গিয়েছে। ব্রাত্য আর্যরা হয়ত জৈন ও বৌদ্ধযুগের আগে থেকেই এই অঞ্চলে এসেছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধযুগের সঙ্গে রাঢ়ের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল দু-হাজার আড়াই-হাজার বছর আগে। পার্শ্বনাথ পাহাড় বর্ধমানের বর্তমান সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে নয়। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম প্রচারের জন্য নিজে এসেছিলেন কিনা তার সঠিক প্রমাণ নেই। তবে দক্ষিণবিহারে তিনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে প্রাচীন বর্ধমানে আসা তাঁর পক্ষে বিচিত্র নয়। রাঢের রূঢ় অধিবাসীরা তাঁর পশ্চাতে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। বর্ধমানের বাউরিদের অন্যতম টোটেম্ 'কুকুর' এবং বাউরিরা এই অঞ্চলের আদিবাসী। মহাবীর নিজে না এলেও, তাঁর জীবিতকালেই তাঁর হাজার হাজার শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এসেছিলেন। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান-মহাবীরের নামেই এই অঞ্চলের নাম হয়ত বর্ধমান। এছাড়া 'বর্ধমান' নামের উৎপত্তি সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। জাতক ও তাঁর পরিবারবর্গের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় মহাবীরের জন্মনাম 'বর্ধমান' রাখা হয়। সেই নামেরই স্মৃতি বহন করছে 'বর্ধমান' জেলা। জৈনদের নিদর্শনও বর্ধমান ও তার পরিপার্শ্ব থেকে অনেক পাওয়া গিয়েছে, যেমন তীর্থঙ্করদের প্রস্তরমূর্তি। সুতরাং নামের মূল কারণ সত্য হবারই সম্ভাবনা।

জৈন ও বৌদ্ধযুগের পরবর্তীকালের প্রচুর নিদর্শন বর্ধমানে পাওয়া গিয়েছে, গোপচন্দ্রের ও গুপ্তদের যুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত। সুতরাং হিন্দুযুগের সভ্যতার সমস্ত ধারা বর্ধমানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বৈষ্ণব শৈব বৌদ্ধ (পালযুগের) ও তান্ত্রিকধারার বিচিত্র মিলন-মিশ্রণ হয়েছে বর্ধমানে। পরবর্তীকালে মুসলমানযুগে বর্ধমানের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা অনেকে জানেন। বখ্‌তিয়ারের পশ্চাদনুগমন করেছিলেন যাঁরা, বর্ধমানের উপর দিয়েই তাঁরা গিয়েছিলেন। মোগলযুগেও বর্ধমান অন্যতম ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ছিল। বর্ধমান জেলায় বহু বনেদী মুসলমানবংশের বাস আছে, এবং মুসলমানযুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনেরও অভাব নেই। প্রসিদ্ধ পীর ও ফকির অনেক আছেন বর্ধমানে। তারপর বণিকের ছদ্মবেশে এসে ইংরেজরা যেমন রাজা হয়েছিলেন, তেমনি বর্ধমানের রাজারাও বণিকের বেশে পাঞ্জাব থেকে এসে মোগলযুগে জমিদার এবং ইংরেজযুগে মহারাজাধিরাজ পর্যন্ত হন। তাঁদের রাজকীয়

বিলাসিতা স্বেচ্ছাচার ও বদান্যতার নিদর্শন বর্ধমানে প্রচুর আছে। ঐতিহাসিক নিয়মে আজ তার অধিকাংশই অবলুপ্তির পথে।

প্রস্তরযুগের সভ্যতার সীমানার মধ্যে যে বর্ধমানের অনেকটা অংশ ছিল, দুর্গাপুরের ভূগর্ভস্থ নিদর্শন থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভাস্কর্য ও সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থেকে জৈন ও বৌদ্ধযুগের প্রবাহের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাও উপেক্ষণীয় নয়। গুপ্তযুগের নিদর্শনও বর্ধমান থেকে পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে মশাগ্রামের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা উল্লেখ্য। শশাঙ্কের কর্ণসুবর্ণ রাজ্যেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ধমান। পাল ও সেন রাজ্যের তো ছিলই। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে বাংলার ইতিহাসে বর্ধমান একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল এবং এই মুসলমান যুগেই বাংলার সংস্কৃতিতে বর্ধমানের দান গুরুত্বপূর্ণ। তার মধ্যে 'বৈষ্ণব সাহিত্যে' দান বোধহয় সবচেয়ে বেশি। নবদ্বীপ ছাড়া শ্রীখণ্ড কাটোয়া কালনা দেনুড় ঝামটপুর বাঘনাপাড়া প্রভৃতি বৈষ্ণবদের ঐতিহাসিক স্থান অধিকাংশই বর্ধমানে এবং কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গৌরীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বর্ধমানবাসী।

বর্ধমানের নাম প্রথমে সঠিকভাবে জানা যায় মুসলমানযুগে। মোগলসৈন্য যখন দাউদ কররানীকে বাংলা দেশ থেকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন টাণ্ডা (মালদহ জেলায়, গৌড়ের কাছে) প্রধান ঘাঁটি হলেও, বর্ধমান ছিল অগ্রগামী মোগলসৈন্যের সম্মুখঘাঁটি। ১৫৭৪-৭৫ সালের কথা। রাজা তোডরমল্ল নিজে মোগলসৈন্যদের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন বিজয়ী মোগলসৈন্যের পদধ্বনিতে তখন বর্ধমান শহর থেকে গড়-মন্দারন পর্যন্ত পথ কেঁপে উঠেছিল ও দাউদ কররানী মন্দারন (আরামবাগ, হুগলি) থেকে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে উড়িষ্যার দিকে পালাচ্ছিলেন। রাজা তোডরমল্লের এই অভিযানের স্মৃতি ছাড়াও সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে একাধিক মোগল শাসকের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধমান শহর। কুতবউদ্দীন, শের আফগান, আজিমুশ্বান, আলিবর্দি খাঁ সকলকেই বর্ধমান শহরে বাস করতে হয়েছিল একসময়। সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর তৃতীয়বার মানসিংহকে পাঠান বাংলার সুবাদার করেন। এই সময় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের জীবনের রোমান্টিক নায়িকা নূরজাহান ছিলেন বর্ধমান শহরে এবং তিনি তখন বর্ধমানের তুর্কী জায়গীরদার শের আফগানের প্রিয়তমা বিবি। রাজসিংহাসনে বসেও জাহাঙ্গীরের মনে তাই শান্তি ছিল না। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বর্ধমান শহরের কথাই তখন তাঁর সবসময় মনে হত। কি করে নূরজাহানকে পাওয়া যায়, বর্ধমান শহরের এক

জায়গীরদার-পত্নীকে কেমন করে আগ্রায় নিয়ে এসে হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী করা যায়, এই ছিল তখন জাহাঙ্গীরের একমাত্র চিন্তা। দরদী কুতবউদ্দীন খাঁ-র সঙ্গে তিনি মতলব করেন, জোর করে নূরজাহানকে ছিনিয়ে আনবেন। কুতবউদ্দীন খাঁকে সেই উদ্দেশ্যে সুবাদার করে পাঠালেন বাংলাদেশে এবং মানসিংহকে বিহারে সরিয়ে দিলেন। নানাভাবে চক্রান্ত করে কুতবউদ্দীন চেষ্টা করলেন শের আফগানকে হত্যা করতে। ব্যর্থ হলেন। অবশেষে সামনা-সামনি লড়াই হল। বর্ধমান রেলস্টেশনের কাছাকাছি কোনো স্থানে এই লড়াই হয়। লড়াইয়ে শের ও কুতব উভয়েই নিহত হন। দু'জনকেই পাশ পাশি কবর দেওয়া হয়। বর্ধমান শহরের একদিকে সেই প্রস্তরমণ্ডিত কবর দু'টি রয়েছে, শের আফগানের ও কুতবউদ্দীনের। কবরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, হতভাগা শের আফগান! আর মনে হয়, যাঁর রূপে পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠত এবং যিনি বিলাসপ্রিয় জাহাঙ্গীরের রাজ্যপরিচালনার ভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন, সেই ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহান একদিন বর্ধমান শহরের ক্ষুদ্র আকাশেই তারকার মতো বিরাজ করতেন, সামান্য জায়গীরদার-পত্নীরূপে।

সম্রাট শাজাহান কুমারজীবনে বিদ্রোহী হয়ে বর্ধমান শহর দখল করেন। শোভা সিং ও রহিম খাঁও বিদ্রোহ করে বর্ধমান শহরে নিহত হন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব তাঁর পুত্র আজিমুশ্বানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং ১৬৯৭ সালে আজিমুশ্বান বর্ধমান শহরে আসেন। বর্ধমান শহরেই প্রায় তিন বছর তিনি থাকেন। মোগল আমল তখন অস্তাচলে। রাজ্যের মধ্যে শৃংখলা নেই। কলকাতা চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় এই সময় ইউরোপীয় বণিকদের দুর্গ গড়ার অনুমতি দেওয়া হয় আত্মরক্ষার জন্য। ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে আজিমুশ্বান সুতানুটি কলকাতা ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারীস্বত্ব ১৬,০০০ টাকা নজর নিয়ে, স্থানীয় জমিদারের (বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী) কাছ থেকে তাঁদের কিনে নেবার অনুমতি দেন। কলকাতা শহর তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হয় বর্ধমান শহর থেকে।

কটক থেকে ফেরার পথে আলিবর্দি খাঁ আরামবাগের 'মুবারক মঞ্জিলে' শুনলেন যে, নাগপুর থেকে একটি মারাঠাবাহিনী পঞ্চকোট (পুরুলিয়ায়) পার হয়ে এসে বর্ধমান জেলায় লুণ্ঠনাভিযান চালিয়েছে। ১৭৪২ সালের ১৫ এপ্রিল নবাব আলিবর্দি খাঁ বর্ধমান শহরে উপস্থিত হন, মারাঠা অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য। পরদিন সকালে তিনি শোনেন যে, মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বর্ধমান শহর ঘেরাও করে ফেলেছে। প্রায় একসপ্তাহ আলিবর্দি খাঁ তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে বর্ধমানে থাকতে

বাধ্য হন, বন্দী অবস্থায়। তারপর লড়াই করতে করতে কাটোয়া হয়ে মুর্শিদাবাদ যাবার চেষ্টা করেন। এই সময় বর্ধমান শহরের আশেপাশে, বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথে চারিদিকের গ্রামাঞ্চলে, বর্গীরা যে অত্যাচার করে তা অবর্ণনীয়। বাংলার দুরন্ত ছেলেরা আজও যে বর্গীর ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার ঐতিহাসিক কারণ আছে। পশ্চিমবাংলায় নবাবী শাসন বেশ কিছুদিনের জন্য প্রায় শেষ হয়ে যায় বলা চলে। এই সময় হুগলি বর্ধমান বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে স্থানীয় বহু বনেদী পরিবার ভাগীরথীর পূর্বতীরে পালিয়ে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। একটা সামাজিক বিপর্যয় হয়ে যায় পশ্চিমবাংলায়।

অগ্রগামী ইতিহাসের এইরকম অনেক পদচিহ্ন আছে বর্ধমান শহরে ও বর্ধমান জেলায়, মুসলমানযুগ থেকে ব্রিটিশযুগ পর্যন্ত। বর্ধমান শহরে মুসলমান সুবাদার ও নবাবরা বসবাস করতেন না। একমাত্র আজিমুশ্বান ছিলেন প্রায় তিন বছর। কিন্তু তাহলেও তাঁরা মধ্যে মধ্যে পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র বর্ধমানে আসতে বাধ্য হতেন এবং কিছুদিন বাস করতেন। কোথায় থাকতেন তাঁরা? তার কোনো চিহ্ন নেই বর্ধমান শহরে বা তার আশেপাশে। কোথায় ছিল তাঁদের সেই প্রাসাদ ও বাসভবন? বর্ধমানবাসী নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আফগান জায়গীরদার বীর শের আফগান কোথায় বাস করতেন? কোথায় সেই জীর্ণ গৃহের পরিত্যক্ত কক্ষ, যেখানে একদিন নূরজাহান ছিলেন? কেউ বলতে পারেন না। বর্ধমান শহর ও তার আশেপাশে জীর্ণ অট্টালিকা অনেক আছে, কিন্তু তার কোনো ইতিহাস জানা নেই। বাকি যা প্রাসাদ, দীঘি ও প্রমোদ-উদ্যান ইত্যাদি আছে বর্ধমানে, তা সবই প্রায় বর্ধমানের মহারাজাদের কীর্তি। নবাবী আমলের কোনো উল্লেখ্য বাস্তু নিদর্শন নেই, ইট পাথরের নিদর্শন। একটি মসজিদ আছে বর্ধমান শহরে, নবাব আজিমুশ্বানের আদেশে তৈরি, নবাবী আমলের অন্যতম নিদর্শন। এছাড়া, বাকি সব বোধহয় চারিদিকে কোথাও জঙ্গলে বা মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। অথবা বারংবার বিদ্রোহীদের দুর্ধর্ষ অভিযানে (শোভা সিং, রহিম খাঁ প্রভৃতি) এবং বর্গীদের অত্যাচারে সেই সব কীর্তি হয়ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারই ইঁট-পাথর দিয়ে হয়ত অন্যান্য অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। এমনও হতে পারে যে বাংলার নবাবরা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রাসাদবহুল কোনো দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলা যুক্তিসম্মত বিবেচনা করেননি, নিরাপদ নয় মনে করে।

আজিমুশ্বানের মসজিদ, শের আফগান ও কুতবউদ্দীনের কবর ছাড়া বর্ধমান শহরে পীর বহরমের স্থানটিও উল্লেখযোগ্য। আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে পীর

বহরম এদেশে আসেন এবং আবুল ফজল ও ফৈজির চক্রান্তে নাকি রাজধানী ছেড়ে বাংলা দেশে বর্ধমানে চলে আসতে বাধ্য হন। বর্ধমান শহরে পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। শহরের প্রান্তে জয়পাল নামে একজন বিখ্যাত হিন্দু সাধুর সঙ্গে পরিচয় হয় পীর বহরমের। তাঁরা পরস্পরের গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। মুসলমান পীর ও হিন্দু সাধুর আধ্যাত্মিক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়, সাধক জয়পাল অভিভূত হয়ে পীর বহরমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বর্ধমান শহরের প্রান্তে এই দুই হিন্দু মুসলমান সাধুর একাত্মতার স্মৃতিচিহ্ন আজও রয়েছে দেখা যায়। পীর বহরম ও জয়পালের নাম হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকেন।

বাংলার বিখ্যাত শাক্তসাধক **কমলাকান্তের** উপাস্য দেবী ও উপাসনার স্থান আছে বর্ধমান শহরে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত বাংলার শক্তিসাধনার দুই জনপ্রিয় সাধক ও চারণকবি, একজন হালিশহরের, আর-একজন বর্ধমানের। বর্ধমান-সংলগ্ন কাঞ্চননগর গোবিন্দদাসের স্মৃতিবিজড়িত বলে অনেকে মনে করেন। বর্তমানে আমরা বাংলার যে কয়েকটি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত তার মধ্যে গোবিন্দদাসের কাব্যটি প্রাচীনতম মনে হয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্য তাঁর কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। গোবিন্দদাসের বিদ্যার জন্মভূমি 'রত্নপুর', কৃষ্ণরামের বিদ্যার জন্মভূমি বীরসিংহের রাজধানী 'বীরসিংহপুর'। সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের স্থান 'উজ্জয়িনী'। ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ বলরাম রাধাকান্ত 'বর্ধমান' বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বর্ধমান কেন্দ্র করে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীও পল্লবিত হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয় লোক বিদ্যা ও সুন্দরের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিও আমাকে দেখিয়েছেন (১৯৫২)। দেখতে দেখতে মনে হয়েছে, সংস্কৃতের 'উজ্জয়িনী' কিভাবে ও কেন বাংলার 'বর্ধমানে' পরিণত হল। ভারতচন্দ্রের কাব্যে বলা হয়েছে, বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা স্বয়ং পণ করেছেন, তাঁকে যিনি বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবেন, তিনিই তাঁর পতি হবেন। বিদ্যার বিবাহের জন্য রাজা চিন্তিত হন। শেষে লোকমুখে কাঞ্চীদেশের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দরের সংবাদ পেয়ে তিনি ভাট পাঠান পত্র দিয়ে। ভাটের পত্র পেয়ে সুন্দরের ইচ্ছা হয় বর্ধমানে আসার। সুন্দর ভাবেন :

> এক' যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
> যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥

সুন্দর কালীসাধনা করেন। দেবী বলেন :

> চল বাছা বর্ধমান বিদ্যালাভ হবে।

কে সুন্দর, কোথাকার সুন্দর, কে বিদ্যা, কোথাকার বিদ্যা, তার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকুক বা না-থাকুক, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'গড়বর্ণন' ও 'পুরবর্ণন' থেকে, প্রায় দুশো বছর আগেকার বর্ধমান শহরের মূল্যবান ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের নগরের সমস্ত বৈশিষ্ট যে বর্ধমানের ছিল তা ভারতচন্দ্রের গড় ও পুরবর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। গড়খাই-প্রধান বর্ধমানের ছয়টি গড় বর্ণনা করেছেন ভারতচন্দ্র :

প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক শেখ মোগল পাঠান ॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রাজপুত।
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত ॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থান।
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন ॥

বর্ধমান শহরের পুরাতন চিত্র এই বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে। পুরবর্ণনার সামাজিক চিত্রটি আরও সুন্দর :

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খঘণ্টারব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ···
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি···
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক···
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ··
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি ॥

সমাজ-জীবনের ছবি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিব চণ্ডী ও ভবানীর পূজারী, বৈদ্য কায়স্থ উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি নাগরিক, অবধূত কোল ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিসম্প্রদায়ের বাস ছিল বর্ধমান শহরে। মধ্যযুগীয় নগরের মতো এক-একটি অঞ্চলের

মধ্যে তাঁদের প্রাধান্ত গণ্ডিবদ্ধ ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রার টানে নবাবী আমলের সেই সব নাগরিক বৈশিষ্ট্য বর্ধমান শহরে আর দেখা যায় না।

মধ্যযুগের আর-একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক স্মৃতিচিহ্ন বর্ধমান শহরের উপান্তে রয়েছে, সতীদাহের স্মৃতিচিহ্ন। অনেকেই জানেন না। সতীর মাঠ নামে পরিচিত স্থানটি। একেবারে পাড়ার লোক ছাড়া বাইরের লোক অনেকেই সতীর মাঠের কথা ভুলে গিয়েছেন। বিরাট একটি বাগান এবং প্রধানত আমগাছের বাগান। আমগাছের তলা সতীদাহের ও সহমরণের শ্রেষ্ঠ স্থান। অনেক সতীমন্দির আছে এখানে, এখন গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ (১৯৫২)। অনেক মন্দির ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। দেখলে মনে হয়, সতীমন্দিরগুলি ১৫০-২০০ বছরের পুরনো। সপ্তদশ শতাব্দীতে, মোগলযুগে, সতীদাহ-সহমরণের যে বেশ প্রাধান্য ছিল তা বার্নিয়ের তাভার্নিয়ের প্রমুখ পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়। মনে হয়, সেই সময় থেকে বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠের এই স্থানটি সতীদাহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং তার নাম হয় 'সতীর মাঠ'। একসময় এই স্থানটি ধর্মান্ধ মানুষের কাছে পবিত্র বলে গণ্য হত। আজ ইতিহাসের গতিধারায় কুসংস্কারের এই কীর্তিস্তম্ভগুলি ধুলোয় মিশে যাচ্ছে।

ভারতচন্দ্র বর্ধমানের পুরাতন গড়ের কথা বলেছেন, কিন্তু গড়গুলির নাম উল্লেখ করেননি। বহু প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ধমানে দেখতে পাওয়া যায়। গড়ের নাম থেকে মনে হয় কতকগুলি হিন্দুযুগে এবং কতকগুলি মুসলমানযুগে নির্মিত। যেমন—তালিতগড় বা মহব্বৎগড, বর্ধমান থেকে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে। এই গড়ের কাছে 'নবাবের হাটে' ১০৮ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। খাঁজাহান খাঁর গড, বর্ধমানের দক্ষিণে উচালনের কাছে। শক্তিগড, রামচন্দ্রগড় ভাঁটাকুলের কাছে। কামারকিতার কাছে নরপালগড, মানকরের কাছে অমরাগড়, রানীগঞ্জের কাছে শেরগড়। সমুদ্রগড পানাগড, কাঁকসার কাছে রাজগড় ও আরও দু-একটি গড়, কুলীনগ্রামের গড়, মঙ্গলকোট, গড় সোনাডাঙা, দিঘারগড, চুড়ুলিয়ার গড, কালনার গড়। বর্ধমান জেলার প্রাচীন স্থানীয় নামের মধ্যেও হিন্দু ও মুসমানযুগের ঐতিহাসিক স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বর্ধমান সাতসৈকা খণ্ডঘোষ গোপভূম সেনভূম শিখরভূম নেপাহাড়ী চম্পানগর ইন্দ্রাণী ইত্যাদি প্রাচীন হিন্দুযুগ অথবা তারও আগেকার কালের নাম। শাহাবাদ হাভেলি মজঃফরশাহী আমীরাবাদ আজমতশাহী জাহাঙ্গীরাবাদ শেরগড় প্রভৃতি মুসলমানযুগের নাম। চম্পানগরে চাঁদসদাগরের বাস ছিল বলে কথিত। বেহুলা-লখিন্দরের শবদেহ গাঙুড় বা বেহুলা

নদী দিয়ে কলায় ভেলায় ভেসে গিয়েছিল। গোপভূমে একদা সদ্‌গোপ রাজা রাজত্ব করতেন (অমরাগড় দ্রষ্টব্য)। সেনপাহাড়ীতে লাউসেনের প্রতিদ্বন্দী ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। সেনভূম সম্ভবত লাউসেনের পিতা কর্নসেনের অথবা তাঁর বংশধরদের রাজ্যভুক্ত ছিল।

বর্ধমানের রাজবংশ। বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত বংশগুলির মধ্যে প্রধান হল বর্ধমানের রাজবংশ, শিয়ারসোলের রাজবংশ, চকদীঘির সিংহরায়বংশ, দেবীপুরের সিংহবংশ, শ্রীখণ্ডের গোস্বামীবংশ, শ্রীবাটীর চন্দ্রবংশ, বৈদ্যপুরের নন্দীবংশ, কাইগ্রামের মুন্সীবংশ, বর্ধমানের তেওয়ারী এবং কুসুমগ্রাম বোহার প্রভৃতি স্থানের মিঞাবংশ। বর্ধমানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমসিংহ প্রথমে বৈকুণ্ঠপুরে বাস করতেন। বর্ধমান থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, বল্লুকা নদীর তীরে, বৈকুণ্ঠপুর একটি বাণিজ্যের স্থান ছিল। গড়খাই-বেষ্টিত প্রাচীন রাজবাড়ির ভগ্নাবশেষ বৈকুণ্ঠপুরের প্রান্তে দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গমরায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী, তাঁর পুত্র আবুরায়। ১৬৫৭ সালে আবুরায় বর্ধমান চাকলার ফৌজদারের অধীনে নগরের কোতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র বাবুরায় বর্ধমান পরগণা ও আরও তিনটি মহলের জমিদারী পান। তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম এবং তস্য পুত্র কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণরাম আরও কয়েকটি নতুন মহল দখল করে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কাছ থেকে প্রথম সনন্দ পান (১৬৮৯)। তাঁর সময়ে ১৬৯৭ সালে চেতুয়া-বরদার জমিদার শোভা সিংহ পাঠান-সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্ধমানরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধে কৃষ্ণরাম নিহত হন। তাঁর পুত্র জগৎরাম বাদশাহের দ্বিতীয় সনন্দ পান এবং ১৭০২ সালে তাঁর এক শত্রুর হাতে কৃষ্ণসায়রে নিহত হন। তাঁর পুত্র কীর্তিচন্দ্র। তিনি চন্দ্রকোণা বালিগড়ি ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করেন। পরে বিষ্ণুপুরের রাজার সঙ্গে সন্ধি করে নবাব আলিবর্দির পক্ষে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র চিত্রসেনরায় বাদশাহের তৃতীয় সনন্দে 'রাজা' উপাধি পান (১৭৪০)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজ্যলাভ করেন ১৭৪৪ সালে। ১৭৬০ সালে বর্ধমান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া হয়। ১৭৭০ সালে তিলকচন্দ্রের মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র তেজচন্দ্র রাজত্ব করেন (১৭৭১-১৮৩২)। তেজচন্দ্রের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। বর্ধমানরাজই পত্তনিপ্রথা প্রচলন করেন এবং ১৮২৯ সালে পত্তনি আইন বিধিবদ্ধ হয়। তেজচন্দ্রের পর প্রতাপচন্দ্র রাজা হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মহাতাপচাঁদ পোষ্যপুত্র গৃহীত হন।

মহাতাপচাঁদের রাজত্বকাল ১৮৩৩ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত। শায়র একাধিক আছে বর্ধমান শহরে। কীর্তিচন্দ্রের জননী রানী ব্রজসুন্দরী 'রানী শায়র' প্রতিষ্ঠা করেন। তার দক্ষিণের ঘাটে শিলালিপি আছে। তার পশ্চিমে 'শ্যামশায়র', ঘনশ্যামরায় প্রতিষ্ঠিত। .তার পশ্চিমে 'কৃষ্ণশায়র', কৃষ্ণরাম রায় প্রতিষ্ঠিত।

কমলাকান্তের মতো শক্তিসাধকদের জন্ম ও কীর্তিস্থান বর্ধমান বৈষ্ণবদেরও অন্যতম তীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্য কাটোয়ায় সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীখণ্ড কুলীনগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বহু বৈষ্ণবসাধক জন্মগ্রহণ করেছেন। 'কড়চা' প্রণেতা গোবিন্দদাস বর্ধমানের কাছে কাঞ্চননগরে (যেখানকার ছুরিকাঁচি বিখ্যাত) জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঝামটপুরে, চৈতন্য-মঙ্গল কাব্যের লেখক জয়ানন্দ আমাইপুরে এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা লোচনদাস কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মুকুন্দরাম দামুন্যায় এবং কাশীরাম দাস সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী খণ্ডঘোষ থানায় কৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঘনরাম কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। তেজচন্দ্রের গুরু ছিলেন সাধক কমলাকান্ত। তাঁর জন্ম অম্বিকা-কালনায়, শেষ বয়সে বর্ধমান শহরে বাস করতেন (পরবর্তী গ্রামবিবরণের মধ্যে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এই কারণেই বর্ধমানকে সমগ্র রাঢ়দেশের মধ্যমণি বলা যায়।

অমরাগড়
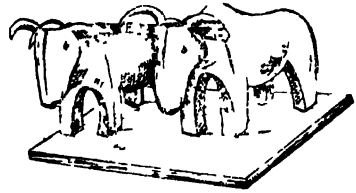
প্রাচীন গোপভূমের অন্তর্গত অমরাগড়। মানকর স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে। সদ্‌গোপরাজা মহেন্দ্রনাথ (মাহিন্দি রাজা বলে কথিত) তাঁর মহিষী অমরাবতীর নামে দুর্গের নামকরণ করেন অমরাগড। গড় বা দুর্গের কোনো চিহ্ন নেই। গড়ের রেখা আছে, জঙ্গলে ঢাকা। জীর্ণ দেবালয় আছে, রাজবংশের কুলদেবতা আছেন। রাজা নেই, রাজ্যও নেই। শূন্য নামের প্রতিধ্বনি আছে ফাঁকা মাঠে, আর আছে কতকগুলি নাম যেমন—হাতশালা (হাতিশালা), ভালুকশোল (ভালুকশালা), রঙ্গাল (রঙ্গালয়), ধলার (ধনাগার), মরাইতলা। বাংলার অধুনালুপ্ত সদ্‌গোপ রাজবংশের ভৌতিক সাক্ষী।

গোপভূমের রাজাদের ইতিহাস লেখা নেই কোথাও। এরকম অনেক রাজার কোনো ইতিহাস লেখা নেই, জানা নেই। বাংলার ইতিহাসের এই সব শূন্য স্থান যতদিন না পূর্ণ হবে, ততদিন বাঙালীর মনে অনেক প্রশ্ন জাগবে এবং তার সদুত্তর কোনো ঐতিহাসিক দিতে পারবেন না। যেমন—পালরাজবংশের কথা। পাল রাজারা যদি বাংলা দেশের বাইরে থেকে না এসে থাকেন, তাহলে তাঁদের আসল পরিচয় পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা যদি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা কায়স্থ রাজবংশ না হন, তাহলে তাঁদের লুপ্ত বংশপরিচয়ও জানা প্রয়োজন। বর্ধমান জেলার নানাস্থানে ভ্রমণের সময় লোকমুখে দু'টি কথা খুব বেশি শুনেছি। উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী তাঁরা বলেন, পালরাজারা সম্ভবত উগ্রক্ষত্রিয় ছিলেন। 'উগ্রক্ষত্রিয়' সম্বন্ধে কয়েকখানি কুলগ্রন্থেও এই কথার উল্লেখ দেখেছি। তার মধ্যে হরিচরণ বন্ধুর 'উগ্রক্ষত্রিয়' একটি। সদ্‌গোপরা বলেন যে,

পালরাজারা সদ্‌গোপবংশীয় ছিলেন। শরৎচন্দ্র ঘোষের 'সদ্‌গোপ-তত্ত্ব' (দুই খণ্ড), জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমারের 'সদ্‌গোপ জাতির ইতিহাস' ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এগুলি প্রকৃত ইতিহাস নয়, কুলপঞ্জী ও কিংবদন্তী থেকে রচিত। তাহলেও ঐতিহাসিকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। কোনো কাহিনী, প্রবাদ বা কল্পনা যখন জনচিত্তে শিকড় বিস্তার করে, তখন মাটিতেও তার মূল থাকা সম্ভবপর। উগ্রক্ষত্রিয় বা সদ্‌গোপ, কারও দাবি বা যুক্তি 'ঐতিহাসিক' নাও হতে পারে। তথ্য ও প্রমাণের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কুলপঞ্জীর প্রমাণ বা কিংবদন্তীর সাক্ষী 'ইতিহাস' বলে গ্রহণ করা যায় না। তবু সদ্‌গোপ-রাজবংশ একাধিক ছিল রাঢ়দেশে এবং পালবংশ তার মধ্যে অন্যতম। মেদিনীপুরের নারায়ণগড় রাজবংশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্বপাল গড় অমরাবতীর কাছে দিগ্‌নগর গ্রামে জন্মেছিলেন এবং সেখান থেকে এসে নারায়ণগড়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গড়-অমরাবতী বা অমরাগড ও দিগ্‌নগর দুই-ই বর্ধমানে। অমরাগড়ের পাঁচ-ছয় মাইল পূর্ব-উত্তরে ভাল্কি, তার মাইল চার দক্ষিণে দিগ্‌নগর। সবটাই গোপভূমের মধ্যে। নারায়ণগড় রাজবংশের কুলপঞ্জীতেও এই কথা বলা হয়েছে। মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশ সম্বন্ধেও প্রবাদ আছে যে তাঁরা জাতিতে সদ্‌গোপ এবং বর্ধমান জেলার নীলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয়-সন্তান।[১] কিন্তু বাংলার সামন্তরাজাদের 'ক্ষত্রিয়ত্বের' দাবির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ইতিহাসের ছাত্রদের নতুন করে কিছু বলার নেই। রাজবংশ হলেই 'ক্ষত্রিয়' হতে হবে এবং উত্তরভারত থেকে আসতে হবে, এরকম একটা বিজাতীয় ধারণার আশ্রয় নিয়েছিলেন এদেশের রাজারা আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির আশায়। সামাজিক জাতিভেদপ্রথা তার জন্য দায়ী। যাই হোক, এরকম একাধিক সদ্‌গোপ-রাজবংশ রাঢ়দেশে ছিলেন এবং তাঁরা দূরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগণা সদ্‌গোপরাজ্যের অতীত স্মৃতি আজও বহন করছে। ভাল্কি, অমরাগড়, কাঁকসা, দিগ্‌নগর, ঢেক্করী-ঢেকুর (গৌরাঙ্গপুর), মঙ্গলকোট, নীলপুর প্রভৃতি স্থানের সদ্‌গোপ-রাজবংশের রাজাদের (পালবংশ-সহ) এই সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে মনে হয় বাংলার পাল-রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের দাবি অন্তত অনুসন্ধানের যোগ্য, উপেক্ষণীয় নয়। উগ্রক্ষত্রিয়দের সম্পর্কেও এই কথা বলা যায়।

১ ত্রৈলোক্যনাথ পালের ও যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য

ভাল্কির ও অমরাগড়ের সদ্‌গোপ-রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। তাঁদের কুলপঞ্জীর মধ্যেও পার্থক্য আছে দেখা যায়। সুতরাং সঠিক ইতিহাস কিছু জানবার উপায় নেই। তবু কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জীর কথা সামান্য কিছুও হয়ত ঐতিহাসিকদের কাছে গ্রাহ্য বা বিবেচ্য হতে পারে মনে করে এখানে উল্লেখ করছি। ভল্লুপাদ (ভল্লুপদ, ভল্লুকপদ) নামে এক ঋষি ছিলেন। ভাল্লুকপালিত বা ভাল্লুকাকৃতি বলে নাম ভল্লুপাদ। আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীতে • তিনি গোপভূমে যে-স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তারই নাম 'ভাল্কি'। বাহুবলে তিনি অনেক দেশ জয় করেন। তাঁর পুত্র গোপাল। তাঁর পৌত্র (মতান্তরে প্রপৌত্র) হলেন অমরাগড়ের বিখ্যাত মহেন্দ্র-রাজা। মহেন্দ্রের রাজ্য কাটোয়া থেকে পঞ্চকোট পর্যন্ত নাকি বিস্তৃত ছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহেন্দ্র রাজা খেজুরড্ডির উগ্রক্ষত্রিয় জগৎসিংহের বাড়ি থেকে জোর করে দশভুজা সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে স্থাপন করেন। সেই দেবীর নাম শিবাখ্যা দেবী। এই শিবাখ্যা দেবীই এই বংশের কুলদেবতারূপে অমরাগড়ে পূজিত হন। রাজা মহেন্দ্রের দুই রানী (কেউ বলেন, তিন রানী) ছিলেন এবং তাঁর দুই কন্যা ছিল, কালিন্দী ও যমুনা। এক কন্যার বংশ হল সিওড়ের রাজবংশ, আর-এক কন্যার বংশ কাঁকসার রাজবংশ। তৃতীয় রানীর সন্তানের বংশ দিগ্‌নগরের বংশ বলে কথিত। প্রবাদ আছে, রাজা লাউসেন ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজিত করে মহেন্দ্রের রাজ্যবিস্তারে সাহায্য করেন। রাজা মহেন্দ্র পরে নিজের রাজ্য দুই ভাগে ভাগ করে দেন। একভাগের রাজধানী অমরাগড়, অন্যভাগের রাজধানী দিগ্‌নগর। এই বংশগুলিই পরে 'ভাল্কির খোঁচ' 'দিগনগরের খোঁচ', 'কাঁকসার খোঁচ' বলে পরিচিত হয়। কাঁকসার রাজবংশের রাজ্য আনুমানিক ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যায়। সৈয়দ বোখারী কাঁকসার গড় ও দুর্গ দখল করে রাজাকে হত্যা করেন এবং জমিদারী মুসলমানদের 'আয়মা' দেন। কাঁকসা অঞ্চলের আয়মাদার মুসলমানরা তাঁদেরই বংশধর। অমরাগড়ের রাজকীয় অস্তিত্ব প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। বর্ধমানের রাজাদের সঙ্গে গোপভূমের (অমরাগড়) সদ্‌গোপরাজাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। বাংলা দেশে মোগল অধিকারকালে এই ঘটনা ঘটে বলে মনে হয়। বর্ধমানের জমিদার-রাজারা তখন থেকেই ক্রমে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন।

অমরাগড়ে এখন গড় নেই, দুর্গ নেই, রাজবাড়িও নেই। কিন্তু গ্রাম প্রদক্ষিণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, বহু প্রাচীন গণ্ডগ্রাম অমরাগড়। হাতিশালা, ভাল্লুকশালা,

রঙ্গালয়, ধনাগার, মরাইতলা নামে যে সব মাঠ গ্রামবাসীরা দেখান, সেখানে উঁচু-উঁচু মাটির ঢিবি বা স্তূপ আছে প্রচুর এবং ইটের গাথুনিও সমাধিস্থ হয়ে আছে যথেষ্ট। ইতিহাস যে একটা-কিছু আছে এবং অনেকদিনের প্রাচীন ইতিহাস, তা বেশ বোঝা যায়। ভূগর্ভে যা আত্মগোপন করে আছে তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে কোদাল-কুড়াল নিয়ে মাটি খোঁড়ার দরকার। কিন্তু খুঁড়বে কে? প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ির অপেক্ষায় এরকম অনেক প্রাচীন স্থান পশ্চিমবাংলায় পড়ে রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভূগর্ভস্থ ঐতিহাসিক নিদর্শন পুনরুদ্ধারের কোনো সম্ভাবনা নেই।

সদ্‌গোপবংশীয় গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে অমরাগড়ের একটি কাহিনী শুনেছি, আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। কথায় কথায় একজন প্রবীণ ব্যক্তি বললেন পূর্বে এঁরা ভাল্লুক পুষতেন, পালন করতেন। 'ভাল্লুকশাল' কথা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও চমকপ্রদ হল, তিনি বললেন, ভাল্লুক মরলে তাঁরা অশৌচ পালন করতেন। হাঁড়ি ফেলতে হত পর্যন্ত। এখন ভাল্লুকও নেই, অশৌচও কেউ পালন করেন না। গোপভূমের রাজবংশের এই সংস্কারের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কি, তা সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন। ভাল্লুক টোটেম এবং ভাল্লুক সম্পর্কে সমস্ত কাহিনী পশুপালকসমাজের নিদর্শন। পশুপালন ও চাষবাস গোপভূমে একই সময়ে বিকাশ হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। তা ছাড়া কৃষি যাঁদের পেশা, পশুপালন যে তাঁদের বৃত্তি নয়, তাও ঠিক নয়। পশুপালন আর্যভাষীদেরও প্রধান বৃত্তি ছিল। আজও কি কৃষকরা পশুপালন করেন না এবং হিন্দুসমাজে পশুপালনের মর্যাদা নেই? যথেষ্ট আছে। ভাল্কি অমরাগড়ের সদ্‌গোপরাজবংশের এই সংস্কারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অসাধারণ। কথায় কথায় গ্রামবৃদ্ধরা যখন বললেন, তখন চোখের সামনে অতীত ইতিহাসের অন্দরমহল যেন খুলে গেল।

অমরাগড়ে পুরাতন দেবালয় আছে অনেক। দেবদেবীও অনেক! কুলদেবতা শিবাখ্যা দেবী আছেন, দুগ্ধেশ্বর শিব আছেন। সাধারণ ইটের বাংলা-মন্দিরে বিরাজ করেন। পঞ্চরত্ন নারায়ণ-মন্দির আছে, অপূর্ব কারুকার্যখচিত। রাঢ়দেশের বাংলা ঘরের মডেলে তৈরি একটি সুন্দর দুর্গামন্দির আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। ঠিক এই ধরনের মন্দিরের গড়ন এই অঞ্চলে আর কোথাও দেখিনি। কাঁকসা রাজবংশের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর মহাদেব, অনাদিলিঙ্গ। 'জীবতকুণ্ড' নামে এক পুষ্করিণীর পাড়ে কঙ্কেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে (১৮৯০—১৯০০) কাঁকসা-বাসী মালিক আবদুল সত্তার, শোনা যায়, এই পুকুরের পাড়ের জমি খুঁড়েছিলেন এবং ভাঙা ইট, স্তম্ভ ও পাথরের দেবদেবীর মূর্তি পেয়েছিলেন অনেক। এখনও

এখানকার অধিবাসীরা বলেন যে, দেবদেবীর মূর্তি খোঁজ করলে পাওয়া যায়, তবে জঙ্গল ভেদ করে সন্ধান করা কঠিন। কাঁকসার রাজবংশধররা অন্যান্য আরও অনেক স্থানে বাস করেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকে মনসাদেবীকে কুলদেবী বলে পূজা করেন। শিব-শক্তি ও মনসার উপাসনা সদগোপরাজবংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রাঢ় অঞ্চলে অধিকাংশ শিবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তীটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। একই কিংবদন্তী যখন কোনো স্থানে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তখন তাব ঐতিহাসিক মূল্য কোনো সন্ধানীই অস্বীকার করতে পারেন না। বনে গিয়ে গরুর দুধ দেওয়া এবং গোপদেব স্বপ্ন দেওয়ার সঙ্গে শিবের উৎপত্তির যে গভীর সম্পর্ক দেখা যায়, তা রাঢের সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত আমরা বাংলার শৈব ও শাক্ত ধর্মের বিকাশের ধাবা সম্বন্ধে অনেক অজানা কথা জানতে পারব।

সদ্গোপ রাজাদের শৌর্যবীর্যেব ঐতিহ্যাশ্রিত কাহিনীও গোপভূমের সর্বত্র যথেষ্ট শোনা যায়। তার মধ্যে অমরাগড়ের মাহিন্দি বাজার বীরত্বের কাহিনী অন্যতম। এই ধরনের কাহিনী অবলম্বন করে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বৃহৎ 'শিবাখ্যা-কিঙ্কর কাব্য' রচনা করেছিলেন। কাব্যগ্রন্থখানি লোকসমাজে আদৌ পবিচিত নয়, কাবণ কাব্যমূল্য তার বিশেষ নেই। তবু এবকম একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ অমরাগড় কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল এবং বাংলা ১৩১৯ সনে 'জন্মভূমি প্রেস' থেকে ছাপা হয়েছিল। গ্রন্থারম্ভে কবি শিবাখ্যা দেবীকে বন্দনা করেছেন :

এসো দেবি! মহামায়া শিবাখ্য। জননী,
তোমাব প্রসাদে মাগো ধরিনু লেখনী।

মহেন্দ্র রাজার অনেক বীবত্বেব কাহিনী এই কাব্যে আছে। অমরাগড়ে অনেক রাজা অভিযান করেছেন এবং বীব রাজা ও তাঁর বীর যোদ্ধারা জীবনপণ করে দেশরক্ষা করেছেন :

অমরার গড় পরিখা বেষ্টিত
নিতান্ত দুর্ভেদ্য জগতে বিদিত,
প্রবেশের পথ,   রোধি মহারথ
থাকিবে সতত হয়ে সতর্কিত,
যাবৎ না শত্রু হয় প্রতাড়িত

মহেন্দ্র রাজার বংশবিবরণও আছে এই কাব্যে :

শোন মহারাজ শোন দিয়া মন
কহি মহেন্দ্রের বংশ-বিবরণ,
পিতামহ তার ক্ষত্রিয় কুমার
ভল্লুপদ নাম জানে সর্বজন,
ভল্লুকে তাহারে করিল পালন।…
জাতীয় প্রকৃতি লুকাবার নয়,
শৈশবে সে শিশু নির্ভয় হৃদয়,
মৃগয়া করিত, শ্বাপদ বধিত,
বনের বরাহ করিয়া বিজয়…

ক্ষত্রিয়-বাতিক বাদ দিলেও, গোপভূমের অনেক কথা এই কাব্য থেকে জানা যায়। বোঝা যায়, রাঢ়ের সদ্‌গোপদের ইতিহাস দীর্ঘকালের ইতিহাস এবং প্রাচীন বনেদী সদ্‌গোপবংশের মধ্যে বর্ধমানের সদ্‌গোপরা অন্যতম। বর্ধমানের গোপভূম থেকে ভাল্কি অমরাগড় দিগ্‌নগর কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চল তাঁদের আদি বসবাসকেন্দ্র কিনা বলা যায় না। তবে এই অঞ্চলের রাজবংশ ও কুলীন সদ্‌গোপবংশীয়রাই বাংলার অন্যান্য স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নয় শুধু, সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও যে সদ্‌গোপদের বিশেষ দান আছে, তা তাঁদের ধর্মকর্ম ও ধ্যানধারণা থেকে আজও পরিষ্কার বোঝা যায়। অমরাগড় বাংলার সদ্‌গোপদের সেই প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন করছে।

মানকর
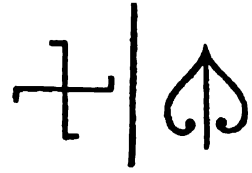
মানকর এককালে বর্ধমান জেলার গৌরব ছিল। ‘পাল ভট্টচাজ খাঁ, তিন নিয়ে মানকর গাঁ’। এখন মানকর দেখে চেনা যায় না (১৯৫২)। চোদ্দ মণ ময়দা লাগত যে মানকরের ব্রাহ্মণদের খাওয়াতে, সেই মানকর পরে মড়কে প্রায় মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অন্তত সাতশো ঘর ব্রাহ্মণ ও সাতশো ঘর তন্তুবায় বাস করতেন মানকরে। ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চা করতেন, আর তাঁতিরা তাঁত বুনতেন। শিল্পকলায় যেমন, পাণ্ডিত্যেও তেমনি অদ্বিতীয় ছিল মানকর। সারা মানকর গ্রাম চষে ফেললেও এখন আর কেউ তা বুঝতে পারবেন না (১৯৫২)। ভগ্ন বাস্তুভিটের রুগ্ন ঘুঘুর দিকে চেয়ে হঠাৎ হয়ত মনে হবে—কি ছিল, কি যেন হারিয়ে গিয়েছে। ভিটের পর ভিটে পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ জনশূন্য। একদা সুপ্রসন্ন মানকর গ্রাম আজ বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।

সবার আগে মনে হয় মানকরের শিল্পী ও বণিকদের কথা। মানকরের গ্রাম্যসমাজের কি পাকাপোক্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদই না ছিল একসময়! ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে আজ। আধুনিক যুগের আক্রোশ মেটাতে হতভাগ্য মানকর সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, অথচ কোনো আশীর্বাদই তার পায়নি। রিক্ত মানকর তার তন্তুবায়দের কথা ভাবে, প্রায় হাজার তাঁতের ধ্বনি যখন প্রতিধ্বনিত হত তার বুকে। মানকরের ‘বেনারসী চেলী’র কথা আজ হয়ত সোনার পাথরবাটির মতোই শোনাবে কানে, কিন্তু এককালে ছিল। মানকরেই তৈরি হত ‘বেনারসী চেলী’। মানকরের তসর ছিল বিখ্যাত। আজ তসরের ‘ত’ পর্যন্ত নেই। মানকরের ‘বিশ্বাস’দের পূর্বপুরুষ মহেশ বিশ্বাস পলু-পোকার চাষ সম্বন্ধে ‘কীট-কৌতুক’ নামে

একখানা বইও লিখেছিলেন, আজ সে-বই দেখলাম অন্ধ পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। বিশ্বাস মশায়ের মুখের বুলিই ছিল :

পরে তসর, খায় ঘি
তার আবার খরচ কি ?

আজ হয়ত হেঁয়ালি মনে হবে, একসময় প্রবাদের মতো চালু ছিল কথাটা। মানকরের 'কুতুনি'র নামডাক ছিল খুব। একদিকে রেশমের নক্শা, অন্যদিকে সুতোয় নক্শা-করা কাপড়কে বলত 'কুতুনি'। মানকরের বয়নশিল্পীদের একচেটে ছিল 'মুগো সুতো'র (মাছ ধরং র সুতো) ব্যবসা। বাংলা দেশের মধ্যে প্রধানত মানকরেই এই মুগো সুতো তৈরি হত। মানকরের কর্মকাররা গহনার 'ডাইস্' তৈরি করতেন, যা বাংলা দেশে আর কোথাও বিশেষ হত না। কর্মকারদের কারিগরির নমুনা স্বচক্ষে দেখে এসেছি মানকরে। যে-কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্রের সূক্ষ্মতম কলকব্জা পর্যন্ত তৈরি করতে পারেন ঘরে বসে, এ-রকম কর্মকার এখনও মানকর গ্রামে একজন আছেন (১৯৫২)। একসময়ে একাধিক ছিলেন। মানকরের তাম্বুলিরা ধানচালের আড়তদারি করে লক্ষপতি হয়েছিলেন, তাম্বুলিপাড়ার বড় বড় অট্টালিকাগুলি তার সাক্ষী রয়েছে আজও। বিখ্যাত 'গোপীনাথ দত্তের' তামাক মানকরের। হিতলাল মিশ্রের মতো ভক্ত পণ্ডিত গীতাভাষ্যকারেরও একাধিক নীলকুঠি ছিল। তাম্বুলিরাও নীলচাষ করতেন। এ সব 'আজি হতে শত বর্ষ' আগেকার কথা। তখন মানকরের শ্রী ছিল সুসমৃদ্ধ। কৃষক কারিগর কুটিরশিল্পী বণিক জমিদার সাধক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য ইত্যাদি নিয়ে মানকরের বিরাট গ্রাম্যসমাজ আত্মনির্ভর ছিল সম্পূর্ণ। শোনা যায়, আঠারো পাড়া নিয়ে ছিল এই গ্রাম্যসমাজ। এখন পাড়ার নাম আছে, পাড়া বলতে যা বুঝায় তা আর নেই।

মানকর কতদিনের প্রাচীন গ্রাম তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা কঠিন। 'পৌষমুনির ডাঙা' ও 'পাণ্ডবক্ষেত্র' দেখিয়ে গ্রামবাসীরা যে কিংবন্তীর কথা বলেন, তা আরও অনেক গ্রামে শুনেছি ও দেখেছি। তা দিয়ে ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যায় না। তবে মানকর যে গোপভূম পরগণার অন্তর্গত ছিল তাতে সন্দেহ নেই এবং কোনো সদ্‌গোপ রাজার রাজ্যভুক্ত থাকাই সম্ভবপর। পালযুগেও এই অঞ্চলে প্রবল প্রতিপত্তিশালী সদ্‌গোপ সামন্তদের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এরকম কোনো সামন্তরাজার রাজ্যসীমানার মধ্যে হয়ত 'মানকর'ও একটি গ্রাম ছিল। কি রকম গ্রাম ছিল, কি তার নাম ছিল, তার কোনো প্রামাণিক হদিশ পাওয়া যায় না। কোনো নিদর্শনও বিশেষ নেই পাল বা সেনযুগের। প্রাচীন দেবালয় আছে অনেক

মানকরে, কিন্তু দু'শো আড়াইশো বছরের বেশি প্রাচীন নয়। উপাসক ও সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্য কিছু ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল যে মানকর তা আজও বেশ বোঝা যায়। এই ধর্মাচরণের ধারা বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়। মানকরের গ্রামদেবতা মানকেশ্বর শিব আছেন এবং তাঁরও উৎপত্তির সঙ্গে সেই একই গোপকাহিনী জড়িত। এ-কাহিনীর যে রীতিমত গুরুত্ব আছে, একথা আগে বলেছি। সুপ্রাচীন 'বুড়ো শিব' আছেন। শৈবধর্মের সঙ্গে গোপভূমের সদ্‌গোপদের একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। একথা অনেকবার বলেছি। মানকরের একদিকে আজও সদ্‌গোপদের বাস আছে। মনে হয় একসময় মানকরের ইতিহাসে তাঁদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, হয়ত হিন্দুযুগেই। তারও আগে গ্রামে প্রাধান্য ছিল যাদের, তারা আজ নগণ্য অবস্থায় মানকরের চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে—বাউরি মেটে হাড়ি ডোম প্রভৃতি। আর মুসলমানযুগের সাক্ষী রয়েছে মুসলমানপাড়া। গোপভূমে মুসলমান-অভিযানের সময় এবং কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চলের সদ্‌গোপ রাজবংশের উচ্ছেদের সময় মানকরের যে কোনো ভূমিকা ছিল না, তা মনে হয় না।

শক্তিপূজারও প্রাধান্য ছিল একসময় মানকরে। মানকরের বৈদ্য-কবিরাজদের কুলদেবী আনন্দময়ী শক্তিমূর্তি। পঞ্চকালী ও বড়কালীও মানকরে বিখ্যাত। বড়কালীর প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ গোস্বামী পঞ্চমুণ্ডির আসন করে সিদ্ধিলাভ করেন। এ-ছাড়া মানকরের 'রাধাবল্লভের মন্দির' আছে, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের দীক্ষাগুরু ভক্তলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত। এই কনৌজ ব্রাহ্মণবংশই মানকর-রায়পুরের প্রধান জমিদার। রাধাবল্লভ-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই বংশে হস্তলিখিত বংশ-পরিচয়ে লেখা আছে:

> এই ভগবন্মূর্তি উপস্থিত নবরত্ন মন্দিরে স্থাপন ক্রিয়োপলক্ষে মহাত্মা ভক্তলাল কর্তৃক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিমন্ত্রণ বিষয়ীক লিখিত পত্র দ্বারায় এই বিগ্রহ প্রকাশের মূল বিবরণের সংক্ষেপ বার্তার সহিত সন ১১৩৫ সালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবস এই ভগবন্মূর্তি উপস্থিত নবরত্ন মন্দিরে স্থাপিত হইবার বৃত্তান্ত স্পষ্টই প্রকাশ আছে।

এই বংশের ইতিহাসের সঙ্গে মানকরের ইতিহাসও অনেকটা জড়িত বলে সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এঁদের গৃহে সংরক্ষিত হাতেলেখা বংশপরিচয় থেকে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই বলছি। এই বংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বদলে দুবে, মনোরথ দুবে ও শ্রীকান্ত দুবের নাম পাওয়া যায়। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের

কাছে দীক্ষা নিয়ে শ্রীকান্ত চন্দ্রকোণায় (মেদিনীপুর) আসেন। তারপর মধুসূদন গোস্বামী, বিহারীদাস ও শ্যামসুন্দর গোস্বামী। শ্যামসুন্দর বর্ধমানের রাজা জগৎরাম রায় ও তাঁর রানীকে দীক্ষা দেন এবং মানকরের পাশে খাণ্ডারী গ্রামে এসে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র ভক্তলাল গোস্বামী মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ও চিত্রসেনকে দীক্ষা দেন এবং ১১২৯ সনে রায়পুর গ্রাম (মানকরের একাংশ) ব্রহ্মোত্তর পান। ভক্তলালের প্রপৌত্র অজিতলাল গোস্বামী এবং অজিতলালের দৌহিত্র হিতলাল মিশ্র। হিতলালের দৌহিত্র রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত তখনকার বাংলার জমিদারদের মধ্যে সর্বপ্রথম কারাবরণ করেন। হিতলাল মিশ্র শুধু যে জমিদার ও নীলকুঠির মালিক ছিলেন তা নয়। তিনি তাঁর গৃহে ভাগবতালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানকরে এবং সেখানে বহু মূল্যবান হাতেলেখা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। হিতলাল নিজে গীতার একটি ভাষ্যও রচনা করেছিলেন। সভাপণ্ডিত ছাড়াও তিনি জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতদের সাদরে ও সসম্মানে পোষণ করতেন। একটি টোলও ছিল তাঁর। ভাগবতালয়ের গ্রন্থাগারে পুঁথির সংগ্রহ যা ছিল, তা বর্ধমান জেলার মধ্যে আর অন্য কোথাও ছিল না বোধহয়। বৈষ্ণবধর্ম তন্ত্র দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান পুঁথি ভাগবতালয়ে ছিল। অনেক পুঁথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিছু-কিছু তাঁরা দানও করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও এখনও দেখলাম, একটি ঘরের মধ্যে প্রায় শতাধিক পুঁথি রয়েছে। আরও অবাক হলাম শুনে যে, ভাগবতালয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি মানকরের মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরি করে দিয়েছিলেন। নিষ্কর জমি এবং অজু করার জন্য বড় একটি পুষ্করিণীও তিনি দান করেছিলেন তাঁদের। ভাগবতের উদারতাবোধ হিতলালের চরিত্রে বিশেষভাবে আত্মীকৃত হয়েছিল মনেহয়।

পণ্ডিতসমাজের জন্যও মানকরের একসময় বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। মানকরের কনৌজপাড়ার ব্রাহ্মণরা একসময় গুরুগিরি ও বিদ্যাচর্চার জন্যই এখানে বসবাস করেন। বর্ধমানের রাজবংশের দীক্ষাগুরুরাই যে মানকর-রায়পুর গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পেয়েছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। হিতলাল মিশ্রের পূর্বোক্ত হাতেলেখা বিবরণ থেকে এ-সম্বন্ধে তাঁর নিজের উক্তিই উদ্ধৃত করছি:

> উক্ত রাইপুর গ্রাম আমার মাতামহ ৺অজিতলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রপিতামহ স্বর্গীয় ভক্তলাল গোস্বামী মহাশয় আপন মন্ত্রশিষ্য বর্ধমানাধিপতি রাজা কীর্তিচন্দ্র বাহাদুরের স্থানে সন ১১১৯ সালের ১৪ই চৈত্রী তারিখের সনন্দানুসারে ব্রহ্মত্তর পাইয়াছিলেন—

হিতলাল মিশ্রের আমলে টোল ভাগবতালয় ইত্যাদির জন্য মানকরে বিদ্যাচর্চার একটা উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল। সভাপণ্ডিত ও সাধারণ পণ্ডিত হিসেবে সেই সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানকরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কনৌজ ব্রাহ্মণও ছিলেন। মানকরের পণ্ডিতদের মধ্যে মদনমোহন সিদ্ধান্ত (বর্ধমানের রাজসভা থেকে মানকরের ভট্টাচার্যরা এঁকে মানকরে আনেন), গদাধর শিরোমণি, নারায়ণ চূড়ামণি, যাদবেন্দ্র সার্বভৌম (হিতলাল মিশ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন), কৈলাসনাথ ও অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখ্য। এ-ছাড়া কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বাসস্থান ও জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম। তাঁদের মধ্যে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন গোস্বামী (মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে) অন্যতম। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গুরু উত্তম ভট্টাচার্য মানকরের বাসিন্দা ছিলেন। মানকরে তাঁর নামে 'উত্তম শায়র' এবং তাঁর স্ত্রীর নামে 'ঠাকরুণ পুকুর' আছে। রঘুনাথ শিরোমণি যদিও নবদ্বীপের পণ্ডিত বলে [illegible], তাহলেও তাঁর জন্মস্থান ছিল মানকর গ্রাম। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে তাঁর 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' গ্রন্থে লিখেছেন: "নবদ্বীপ সারস্বত সমাজের উজ্জ্বলতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি বর্ধমান জেলার কোটা মানকরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাঁহার জননী ভরণপোষণের অভাবে নদীয়ায় আসিয়া এক কুটুম্বের বাটীতে আশ্রয় লন। এই একচক্ষু কাণা বালক রঘুনাথের বুদ্ধিশক্তি বিষয়ে ভবিষ্যতে অনেক গাল-গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে" (পৃ ৬১-৬২)। ভট্টপল্লীনিবাসী শিবচন্দ্র সার্বভৌম কালীপ্রসন্নবাবুকে বলেছিলেন: "গুরুপরম্পরায় সকলে জানে, কোটা মানকর শিরোমণি পিতৃভূমি"। শিরোমণির শেষ বংশধর নবদ্বীপে বিগত শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, তাঁর নাম রামতনু ন্যায়ালঙ্কার। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা' গ্রন্থে (পৃ ৯০-৯১) এই বিবাদ-প্রসঙ্গে বলেছেন: "আমরা নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, উক্ত রামতনু ৯৮ বৎসর পূর্বে নিঃসন্তান পরলোকগমন করেন এবং তিনি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি মহাশয়ের সপিণ্ড জ্ঞাতি ছিলেন। ইঁহারা মানকরের 'চট্টোপাধ্যায়' বংশীয় বটেন।……কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় শিরোমণিবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন, এরূপ শুনা যায় নাই।" যাই হোক, মনে হয় বিখ্যাত কাণা শিরোমণি মানকর থেকেই নবদ্বীপে গিয়েছিলেন এবং তাঁর পিতৃভূমি মানকর। রঘুনাথ সম্পর্কে ঘটক মুলো পঞ্চাননের কারিকাটি উদ্‌ধৃত করছি:

বাসুদেবে তিন শিষ্য চৈয়ে বথোত্তর।
নদের লোক যাহাদের নামে জীয়ে রয়॥

চৈয়ে ছোঁড়া হুই, বড়ো নিয়ে তার নাম।
রয়ো বেটা বুদ্ধি মোটা ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড়ো নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষ ধরে যে করেছে মাথ॥

কাণা রঘুনাথ সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। যেমন, রঘুনাথ 'ক' অক্ষর শিক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করেন, 'ক' নাম হল কেন? একবার শিশু রঘুনাথ গ্রাম্য গুরুমশায়ের আদেশে তাঁর তামাকের জন্য গুরুপত্নীর রন্ধনশালায় আগুন আনতে যান, কোনো পাত্র না নিয়ে। গুরুপত্নী জলন্ত অঙ্গার হাতায় করে যখন নিয়ে আসেন, রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ আঁজলা ভরে ধুলো তুলে নিয়ে তার উপর আগুন নেবার জন্য সামনে এসে উপস্থিত হন। রঘুনাথ জন্মকাণা নন। ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে একাগ্রচিত্তে একবার তিনি যখন দার্শনিক বিচারে মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর চোখে একটি পতঙ্গ পড়ে চোখটি কাণা হয়ে যায়। এরকম অনেক রকমের গল্প।

রঘুনাথ গোস্বামী ছিলেন মানকরের পাশে মাড়ো গ্রামের বাসিন্দা। মাড়ো গ্রাম মানকর ইউনিয়নের মধ্যে। অ্যাডাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত রিপোর্টে (১৮৪৭) রঘুনন্দন সম্বন্ধে লিখেছেন:

The most voluminous native author I have met with is Raghunan Goswami, dwelling at Maro…

অ্যাডাম সাহেব রঘুনন্দনের রচিত ৩৭ খানা গ্রন্থের দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। তার মধ্যে ৩৫ খানা সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং দু'খানা বাংলাভাষায়। বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'রামরসায়ন' উল্লেখ্য। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে 'ছন্দোমঞ্জরীর' টীকা, 'সদাচার নির্ণয়', 'রোগার্ণব তারিণী', 'শরীর বিবৃত্তি', 'লেখদর্পণ', 'হরিহর স্তোত্র' ইত্যাদি ৩৫ খানা গ্রন্থের নাম করেছেন অ্যাডাম সাহেব।

এই সামান্য বিবরণ থেকে বোঝা যায়, প্রায় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মানকর বর্ধমান জেলার বিদ্যাচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দী, অর্থাৎ হিতলাল মিশ্রের আমল পর্যন্ত, মানকরের সারস্বত-সাধনার ধারা প্রায় অব্যাহত থাকে। বিদ্যার পাশাপাশি দেখা যায়, বাণিজ্য ও শিল্পসাধনাতেও মানকরের বিশেষ খ্যাতি ছিল, অর্ধশতাব্দী আগেও। তারপর একদিকে মড়ক ও মহামারীতে, অন্যদিকে আধুনিক নাগরিক যুগের অভিশাপে মানকরের সুসমৃদ্ধ আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের ভিত পর্যন্ত ভেঙে যায়। সেই আঘাত কাটিয়ে উঠে আজও মানকর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

গৌরাঙ্গপুর-ঢেকুর
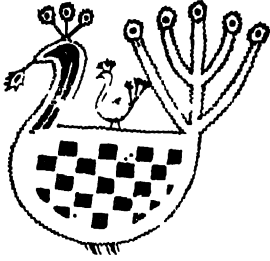
বাংলা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের লাউসেন ও ইছাই ঘোষের কাহিনী বাঙালীর কাছে বিশেষ পরিচিত। কাহিনীর অন্যতম নায়ক ইছাই ঘোষ ঐতিহাসিক ব্যাক্তি। ঐতিহাসিকদের কাছে যিনি 'ঢেক্করীর' ঈশ্বর ঘোষ বলে খ্যাত, তিনি ঢেকুরের ইছাই ঘোষ এবং বর্ধমান জেলার গোপভূম রাজ্যের অন্যতম গোপরাজবংশধর, উত্তররাঢের স্বাধীন সামন্তরাজা।

ঢেক্করী বা ঢেকুর বলে কোনো গ্রাম নেই গোপভূমে। জয়দেব-কেঁদুলির পুবদিকে অজয়নদের দক্ষিণতীরে সেনপাহাড়ীর অন্তর্গত গৌরাঙ্গপুর নামে একটি গ্রাম আছে। দামোদরপুর গৌরাঙ্গপুর খেরওয়াড়ি—এই তিনটি গ্রাম বিষ্ণুপুর মৌজার অন্তর্গত। বিষ্ণুপুর ও খেরওয়াড়ির মাঝামাঝি শ্যামারূপার গড়। এই শ্যামরূপার গড়ই ত্রিষষ্ঠিগড় বা ঢেকুর বলে স্থানীয় লোকের কাছে খ্যাত। এই ত্রিষষ্ঠিগড়েই গোপরাজা ভবানীভক্ত ইছাই ঘোষ ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই মন্দিরের কোনো চিহ্ন নেই এখন। উঁচু টিলার মতো স্তূপের গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট চতুষ্কোণাকার ইটের মন্দির আছে, পরবর্তীকালে তৈরি। দক্ষিণে গৌরাঙ্গপুরে 'ইছাই ঘোষের' বিখ্যাত দেউল আছে, বাংলা দেশের কয়েকটি রেখ-দেউলের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। বিশেষ প্রাচীন নয়। গড়ন ও অন্যান্য বিশেষত্ব দেখে বিশেষজ্ঞরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর দেউল বলে মনে করেন। পরবর্তীকালে গোপরাজবংশের কেউ হয়ত ইছাই ঘোষের স্মৃতিরক্ষার্থে এই দেউল নির্মাণ করেছিলেন, এমনও হতে পারে।

অজয়নদের দক্ষিণতীরে ইছাই ঘোষের দেউল এবং উত্তরতীরে 'লাউসেন তলা'। লোকপ্রবাদ এই যে ইছাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে লাউসেন এখানে শিবির স্থাপন করেন। 'লাউসেন কুণ্ড' নামে কূপ এবং হাটুগাড়ি নামে দুইটি পুকুরের অবশেষ লাউসেন-তলার স্মৃতি রক্ষা করছে। বহুদূর থেকে ডোম জাতির লোকেরা এসে প্রতি বছর ১৩ বৈশাখ এই স্থানে লাউসেনের সেনাপতি তাদের স্বজাতি কালুবীরের পূজা করে। অজয়ের দক্ষিণে 'কাঁদুনেডাঙা' নামক স্থানে লাউসেন ও ইছাইয়ের যুদ্ধ হয়। স্থানটি দেখিয়ে স্থানীয় কৃষকরা আজও কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে :

শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা
আজি বনে যেওনা রে ইছাই গোয়ালা।

ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম লিখেছেন, ইছাই ঘোষের গড় পাহাড-ঘেরা ছিল। কাছাকাছি পাহাড় না থাকলেও, পাহাড় এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কবি লিখেছেন যে, দুর্গম গভীর অরণ্য কেটে ইছাই বসতি স্থাপন করেছিলেন। এখনও গভীর জঙ্গল ও দুর্গম বিস্তীর্ণ শালবনের ভিতর দিয়ে গৌরাঙ্গপুর ও শ্যামরূপার গড়ে যেতে হয়। আমরা যখন গিয়েছিলাম (১৯৫২) তখন স্থানীয় সাধারণ লোক পর্যন্ত ভয়ে আমাদের সঙ্গী হতে চাননি। গৌরাঙ্গপুর পেঁছে গ্রামে মুসলমান মণ্ডলের গৃহে জলযোগ করে, আমরা ইছাই ঘোষের দেউল ও শ্যামারূপার গড় দেখতে যাত্রা করলাম। তখন গ্রামের মণ্ডলসহ চার-পাঁচজন কুঠার-কাটারি নিয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হলেন। এরকম গভীর জঙ্গলে জীবনে কোনদিন প্রবেশ করিনি। যেতে যেতে পদে-পদে মনে হচ্ছিল, যে-পথ দিয়ে চলেছি, সে-পথ দিয়ে ফিরে আসা বোধহয় আর সম্ভব হবে না। পথ চলতে চলতে গ্রামের মণ্ডল বলছিলেন, কাঠ কাটার সময় কাঠুরেরা পথ তৈরি করে, তারপর পথ আবার জঙ্গলে ঢেকে যায়। পথের চিহ্ন থাকে না কোথাও। দু'হাত দিয়ে ডালপালা কেটে কেটে পথ তৈরি করে তাঁরা যাচ্ছিলেন, আমরা তাঁদের অনুসরণ করছিলাম। এইভাবে গৌরাঙ্গপুর থেকে ইছাই ঘোষের দেউল দেখে প্রায় দু'তিন মাইল অরণ্যপথ অতিক্রম করে আমরা শ্যামরূপার গড়ে পৌঁছলাম। যেতে যেতে ঘনরামের বর্ণনার কথা মনে পড়ছিল :

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটি॥

শ্যামারূপার গড়ের চারিদিকে জঙ্গল এত দুর্ভেদ্য যে, আমাদের দলপতি গ্রামের মণ্ডল পর্যন্ত আমাদের তার মধ্যে নিয়ে যেতে সাহস করলেন না। তিনি বললেন যে, ওর মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে পারবেন না এবং একবার ঢুকে তিনি আর পথ খুঁজে পাননি, কাঠুরেরা তাঁকে উদ্ধার করেছিল। নেকড়ে বাঘ ও বিষাক্ত সাপ আছে প্রচুর জঙ্গলের মধ্যে। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে অসংখ্য ময়ূর ছিল এই গড়ের জঙ্গলে। গড়ের পাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে। কাঠুরেরা তার টুকরো নিদর্শন মধ্যে মধ্যে সংগ্রহ করে আনে। গড়ের উপর থেকে মনে হয় পাহাড়ের মতো জঙ্গল নিচে নেমে গিয়েছে। সেখান থেকেই আমরা সেই ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে দেখলাম। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, এই হল ঢেক্করী বা ঢেকুর এবং এখানেই ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বাসের ভিত্তি নেই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না, তাই বলছি। প্রথমে ঢেক্করী বা ঢেকুর নামটি কোথা থেকে এল, এ-প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন।

বীরভূম-বর্ধমানের সীমান্তে ঢেকুর বা ত্রিষষ্টিগড়। পূর্বে লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাতা 'ঢেকারু' নামে (ঢোকরা?) এক জাতি ছিল। বীরভূম-বর্ধমানের এই অঞ্চলেই তাদের বাস ছিল। এখনও তাদের অস্তিত্ব আছে। এই লোহার ঢেকারু জাতির বসবাসের প্রাধান্যের জন্যই মনে হয় এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল ঢেক্করী বা ঢেকুর। এখন সেই লোহার জাতি ও তার ব্যাবসা দুই-ই প্রায় লুপ্ত হয়েছে। জাতির নাম 'ঢেকারু' ঠিকই আছে, তাদের অস্তিত্বও আছে, স্থানের ঢেক্করী নামটি শুধু লোপ পেয়েছে। তা ছাড়া ঢেকুরের ইছাইয়ের রাজধানী প্রসঙ্গে একথাও বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, অজয়ের দক্ষিণতীরে বর্ধমানের গোপদের শৌর্যবীর্যের খ্যাতি এখনও আছে এবং সে-খ্যাতির ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে রাঢ়ের লোক সুপরিচিত।

এইবার ঐতিহাসিক নিদর্শনের কথা বলা যাক। ১৮৩৩ সালের কিছু আগে দিনাজপুর জেলার রামগঞ্জ গ্রামে ঈশ্বর ঘোষের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। বাংলা দেশে আজ পর্যন্ত যত তাম্রলিপি ও শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসনখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। প্রায় চল্লিশ বছর আগে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই তাম্রশাসনের বঙ্গানুবাদসহ একটি বিবরণ প্রকাশ করেন বাংলা 'সাহিত্য' নামক পত্রিকায় (১৩২০ সন)। পরে ননীগোপাল মজুমদার এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন তাঁর 'ইন্‌স্ক্রিপ্‌শন্‌স অফ বেঙ্গল' গ্রন্থে। লিপিবিজ্ঞান, অক্ষরের, ছাঁদ, খোদাইয়ের রীতি ইত্যাদি বিচার করে মজুমদার মহাশয় তাম্রশাসনখানি পালযুগের

শেষ পর্বের বলে মন্তব্য করেন। তাম্রশাসনের বিষয়বস্তু হল—মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ পিয়োল্লমণ্ডলের গাল্লিটিপ্যক বিষয়ান্তর্গত দিগ্‌ঘাসোদিক নামে একখানি গ্রাম ভট্ট নিব্বোকশর্মণকে দান করেছেন এবং ঢেক্করী থেকে তিনি উক্ত তাম্রশাসনাধীন আদেশ জারী করছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু[১] ও ননীগোপাল মজুমদার মনে করেন, ঢেক্করী আসামের গোয়ালপাড়া বা কামরূপ জেলায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মনে করেন বর্ধমান জেলায়। সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে ঢেক্করীর অবস্থান সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় তাতে শাস্ত্রী ও মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমানই সত্য বলে মনে হয়। রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বরেন্দ্রভূমির পুনরুদ্ধারে যে সকল সামন্তরাজা রামপালকে সাহায্য করেছিলেন সৈন্যসামন্ত দিয়ে, সন্ধ্যাকরনন্দী অতিসংক্ষেপে তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রামচরিতকাব্যের প্রাচীন টীকাকার তাঁদের বিশেষ পরিচয় দিয়ে ঐতিহাসিকদের যে কত বড় উপকার করেছেন তা বলা যায় না। এই সব স্বাধীন সামন্তরাজাদের মধ্যে 'বন্দ্য' বা ভীমযশা হলেন দক্ষিণ বিহারের। 'গুণ' বা বীরগুণ হলেন উড়িষ্যা ও বাংলার সীমান্তের কোনো অটবী রাজ্যের। 'সিংহ' বা জয়সিংহ হলেন দণ্ডভুক্তির (মেদিনীপুরের)। 'শূর' বা লক্ষ্মীশূর হলেন 'অপর-মন্দার' বা মান্দারনের (হুগলি)। 'শিখর' বা রুদ্রশিখর হলেন তৈলকম্পীর বা পুরুলিয়া-মানভূম জেলার তেলকূপীর, শিখরভূমের। ভাস্কর হলেন উচ্ছালের (বীরভূমের ?)। প্রতাপ হলেন ঢেক্করীর (গোপভূম-বর্ধমান)। 'অর্জন বা নরসিংহার্জুন কজঙ্গলের, অর্থাৎ রাজমহলের দক্ষিণে কঙ্কজোলের।[২] এই পরিচয় থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রামপালকে যে সামন্তরাজারা সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের ও রাঢ় অঞ্চলের। উড়িষ্যা-বাংলার সীমান্ত ও দক্ষিণ-বিহার থেকে আরম্ভ করে মেদিনীপুর হুগলি মানভূম বর্ধমান বীরভূম রাজমহল পর্যন্ত তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সেই সব সামন্তরাজ্যের মধ্যে ঢেক্করী একটি। ঢেক্করী আসামে হওয়া সম্ভব নয়, বর্ধমানে হওয়াই সম্ভবপর এবং আমাদের এই ত্রিষষ্টিগড়-ঢেকুরই সেই প্রাচীন ঢেক্করী। সমস্যা হল প্রতাপকে নিয়ে। প্রতাপকে টীকাকার 'প্রতাপসিংহ' বলেছেন বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। বাংলার সামন্তরাজাদের 'সিংহ' উপাধির এবং রাজপুত ক্ষত্রিয়-উৎপত্তির কতখানি গুরুত্ব আছে, তা ঐতিহাসিকরা জানেন। প্রতাপসিংহ যে ঘোষ-বংশজাত নন, তা

১ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড, ২৫০-৫১

২ রাধাগোবিন্দ বসাক : রামচরিত, ভূমিকা।

বলা যায় না। বাকি থাকে ঈশ্বর ঘোষের বা ইছাই ঘোষের বংশপরিচয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে:

সোমের পরম বন্ধু বাঁধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা॥···
নাকড়া নিশান দিল লিখি পরওয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা॥
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ।

সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ। কিন্তু রামগঞ্জ তাম্রশাসনে ঈশ্বর ঘোষের যে সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় আছে তাতে দেখা যায়, ধূর্ত ঘোষের পুত্র বাল ঘোষ একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। ধবল ঘোষ নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। ধবল ঘোষের পুত্র হলেন ঈশ্বর ঘোষ। তাম্রশাসন ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের বংশপরিচয়ে মিল নেই। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ প্রাচীন রাজকাহিনীকে মঙ্গলকবিরা কুলপঞ্জী মিলিয়ে কাব্যে রূপায়িত করেননি। ঈশ্বর ঘোষ একাদশ শতাব্দীর সামন্ত-রাজা, মহীপালের সমসাময়িক। মহীপালের রাজত্বকালে বৈদেশিক আক্রমণে (চোল ও কলচুরী) পশ্চিমবঙ্গে যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, সেই সুযোগেই মনে হয় ঈশ্বর ঘোষ বর্ধমানের গোপভূমের বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে ঢেকুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কর্ণসেন ও তাঁর পুত্র লাউসেন হয়ত মেদিনীপুরের কোনো অঞ্চলের সামন্তরাজা ছিলেন এবং দুই সামন্তরাজার মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ বা যুদ্ধ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। রাঢ় অঞ্চলে ডোমরাই প্রধান যোদ্ধার জাত এবং গোপদের শৌর্যবীর্যও অতুলনীয়। রাঢ়ের সেই লোকসেনার বীরত্বের কাহিনী ও যুদ্ধযাত্রার চিত্র তাই ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। একাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক কাহিনী কয়েকশো বছর মুখে মুখে লোকগাথা ও লোককথায় পল্লবিত হয়ে এসে ধর্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে হয় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বৌদ্ধ উৎসবের যদি কোনো প্রভাব বা অবশেষ থাকে (আছে মনে হয়), তাহলে সেটাও ঐ পালযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধ্বংসাবশেষ।

রাজা ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের কাহিনী ছাড়াও ধর্মমঙ্গলের আর একটি কাহিনী আছে, রাজা হরিশচন্দ্রের কাহিনী। ভট্টশালী মহাশয়ের মতে হরিশচন্দ্র ঢাকা জেলার সাভারের রাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে ধর্মপূজার প্রচলন নেই। হরিশচন্দ্র ধর্মঠাকুরের ভক্ত ছিলেন এবং পুত্রকে বলিদান দিয়েছিলেন, ব্রাহ্মণবেশী ধর্মের অতিথিসেবার জন্য। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করেন, হরিশচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অমরাগড়ের রাজা ছিলেন[৩] এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কোনো কোনো ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়, রাজা হরিশচন্দ্রের রাজধানীর নাম 'অমরা'। এই 'অমরা'-কেই বিদ্যানিধি মহাশয় মানকরের অদূরবর্তী অমরাগড় বলেছেন (আগে অমরাগড়ের পরিচয় দিয়েছি)। এও অনুমান, কিন্তু এ অনুমান সত্য হলেও হতে পারে। যদি হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে :

ইছাই ঘোষ বা ঈশ্বর ঘোষ এবং হরিশচন্দ্র দু'জনেই সমসাময়িক। বর্ধমান জেলার গোপভূমের রাজা ছিলেন দু'জন এবং গোপরাজা। একজনের রাজধানী ছিল ঢেকুরে, আর একজনের অমরায়। ইছাই ছিলেন ভবানীভক্ত, হরিশচন্দ্র ধর্মঠাকুরভক্ত। বাংলার ধর্মমঙ্গল কাব্যের দুটি লোকপ্রিয় কাহিনী বর্ধমানের গোপভূমের দান এবং গোপরাজাদের কাহিনী।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ইছাই বা ঈশ্বর ঘোষের আছে, আগে তা বলেছি, হরিশচন্দ্রের নেই। সাংস্কৃতিক প্রমাণ দু'জনেরই স্বপক্ষে। বর্ধমান জেলার সদ্গোপ ও গোপরা প্রধানত শৈব ও শাক্ত ধর্মের সাধক। শক্তির পূজারী তাঁরা। 'অমরাগড়' প্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সুতরাং ইছাই ঘোষ স্বচ্ছন্দে ভবানীভক্ত হতে পারেন। ডাকার্ণব গ্রন্থে বৌদ্ধ তান্ত্রিক পীঠস্থানের মধ্যে 'ঢিক্কর' নামে স্থানের উল্লেখ আছে।[৪] ঢিক্কর মনে হয় এই ঢেক্করী বা ঢেকুর। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের পীঠস্থান ছিল ঢেকুর। পালযুগের গোপরাজা ইছাই ঘোষ মনে হয় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। এছাড়া বর্ধমানের সদ্গোপ ও গোপদের মধ্যে ধর্মপূজারও বিশেষ প্রচলন আছে। উত্তর ও পূর্ব বর্ধমানের (প্রাচীন গোপভূমে) অনেক গ্রাম দেখেছি, ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবায়েত সদ্গোপ অথবা গোপ। সুতরাং অমরাগড়ের রাজা যদি হরিশচন্দ্র হন তাহলে তিনি ধর্মঠাকুরের ভক্তও হতে পারেন। আর একাদশ শতাব্দীতে পালযুগের ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

এইবার গোপভূমের অন্তর্গত প্রাচীন ঢেকুরের রাজা ঈশ্বর বা ইছাই ঘোষের প্রভাবপ্রতিপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। রামগঞ্জ তাম্রশাসনে বলা হয়েছে :

> ······তস্যা ঈশ্বর ঘোষ এষ তনয়ঃ হে—
> ধামা জয়ত্যেকো দুর্ধরসাহসঃ কিম
> প·ং কান্ত্যা জিত্যেন্দুদ্যুতিঃ
> যস্য প্রোর্জিতশৌর্যনির্জিতরিপোঃ—

৩ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৮ খণ্ড, পৃ ৭৭।

৪ H. P. Sastri: Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS. in the Govt. Coll., Vol I. 1917. P. 92.

চন্দ্রের দ্যুতিকেও ঈশ্বর ঘোষের কান্তি হার মানায়, তাঁর শৌর্যবীর্যের তুলনা হয় না। এই মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ তাঁর তাম্রশাসনে যাঁদের উপর আদেশ জারী করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন : রাজন রাজ্ঞী রাজন্যক রাণক রাজপুত্র কুমারামাত্য মহাসান্ধি-বিগ্রহিক মহাপ্রতিহার মহাকরণাধ্যক্ষ মহামুদ্রাধিকৃত মহাক্ষপটলিক মহাসর্বাধিকৃত মহাসেনাপতি মহাপাদমূলিক মহাভোগপতি মহাতন্ত্রাধিকৃত মহাব্যূহপতি মহাদণ্ডনায়ক মহাকায়স্থ মহাবলাকোষ্ঠিক দণ্ডপাশিক কোট্টপতি হট্টপতি, ভুক্তিপতি বিষয়পতি ঔখিতাসনিক মহাবলাধিকরণিক মহাসামন্ত মহাকটুক ঠক্কুর অঙ্গিকরণিক অন্তঃপ্রতীহার দণ্ডপাল খণ্ডপাল দুঃসাধ্যসাধনিক চৌরোদ্ধরণিক উপরিক তদানিযুক্তক আভ্যন্তরিক বাসাগারিক খড়গগ্রাহ শিরোরক্ষিক বৃদ্ধধানুষ্ক একসরক খোল দূত গমাগমিক লেখক দূতপ্রৈষণিক পানীয়াগারিক সান্তকিক কর্মকর গৌল্মিক শৌলকিক এবং অন্যান্য রাজাজ্ঞাধীন কর্মচারী। এত বিচিত্র রাজকর্মচারী আমলা-অমাত্যের নামের তালিকা পালযুগের কোনো শিলালেখ বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়নি। পালযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিস্তৃত চিত্র ঈশ্বর ঘোষের এই তাম্রশাসন থেকে পাওয়া যায়, যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই জন্য এর ঐতিহাসিক মূল্য এত বেশি। কিন্তু যে-কথা সবচেয়ে বেশি মনে হয় তা হল এই যে, যিনি মহামাণ্ডলিক বা একজন সামন্তরাজা মাত্র ছিলেন, তিনি অন্যান্য রাজা বা রাজন্যকদের হুকুম জারী করেন কি করে? অন্যান্য সামন্তরাজাদের (রাঢ় অঞ্চলের) কি তাহলে ঈশ্বর ঘোষ নিজের বাহুবলে বশীভূত করেছিলেন? তাম্রশাসনে সেই ইঙ্গিতই রয়েছে। গোপভূমের রাজা ঢেকুরের ইছাই ঘোষ কেবল যে একজন বীর যোদ্ধা ও প্রভাবশালী সামন্তরাজা ছিলেন তা নয়। মহীপালের রাজত্বকালে একাদশ শতাব্দীতে, আভ্যন্তরিক রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সুযোগে হয়ত তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রতিবেশী সামন্তরাজাদের মধ্যে দু-চারজনকে বাহুবলে জয়ও করেছিলেন। অমরা ও ঢেকুর কেন্দ্র করে গোপভূম রাজ্যের সীমানা হয়ত বর্ধমান থেকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে বর্ধমানের স্বাধীন গোপরাজাদের মহিমাও ছড়িয়ে পড়েছিল।

অম্বিকা-কালনা

গঙ্গার তীরে কালনা। শুধু কালনা নয়, অম্বিকা-কালনা। গঙ্গার একদিকে কালনা, অন্যদিকে শান্তিপুর। শান্তিপুর ডুবু-ডুবু, নদে যখন ভেসে যায়, তখন কালনাও ডুবে গিয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের শ্রীচৈতন্য এসে কালনার তেঁতুলতলায় বসেছিলেন। গৌরীদাসের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছিল। মুসলমান আমলের কথা। তার আগে কি কালনার কোনো ইতিহাস ছিল না? ভাগীরথীর বুক থেকে হঠাৎ একদিন কি চর ঠেলে উঠেছিল? মনে হয় না কালনার মাটি দেখে, যদিও বর্ধমানের গাঙ্গেয় উপকূলে কালনা। আরও সন্দেহ হয় নাম শুনে। 'অম্বিকা-কালনা'র অম্বিকাটি কে? আমাদের কাছে অম্বিকা হলেন দুর্গা। দেবদেবীরও ধর্মান্তরের ইতিহাস আছে। আসলে অম্বিকা হলেন জৈনধর্মীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী, পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। কালনার ইতিহাস কি তাহলে?

নামে কিছু আসে যায় না বটে, কিন্তু ইতিহাসে আসে যায়। 'বর্ধমান', 'অম্বিকা-কালনা', 'বজাসন' (বজ্রাসন) ইত্যাদি নাম যত সহজে উপেক্ষা করা যায়, তত সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। দৈববাণী শুনে গ্রামের বা স্থানের নাম হয় না। নামের একটা ইতিহাস থাকে। 'যার· বৃদ্ধি হচ্ছে' সেই 'বর্ধমান' এরকম নিরবয়ব.ভাবের আশ্রয়ে নামের উৎপত্তি সচরাচর হয় না। বর্ধমান মহাবীরপন্থী জৈনদের দেওয়া নাম বললে একটা মানে হয়। তার থেকে ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া যায়। অতীত এইভাবে বর্তমানের সঙ্গে মিশে থাকে। যেমন আছে 'বজ্রাসনে' ও 'অম্বিকা-কালনা'য়।

বজ্রযানী বৌদ্ধদের বজ্রাসন 'র-ফলা' ঝেড়ে ফেলে সহজে 'বজাসন' হয়েছে। 'অম্বিকা' উপাসনার উত্তরাধিকার নিয়ে কালনা হয়েছে 'অম্বিকা-কালনা'। এসব বৌদ্ধ বা জৈন বায় নয়, অবধারিত সত্যও নয়। একটা সংকেত মাত্র, লুপ্ত ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ অনুসন্ধানের অনেক বাতির মধ্যে একটি মাত্র বাতি। যত টিম্‌টিমেই হোক, উপেক্ষণীয় নয়।

জৈনদেবী অম্বিকার উপাসনা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত ছিল মনে হয়। বিভিন্ন কর্মে দেবীর বিভিন্ন মূর্তি ও বিচিত্র বর্ণের কল্পনা করা হত। শান্তিকর্মে শ্বেতবর্ণ, বশ্যকর্মে পীতবর্ণ, মারণ উচাটনাদি কর্মে রক্তবর্ণ ইত্যাদি। উপাসকের ভাবের সঙ্গে উপাস্যের বর্ণের এই সামঞ্জস্যসাধন বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের বড় কথা। জৈন দেব-দেবীও ক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর গুণাগুণের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন মনে হয়। অম্বিকার রূপও নানাভাবে তাঁরা কল্পনা করেছিলেন। দ্বিভুজা চতুর্ভুজা অষ্টভুজা—এমনকি বিংশতিভুজা অম্বিকা পর্যন্ত। অম্বিকা সিংহবাহিনী, হাতে আম্রপল্লব ও শিশু। কখন দুহাতে আম্রলুম্বি, এক হাতে বরদমুদ্রা, অন্য হাতে শিশু। অষ্টভুজার হাতে শঙ্খ চক্র ধনু খড়্গ শস্য আম্রলুম্বি পাশ ইত্যাদিও আছে। বিংশভুজার হাতে খড়্গ শক্তি সর্প ঢাল কমণ্ডলু পদ্ম অভয় ও বরদমুদ্রা দেখা যায়।[১]

বোঝা যায়, জৈনদেবী অম্বিকা খুব সহজেই বাংলার দুর্গার ধ্যানমূর্তির মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে অম্বিকা-কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী, চতুর্ভুজা কালীমূর্তি, সিংহবাহিনী দুর্গা নন। কিন্তু তাতে কি? যিনি দুর্গা তিনিই কালী এবং যিনি অম্বিকা তিনিই দুর্গা ও সিদ্ধেশ্বরী। মিলনে বাধা নেই। প্রথমত হিন্দুধর্মের একাত্মীকরণের অসাধারণ শক্তি, দ্বিতীয়ত বাংলার উদার মাটিতে তার বিশিষ্টতার কথা ভাবলেই বোঝা যায়, এ-মিলন কতখানি সম্ভবপর। এইজন্যই মনে হয়, অম্বিকা-কালনার অম্বিকা জৈনদেবী ছিলেন, পরে তিনি হিন্দু শক্তিপূজায় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবের যুগেই বাংলা দেশে অম্বিকা-পূজার প্রচলন ছিল মনে হয়। অর্থাৎ পালযুগে। অম্বিকা-কালনার ইতিহাস হিন্দু পালযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত না হলে 'অম্বিকা' কথার ব্যাখ্যা করা যায় না। অম্বিকা-কালনাই বৈষ্ণব-কবিদের কাছে 'আম্বুয়া' বলে পরিচিত ছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে 'আম্বুয়া' নামের

---

১ Iconography of the Jain Goddess Ambika : U. P. Shah : Journal of the Univ. of Bombay, Vol 9. Part 2, 1940 আমার অনুরোধে লেখক এই রচনাটি আমাকে পাঠিয়ে দেন, সেজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।—লেখক।

উল্লেখ আছে। সুতরাং অম্বিকা নামটি অর্বাচনীয় নয়, প্রাচীন। পালযুগ পর্যন্ত তার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করা অযৌক্তিক নয়।

ভাগীরথীতীরে অম্বিকা যে হিন্দুযুগেও বেশ সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এখনও আছে। কালনায় মুসলমানযুগের যে কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে তার মধ্যে কয়েকটি মসজিদ ও একটি দুর্গ প্রধান। জীর্ণ জঙ্গলাকীর্ণ মসজিদের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায়, হিন্দু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ দিয়ে মসজিদ তৈরি। পাথরের টুকরোর উপর এখনও হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। সংঘাতের চিহ্ন মসজিদের গায়ে যেন খোদাই করা। ১৯১৬ সালে খান সাহেব মৌলবী আবদুল ওয়ালী কালনার মসজিদ ও অন্যান্য মুসলমানযুগের নিদর্শন পরিদর্শন করে লেখেন:

> It appears that it was a celebrated place during the Muhammedan rule, and earlier, during the Hindu period. Being situated on the river, it was no doubt considered to be a healthy and suitable place for strategical purposes. Nothing of the period of the Hindus can now be traced, except that some of the later Archaeological remains reveal the fact that the Muhammedans built out of the materials of the older and Hindu ruins. (The Antiquities of Kalna : Bengal Past & Present, Vol 14, Jan-June, 1917).

খান সাহেবের কথাই ঠিক। প্রাচীন হিন্দুযুগে এবং মুসলমানযুগেও অম্বিকা-কালনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। একটি পত্তন ছিল অম্বিকা। বাণিজ্যপ্রধান পত্তন। সামরিক কারণেও তার রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। মুসলমানযুগে তো ছিলই। তারপর ভাগীরথীর গতির পরিবর্তন হয়েছে. কালনার ইতিহাসের ধারাও বদলেছে। নদীনির্ভর গঞ্জ, বন্দর বা পত্তনের যেমন হয়, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের যেমন হয়েছে। কালনায় তার ব্যতিক্রম হয়নি।

কালনার মুসলমানযুগের নিদর্শনগুলি তুর্কী-আফগান রাজত্বকালের। বর্তমান কালনা শহর থেকে প্রায় দেড়মাইল পুবে সেই সব নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। অঞ্চলটি 'শাসপুর' বলে পরিচিত। তিনটি পুরাতন মসজিদের অস্তিত্ব দেখা যায় এখানে। এখন অবশ্য জাদুঘরের কঙ্কালের মতো তার অবস্থা, তার উপর গাছগাছড়া ও জঙ্গলে ঢাকা। সবচেয়ে বড় মসজিদটি যে কত বড় ও কত সুন্দর স্থাপত্যের

নিদর্শন ছিল তা তার পাঁজরের মতো জীর্ণ খিলানগুলি দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়। বিরাট মসজিদ, মাথার গম্বুজ ও মিনারগুলি ভেঙে গিয়েছে, তবে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। খানদানি মুসলমানসমাজের একসময় বেশ প্রতিপত্তি ছিল কালনায়। থাকারই কথা, কারণ মুসলমান রাজত্বকালে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল কালনা। শোনা যায়, এই মসজিদে তখন কালনা অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান ঈদের নমাজ পড়তে আসতেন। অভিজাত ধনী মুসলমানরা পাল্‌কি করে আসতেন এবং প্রায় সাত-আটশো পাল্‌কির ভিড় হত মসজিদের সামনে, গঙ্গার তীরে। প্রধান মসজিদটির অনতিদূরে আর-একটি মসজিদ আছে, সুন্দর মসজিদ। একটি দীঘির পাড়ে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। দীঘির স্থানীয় নাম 'মজলিস সাহেব কা দীঘি'। দীঘিটি একজন আফগানপ্রধান কাটিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি আর-একটি মসজিদ আছে, কালনা মিশন হাউসের কাছে। পয়লা মাঘ প্রতি বছর একটি মেলা হয় এখানে এবং দীঘির ধারে [illegible] হন সকলে। প্রবাদ এই, পূর্বে নাকি একটি সোনালি মসজিদ ও চৌকি, মজলিস সাহেবের দীঘি থেকে উপরে ভেসে উঠত মেলার সময়। প্রবাদের মধ্যে হিন্দুদের প্রভাব স্পষ্ট। মজলিস সাহেবের ঘেরা আস্তানা আছে মসজিদের পাশে। পীরের আস্তানায় মানতের যে মাটির ঘোড়া দেখা যায় তারও অভাব নেই।

কালনার মসজিদের তিনটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। বহুদিন পর্যন্ত শিলালেখগুলি কালনা কোর্টের কাছে পড়ে ছিল। ১৯০৩ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের ব্লক সাহেব সেগুলি তাঁর পরিদর্শনের পথে দেখতে পেয়ে কলকাতার মিউজিয়মে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। তারও অনেক আগে ব্লকম্যান সাহেব এই শিলালেখ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আলোচনা করেন (১৮৭ সাল, প্রথম খণ্ড)। প্রথমে ব্লকম্যান সাহেব মনে করেছিলেন যে শিলালিপিগুলি হোসেন শাহের আমলের। পরে বিশেষজ্ঞরা পাঠোদ্ধার করে বলেছেন যে, কালনার মসজিদের শিলালিপি হাব্‌সী রাজাদের আমলের। একটি শিলালিপির তারিখ হিজ্‌রা ৮০৫, অর্থাৎ ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ। হাব্‌সীরা কিছুকাল বাংলা দেশে প্রভুত্ব করেন। ব্লকম্যানের ভাষায়, 'From protectors of the dynasty, the Abyssinians became masters of the Kingdom.'

সৈফুদ্দিন ফিরোজ রাজত্ব করেন ১৪৮৭ থেকে ১৪৯০ সাল পর্যন্ত। খুনজখমের কাহিনীতে হাব্‌সীদের রাজত্বের ইতিহাস রক্তাক্ত ও কলঙ্কিত হয়ে আছে। দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মামুদ্‌ শাহ্‌ রাজত্ব করেন মাত্র এক বছর (১৪৯০-৯১)। তাঁরই

রাজত্বকালে কালনার একটি মসজিদ তৈরি হয়েছিল। বাকি দুটি মসজিদের মধ্যে একটি তৈরি হয় আলাউদ্দীন আবুল মুজফ্‌ফর ফিরোজ শাহের আমলে, ১৫৩৩ সালে, আর-একটি তৈরি হয় ১৫৬০ সালে আবুল মুজফ্‌ফর বাহাদুর শাহের আমলে। অর্থাৎ মসজিদগুলি প্রায় ৪০০।৪৫০ বছরের পুরনো। বাংলা দেশের মুসলমানযুগের শিলালিপির মধ্যে কালনার মসজিদের শিলালিপিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে মুসলমান শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে যে বেশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন, তা এই লিপিনিদর্শন থেকে বোঝা যায়।

কালনার যে বড় মসজিদটির কথা আগে বলেছি, সেটি মনে হয় মুজফ্‌ফর ফিরোজ শাহের আমলে ১৫৩৩ সালে তৈরি। 'মসজিদ-ই-জামিয়া' বা শহরের প্রধান মসজিদ এইটি। নমাজের জন্য মুসলমানরা এখানে জমায়েত হতেন। মুজফ্‌ফর ফিরোজ শাহ হলেন নসরৎ শাহের পুত্র এবং বিখ্যাত হুসেন শাহের পৌত্র। মাত্র কয়েক মাসের জন্য তিনি রাজত্ব করেন। সেই সময় তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও অমাত্য উলুগ্‌ মসজদ খাঁ মালিক তাঁর আদেশে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এত বড় মসজিদ্-ই-জামিয়া তিনি কালনায় ভাগীরথীতীরে তৈরি করতে অকারণে আদেশ করেছিলেন বলে মনে হয় না। বর্ধমান জেলায় অজয় ও ভাগীরথীর তীরে মুসলমানদের বাস বেশি দেখা যায় এবং তার মধ্যে বনেদী মুসলমানবংশও অনেক আছেন। আয়মাদার মুসলমানদের কথা অমরাগড় কাঁকসা প্রসঙ্গে বলেছি। এই সব আয়মাদার জায়গীরদার মুসলমান-পরিবার মুসলমান অভিযানের সময় থেকে এ-অঞ্চলে বসবাস করছেন বলে মনে হয়। অভিযাত্রীদের সঙ্গী হয়েছিলেন যাঁরা তাঁরাই পরে আয়মা ও জায়গীর পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। মুসলমান অভিযানের অন্যতম পথ ছিল নদীর তীরবর্তী পথ। বিজয় অভিযানের পথের উপর, অজয় ও ভাগীরথীর সংলগ্ন স্থানে তাই মুসলমানপ্রাধান্য দেখা যায়। এই পথের উপর অম্বিকা-কালনা ছিল প্রাচীন পত্তন ও গঞ্জের মতো, যেমন ছিল সপ্তগ্রাম। তাই কালনাকে বিজয়ী মুসলমানরা তাঁদের প্রধান বাসস্থান করে তুলেছিলেন। প্রধানত সামরিক কারণে শাসকদের আশ্রয়ে তাঁরা এসেছিলেন কালনায়। তারপর অর্থনৈতিক স্বার্থে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বর্ধমানের মধ্যে কালনা অন্যতম মুসলমানপ্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগে। তা না হলে হুসেন শাহের পৌত্র কালনায় অত সুন্দর করে মসজিদ-ই-জামিয়া তৈরি করার আদেশ দিতেন না। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মাত্র একবছরের হাব্‌সী নবাবও তাহলে কালনায় মসজিদ তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হতেন না।

সাত-আটশো পাল্কি জমা হত কালনার প্রধান মসজিদ-ই-জামিয়ার সামনে, গঙ্গার তীরে, ঈদের নমাজের সময়। তখন সামাজিক পদমর্যাদার সঙ্গে পাল্কি ঘোড়া ও হাতিতে চড়ার অধিকারের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে এই ধরনের মর্যাদা ও অধিকারের মূল্য ছিল। সেই উত্তরাধিকার আমাদের দেশে আধুনিক যুগের প্রবর্তক ইংরেজরাও অনেকদিন পর্যন্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাল্কি ঘোড়া বা হাতিতে চড়ার অধিকার সকলের ছিল না সমাজে। পাল্কিরও আবার তারতম্য ছিল মর্যাদাভেদে। মর্যাদা যত বেশি, পাল্কি-বেহারার সংখ্যা তার তত বেশি। কালনার মসজিদের সামনে যে সাত-আটশো পাল্কি জমা হত, তার বেয়ারার সংখ্যা কার কত ছিল জানা যায় না। জানতে পারলে তখনকার মুসলমান-সমাজের সেনাবিন্যাস পরিষ্কার বোঝা যেত। শুধু পাল্কিতেই যে পদমর্যাদার আভাস পাওয়া যায় তাতে বোঝা যে, অন্তত সাত-আটশো সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস ছিল কালনায়। কালনার সেই সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে একজন মির্জা মেহ্‌দী 'কলকাতা মাদ্রাসা' তৈরির জন্য জমি দান করেছিলেন কলকাতায়। তাঁর জমিতেই কলকাতার বিখ্যাত মাদ্রাসা তৈরি। এই 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা'র পশ্চিমদিকে আজও একটি ছোট্ট গলি আছে, মির্জা মেহদীর নামে। কালনার প্রায়লুপ্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমানসমাজের অনাদৃত নগণ্য স্মৃতিচিহ্ন এই ছোট গলি।

ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধারায় অবগাহন করে অম্বিকা-কালনা আধুনিক যুগে গাত্রোত্থান করেছে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-গৌরীদাস থেকে শুরু করে তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যাসাগর পর্যন্ত কালনার বিচিত্র সংস্কৃতিধারা প্রবাহিত হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে কালনা বেশি দূর নয়। নব্যযুগের সংস্কৃতির তরঙ্গ কালনার গাঙ্গেয় উপকূলেও আঘাত করেছে। নৌকায় করে পায়ে হেঁটে স্বয়ং বিদ্যাসাগর নতুন আদর্শ বহন করে নিয়ে গিয়েছেন কালনায়। কালনাবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি হয়েছেন তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভূ। সে এক বিচিত্র কাহিনী! কালনার ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

প্রাচীন হিন্দুযুগ ও মুসলমানযুগের অম্বিকা-কালনার কথা বলেছি। মুসলমানযুগে কেবল অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রাধান্যই যে ছিল অম্বিকা-কালনার, তা নয়। তার সংস্কৃতিক-প্রাধান্যও ছিল যথেষ্ট। পঞ্চদশ শতকের শেষদিক থেকে শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তনের পর, তার আদিকেন্দ্ররূপে বর্ধমান জেলার গুরুত্ব যখন বেড়ে যায়, তখন থেকেই ওপারে শান্তিপুর এবং এপারে কালনার ঐতিহাসিক প্রাধান্য বাড়ে।

ষোড়শ শতকের গোড়া থেকে যে বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলি বাংলা দেশে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে, তার মধ্যে প্রাচীন 'বৈদ্যখণ্ড' বা শ্রীখণ্ড, কণ্টকনগরী বা কাটোয়া ও আম্বুয়া কিংবা অম্বিকা-কালনা অন্যতম। শ্রীচৈতন্য যে সন্ন্যাস গ্রহণের পর রাঢ়দেশে কয়েকদিন ভ্রমণ করেছিলেন, একথা কৃষ্ণদাস কবিরাজ উল্লেখ করেছেন :

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ॥
এই শ্লোক পড়ি কভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়দেশে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য : ৩য়)

নিত্যানন্দ গঙ্গার উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ত্রিবেণী সপ্তগ্রাম আম্বুয়া শান্তিপুর প্রভৃতি নিত্যানন্দের প্রেমের বাণীতে মুখর হয়ে উঠেছিল। বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবতে' তার উল্লেখ করেছেন :

জয় জয় অবধূতচন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুলুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে॥
তবে কথোদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য গোসাঞি প্রিয় বিগ্রহের ঘরে॥
(শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য : ৫ম)

বৃন্দাবন দাসের এই 'আম্বুয়া-মুলুক'ই হল অম্বিকা-কালনা। শ্রীচৈতন্যের বিশ্রামস্থান বলে কথিত প্রাচীন তেঁতুলতলা কালনায় আজও দেখা যায়। শ্রীপাট-অম্বিকা গৌর-গৌরীদাসের মিলনস্থান বলে প্রসিদ্ধ। আরও উল্লেখযোগ্য হল, গৌরাঙ্গপূজার প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল শ্রীখণ্ডে ও অম্বিকা-কালনায়। ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে কালনায় যে মুসলমানসমাজের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, সেকথা আগেই বলেছি।

কালনায় মুসলমানদের এই প্রতিপত্তির সময় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ তাঁদের পার্ষদবৃন্দসহ যখন ধর্মপ্রচারের জন্য ভ্রমণ করছিলেন, তখন অম্বিকা-কালনা কি রূপ ধারণ করেছিল, আজ তা ভাবা যায় না। কালনার মতো সপ্তগ্রামের কথাও মনে পড়ে। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' সেই সামাজিক রূপের ছবি কিছুটা ফুটে উঠেছে :

নিত্যানন্দস্বরূপ আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিতে প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনারে জন্মায়ে ধিক্কার॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য: ৫ম)

কাব্যিক উচ্ছ্বাস বা অতিরঞ্জন যে নেই তা নয়। কিন্তু তার মধ্যেও ইতিহাসের সামান্য যে আভাস আছে, তার মূল্য অনেক।

তারপর মোগল ও ব্রিটিশ যুগের সন্ধিক্ষণ এবং ব্রিটিশযুগকে বর্ধমানের দিক থেকে বর্ধমান মহারাজাদের যুগ বলা যায়। রাঢ়দেশের প্রাচীন সামন্তরাজবংশগুলিকে (গোপভূম, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি) মোগল ও ব্রিটিশের যোগসাজসে বর্ধমানের মহারাজারা একে-একে উচ্ছেদ করেছেন এবং তাঁদের রাজ্যগুলিকে আত্মসাৎ করে বা নিলামে কিনে বাংলার অন্যতম প্রতিপত্তিশালী নব্য জমিদারে পরিণত হয়েছেন। বিশাল জমিদারীর 'মহারাজা' হয়ে, পত্তনিব্যবস্থার উদ্ভাবন করে, তাঁরা যেমন জমিদারী-স্বার্থ রক্ষা করেছেন, তেমনি অন্যান্য জমিদারদের মতো মধ্যযুগীয় দয়াদাক্ষিণ্য ও বদান্যতার পরিচয় দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হননি। বর্ধমানের পথঘাট (প্রধানত সৈন্য চলাচল বা তীর্থযাত্রার সুবিধার জন্য) তাঁরা তৈরি করেছেন, দীঘি-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে অসংখ্য দেবালয়ে দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দেবোত্তর ও বৃত্তি দান করেছেন। এক্ষেত্রে সাতশৈকা সমাজের বৈদ্য কবিরাজরাও ব্রাহ্মণোচিত মর্যাদায় সমাজে স্থান পেয়েছিলেন। বর্ধমান রাজগণও তাঁদের যথোচিত মর্যাদা দিতেন। অর্থাৎ মধ্যযুগের স্থাবর সমাজের স্তম্ভগুলিকে যতদূর সম্ভব মজবুত করে তৈরি করেছেন। মিদারী বদান্যতার গাথায় তাই বর্ধমানেরও উল্লেখ আছে দেখা যায় :

দিনাজপুরের নগদ দান, রানী ভবানীর কীর্তি।
কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, বর্ধমানের বৃত্তি॥

অম্বিকা-কালনাতেও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবদেবী ও দেবালয় আছে। তার মধ্যে প্রধান হল, ১৭৪০ সালে চিত্রসেন প্রতিষ্ঠিত কালনার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের শিলালিপিতে আছে—"শুভম শকাব্দা ১৬৬১। ২।২৬।৬ শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা 'চিত্রসেন রায়সা। মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র—"। মন্দিরটির গড়ন 'জোড়বাংলা'র মতো, অর্থাৎ একজোড়া দোচালা বাংলা ঘরের মতো। কাঞ্চননগরে ঠিক অনুরূপ একটি দোতালা জোড়বাংলা মন্দির জীর্ণাবস্থায় পড়ে আছে। দোতালা জোড়বাংলা মন্দির খুবই দুর্লভ। আকারে, গডনে এবং পোড়ামাটির কারুকার্যের সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, একই সময়, হয়ত একই মিস্ত্রীর হাতে তৈরি। এ-ছাড়া কালনার অধিকাংশ মন্দিরই সাধারণ বাংলা মন্দিরের মতো, ১০৮টি শিবমন্দিরসহ। সিদ্ধেশ্বরী-বাড়িতে যে কয়েকটি শিবমন্দির আছে, তার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা করেন তিলকচন্দ্রের মাতা ১৭৬৪ সালে, আর-একটি প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ির বিখ্যাত অমাত্য রামদেব নাগ, ১৭৪৭ সালে। কবি ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করে বর্ধমান রাজবাড়ির অমাত্য এই রামদেব নাগকে অমর করে রেখেছেন। রামদেব নাগ 'মূলাযোড়' (২৪-পরগণা) গ্রাম পত্তনি নিয়ে এমনভাবে সেখানকার লোকজন এবং কবি ভারতচন্দ্রের উপর পর্যন্ত অত্যাচার উৎপীড়ন করেছিলেন যে, ভারতচন্দ্র এই 'নাগাষ্টক' রচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন :

স্থিতং মূলাজোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং।
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ··
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহ নারী বিরহিণী
হতাশা দাশাদ্যাশ্চকিতমনসো বান্ধবগণাঃ।
যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপিচ বস্ত্রং চিরচিতং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥

সবই নাগ মশায় গ্রাস করে ফেলেছেন বলে ভারতচন্দ্র অভিযোগ করছেন। অমাত্য রামদেব নাগের উৎপীড়ন-নির্যাতন এমনই সীমাহীন। এ-হেন রামদেব নাগ সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে দেবালয় নির্মাণ করে শিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নিশ্চয় অন্যায়ের পাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায়। নাগ মশায় তাঁর প্রভুদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন।

বর্ধমানের জমিদারদের পোষকতায় যে-সব বিদ্যাস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে, তার মধ্যে অম্বিকা-কালনা অন্যতম। একসময়, অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে, কালনা বহু

সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সমাবেশে শীর্ষস্থানীয় বিদ্যাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৭ সালে অ্যাডাম সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, কালনা থানার মধ্যেই সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (বর্ধমান জেলায়)। বিদ্যালয় টোল ও মক্তবের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে এই :

কালনা থানা	৭৩	৩৭	৬
পূর্বস্থলী থানা	৩৩	১৮	৩
গাঙ্গুরিয়া থানা	১৬	৭	১
রায়না থানা	৭২	১৪	১৪
বর্ধমান থানা	৩৭	২	১০
মঙ্গলকোট থানা	৪৫	১০	৪
আউসগ্রাম থানা	৯১	৩১	২৯

লক্ষণীয় হল, সদর বর্ধমান থানায় বাংলা বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোলের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং সেই অনুপাতে ফারসি আরবি শিক্ষার মক্তবের সংখ্যা বেশি। রাজবাড়ির চারপাশে মোগলযুগের ঐতিহ্যেরই যে প্রাধান্য ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায় এবং তারপর ব্রিটিশ যুগের প্রাধান্য বাড়ে। কালনা থানায় সংস্কৃত টোলের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। কালনা ছাড়া আউসগ্রামও ছিল বর্ধমানের অন্যতম প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র। কালনার পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, অযোধ্যারাম বিদ্যাবাগীশ। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও তাঁর বংশের ইতিহাস অম্বিকা-কালনার ইতিহাসের একটি অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। পণ্ডিত তারানাথের জীবনে একাধারে বিদ্যা ও বাণিজ্যের যে বিচিত্র স্ফুরণ দেখা যায়, তা উনিশ শতকের বাঙালী পণ্ডিতদের জীবনে বিশেষ দেখা যায় না।

তারানাথের পূর্বপুরুষরা যশোহর জেলার 'সারল' গ্রামে বাস করতেন। তখন যশোহরের এই গ্রাম সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার প্রধান সমাজ বলে গণ্য ছিল। তারানাথের পূর্বপুরুষ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত বরিশাল জেলায় বৈচণ্ডী গ্রামে বাস করতেন। বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র যখন কালনায় তাঁদের সমাজবাড়ির সামনে দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেশ-বিদেশ থেকে অনেক পণ্ডিত এনে তিনি সভাস্থ করেছিলেন। সেই সময় রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত কালনায় আসেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কথা। ষড়দর্শনের বিচারে তিনি সভাস্থ পণ্ডিতদের পরাস্ত করে তিলকচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর অনুরোধে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি গ্রহণ করে কালনায় বসবাস

করতে আরম্ভ করেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত পূর্ববাংলা থেকে এসেছিলেন বলে আজও তাঁর বংশধররা এই অঞ্চলে 'বাঙাল ভট্টাচার্য' বলে পরিচিত। তর্কসিদ্ধান্তের তিন পুত্র—শিবদাস, দুর্গাদাস ও কালিদাস। কালিদাস সার্বভৌমের পুত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮১২ সালে কালনায় জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে তিনি প্রায় আট-নয় বছরের বড় ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক পরিচালক বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান রামকমল সেন মশায়ের সঙ্গে কালনার 'বাঙাল ভট্টাচার্য' পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। রামকমল প্রায়ই কালনায় যেতেন। তিনিই তারানাথ ও তাঁর জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তকে কলকাতায় নিয়ে এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন। তারানাথ প্রথমে অলঙ্কারশ্রেণীতে ভর্তি হন। পরে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক নিমচাঁদ শিরোমণির কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্র, তখন বিদ্যাসাগর অলঙ্কারশ্রেণীর ছাত্র। প্রতিদিন বিকেলবেলা ছুটির পর বিদ্যাসাগর তারানাথের ঠনঠনিয়ার বাসায় যেতেন। তখনকার কলকাতার বড় বড় পণ্ডিতসভায় তারানাথ বিচারের জন্য আমন্ত্রিত হতেন এবং বালকছাত্র বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে করে তিনি সভায় নিয়ে যেতেন। বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তিনি সভায় প্রায়ই 'পূর্বপক্ষ' করাতেন। পনের বছরের বালক বিদ্যাসাগরের 'পূর্বপক্ষ' করা দেখে সকলে বিস্মিত হতেন। পরে তারানাথ উঠে সভাস্থ পণ্ডিতদের বিচারে পরাস্ত করতেন।

কলেজের পাঠ শেষ হবার পর বাচস্পতি মশায় বর্ধমানের সদর আমিন পদের নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। বৃত্তিভোগ করা বা চাকরি করার মতো মনোভাব তাঁর কোনকালেই ছিল না। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে উন্নতি করাই বাচস্পতি মশায়ের কাম্য ছিল। সেকালের এই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের মাথায় কোথা থেকে, কেমন করে যে বণিকযুগের স্বাধীন বাণিজ্যের আদর্শ প্রবেশ করেছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। যুগাদর্শের আশ্চর্য প্রকাশ এই পণ্ডিতমশায়ের মধ্যে হয়েছিল। কালনায় নিজবাড়িতে টোল খুলে তিনি ছাত্রদের বিদ্যাদান করতে আরম্ভ করেন এবং তার সঙ্গে নানারকমের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকেন। তারানাথের বাণিজ্যের সেই কীর্তিকাহিনী তাঁর পাণ্ডিত্যের কীর্তির তুলনায় বোধহয় বেশি চমকপ্রদ। বাচস্পতি মশায় কালনাতে টোল করেন বাড়িতে এবং কাপড়ের দোকান খোলেন বাজারে। তখন বিলিতি কাপড়ের আমদানি পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়নি। বিলিতি সুতো কিনে অম্বিকা-কালনায় প্রায় বারশো তন্তুবায়কে দিয়ে তিনি কাপড় বুনিয়ে ব্যবসা করতেন এবং বাইরেতেও কাপড় চালান

দিতেন। কিছুদিন পরে তারানাথ মেদিনীপুর জেলার রাধানগর গ্রামে কাপড়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। কাশী মির্জাপুর কানপুর মথুরা গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি কাপড় পাঠাতেন। তখনও কিন্তু রেলপথ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গরুরগাড়িতে অথবা মুটের মাথায় পণ্ডিতমশায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাপড় চালান দিতেন। কলকাতার বড়বাজারেও তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। কাশী-অমৃতশহর থেকে তখন প্রায় ছয় লক্ষ টাকার শাল বাংলা দেশে আমদানি হত। তার মধ্যে প্রায় একলক্ষ টাকার শাল বাচস্পতিমশায় নিজে আমদানি করতেন। এ-ছাড়া হীরা-জহরৎ, সোনা-রুপোর অলঙ্কারেরও তাঁর ব্যবসা ছিল। বীরভূমে দশ হাজার বিঘে জঙ্গল কিনে তিনি চাষ করতে আরম্ভ করেন এবং পাঁচশো গরু কেনেন দুধ-ঘিয়ের ব্যবসায়ের জন্য। মুটের মাথায় করে কলকাতায় ঘি এনে তিনি বিক্রি করতেন। কালনাতে তিনি নেপাল ও তরাই অঞ্চল থেকে কাঠ আমদানি করে ব্যবসা শুরু করেন এবং কাঠের ব্যবসাতেই কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এই সময় কালনায় তিনি প্রাসাদের মতো বিরাট অট্টালিকা তৈরি করেন বাসের জন্য। কাপড় কাঠ ছাড়া চালের ব্যবসা করতেও বাচস্পতি মশায় ছাড়েননি। কালনায় কয়েকশত ঢেঁকি বসিয়ে তিনি ধান ভানাতে আরম্ভ করেন, কারণ চালের কল তখনও তেমন চালু হয়নি। ঢেঁকির শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে কালনাবাসী যখন অভিযোগ করেন, তখন তিনি তাঁর ঢেঁকিশালা বা ঢেঁকির কারখানা দূরে গাঁয়ে সরিয়ে নিয়ে যান। বাণিজ্যের কি অদম্য সক্রিয় প্রতিভা। কলকাতার শীল-মল্লিক-লাহারাও কালনার বাচস্পতি মশায়ের কাছে হার মেনে যাবেন।

অম্বিকাদেবী, অত্যাচারী রামদেব নাগের শিবমন্দির, প্রাচীন মসজিদ, মির্জা মেহদী, পণ্ডিত অথচ বণিকচূড়ামণি তারানাথ তর্কবাচস্পতি,- এই সমস্ত নিয়ে অম্বিকা-কালনার সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে, যা হঠাৎ কোনো পর্যটকের দৃষ্টিগোচর হবে না।

জামালপুরের বুড়োরাজ

কালনা মহকুমায় পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত একটি নগণ্য গ্রাম জামালপুর। পাটুলি স্টেশনে নেমে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল হেঁটে গ্রামে পৌঁছতে হয়। পথের মধ্যে মধ্যে জঙ্গল এবং বিচ্ছিন্ন দু-একটি গ্রাম। নদী নালা খাল বিল পুকুর বিশেষ নেই। গঙ্গা অনেক দূর। গ্রামের একদিকে একটি ছোট বিল আর মরা-গঙ্গা একমাত্র সম্বল। গ্রীষ্মকালে যেখানে যেটুকু জলের চিহ্ন থাকে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বুড়োরাজের উৎসব হয় বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায়। বিরাট মেলা বসে। নবদ্বীপ কাটোয়া দাঁইহাট কালনা কৃষ্ণনগর শান্তিপুর কলকাতা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা আসেন নানা-রকম পণ্যের পসরা নিয়ে। সুদূর গ্রাম থেকে গ্রাম্য কারিগররা আসেন। প্রায় একমাস ধরে মেলা চলে। প্রতিদিন গ্রাম গ্রামান্তর থেকে হাজার-হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। জল নেই, মাথা গোঁজার স্থানও নেই। অন্নকষ্ট দেখেছি, যাযাবর জীবনও দেখেছি। কিন্তু এরকম জলকষ্ট দেখিনি। টিউবওয়েল যা আছে তার সাধ্য নেই যাত্রীদের জল যোগান দেওয়ার। কাতারে কাতারে নলকূপের সামনে যাত্রীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে (১৯৫৩)। আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠ থেকে কাতর আর্তনাদ শোনা যায় 'একটু জল দাও'! নদী-মাতৃক শস্যশ্যামল বাংলা দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব চোখের সামনে বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে ওঠে। মনে হয়, পথ ভুলে মরুপ্রান্তরে এসেছি। ইউনিয়ন বোর্ড, মেলার কর্তৃপক্ষ, বুড়োরাজের সেবায়েত ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও এই নিদারুণ জলসঙ্কটের সমাধান করতে পারেন না। পুকুরের তলা পর্যন্ত ফাটা, মাটিও চৌচির। অথচ বর্ধমান জেলার মধ্যে এতবড় উৎসব ও মেলা খুব বেশি হয় না।

বুড়োশিবের 'বুড়ো', আর ধর্মরাজের 'রাজা', দু'য়ে মিলিয়ে 'বুড়োরাজ'। সাধারণত 'নাথ' বা 'ঈশ্বর' যোগ করেই শিবের নামকরণ হয় এদেশে, 'রাজ' দিয়ে হয় না। জামালপুরে হয়েছে, কারণ সেখানে দুই দেবতা মিলিত হয়ে সর্বজনপূজ্য লোক-দেবতায় পরিণত হয়েছেন। রাঢ়ের ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশপ্রসঙ্গে, সংস্কৃতি-তত্ত্বের দিক দিয়ে, জামালপুরের বুড়োরাজের গুরুত্ব যে কতখানি, অনুসন্ধানী ও কৌতুহলীরা তা বুঝতে পারবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের পর আমার মনে হয়েছে, রাঢ়ের অন্যতম গণদেবতা (তথাকথিত অনুন্নত সমাজের) ধর্মঠাকুরকে ক্রমে হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠ দেবতা শিবঠাকুর অনেক স্থানে আত্মসাৎ করে ফেলেছেন। জামালপুরের বুড়োরাজ তার অন্যতম ঐতিহাসিক সাক্ষী।

বুড়োরাজের পুজোর পুরোহিত হলেন একজন ব্রাহ্মণ। পৌরোহিত্য-পদে প্রতিষ্ঠার কাহিনীটি এই : যদু ঘোষ নামে স্থানীয় একজন গোপ একদা দেখতে পায় যে তার শ্যামলী নামে গাইগরুটি জামালপুরের একস্থানে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁট থেকে ঠিক ফোয়ারার মতো দুধ ঝরে পড়ছে। স্থানীয় বিজ্ঞ ব্যক্তি চাটুজ্যে মশায়ের কাছে তিনি যান, রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। চাটুজ্যেমশায় দেখলেন, একটি পাথরের মাথায় দুধ জমা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, পাথরটি অনাদিলিঙ্গ শিব। সেই রাত্রেই চাটুজ্যে মশায় স্বপ্ন দেখলেন, দেবতার পুজোর ব্যবস্থা করতে হবে আড়ম্বরে। তাই করা হল। পুজো আরম্ভ হল। চাটুজ্যে মশায় পুজো করেন, আর যদু গোপ দূরে গলবস্ত্র হয়ে বসে থাকেন। পুজোর পর ব্রাহ্মণঠাকুর বলেন, 'যদু, তোর পুজোই আগে করলাম, ভগবান তোকেই আগে কৃপা করেছেন কিনা।' যদুর বাড়ি ছিল পাশের নিমদহ গ্রামে। এইজন্য এখনও সর্বাগ্রে নিমদহের পুজো হয়। এই চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র-বংশই (নদীয়াবাসী) এখন বুড়োরাজের সেবায়েত।

খুব পরিচ্ছন্ন কিংবদন্তী। বোঝা যায়, একসময় রাঢ়ের কোনো প্রতিভাবান ব্রাহ্মণঠাকুর পরিপাটি করে রচনা করেছিলেন, তথাকথিত অনুচ্চসমাজের জনপ্রিয় গ্রামদেবতাদের হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে। কিংবদন্তীটি জামালপুরের বিশেষত্ব নয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অনাদিলিঙ্গ শিবের উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই ধরনের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে দেখা যায়। সর্বত্রই প্রায় গোপদের সঙ্গে শিবের আবির্ভাব-রহস্য জড়িত। একথা আগেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি এবং এর সাংস্কৃতিক গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করেছি। শৈবধর্মের সঙ্গে অন্তত বাংলাদেশের বিশেষ করে রাঢ়ের গোপদের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে, সেকথাও বলেছি। কিংবদন্তীর মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দুসমাজের সাংস্কৃতিক সমীকরণের কৌশলটিও সুস্পষ্ট।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুড়োরাজের পূজা ও গাজন হয়। শিবের পূজা ও গাজন হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। সমস্ত রাঢ় অঞ্চলে সাধারণত বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্মরাজের গাজন হয। তাহলে বুড়োরাজ কি শিব, না ধর্মরাজ? কেউ কেউ বলেন, আদিপুরোহিত চাটুজ্যে মশাই এই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, অনাদিলিঙ্গ শিব বলে। অনাদিলিঙ্গ শিবের অভাব নেই বাংলায়। বাংলার অন্যতম গ্রামদেবতা শিব। সর্বত্রই চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের পূজা ও গাজন হয। সমগ্র বাঢ অঞ্চলের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রতিপত্তিশালী 'অনাদিলিঙ্গ' শিব তারকেশ্ববেব তাবকনাথ। সেখানেও এব ব্যতিক্রম নেই। হঠাৎ কোনো ব্যবস্থাব জন্য বুড়োবাজের পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় হয়নি। শিবেব পূজা বৈশাখী পূর্ণিমায় কোনো জায়গায় হয় না। কয়েকটি খুব বড বড মনসার মেলা, গাজনেব মেলা, পীরসাহেবের মেলা বর্ধমানে হয়। জামালপুবেব উৎসব ও মেলা তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে।

জামালপুর গ্রাম ব্যগ্রক্ষত্রিয়প্রধান। তা ছাড়া বাউরি গোপ ও সদ্গোপদেরও বাস আছে যথেষ্ট। পাশেব নিমদহ গ্রামে একসময গোপদেরই প্রাধান্য ছিল। এখন আব নেই। আশপাশেব গ্রামের জনসংস্থান দেখে পরিষ্কাব বোঝা যায়, একসময় সদ্গোপ ও গোপরাই এই অঞ্চলে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ব্যগ্রক্ষত্রিয়েরও বাস ছিল যথেষ্ট। বাউরিদেব সংখ্যাও এ অঞ্চলে অল্প নয। জামালপুর ও তাব পরিপার্শ্বেব এই জনসংস্থান বিশেষভাবে মনে রাখা দবকার, বুড়োরাজ প্রসঙ্গে। জনপদেব জনের সঙ্গে জনসংস্কৃতিব যোগাযোগ এত প্রত্যক্ষ ও গভীব যে এই সংস্থান উপেক্ষা করা যায না।

এই অঞ্চলেব দীর্ঘকালেব প্রথা অনুযায়ীই বুড়োবাজেব পূজাব ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেটা ধর্মপূজার প্রথা। ধর্মবাজ থেকে বুড়োশিবে রূপান্তবিত হবাব মধ্যপথে. সংস্কাব ও প্রথাব টানে, আপস কবে রয়েছেন বুড়োরাজ। ব্রাহ্মণ পুবোহিতের দূবদর্শিতা এবং হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত উদাবতাব জন্যই এই আপস সম্ভব হয়েছে। হিন্দুধর্ম বা সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ বিরোধ বা সংঘর্ষ কোনদিনই কাম্য মনে কবেনি। বিদেশীয় বিজাতির ধর্মসংস্কৃতি তাই অনায়াসে তার পক্ষে আত্মসাৎ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের এত প্রাধান্যের পবেও তাই হিন্দুধর্মেব বিজয়ী পুনবভ্যুত্থানের পথ পরিষ্কার হয়েছে। নানাজাতি ও বর্ণের অসংখ্য গ্রামদেবতা তাই সহজেই হিন্দু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন।

জামালপুরের বুড়োরাজ প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। সাক্ষাৎ যমের হাত থেকে ভক্ত রুগীরা মুক্তি পান বলে যমবাজ তথা ধর্মরাজের পূজার ব্যবস্থা

হয়নি। শক্তি বা মাহাত্ম্যের প্রশ্ন উঠলে শিবেরও সে-শক্তি আছে, তার জন্য শিবের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ধর্মরাজের পূজার প্রশ্ন ওঠে না। একটা সাংস্কৃতিক সমস্যাকে নিছক ধর্মতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গেলে এই ধরনের উভয়সঙ্কটে পড়তে হয়। অথচ সমস্যাটি খুব যে জটিল তা নয়। পূর্বস্থলী থানায় এই অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে ধর্মপূজার প্রতিপত্তি যে কতখানি তা গ্রাম প্রদক্ষিণ করলেই বোঝা যায়। ধর্মরাজ এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান গ্রামদেবতা এবং ধর্মরাজ কেবল যমরাজ নন। রাঢ়ের লোকদেবতা ও গ্রামদেবতার মধ্যে ধর্মরাজ প্রাচীন ও প্রধান। জাতিবর্ণনির্বিশেষে তিনি সকল শ্রেণীর দেবতা। আদিতে ধর্মরাজ যে সাধারণ অবহেলিত ও উপেক্ষিত জনের উপাস্য দেবতা ছিলেন, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। রাঢ়ের এই জনসাধারণই বীর যোদ্ধা ছিল, স্থানীয় সামন্তদের অধীনে লাঠিয়াল ও সৈনিকের কাজ করাই ছিল তাদের বংশগত পেশা। ধর্মরাজ এই বীর যোদ্ধাদেরও দেবতা ছিলেন। বীরত্ব ও শক্তিরও প্রতিভূ ছিলেন তিনি। আজও ধর্মরাজের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। তার মধ্যে জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে লাঠিয়াল গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়দের বিশাল সমাবেশ ও পাঁঠা কাড়াকাড়ি বিশেষ উল্লেখ্য মনে হয়।

জামালপুরের বুড়োরাজ ইট-পাথরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নন। রাঢ়ের সাধারণ বাঁকানোচালের খড়ো ঘরে প্রতিষ্ঠিত। বুড়োরাজের মন্দির করা নিষেধ বলে কথিত। নতুন ঘর ছাইলেও নাকি চাল ফুটো হয়ে যায়। বুড়োরাজের ঘর তৈরি করে ব্যগ্রক্ষত্রিয়রাই। নিমদহ থেকে পূজা এলে তবে অন্যের পূজা হয়। নিমদহের গোপরা, আজ কেউ নেই বিশেষ, থাকলেও তেমন সঙ্গতি নেই। তাই গ্রামের জমিদার ও গ্রামবাসীরা পূজা পাঠান। হাড়ি ও ডোম জাতির লোকেরা শুয়োর বলি দেয়। হাঁসও বলি হয়। পাঁঠা যে কত হাজার বলি হয় তার ঠিক নেই। সাধারণত মন্দিরের সামনে বলি হয় না, শিবের নামেও পাঁঠা উৎসর্গ করা হয় না। চারিদিকে হাজার হাজার লোক বড় বড় লাঠি ও পাঁঠা নিয়ে জমা হয়ে থাকে। অধিকাংশই হল গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, হাতে মজবুত পাকা বাঁশের তেলচুকচুকে লাঠি। দেখলেই সেই রণপার যুগের কথা মনে হয়, আর 'বাংলার লাঠি'র কথা। পাঁঠাবলির সংকেত পেলেই যে যেখানে থাকে পাঁঠা বলি দিতে আরম্ভ করে, রক্তের স্রোত বইতে থাকে পথে পথে, মাঠে মাঠে। সকলেই প্রায় ছোট ছোট দল বেঁধে আসে লাঠিসোটা নিয়ে। পাঁঠা কাড়াকাড়ি হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড লাঠালাঠি। আগে খুনজখমও হত যথেষ্ট, এখন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন থাকে। আজ যা বর্বরতা বলে মনে হয়, একসময় সেটা বীরত্বের খেলা বলে গণ্য হত। পাঁঠা কাড়াকাড়ি

উপলক্ষ্য করে লাঠিখেলা হত এবং সেটা ছিল ধর্মরাজের উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। বেশ বোঝা যায়, ধর্মরাজের উৎসব কেন্দ্র করে রাঢ় অঞ্চলে এই রকম বীরত্বের ক্রীড়াপ্রদর্শনী হত। এখন তার বিকৃত অবশেষটুকু আছে মাত্র। কাঁধের লাঠিতে ছিন্নমুণ্ড পাঁঠা ঝুলিয়ে লাঠি ঘুরিয়ে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ করে এখনও যখন তারা ছুটে যায়, তখন ত্রাসের সঞ্চার হয় চারিদিকে। যাত্রীদেরও ভয় পেয়ে চারিদিকে ছুটে পালাতে দেখেছি (১৯৫২)। বাস্তবিকই ভয়াবহ দৃশ্য, না দেখলে ভাবা যায় না।

এই হল বুড়োরাজের উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব। বুড়োরাজকে যে নৈবেদ্য দেওয়া হয় তার মাঝখানে একটা দাগ কাটা থাকে। অর্থাৎ নৈবেদ্যের অর্ধেক শিবের, বাকি অর্ধেক ধর্মরাজের। আগে যে মধ্যপথে আপসের কথা বলেছি, তার বড় প্রমাণ এর চেয়ে আর কিছু নেই। উদারতারও এমন বিচিত্র পরিচয় আর কোথায় আছে? ধর্মঠাকুরের সেবায়েত পরে ব্রাহ্মণরাও হয়েছেন। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ সেবায়েত এখনও ডোমপণ্ডিত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্‌গোপ প্রভৃতি অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণরা যখন ধর্মরাজকে হিন্দুদেবতামণ্ডলীর মধ্যে গ্রহণ করেছেন, তখন কোনো বিরোধের পথে না গিয়ে আপসের পথে অগ্রসর হয়েছেন। বুড়োরাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একই পাত্রে নৈবেদ্য গ্রহণ করছেন শিব ও ধর্মরাজ। কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই, দীনতা নেই। নৈবেদ্যের মধ্যে একটি দাগই উভয় দেবতার কাছে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট। শিবের সামনে বলিদান হয় না। অবশ্য শিবের কাছে শক্তি থাকেন এবং শক্তির কাছে বলিদানের বিধি আছে। কিন্তু তাই বলে শুয়োর বলি নয়। বুড়োরাজের মন্দিরের একপাশে হাড়িরা শুয়োর বলি দেয়, কোনো বাধা নেই। 'বুড়োরাজে'র জয়ধ্বনি করেই গোপ ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেয়, তাতেও কোনো বাধা নেই। গ্রাম-গ্রামান্তরের মুসলমানরাও পাঁঠা মানত করে, কোনো সংস্কার নেই। সর্বসংস্কারমুক্ত উদারতার প্রতীক 'বুড়োরাজ' মনেহয় যেন বাংলার নিজস্ব মানবধর্মের প্রতিমূর্তি।

দেন্দুড়-দেনুড়

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী এবং প্রাচীনতম বাংলা চৈতন্যচরিত-কাব্য 'চৈতন্যভাগবত' রচয়িতা বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বাস করতেন। মন্তেশ্বর থানার অধীন দেনুড় গ্রাম, প্রাচীন নাম 'দেন্দুড়'। ভারতী-সম্প্রদায়ের কেশব এবং বাংলার অন্যতম আদি বৈষ্ণবকবি বৃন্দাবনদাসের জন্মস্থান ঠিক কোথায় বলা যায় না। তাঁদের জন্মকাহিনীর মধ্যে পরবর্তীকালে এত অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ হয়েছে যে আজ আর তা ভেদ করে সত্য ইতিহাস জানার উপায় নেই। তা হলেও, দেনুড়ে উভয়েই কিছুকাল বসবাস করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনের পবিত্র স্মৃতি শ্রীপাট দেনুড় আজও বহন করছে।

বর্ধমান বা কালনা থেকে দেনুড় সহজে যাবার উপায় নেই। সুদীর্ঘ পথ মোটরে গিয়ে, মন্তেশ্বর থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে দেনুড় পৌঁছতে হয়। কেশবভারতী ও বৃন্দাবনদাসের স্মৃতিবিজড়িত দেনুড় রীতিমতো বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ঘরবাড়ির সন্নিবেশ এত সুন্দর যে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। খড়ের বাংলা ঘর যে কত সুন্দর হতে পারে এবং তার বাঁকানোচাল স্থাপত্যশিল্পের যে কি অপূর্ব নিদর্শন, তা বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গেলে বোঝা যায়। কেশবভারতীর বংশধররা যেখানে থাকেন, সেখানে এই ধরনের কয়েকটি সুন্দর চালাঘরের দিকে একদৃষ্টে যখন তাকিয়ে ছিলাম, তখন একজন বললেন, 'আর বেশিদিন এরকম ঘর বাংলা দেশে থাকবে না, কারণ এই জাতের ঘরামিরা ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে।' কথাটা

বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও বীরভূমেও শুনেছি। যাই হোক, চালাঘরের পাশে কেশবভারতীর মন্দির পরবর্তীকালে তৈরি। অনেক পার্থক্য, ঘরের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। এই ধরনের স্মৃতিমন্দির ও দেবালয় যা পরে তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে, তার মধ্যে দেখেছি বাংলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতির স্বকীয়তার কোনো চিহ্ন নেই। মিস্ত্রী ও কারিগরের অভাব বলে কেউ কেউ তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, আবার কেউ বলেছেন লোকরুচির পরিবর্তন হয়েছে। প্রথম অভিযোগ অনেকটা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগ পুরোটাই মিথ্যা। যুগে যুগে লোকরুচির পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সেই পরিবর্তনের একটা সুস্থ স্বজাতীয় ধারা যদি না থাকে তাহলে বুঝতে হবে, তার মধ্যে গলদ আছে। প্রসঙ্গত কথাটা উল্লেখ করছি, কারণ এরকম দৃষ্টান্ত অনেক গ্রামে দেখেছি। দেনুড়েও শ্রীপাটের সংস্কার করা হয়েছে যখন, তখন সেবাইতরা এসম্বন্ধে সচেতন থাকলে আরও ভাল হত।

সকলেই জানেন ঈশ্বর পুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু এবং কেশবভারতী সন্ন্যাসগুরু। 'ভারতী' সম্প্রদায়ভুক্ত বলে নাম কেশবভারতী। 'প্রেমবিলাসে'র (১৩ অধ্যায়) মতে কেশবের আসল নাম কালীনাথ আচার্য এবং তাঁর আদি বাসস্থান নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে। অধিকাংশ সময় তিনি 'কণ্টকনগর' বা কাটোয়ায় বাস করতেন এবং কাটোয়াতেই তিনি ১৫১০ সালে শ্রীচৈতন্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। শ্রীপাট পরিক্রমা'তে কেশবের দেনুড় গ্রামে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে :

বাল্যকালে কেশবের দেন্দুরাতে স্থিতি,
বৃন্দাবন দাসের হয় যেথায় বসতি।

বাঙালী ব্রাহ্মণবংশে কেশবের জন্ম। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হয়েছে :

> He is said to have belonged to the village of Denud, in the district of Burdwan and born of Bengali Brahmin ancestry. According to 'Prema-vilasa' (ch 13) Kesava's former name was Kalinath Acarya, and his native place was Kuliya in Navadvipa. But he appears to have resided chiefly at Katwa (Kantaka-nagara). (Dr. S. K. De. Vaisnava Faith & Movement : P. 15. Fn. 2).

কেশবভারতীর বংশের 'ব্রহ্মচারী'রা (উপাধি) এখন দেনুড়ে বাস করেন। বর্ধমানের অন্যান্য স্থানে কেশবের অন্য বংশধররাও বাস করেন। দেনুড়ে কেশবভারতীর একটি মন্দির ও মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বৃন্দাবনদাসের জন্মস্থান কোথায় ঠিক বলা যায় না। যতদূর জানা যায়, তাতে মনে হয় কুমারহট্ট-হালিশহরে (২৪-পরগণায়) তাঁর জন্মস্থান। 'পাট-পর্যটন' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

হালিশহর নতি গ্রামে নারায়ণী-স্থত।
দাস বৃন্দাবন নামে জগতে বিদিত॥
নতি গ্রামে জন্ম তায় দেন্দুড়াতে স্থিতি।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচিলেন তথি।

নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম সম্বন্ধে যে সব অলৌকিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই মিথ্যা ও আজগুবি।[১] কুমারহট্ট-হালিশহর ছেড়ে নারায়ণী শিশু বৃন্দাবনসহ কিছুদিন নবদ্বীপের কাছে মামগাছি গ্রামেও বাস করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে বৃন্দাবনদাস বর্ধমান জেলার দেন্দুড় গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন। শোনা যায় এই দেন্দুড় গ্রামে অবস্থানকালেই তিনি 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেছিলেন।

'চৈতন্যভাগবত' রচনা সম্বন্ধেও নানামত প্রচলিত আছে। অল্পবয়সে বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের অনুচর হন। তিনি শ্রীচৈতন্যেরও অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হননি, "সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।" তবে নবদ্বীপলীলা দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি বলে তিনি বারবার দুঃখ করেছেন, শ্রীচৈতন্যকে দেখেননি বলে নয় :

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম এখন না হইল।
হেন মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥

নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বৃন্দাবনদাস দেন্দুড়ে গিয়ে বাস করেন। তাই যদি হয়, তাহলে 'চৈতন্যভাগবত' তিনি কোথায় রচনা করেছিলেন ?

চৈতন্যভাগবতে বহুবার বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেছেন যে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর উৎসাহে শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হন। যেমন :

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিযা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

অথবা

অন্তর্যামীরূপ বলরাম ভগবান
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥

১ সুশীলকুমার দে'র পূর্বোধৃত গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

চৈতন্যজীবনীর অধিকাংশ উপকরণও তিনি নিত্যানন্দের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর পুত্র ছিলেন। শ্রীবাসের আঙিনাতেই চৈতন্য-জীবনের অনেক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পারিষদদের মুখ থেকেও তিনি অনেক বৃত্তান্ত শুনেছিলেন। এই কারণেই চৈতন্যের জীবনচরিতের মধ্যে 'চৈতন্য-ভাগবতের' মূল্য অত্যন্ত বেশি। কোনো কল্পিত ঘটনা বৃন্দাবনদাসের রচনার মধ্যে বিশেষ নেই। সহজ সরল ভক্তির উচ্ছ্বাস আছে, অনাড়ম্বর আবেগ আছে, ঘটনার নিজস্ব ব্যাখ্যাও আছে, কিন্তু নিছক আজগুবি অলৌকিক কাহিনীর উৎকট বর্ণনা নেই। 'চৈতন্যভাগবতে'র এটাই হল বিশেষত্ব।

কিন্তু 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল কি ও রচনাস্থান কোথায়? বৃন্দাবনদাসের কাব্য যখন লেখা হয় তখন শ্রীবাস পণ্ডিত ও সনাতন-রূপ জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। "অদ্যাপিও শ্রীবাসের চৈতন্য কৃপায়, দ্বারে সব উপসন্ন হতেছে লীলায়"; "অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ-সনাতন, চৈতন্যকৃপায় হৈল বিদিত ভুবন"— এই সব উক্তির মধ্যে 'অদ্যাপিও' কথা কবি অকারণে ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয় না। তাই মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্বে গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয় এবং নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের (বা বীরচন্দ্র) জন্মের পূর্বে গ্রন্থরচনা শেষ হয়। 'চৈতন্যভাগবতে'র সমাপ্তি দেখে অনেকে মনে করেন কবি বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং রচনা শেষ হবার পূর্বেই পরলোকগমন করেছিলেন। একথাও সমীচীন বলে মনে হয় না। অধ্যাপক সুকুমার সেন মনে করেন যে, শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই 'চৈতন্যভাগবত' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল।[২] চৈতন্যের জীবদ্দশায় যদি 'চৈতন্যভাগবত' রচিত হয়ে থাকে এবং নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বৃন্দাবনদাস দেনুড়ে বসবাসের জন্য গিয়ে থাকেন, তাহলে দেনুড়ে তিনি চৈতন্যভাগবত রচনা করতে পারেন না। চৈতন্যভাগবত তার আগেই অন্য কোথাও রচিত হয়েছিল। হয়ত নবদ্বীপের মাতুলালয়ে বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

চৈতন্যভাগবত যেখানেই রচিত হোক না কেন, তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। অন্য স্থানে রচিত হলেও বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামের গুরুত্ব তাতে কমছে না। কারণ কবি শেষজীবনে যে গ্রামটিকে নিজের জীবনসাধনার তীর্থস্থান বলে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেই গ্রামই তাঁর নিজস্ব গ্রাম মনে করা উচিত।

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড: সুকুমার সেন, পৃঃ ২৪০-২৪১।

দেনুড়ের ধুলোমাটি যখন বৃন্দাবনদাসের সেই জীবনস্মৃতি-বিজড়িত, তখন বাংলার বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলির মধ্যে তার স্থানও অন্যতম। কবি হিসাবে বৃন্দাবনদাসের স্থান তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক উচ্চে। বৃন্দাবনদাসের অনুমতি নিয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেছিলেন :

বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লযে লিখি যাহাতে কল্যাণ।

কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটির কাছে ঝামটপুর গ্রামে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস ছিল। এইখানে বল্লালসেনের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়েছিল এবং সনাতন রূপের পিতৃভূমিও ছিল এইখানে। ঝামটপুরের কবি কৃষ্ণদাস দেনুড়ের বৃন্দাবনদাসকে কি চোখে দেখতেন এবং কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তা তাঁর এই উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় :

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস
চৈতন্যলীলায ব্যাস বৃন্দাবন দাস।
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল।...
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।

কৃষ্ণদাস যে অতিশযোক্তি করেননি তা চৈতন্যভাগবতের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন।

চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিক মূল্যের কথা আগে বলেছি। রাঢ়ের তথা পশ্চিমবাংলার ইতিহাস রচনায বৃন্দাবনদাসের তথ্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। 'পাষণ্ড' পাষণ্ডীরা'রা বৈষ্ণবদের যেরকম নিন্দ'বা'দ ও কুৎসা করত তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন বৃন্দ.বনদাস :

কিছু নাহি জানে লোক ধনপুত্রবসে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
কেহ বোলে এ বামনে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাইনি স্রোতে॥
এ বামনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে ভাগবতগণ॥

এই কথা শুনে ক্রোধে আগুনের মতো জ্বলে উঠে অদ্বৈত বলেছিলেন :

পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥

এই 'পাষণ্ড পাষণ্ডীরা' কারা? মদ্য-মাংস দিয়ে যারা চণ্ডীপূজা করত, ধর্মপূজা করত, তারা নয় কি? মনে হয় তাদেরই বৃন্দাবনদাস 'পাষণ্ড' ও 'পাষণ্ডী' বলেছেন। দেন্নুড় প্রসঙ্গে কথাটা আরও বিশেষভাবে মনে হয়, কারণ দেন্নুড়ে কেশবভারতী ও বৃন্দাবনদাসের বসবাসের আগে এবং বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচারিত হবার আগে, শৈব ও শাক্ত ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের তথা রাঢ়ের সর্বত্রই তাই ছিল, দেন্নুড়েও ছিল। দেন্নুড়ের আদি গ্রামদেবতা হলেন দেন্দুড়েশ্বর বা দীনেশ্বর শিব। শিবমন্দিরের মধ্যে একটি প্রাচীন চণ্ডীমূর্তি আছে, কালো পাথরের, নাম "বিক্রমচণ্ডী"। বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাটে যে গৌরনিতাইয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানেও একটি চমৎকার কালো পাথরের মহিষমর্দিনী মূর্তি আছে। এই বিক্রমচণ্ডী ও মহিষমর্দিনী দেন্দুড়ের গ্রামদেবতা ছিলেন একসময়। হয়ত পৃথক দেবালয়েও তাঁরা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বিক্রমচণ্ডী শিবমন্দিরে এবং মহিষমর্দিনী গৌরনিতাইয়ের মন্দিরে আশ্রয় পেয়েছেন। দেন্নুড় ও তার আশপাশের গ্রামে (পাতুন, মন্তেশ্বর প্রভৃতি) চণ্ডী চামুণ্ডা ও ধর্মরাজের প্রতিপত্তি এখনও এত বেশি যে কেশবভারতী ও বৃন্দাবনদাসের কালে তার রূপ কি ছিল কল্পনা করা যায় না। বর্ধমান জেলা যেমন বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান, তেমনি শাক্তদেরও পীঠস্থান। শক্তির সাধনা ও ভক্তির আরাধনা এখানে যেন পাশাপাশি খাতে প্রবাহিত হয়েছে। বর্ধমানের বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় একসময় তান্ত্রিক ও শাক্ত সাধকদের প্রাধান্য ছিল। এখনও অনেক জায়গায় আছে। দেন্নুড় তার মধ্যে অন্যতম।

পাতুন । নতুনগ্রাম । দাঁইহাট
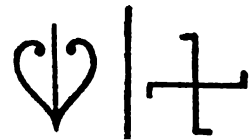
বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিত্যক্ত মূর্তির সংখ্যা যে কত তার হিসাব নেই। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম থেকে এইরকম মূর্তি উদ্‌যোগী অনুসন্ধানীরা অনেক সংগ্রহ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়মে সেগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গ তথা রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামেও অসংখ্য মূর্তি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ঔদাসীন্যের জন্য মূর্তিব্যবসায়ীরা অনেক মূর্তি অপহরণ করে বিদেশীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন (১৯৫২-৭৫)। বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমান প্রভৃতি জেলার একাধিক গ্রামে এই মূর্তি-অপহরণের চাঞ্চল্যকর কাহিনী শুনেছি (১৯৫২-৫৭)। অনেক গ্রামে এইসব মূর্তির এখন আর পূজা হয় না, কোনো গ্রামে বুদ্ধমূর্তি বিষ্ণুমূর্তি ইত্যাদি স্থানীয় গ্রামদেবতার নামে পূজিত হয়। পূজা হোক বা নাই হোক, গ্রামবাসীদের যেন একটা নাড়ীর টান আছে দেখেছি মূর্তির প্রতি। মূর্তি চুরি হলে বা হারিয়ে গেলে তাই গ্রামে সাড়া পড়ে যায়। এরকম অনেক অভিযোগ আমি শুনেছি। পূর্ববঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের মতো পশ্চিমবঙ্গের দেব-দেবীর বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য যে কত, তা আজ পর্যন্ত কেউ অনুসন্ধান করে দেখেননি। বৌদ্ধ মহাযান বজ্রযান ও তন্ত্রযানের প্রভাবে কত নতুন নতুন বুদ্ধ ও নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা দেশে তার ঠিক নেই। কেবল পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেই এই প্রভাব বিস্তৃত হয়নি, পশ্চিমবঙ্গও যে বৌদ্ধ মহাযান ও তন্ত্রযানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল, বীরভূম বাঁকুড়া হুগলি মেদিনীপুর মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পরিত্যক্ত সব পাথরের মূর্তি দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবদেবীর মূর্তির বৈচিত্র্য ও নির্মাণকুশলতা দেখলে একথাও বোঝা যায় যে, বাংলা দেশে ভাস্কর্যশিল্পের বেশ উন্নতি হয়েছিল।

প্রধানত পাল-রাজাদের আমল থেকেই বাংলার ভাস্কর্যকলার ক্রমোন্নতি হয়। নতুন নতুন দেবদেবীর আবির্ভাবের ফলে এবং অসংখ্য 'সাধন' ও 'ধ্যান' অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণের তাগিদে ভাস্কর্যের উন্নতি হতে থাকে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, বাংলার সেই ভাস্কররা কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তাঁরা, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, উত্তরে পুবে পশ্চিমে, ভাস্কর্যের কোনো স্থানীয় শৈলীর বিকাশ হয়েছিল কি, আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে? একই আর্থিক-সামাজিক পরিবেশে এবং একই ধর্মের প্রেরণায় বাংলার ভাস্কর্যের স্বর্ণযুগের বিকাশ হলেও, তার আঞ্চলিক রীতির প্রকরণভেদ থাকা আশ্চর্য নয়। বাংলার ভাস্কর্যের গৌড়ীয় রীতির অন্যতম সাধনকেন্দ্র ছিল রাঢ়দেশ। বৌদ্ধ মহাযান বজ্রযান তন্ত্রযান ও হিন্দুতন্ত্রের যেখানে প্রবল প্রতিপত্তি ছিল, সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিপূজারও প্রচলন ছিল। মূর্তি গড়ার জন্য ভাস্কররাও ছিলেন এবং ভাস্করপ্রধান গ্রাম ছিল, গ্রাম্য স্টুডিও ছিল। বর্ধমান জেলার দাঁইহাট ও পাতুন গ্রাম তার অন্যতম ঐতিহাসিক সাক্ষী।

দাঁইহাটের ভাস্করদের খ্যাতি কিছুকাল আগে পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল। দাঁইহাটের নবীন ভাস্করের হাতে তৈরি দেবদেবীর মূর্তি বর্ধমান জেলায় আজও অনেক আছে। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল ক্ষীরগ্রামের দশভুজা যোগাদ্যা মূর্তি। দাঁইহাট কাটোয়া মহকুমায়, কাটোয়ার কাছে। পাতুন কালনা মহকুমায়, কালনা-কাটোয়ার প্রায় সীমান্তে বলা চলে। মন্তেশ্বর থেকে দেনুড় যাবার পথে পাতুন গ্রাম। কিংবদন্তী এই মহর্ষি পতঞ্জলি-নানাস্থানে ঘুরে অবশেষে এই পাতুন গ্রামে এসে বসবাস করেন এবং এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করতে থাকেন। গ্রামের নাম তাই 'পাতুন' এবং গ্রামদেবতা শিবের নাম 'পতঞ্জলীশ্বর'। মহর্ষি পতঞ্জলি পাতুন পর্যন্ত আসুন বা নাই আসুন, গ্রামটি যে প্রাচীন তা দেখলে বোঝা যায়। যে মন্দিরটিতে গ্রাম-দেবতা পতঞ্জলীশ্বর থাকেন, সেই মন্দিরটি শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির বলে মনে হয়। পাশেই একটি পুকুর। এই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। মন্তেশ্বর থেকে প্রায় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে আমরা যখন দেনুড় যাচ্ছিলাম (১৯৫৩) বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাটে, তখন পাতুনের লোকজন দৌড়ে এসে এই খবরটা আমাদের দিয়ে গেলেন। ফেরবার পথে আমরা তাই পাতুন দেখার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

পাতুন গ্রামে বড় বড় দেবালয় অথবা দর্শনীয় কীর্তিস্তম্ভ বিশেষ নেই। গ্রামদেবতা ধর্মরাজ এবং পতঞ্জলীশ্বর বা পত্রেশ্বর শিব। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজারী ব্যগ্রক্ষত্রিয়।

কেউ অভিজাত দেবালয়ে বাস করেন না। গ্রামেও আভিজাত্যের চিহ্ন কোথাও নেই। সহজ সরল অনাড়ম্বর গ্রাম পাতুন। পত্রেশ্বরের প্রাচীন মন্দিরটি গ্রামের পাশে মাঠের মধ্যে একাকী নির্বাসিত বলা চলে। তারই পাশে একটি পুকুর। আশপাশের জমির অসমতলতা লক্ষণীয়। এই মৃত্তিকাগর্ভে নাকি অসংখ্য দেবদেবীর পাথরের মূর্তি সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের তাই বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন নয় দেখলাম, মাটিতে কোপ্ দিলেই মূর্তি পাওয়া যায়। এইভাবে শত শত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং মূর্তিগুলি পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে বাইরে স্তূপাকার করে জড়ো করা রয়েছে। অনেক মূর্তি নাকি অনেকে নিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যা মূর্তি এখনও রয়েছে, তাই দিয়েই একটা ছোটখাট মিউজিয়াম তৈরি করা যায় (১৯৫৩)।

পত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে-বাইরে যে-সব পাথরের মূর্তি স্তূপীকৃত করা রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ক. বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি।

খ. অবলোকিতেশ্বর, লোকেশ্বরবিষ্ণু, বিষ্ণু (নানারূপের), সূর্য, গণেশ মূর্তি।

গ. ধর্মরাজের নানাপ্রকারের কূর্মমূর্তি।

ঘ. শিবলিঙ্গ।

মূর্তিগুলি দেখলে মনে হয়, অধিকাংশই পালযুগের শেষে এবং সেনযুগে খোদাই করা হয়েছে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য হল, মূর্তিগুলির আনকোরা নূতনত্ব। অর্থাৎ মূর্তিগুলি কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। পাথরের খণ্ড ঘষামাজা পর্যন্ত হয়নি, দেখলেই বোঝা যায়। পূজা তো হয়ইনি, এমনকি মন্দির বা প্রাসাদ অলঙ্করণের জন্যও ব্যবহার করা হয়নি। অনেক অসম্পূর্ণ মূর্তিও আছে, দেখলে ছেনি-বাটালির ঘা পর্যন্ত চেনা যায়। এছাড়া একই মূর্তির সংখ্যাধিক্য এবং একস্থানে একত্র সমাবেশ থেকে এই কথাই মনে হয় যে পাতুন গ্রাম এককালে ঠিক দাঁইহাটের মতো ভাস্করদের গ্রাম ছিল। যে-সব দেবদেবীর মূর্তির চাহিদা ছিল এ অঞ্চলে, প্রধানত সেই সব মূর্তিই ভাস্কররা তৈরি করতেন। আজ সেই ভাস্করদের বংশ পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গিয়েছে পাতুনে। আর দাঁইহাটে যাঁরা আছেন তাঁরাও বংশগত পেশা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে, ঠিক পটুয়াদের ও অন্যান্য লোকশিল্পীদের মতো। রাঢ়ের ভাস্করদের লুপ্ত কীর্তির সামান্য নিদর্শন পাতুন গ্রামের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। পরিবর্তনের স্রোতে পাতুনের ভাস্করদের সেই স্টুডিও মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ হয়েছে এবং সেই লুপ্ত স্টুডিওর দেবদেবীর মূর্তিই আজ

পাত্রেশ্বর মন্দিরের ভিতরে বাইরে স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। বোবা দেবদেবীর মুখে ভাষা নেই, মূর্তিও খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু তাহলেও এইসব দেবদেবীর ভগ্নস্তূপ থেকে রাঢ়ের সমাজ-জীবন ও ধর্মাচরণের ইতিহাসের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তার মূল্য অসাধারণ। দেবদেবীর সংখ্যা থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়, কার প্রতিপত্তি কত বেশি ছিল। যার প্রতিপত্তি যত বেশি ছিল তাঁর মূর্তিই ভাস্করদের স্টুডিওতে তৈরি হত সবচেয়ে বেশি।

তারা চামুণ্ডা ও মহিষমর্দিনীর মূর্তি ছাড়া পাতুনে অষ্টভুজ ও দশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণু (?) দেখেছি শুনেছি এরকম একাধিক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, কয়েকটি এর মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মূর্তি লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি বলেই মনে হয়। মুর্শিদাবাদের ঘিয়াসাবাদে প্রাপ্ত বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি মূর্তিতে, পাদপীঠে অবলোকিতেশ্বরের অনুগ প্রেত সূচীমুখের প্রতিমূর্তি খোদিত আছে। রাখালদাস এই মূর্তিকে লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি বলেছেন। এই জেলার সাগরদীঘি অঞ্চলে প্রাপ্ত ত্রিভঙ্গ বা অতিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান একটি পিতলের ষড়ভুজ, সপ্ত ত্রিশিব নাগের আচ্ছাদনসহ হৃষীকেশ-বিষ্ণুমূর্তিকে বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সমস্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে এবং একেও 'লোকেশ্বর-বিষ্ণু' বলা হয়েছে।[১]

রাখালদাস বলেছেন, এই লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তিগুলি এমন একসময় তৈরি হয়েছিল যখন প্রাচীন ভাগবত-বৈষ্ণব মূর্তির সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযানী লোকেশ্বরের মিলন-মিশ্রণ ঘটেছিল :

> This particular class of specimens, therefore, indicates a blending of the older Bhagavata class of Vaishnava images and the Lokesvaras of the later Mahayana school of Buddhism. (E. I. S. M. S.,—P. 96).

হরি-হর, শঙ্কর-নারায়ণ, শিব-বিষ্ণু প্রভৃতির মতো লোকেশ্বর-শিব, লোকেশ্বর-বিষ্ণু ইত্যাদি যুগসন্ধিক্ষণের দেবতা। বৈষ্ণব ও শৈবদের সমন্বয়ের জন্য হরি-হর যেমন, মহাযানী বৌদ্ধ ও শৈব, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের সমন্বয়ের জন্য লোকেশ্বর-শিব ও লোকেশ্বর-বিষ্ণুও ঠিক তেমনি। পাতুনের ভাস্কররা লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি তৈরি করতেন যখন, তখন তার স্থানীয় চাহিদা নিশ্চয় ছিল। কোন্ সময় লোকেশ্বর-বিষ্ণু-

১ R. D. Banerjee : Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture, P. 125 : M. Ganguli : Handbook to the Sculptures in Vangiya Sahitya Parisad. P. 120.

মূর্তি নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল? এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অবনতির ফলে তার প্রভাব কমছিল এবং হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান হচ্ছিল। লোকেশ্বর-বিষ্ণু এই যুগসন্ধিক্ষণের দেবতা। পাতুনের একাধিক লোকেশ্বর-বিষ্ণু মূর্তি থেকে বর্ধমান তথা রাঢ় অঞ্চলের এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাস আলোকিত হয়ে ওঠে।

পাতুনের দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হল শিবলিঙ্গের ও কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ ঠাকুরের মূর্তি। ধর্মরাজের এত বিচিত্র কূর্মমূর্তি একত্রে আর কোথাও দেখিনি। ছোটবড নানাআকারের শতাধিক কূর্মমূর্তি পাতুনে স্তূপাকার করা রয়েছে, আর তার সঙ্গে আছে শিবলিঙ্গ। পরিষ্কার বোঝা যায়, ধর্মঠাকুর ও শিব হলেন এই অঞ্চলের বা রাঢ়ের গ্রামদেবতা ও লোকদেবতা। পাতুনের ভাস্করদের স্টুডিওতে তাই এই দুই দেবতার মূর্তি সবচেয়ে বেশি তৈরি হত। বিশাল কাছিমের মতো কূর্মমূর্তিও অনেক আছে। এই সব বিচিত্র কূর্মমূর্তি দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর কূর্মমূর্তিতেই পূজিত হতেন। কূর্মের সঙ্গে ধর্মঠাকুরেব সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ও অবিচ্ছেদ্য। পাতুনের স্তূপীকৃত কূর্মমূর্তিব সামনে দাঁড়িয়ে এছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নয়। পরে ধর্মঠাকুর কেবল শিলাখণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছেন ভাস্কর্যের অবনতির জন্য। অনেক স্থানে ধর্মঠাকুব শিবে পবিণত হয়েছেন। পাতুনের শিবলিঙ্গের প্রাচুর্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধ্বংসস্তূপ ও অসম্পূর্ণ ভগ্ন মূর্তির দিকে চেয়ে মনে হয় যেন পাতুনের ভাস্কবদেব স্টুডিওর চারভাগের তিনভাগ জুড়ে ছিল কূর্মমূর্তি ধর্মরাজ ও শিবলিঙ্গ। ধর্মরাজ যে কূর্মমূর্তি ছেড়ে ক্রমে শিবলিঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছেন, তারও যেন একটা আভাস পাওয়া যায় পাতুনে।

দাঁইহাটের নবীন ভাস্কর

১৩১২-১৩ সনে, আজ থেকে ৭০ বছর আগে, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঢ়ভ্রমণ করেছিলেন। সেইসময় দাঁইহাটের যে দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন এবং নবীন ভাস্করের (তখন জীবিত) সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা উদ্ধৃত করা হল। পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

"ক্রমে আমরা প্রসিদ্ধ দাঁইহাটের সমীপবর্তী দেওয়ানগঞ্জের ষষ্ঠীতলায় উপস্থিত হইলাম। বৃক্ষমূলে সিন্দুরমণ্ডিত ও ফুলবিল্বদল বিভূষিত কয়েকটি দেবমূর্তি দেখিয়া আমি গাড়ী (গরুর গাড়ি—বি) হইতে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম তন্মধ্যে দুইটি মূর্তি·· চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির সহিত অভিন্ন। একটি ব্রহ্মামূর্তি এবং অন্যান্য কতকগুলি

ভগ্নপ্রায় মূর্তিও সে স্থানে রহিয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা দাঁইহাট আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলা ১১টা। চতুর্দিকে পিত্তলকাঁসার কার্যালয়ে হাতুড়ির শব্দ শুনিয়া আমার মনে দাঁইহাটের পূর্ব সমৃদ্ধির কথা জাগরূক হইয়া উঠিল। পূর্বে দাঁইহাট গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, এক্ষণে গঙ্গাস্রোত দাঁইহাট হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে মেটেরীর নিম্নে সরিয়া গিয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য কিম্বা দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে মেটেরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু দাঁইহাটের কোন উল্লেখ নাই। পূর্বে দাঁইহাট গঙ্গাতীরে একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল, অদ্যাপি এখানে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

"ক্রমে আমরা বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী শ্রীনবীনচন্দ্র ভাস্কর মহাশয়ের কারখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি পশ্চিমভারতের নানাস্থানে প্রস্তরশিল্পের শিল্পশালা দেখিয়াছি—কিন্তু বঙ্গভূমিতে আজি এই প্রস্তরশিল্পের কারখানা দেখিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম।...জেমো স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় শ্রীযুক্ত নবীন ভাস্করের নামে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি পত্রখানি বাহির করিয়া নবীনবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় কারখানার অধ্যক্ষ নবীনবাবুর যোগ্য পুত্র যোগেন্দ্রবাবু আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গেলেন। নবীনবাবু পত্রপাঠপূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী সিধা উপস্থিত হইল। আমাদের ইচ্ছা ছিল সেদিন রন্ধনের গোলযোগে না যাইয়া, জলযোগ করিয়া দিন কাটাইব। কিন্তু নবীনবাবুর নির্বন্ধাতিশয় রহিত করিতে পারিলাম না।...রন্ধনান্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আমি নবীনবাবুকে লইয়া তথ্য সংগ্রহ কবিতে লাগিলাম। উপেন্দ্রবাবু (ভ্রমণসঙ্গী—বি) নিদ্রিত হইলেন। হরেকৃষ্ণ গরু দুইটিকে খাওয়াইতে প্রবৃত্ত হইল।

"নবীনবাবু বলিলেন যে, তাঁহাদের বংশে ঊর্ধ্বতন ১৬ পুরুষে অনেক প্রসিদ্ধ ভাস্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কীর্তিনিদর্শন অদ্যাপি বঙ্গের নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। তাঁহারা ২০০ বৎসর দাঁইহাটে বাস করিতেছেন। তদবধি তাঁহাদের প্রস্তরশিল্পের কারখানায় বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হইয়া বঙ্গদেশের বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

"সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, বহুদর্শী, বিচক্ষণ নবীনচন্দ্র বলিলেন—'মহাশয়, বোধ হয়, এতদিনের সাধের কারখানা বুঝি বন্ধ করিতে হয়। দেবদেবীও বিলাত হইতে আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। সুলভে বিলাতী দেবমূর্তি পাইলে লোকে বেশী মূল্যে আমাদের নির্মিত মূর্তি গ্রহণ করিবে কেন?' আমি কহিলাম,—'সেকালে ঠাকুর প্রতিষ্ঠার

যুগে বিগ্রহশিল্পের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, বর্তমান কুক্কুর প্রতিষ্ঠার যুগে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে।' নবীনবাবু বলিলেন যে, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বর্ধমান, নাটোর, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের রাজবংশের দেবমূর্তি গঠন করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ নবীনচন্দ্রের প্রস্তরশিল্পের নৈপুণ্য কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন। যাঁহারা বিগত শিল্পপ্রদর্শনীতে তাঁহার বালগোপাল মূর্তি পরিদর্শন করিয়াছেন—তাঁহারাই বলিবেন—বিগ্রহশিল্পে নবীনচন্দ্র জয়পুরের শিল্পিগণ অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট!

"এতদ্ভিন্ন ক্ষীবগ্রামের যুগাদ্যা দেবীর অপূর্ব মূর্তি নবীনচন্দ্রেব নির্মিত। ·· সিউড়ীর দক্ষিণারঞ্জন বাবুদিগের এবং জেমোর রাজবাটীতে স্থাপিত কালীমূর্তি, মুক্তাগাছার রানী বিদ্যাময়ী ও আনন্দময়ী দেবী কর্তৃক কাশীতে প্রতিষ্ঠিতা কালী মূর্তি, বর্ধমান রাজবাটীর গোপালজী ও কালীমূর্তি, মহারানী স্বর্ণময়ীর সৈদাবাদ বাটীস্থ রাধামাধবজী মূর্তি, ময়মনসিংহ শ্রীধরপুবের বাল-গোপাল মূর্তি, এবং মহামায়া দেবী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথজী মূর্তি, নাটোর রাজবাড়ীর আনন্দকালী ও বিবিধ বিগ্রহ, নাটোরে সারদাগুরুবাটীব মহাকালী প্রতিমূর্তি, মণিপুর রাজবাটীর কালীমূর্তি—বঙ্গের অদ্বিতীয় প্রস্তরশিল্পী নবীন ভাস্করের হস্তপ্রসূত। দিনাজপুবেব মহারানী শ্যামমোহিনী নবীন ভাস্করের নির্মিত কৃষ্ণেব কালীয়দমন মূর্তিব শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে বিমুগ্ধচিত্তে নবীনচন্দ্রকে সোনার বাঁটালি পুরস্কাব দিয়াছিলেন।

"প্রস্তবশিল্প ভিন্ন ধাতুময়ী দেবী মূর্তিগঠনেও নবীনচন্দ্রের অদ্ভুত দক্ষতা দেখিলাম। নবীনচন্দ্রের সমস্ত পরিচয় এই ক্ষুদ্র বিবরণে সম্ভব হয় না। আমি বলিলাম 'আপনি বর্তমান রুচিকর মানুষেব মূর্তি গঠন করেন না কেন?' সগর্বে নবীনচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'মহাশয় যে হস্তে দেবতা গড়িয়াছি, সেই হস্তে বা-নর গড়িব? আমাকে এরূপ অপমানের কথা বলিবেন না।' আমি ইহা শুনিয়া নবীনচন্দ্রকে ধন্যবাদ করায় নবীনচন্দ্র অশ্রুসিক্ত নয়নে আমার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল আমার সহিত নবীনচন্দ্রের নানা প্রসঙ্গে কথোপকথন হইল।" (১২ ফাল্গুন, ১৩১৩, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৪ সাল)।

নতুনগ্রাম

১৯৫০-এর দশকে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনকালে নতুনগ্রাম যাইনি। তখন নতুন গ্রামের খ্যাতিও ছিল না। ১৯৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে নতুনগ্রামে যাই, প্রধানত 'অল-ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস বোর্ডে'র জন্য পশ্চিমবাংলার লোকশিল্পীদের সম্বন্ধে

একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষার কাজে। পাটুলি থেকে নতুনগ্রাম ঘুরে কাটোয়া যাওয়া যায়। নতুনগ্রাম খুব সাধারণ একটি গ্রাম এবং গ্রামের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের কালো দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। পনের-ষোল ঘর (পরিবার) সূত্রধরশিল্পী (wood-carver) এই গ্রামে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে শম্ভু সূত্রধর 'জাতীয় পুরস্কার' (National Award) পাওয়ার ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে, যেমন হয়েছে বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ো গ্রামের রাসবিহারী কুম্ভকারের। শম্ভুর খোদিত কাঠের মহিষমর্দিনী মূর্তি খুবই সুন্দর। ও'র মাসিক আয় ২০০।২৫০ টাকার মতো, গড়ে ২০০ টাকা। বাকি সূত্রধরদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। তাঁরা সাধারণত লক্ষ্মীপেঁচা ও গৌরাঙ্গের মূর্তি তৈরি করেন, এবং মূর্তির জন্য পিটুলি আমড়া শিমুল আর ছাতিম কাঠ ব্যাবহার করা হয়। রাম সীতা মহাদেব লক্ষ্মীর পুতুলও তাঁরা গড়েন। পুজোর সময় ও রাসের মেলায় এই সব কাঠের পুতুল ও মূর্তি বিক্রি হয়। পাইকাররা ৮ থেকে ১০ টাকায় একশো পুতুল কিনে নিয়ে যায়।

সূত্রধরদের উপাধি কুণ্ডু কর খাঁ পাল ভাস্কর প্রভৃতি। দাঁইহাটের ভাস্করদের সঙ্গে এঁদের আত্মীয়তা আছে। শম্ভুর পিসেমশায়ের পিতা দাঁইহাটের বিখ্যাত নবীন ভাস্কর। গ্রামে রক্ষাকালীর বেদী আছে, মনসতলা আছে। চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন হয়, কিন্তু সন্ন্যাসী হয় না কেউ। শ্রাবণসংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী-পূজা হয়। রক্ষাকালীর কৃপায় সূত্রধররা কোনরকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছেন এই মাত্র।

দাঁইহাট

১৯৫২-৫৩ সালে দাঁইহাট গিয়েছি, আবার ১৯৬৯ সালে যাই। সতের-আঠার বছরের মধ্যে দাঁইহাটের কোনো পরিবর্তন হয়নি, কেবল কিছু প্লাস্টিকের জিনিস-পত্তরের আমদানি এবং লক্ষ্যহীন ভ্রাম্যমাণ তরুণের সংখ্যা বেড়েছে। নবীন ভাস্করের প্রপৌত্র শৈলেন ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাতে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললাম। দাঁই-হাটের ভাস্কররা লাহোর থেকে বাংলা দেশে আসেন। ২৫০-৩০০ বছর আগে (অর্থাৎ আট-দশ পুরুষ আগে) বর্ধমানের রাজারা তাঁদের নিয়ে আসেন, পাথরের মূর্তি গড়ার কাজের জন্য। দেবদেবীর মূর্তি, তার সঙ্গে রাজাদের মূর্তিও। কৃপারাম সভারাম খেলারাম গোলকরাম থেকে রামধন ভাস্কর প্রায় ৮০ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে মারা যান। নবীন ভাস্করের তিন পুত্র যোগেন্দ্রনাথ আনন্দগোপাল বিজয়-গোপাল। এঁরা সকলেই ভাস্করের কাজ করেছেন। এবং এঁদের তৈরি দেবদেবীর মূর্তি অনেক মন্দিরে আছে। যোগেন্দ্রনাথের পৌত্র শৈলেন ভাস্কর বর্তমানে ভাস্করের

কাজ করেন। অন্যান্য বংশধরদের অনেকে শিল্পীর কাজ ছেড়ে অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। কেউ জুয়েলার, কেউ দরজি, কেউ রেলে, কয়লাখনিতে কাজ করেন। কমবেশি তিনশো ভাস্কর-পরিবারের বাস ছিল একদা দাঁইহাটে। বর্তমানে তাঁদের বংশধররা অধিকাংশই চাকরিজীবী।

শৈলেন ভাস্কর পিতা-পুত্র মিলে কাজ করে মাসে ৩০০ টাকার মতো কোনরকমে রোজগার করেন। তাতে সংসার চালানোই বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এবং স্টুডিওর কাজকর্ম করার জন্য পাথর কেনারও টাকা থাকে না। বালেশ্বর চ্যাণ্ডেল-মাকড়ানার পাথর, দামও এখন বেশি। কালীঘাট ও চিৎপুরের দোকানদারদের জন্য কৃষ্ণ কালী গৌর নিতাই রাধা ইত্যাদির মূর্তি তাঁরা নির্মাণ করেন। চাহিদা বিশেষ নেই, কারণ দাম বেশি পড়ে। খুব ছোট মূর্তি তৈরি করলে মেহনত পোষায় না। নতুন-গ্রামের শম্ভু সূত্রধরও এই কথা বলেছিলেন, যখন তাঁকে বলেছিলাম কাঠের ছোট মহিষমর্দিনী মূর্তি করতে। একটি ১৪ ইঞ্চি উঁচু কাঠের মহিষমর্দিনী মূর্তি আমি কিনেছিলাম, শম্ভু সূত্রধরের তৈরি (১৯৭০ সালে), ৪৫ টাকা মূল্যে। এখন আরও বেশি দাম হবে। বড় মূর্তির চেয়ে ছোট মূর্তি তৈরি করতে অনেক সময় বেশি মেহনত করতে হয়, অথচ তার মজুরির মূল্য পাওয়া যায় না। শৈলেন ভাস্করও তাই বললেন। মূর্তির মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় তার একটা হিসেব তিনি এইভাবে করে দিলেন (১৯৬৯):

৯ ইঞ্চি একটি রাধামূর্তি

পাথর কাটতে লাগে ৮ দিন। রং পালিশ করতে ৪ দিন

শেষ পালিশ অঙ্গরাগ ১ দিন। মোট ১৩ দিন

বালেশ্বরের কষ্টিপাথর ২৫-৩০ সের একটি খণ্ড : মূল্য ৩৫ টাকা

১৩ দিনের মজুরি, ৮ টাকা হিসাবে : ১০৪ টাকা

শ্রীরাধার নয় ইঞ্চি মূর্তির মোট মূল্য হয় : ১৩৯ টাকা।

এই হিসেব থেকে একজন ভাস্কর মাসে কত আয় করতে পারেন জানা যায়। ১৩ দিন খেটে ১০৪ টাকা মজুরি। তার থেকে রং-পালিশের দাম বাদ দিলে ৯০ টাকার মতো হয়। অর্থাৎ মাসে ১৮০ থেকে ২০০ টাকা, যদি প্রতি মাসে নয় ইঞ্চির দুটি মূর্তি তৈরি করা যায়। দাঁইহাটের ভাস্করদের পক্ষে তাও বর্তমানে করা সম্ভব হয় না। কাজেই তাঁদের ভাস্কর্যের পুনর্জীবনলাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।

কাটোয়া । বাঁধমুড়া । সিঙ্গি

নবদ্বীপের নিমাই সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নিলে গঙ্গাতীরের কাটোয়া নগবটিকে নিমাই-জননী নাকি মনের দুঃখে 'কণ্টকনগর' বলেছিলেন। সেই কণ্টকনগর থেকে 'কাটোয়া' নাম হয়েছে। কেউ বলেন, কাঁটাদিয়া বা কাঁটাদ্বীপ থেকে কাটোয়া নামেব উৎপত্তি। নবদ্বীপ অগ্রদ্বীপ কুশদ্বীপ যেমন, সেইরকম কণ্টকদ্বীপ থেকে কাঁটাদ্বীপ—কাটোয়া হওয়া অসম্ভব নয়। দ্বীপ দহ দিয়ে গঙ্গাতীরে একাধিক গ্রামের নাম আছে। এরকম কোনো অরণ্যময় কণ্টকাকীর্ণ দ্বীপ ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় বিশ্বম্ভরকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়ে 'শ্রীচৈতন্যে' রূপান্তরিত করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তারই নাম কাটোয়া।

চৈতন্যপূর্ব যুগের কাটোয়ার সঠিক ইতিহাস জানা কঠিন। বখ্‌তিয়ার যখন অতর্কিতে নদীয়া আক্রমণ করে লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন, তখন কোন্ পথ দিয়ে তিনি অভিযান করেছিলেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে বর্ধমানের দক্ষিণ পর্যন্ত যে গৌড়েশ্বরের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, কুলীনগ্রামের শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ) উক্তি থেকে তা জানা যায়। তার আগে মুসলমানযুগের বাকি দু'শো বছরের ইতিহাস ভাগীরথীর ধারা ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। উত্তর-রাঢ়ের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে মুসলমান-আধিপত্য ও মুসলিম সংস্কৃতির চিহ্ন দেখে তা বোঝা যায়। পরবর্তীকালে কাটোয়া মুর্শিদাবাদের 'দ্বার' বলে গণ্য হয়েছে। তার আগেও কাটোয়ার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব যাই থাক, ভৌগোলিক গুরুত্ব অবশ্যই ছিল। সুতরাং মুসলমান আমলের গোড়া থেকেই মনে হয় এই অঞ্চলের অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতো কাটোয়াতেও মুসলমানদের আধিপত্য বাড়ে। আধিপত্য মানে সর্বক্ষেত্রে

সংখ্যাধিক্য নয়, ইসলামের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে, প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অর্থাৎ গাজীসাহেবদের জেহাদ চলতে থাকে সোৎসাহে। বিশেষ করে মঙ্গলকোট ও কালনা যখন কাটোয়া থেকে বেশি দূর নয়, তখন মনে হয় না যে গাজীসাহেবদের প্রভাব থেকে কাটোয়া মুক্ত ছিল। গ্রামের অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক, ছন্নছাড়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকরা ধর্মান্তরিত যে হয়েছিল তাতেও সন্দেহের অবকাশ কম। 'ধর্মরাজ' ঠাকুর তখন একবার সমাজটাকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কাটোয়াতে এখনও 'ধর্মরাজ' আছেন। বৃন্দাবনদাস যাদের 'পাষণ্ড' বলেছেন, তারাও যে কাটোয়াতে একেবারে ছিল না তা নয়। অর্থাৎ তান্ত্রিক উপাসকের সংখ্যাও কম ছিল না কাটোয়াতে। আজও কাটোয়ায় শক্তিপূজা মহাসমারোহেই অনুষ্ঠিত হয়। চৈতন্যপূর্ব নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক পরিবেশ কাটোয়া শ্রীখণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলেও ছিল বলে মনে হয়। মদ্য-মাংস দিয়ে যারা দেবদেবীর পূজা করে, তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল লোকসমাজে।

চৈতন্যযুগের গোড়া থেকে, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সংঘাতের পর্ব শেষ না হলেও, সমন্বয় যে শুরু হয়েছিল তা বোঝা যায়। কাজীর ঐতিহাসিক উক্তি তার অকাট্য প্রমাণ। নগরকীর্তনের দল যখন নবদ্বীপের কাজীর বাড়ি চড়াও হল, তখন কাজী ঘরে পালিয়ে যান। তারপর ফিরে এসে কাজী সাহেব শ্রীচৈতন্যকে বলেন :

> গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
> তেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা॥
> নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
> সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥
> ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
> মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়॥
>
> —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদি

"তেহ সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা"—কাজীর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমীকরণের কাজ তখন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। নবদ্বীপে যখন হয়েছিল, তখন কাটোয়াতেও মনে হয় একটা সাম্প্রদায়িক উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাকালে। কারণ শ্রীচৈতন্য ইসলাম-ধর্মের আশঙ্কা যতটা প্রকাশ করেননি, এমনকি তাঁর চরিতকাররা পর্যন্ত, তার চেয়ে

অনেক বেশি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন ধর্মাচরণের নামে হিন্দুধর্মের ব্যভিচার সম্বন্ধে। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ প্রসঙ্গে কথাটা গুরুত্বব্যঞ্জক মনে হয় এবং কাটোয়া প্রসঙ্গে সেইজন্যই বিষয়টির অবতারণা করা হল। কেন শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করেছিলেন ?

সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ সঠিক জানা যায় না। চরিতকারদের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যা বলেছেন তা থেকে মনে হয়, ধর্মসংস্কারই তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ধর্মের আচারের নামে যে ব্যভিচার চলছিল সমাজে, তাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন চৈতন্য। শ্রীচৈতন্যচারতামৃতে তাঁর নিজের উক্তিটি লক্ষণীয় :

যত অধ্যাপক আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্মী ধর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন ॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি হইল বিপরীত।
এ সব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥...
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসীর বুদ্ধে মোর প্রণত হইব ॥...
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইতে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি এই যুক্তি সার ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদি—১৭অ

সার্বভৌম, আগমবাগীশ প্রভৃতি বৈদান্তিক, তান্ত্রিক ও অন্যান্য আচার্যরা নবদ্বীপে যে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে বিশ্বম্ভরের ভক্তির আলোড়ন এবং প্রচারের জন্য কীর্তনের 'মাধ্যম' অত্যন্ত বেমানান মনে হচ্ছিল। তাঁদের কাছে ব্যাপারটা খুব প্রীতিকরও মনে হচ্ছিল না। টোলের পড়ুয়ারা পর্যন্ত এই কীর্তনীয়াদলের নিন্দা করত—"তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়, যাঁহা তাঁহা প্রভুর 'নিন্দা হাসি সে করয়।" এই বিরোধিতা দূর করার জন্যই বিশ্বম্ভর সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন মনস্থ করেন এবং কাটোয়াতে কেশবভারতীর কাছে এসে দীক্ষা নেন :

এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা ॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ চন্দ্রশেখর আচার্য।
মুকুন্দ দত্ত এই তিন করিল সর্বকার্য॥
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগন।
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত: আদি, ১৭ অ

বৃন্দাবনদাস 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' সন্ন্যাসগ্রহণের আরও বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, গঙ্গা পার হয়ে শ্রীচৈতন্য কণ্টকনগরে এলেন। আগে থেকে তিনি যাঁদের জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এসে একে-একে মিলিত হন কাটোয়ায়। তাঁদের বৃন্দাবনদাস নাম করেছেন অবধূতচন্দ্র বা নিত্যানন্দের, গদাধর মুকুন্দ চন্দ্রশেখর ও ব্রহ্মানন্দের। সন্ন্যাসগ্রহণের পর কেশবভারতী তাঁর নাম দিলেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', যা থেকে বিশ্বম্ভর 'চৈতন্য' নামে পরিচিত হলেন। "এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সর্বলোকে তোমা হইতে ধন্য।" সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্য মাত্র একরাত্রি বাস করেন। সারারাত্রি ধরে কাটোয়ায় তিনি কীর্তন করেন:

করিযা সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টকনগর॥
করিলেন প্রভু মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিকে গাইতে লাগিল সব ভৃত্য॥…
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥…

পরদিন সকালে শ্রীচৈতন্য তাঁর গুরুকে বলেন—"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্বথা। প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র মুঞি পাঙ যথা॥" গুরু কেশবভারতীও তাঁর সঙ্গী হতে চান। তারপর "অগ্রে গুরু করিণা চলিলা প্রভু বনে।"

কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সিংদরজা দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে শ্রীচৈতন্যের মস্তকমুণ্ডনের স্থানটি চিহ্নিত রয়েছে দেখা যায়। তার পাশে ভিতরে রয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রকাশের ও সন্ন্যাসগ্রহণের স্থান।' মধু পরামাণিকের সমাধিও আছে সেখানে। ঠিক তারই সংলগ্ন কেশবভারতীর সমাধি বা সমাজ। দাস গদাধরের সমাধিও রয়েছে দরজার সামনে। সন্ন্যাসগ্রহণের স্থানে মধুর সমাধি ছাড়া, চৈতন্যের দীক্ষার আসন ও

শুরুশিষ্যের পদচিহ্নও আছে। দীক্ষাস্থানের কাছে কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইতদের সমাধি। বাড়ির ভিতরে আছে দাস গদাধর প্রতিষ্ঠিত এবং শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার কল্পিত গৌরাঙ্গমূর্তি। পাশে নিত্যানন্দের মূর্তিও পরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রীখণ্ডের তিনটি গৌরাঙ্গমূর্তি নরহরি সরকার ঠাকুর তৈরি করিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তিটি তিনি দাস গদাধরকে দিয়ে কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তিটি দেখবার মতো। কাটোয়ার মূর্তিটি শ্রীখণ্ডের মূর্তিরই বর্ধিত এবং ভাবপ্রধান রূপ।

দাস গদাধর তাঁর প্রিয় শিষ্য যদুনন্দন ঠাকুরকেই কাটোয়ার গৌরাঙ্গসেবার ভার দিয়ে যান। এই যদুনন্দন ঠাকুরের বংশধর রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণরাই কাটোয়ার গৌরাঙ্গবাড়ির সেবাইত। ভক্তদের ভেট নিয়ে গৌরাঙ্গের সেবা চলে, কোনো দেবোত্তর সম্পত্তিতে চলে না। গৌরাঙ্গবাড়ি ছাড়িয়ে কিছুদূরে গঙ্গা-অজয় সঙ্গম। সঙ্গম ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে গৌরাঙ্গঘাট ছিল, এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন। কাটোয়া থেকে প্রায় একমাইল দূরে, দাঁইহাটের পথে মাধাইতলা। পথ চলতে 'ঘোষেশ্বর শিব' এখনও তাঁর রীতিমত প্রতিপত্তি ঘোষণা করছেন।

ধর্মরাজ আছেন, ঘোষেশ্বর শিব আছেন এবং কালীও আছেন কাটোয়ায়। শ্রীচৈতন্য যাঁদের উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করতে এসেছিলেন কাটোয়ায়, সেই 'পাষণ্ডদে'র প্রতাপ তখনকার কাটোয়া গ্রামেও যথেষ্ট ছিল। সন্ন্যাসগ্রহণকালে তিনি মাত্র একরাত্রি বাস করেছিলেন কাটোয়ায় এবং সেই রাত্রি কীর্তনগান ও নৃত্য করেই কাটিয়েছিলেন। গৌরাঙ্গবাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, "চব্বিশ বৎসর শেষ সেই মাঘ মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস"। অর্থাৎ জানুয়ারি ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সেই রাত্রিটি কেমনভাবে কেটেছিল তাঁর? আজ থেকে প্রায় সাড়ে-চারশো বছর আগেকার একরাতের কথা মনে পড়ছিল আষাঢ়ের এক দ্বিপ্রহরে। তখনও রাঢ়দেশে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য আরম্ভ হয়নি। সন্ন্যাসের পর পায়ে হেঁটে বৃন্দাবন যাত্রার পথে তিনি যে তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণ করেছিলেন—"সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন, রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ"—তখনই বা ভিন্নধর্মীরা তাঁর যাত্রাপথে কিরকম ব্যবহার করেছিল, জানতে ইচ্ছা হয়। নবদ্বীপের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারাই যদি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে থাকেন—"প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হইল নাশ, সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ"—তাহলে কাটোয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তদানীন্তন অশিক্ষিত ভিন্নধর্মাচারী (বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং ধর্ম চণ্ডী ইত্যাদির উপাসক) জনসাধারণ খুব যে

মার্জিত ব্যবহার করেছিল তা মনে হয় না। কাটোয়া-দাঁইহাটের পথে 'ঘোষেশ্বর শিব' ছাড়াও পাতাইহাটে পাতাইচণ্ডী, একাইহাটে একাইচণ্ডী প্রভৃতির এবং আশপাশের গ্রামে ধর্মরাজের এখনও যে প্রতিপত্তি আছে তা দেখলে বৃন্দাবনদাসের সামাজিক চিত্রটি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে :

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
বামাচারী সন্ন্যাসী মদ্যপান করে।
দেবতা জানেন সভে চণ্ডী বিষহরি।
তাও যে পূজেন সেহো মহাদম্ভ করি॥
ধনবংশ বাঢ়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংস দানব পুজয়ে কোন জনে॥

এই যখন রাঢ়দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, শ্রীচৈতন্য তখন কাটোয়ায় সন্ন্যাস নিয়ে নতুন ধর্মপ্রবর্তনের জন্য গৃহত্যাগী হন। "বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইল সকল সংসার" যখন, তখন নি[illegible] ভক্তির বন্যায় ব্যভিচারের আবর্জনা ভাসিয়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সন্ন্যাস ও সঙ্কল্প গ্রহণের ঐতিহাসিক স্থান কাটোয়া, কেবল তীর্থস্থান নয়।

মনেহয় ষোড়শ শতাব্দীতে হুসেনশাহের আমল থেকেই কাটোয়া শ্রীখণ্ড নৈহাটি ঝামটপুর অঞ্চল উত্তররাঢ়ের অন্যতম সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা নবাবের দরবারে আধিপত্য বিস্তার করে দেশীয় সমাজেও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। এই নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তির ফলে তাঁরা অনেকেই চৈতন্যপ্রবর্তিত বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রধান ধারকবাহক হন। তাঁরা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলার বণিক-সম্প্রদায়ের বেশ আধিপত্য ছিল। বর্ধমান হুগলি প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরলে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই উপেক্ষিত অধ্যায়ের অজস্র নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কাটোয়াতেও তার অভাব নেই। গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদের বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতীকস্বরূপ বড় বড় অট্টালিকা আজও কাটোয়ায় বিরাজ করছে। বণিকরাও বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বণিকদের বৈষ্ণবধর্মের পোষকতার কথা নিত্যানন্দের ধর্মপ্রচারের কাহিনী থেকেই জানা যায়। ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে নিত্যানন্দ বণিকদের ঘরে ঘরে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন। বৃন্দাবনদাস তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

উত্তররাঢ়ে কাটোয়ার বণিকরা ভিন্নধর্ম আচরণ করতেন বলে মনে হয় না। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পর তাঁরাও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর পর প্রায় দুশো বছর কাটোয়া অঞ্চলের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বিশেষ জানা যায় না। এইসময় এখানকার প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ ও বণিকদের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য চলতে থাকে বলে মনে হয়। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘাতও হত বলে অনুমান করা যায়। বৈষ্ণবধর্মের পোষকদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তিই হয়ত সাধারণ লোকের মনে সন্দেহের ইন্ধন যোগাত বেশি এবং প্রচলিত শৈব তান্ত্রিক প্রভৃতি লোকধর্মের সঙ্গে তার সংঘাতের অন্যতম কারণও সেটা হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রায় দুশো বছর পরে, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে কাটোয়াকে আর-এক নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এবারে শ্রীচৈতন্য নন, মারাঠা বীর ভাস্কর পণ্ডিত, শঠচূড়ামণি ক্লাইভ ও তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা কাটোয়ার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন একে-একে। শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁরা কেউ নতুন মানবতার ধর্মপ্রচারের জন্য আসেননি। ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে তাঁরা এসেছিলেন, সোনার বাংলার 'মগের মুল্লুকে' লুটতরাজ করতে। বাংলার সৌভাগ্য-সূর্য অস্ত গেছে ভাগীরথীর পশ্চিমে কাটোয়ায, তারপব পুবে পলাশীব মাঠে সন্ধ্যার কালো অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেলেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়াতে বাংলার ভাগ্যবিধাতা ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। 'মুর্শিদাবাদ' যখন তাঁরই নামে নতুন রাজধানী হয়ে ওঠে, তখন কাটোয়ার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁর দূরদৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে। এই সময় সম্রাট ফররুখ-শায়র যখন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন তখন ১৭১৩ সালে, সৈয়দ শাহ আলম খাঁ নামে জহান্দার শাহ বাদশাহের জনৈক উজীব দিল্লীতে বাস করা নিরাপদ নয় মনে করে, নানাদেশ ঘুরে ঘুরে শেষে কাটোয়ায় আসেন। বাকি জীবন ধর্মসাধনা করে কাটাবেন মনস্থ করে, তিনি কাটোয়ার একদিকে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতবাড়ি ও একটি মসজিদ তৈরি করেন। মসজিদের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি সম্রাটের কাছ থেকে প্রায় ১৭,০০০ টাকা মুনাফার নিষ্কর সম্পত্তি পান। শাহ আলম খাঁ নিজে বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং শোনা যায় ২৫০ জন জোয়ান মর্দ সঙ্গে করে কাটোয়া এসেছিলেন। তিনি যে বর্মটি পরতেন সেটা নাকি সাড়ে তিন মণ লোহা দিয়ে তৈরি ছিল। তাঁরই এক বংশধর সফিউর রহমান সেটি কাটোয়ার এক কর্মকারের কাছে বিক্রি করে দেন এবং কর্মকার তাই দিয়ে ছুরি কাঁচি দা কুড়ুল তৈরি করে বেচে ফেলে নিশ্চিন্ত হন। কাটোয়ায় শাহ আলম খাঁর তৈরি এই মসজিদটি আছে। তাছাড়া তাঁর নিজের ও তাঁর বংশধরদের সমাধিও আছে। তাঁরই বাস্তুভিটেয় তাঁর বর্তমান বংশধর ও মুতঅল্লি

সৈয়দ মহম্মদ খোদা হাফিজ নতুন বাড়ি ও সুন্দর ফুলবাগান তৈরি করেছেন। শাহ আলমের তৈরি পুরনো সিংদরজাটি এখনও আছে এবং তাঁর মসজিদ ও গৃহের চারিদিকে গড়খাইয়ের অস্তিত্ব আজও পরিষ্কার দেখা যায় (১৯৫২-৫৩)।[১] শাহ আলম খাঁ তাঁর সাধনার স্থান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিলেন শোনা যায়। গঙ্গার তীরে শানবাঁধানো ঘাটও তিনি করে দিয়েছিলেন স্নানার্থীদের জন্য।

শাহ আলম খাঁর নিভৃতে ধর্মসাধনার এই ইতিবৃত্তটি কৌতূহলজনক। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের স্থানে শাহ আলম খাঁও বৈরাগ্যসাধনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, কাটোয়ার ইতিহাসে তা বেমানান মনে হয় না। কিন্তু সমস্ত সাধনার নির্লিপ্ত পরিবেশ বর্গীদের রণহুংকারে কেঁপে উঠল কাটোয়ায় এবং ইংরেজরা তার পরে দীর্ঘস্থায়ী বিভীষিকার পর্দা উন্মোচন করলেন। বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ায় খোল-করতালের ধ্বনি কিছুকালের জন্য বোধহয় স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৭৪২ সালে বর্গীদের অভিযান আরম্ভ হয় বাংলায় আর বাংলার যত দুরন্ত ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বিব্রত মায়েরা ঘুম পাড়িয়ে ফেলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ আরামবাগের 'মুবারক মঞ্জিল' থেকে খবর পেয়ে ছুটে আসেন লোকলস্কর নিয়ে, কিন্তু বর্ধমান শহরে ঘেরাও হয়ে থাকেন। বর্ধমান থেকে কাটোয়া আসার পথে নিগনে বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ হল। ১৭৪২ সালের ২৬ এপ্রিল আলিবর্দি খাঁ কাটোয়া পৌঁছন। প্রত্যক্ষদর্শী কবি গঙ্গারাম তাঁর 'মহারাষ্ট্রপুরাণে' লিখিছেন:

> ঘেরাও হইতে নবাব আইল কাটঞাতে।
> শুনিয়া ভাস্কর তবে লাগিল ভাবিতে॥
> ছি ছি ছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
> এতদিন বৃথা আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥

১৭৪২ সালের জুন মাস থেকে কাটোয়ায় বর্গীরা ঘাঁটি করে বসে। মীরহবিব তাদের পরামর্শদাতা ও এজেন্টের কাজ করেন। এই সময় ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী অঞ্চল মারাঠা দস্যুদের অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। নবাবী শাসন কিছুদিনের জন্য লোপ পেয়ে যায়, বর্গীর শাসন চলতে থাকে। সলিমুল্লাহ তাঁর 'তারিখ-ই-বঙ্গাল' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই সময় গঙ্গার পশ্চিমতীর থেকে অনেক বনেদী পরিবার ও গণ্যমান্য

১ ১৯১৭ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে, ১৩ খণ্ড, ৩নং—শাহ আলম খাঁর মসজিদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

লোক পালিয়ে আসেন গঙ্গার পূর্বতীরে বসবাসের জন্য। সলিমুল্লাহের কথা মিথ্যা নয়। 'মহারাষ্ট্রপুরাণ' রচয়িতা প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারামের বিবরণের মধ্যেও এই ভিটেমাটি ছেড়ে পলায়নের দৃশ্য ভয়াবহভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন :

তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
যত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলায কত নিক্তি হডপি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
সঙ্খ বণিক পলাএ করা লইযা যত।
চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য যত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥
গোশাঞি মোহান্ত জত চোপালাএ চডিয়া।
বোচকা বুচকি লয় জয় বাহুকে করিযা॥
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম স্থইনা সব পলাইল॥

পর্তুগীজ দস্যু 'বণিক ও গোলাম-ব্যবসাযীরা ইংরেজ কুঠিয়ালরা, ডাচ ও ফরাসী বণিকরা পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যসমাজকে যখন ভাঙতে আরম্ভ করে, সেই সময় মারাঠা দস্যুরা নির্মমভাবে লুঠতরাজ করে সেই নিশ্চিন্ত সমাজ-জীবনকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীদের তারা নিষ্ঠুর অস্ত্রবলে যাযাবর উদ্বাস্তু দলে পরিণত করে। বিশেষ করে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরের গ্রামগুলিকে তছনছ করে দেয়। গঙ্গারামের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্তী গ্রামগুলি থেকে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পরিবার পুঁথিপত্র নিয়ে পালিয়ে যান, কায়স্থ বৈদ্য ও বণিকরাও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে পশ্চিমবাংলার গ্রাম্যসমাজের এই ভাঙন গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম থেকে পুবে যাঁরা পালিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তখনকার নতুন কলকাতা শহরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁরাই গ্রাম্যসমাজের মতো সমাজ গড়ে তোলেন কলকাতায়। কাঁসারিপাড়া মুচীপাড়া বামুনপাড়া ইত্যাদি তখন থেকেই বোধ হয় দানা বাঁধতে আরম্ভ করে কলকাতা শহরে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্যসমাজের ভাঙনের সঙ্গে কলকাতা

শহরের নতুন সমাজের গড়নের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। তার জন্য ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর যতটা দায়ী, তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী পর্তুগীজ ডাচ ইংরেজ ফরাসী বণিকদের শোষণ এবং মারাঠী বর্গীদের নিষ্ঠুর লুণ্ঠন।

১৭৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাস্কর পণ্ডিত কাটোয়ায় দুর্গাপূজা করেছিলেন মহাসমারোহে। স্থানীয় জমিদার ও গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে ভেট আদায় করে তিনি পূজার সামগ্রী সংগ্রহ করেন। গঙ্গারাম তারও বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিষ আইসে কত হাজারে হাজারে ॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা আরম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন ॥

পূজা হচ্ছিল ধুমধাম করে। এমন সময় মহানবমীর দিন সকালে (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৪২) রাতারাতি গঙ্গা পার হয়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ বর্গীদের আক্রমণ করেন। নবাবের বিপুল সেনাবাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন কবি গঙ্গারাম :

একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে ॥
মুস্তাফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে যায় ঘোড়া বিস হাজার ॥
যেই মাত্র নবাব সাহেব ভাবকপুর আইল ॥
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল।
তবে বরগি পিঠ দিয়া শীঘ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ ॥

নবাবের সৈন্য কাটোয়া থেকে কটক পর্যন্ত ধাওয়া করে বর্গীদের চিল্কা হ্রদ পার করে দিয়ে আসে। আলিবর্দি খাঁ বাংলার মুখরক্ষা করেন।

মাত্র পনের বছর পরের কথা। ১৭৫৭ সাল। ১৭৪২ সালের জুন মাসে বর্গীরা কাটোয়ায় ঘাঁটি করে বসেছিল। ১৭৫৭ সালের ঠিক জুন মাসেই (১৯ জুন) মেজর কুটে কাটোয়া দুর্গ দখল করেন ক্লাইভের নির্দেশে। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে সাঁকাই গ্রামে এই দুর্গের হাটির ধ্বংসস্তূপ দেখিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা সেই কথা আজও স্মরণ করেন। আসল স্থানটি ভাগীরথী অজয়ের গর্ভে বিলীন বলে মনে হয়। সেই রাতেই ক্লাইভ সসৈন্যে পাটুলি থেকে কাটোয়া আসেন। ২১ জুনের এক বৈঠকে তিনি কাটোয়াতে অবস্থান করা ঠিক করেন। কিন্তু বৈঠকের

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ক্লাইভ তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। ২২ জুন কাটোয়া থেকে ইংরেজ সৈন্য গঙ্গা পার হয়ে অভিযান আরম্ভ করে। মধ্যরাতে তারা পলাশীর নবাবের সৈন্যের মুখোমুখি হয়। ২৩ জুন বৃহস্পতিবার (১৭৫৭) পলাশীর যুদ্ধে বাংলার তথা ভারতের ভাগ্য প্রায় দুই শতাব্দীর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়। সেটা দাসত্বের দুর্ভাগ্য।

বাঁধমুড়া ও সিঙ্গি গ্রাম

আজ থেকে ৭০ বছর আগে (১৩১২-১৩ সনে) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়-ভ্রমণে বেরিয়ে কাটোয়া থেকে বাঁধমুড়া ও সিঙ্গিগ্রামে যান। বাহন গরুর গাড়ি, গাড়োয়ান হরেকৃষ্ণ। বাঁধমুড়া, পাঁচালিকার দাশরথি রায় এবং সিঙ্গি মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস, এই দুজন কবির জন্মস্থান ও কবিকীর্তির জন্য খ্যাত। বাঁধমুড়া সম্বন্ধে পর্যটক লিখেছেন: "—আমাদের গাড়ী দাশরথি রায়ের ভগ্নাবশিষ্ট বাটীর নিকটে পৌঁছিল। কিন্তু বাটীতে দাশরথি রায়ের একজন ভাদ্রবধূ ব্যতীত অন্য কেহ নাই…। ভগ্ন প্রাচীর ভিন্ন বাটীর অন্য কোন নিদর্শন নাই।… চতুর্দিকে ভগ্নপ্রাচীর; বায়ুকোণে ভগ্ন দোতলা গৃহের ধ্বংসাবশেষ। সেই রায় মহাশয়ের বিধবা ভাদ্রবধূ একখানি ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। কিন্তু তাহাও জীর্ণপ্রায়। দক্ষিণদিকে পূজার দালানের ভগ্নাবশেষ। পশ্চিমদিকে দুইখানি ছোট চালা, একখানি রান্নাঘর, অপরখানি গোয়াল।" এই বিধবা মহিলা দাশরথির ভ্রাতৃবধূ তিনকড়ি রায়ের স্ত্রী, নাম হরসুন্দরী। দাশরথি রায়ের পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। তাঁর দুই স্ত্রীর গর্ভে বাইশটি পুত্র জন্মায়। দাশরথি বাল্যকাল থেকে মাতুলালয় পীরগ্রামে পালিত হন। পরে তিনি সেখানেই তাঁর বাসভবন ও দুটি দেবমন্দির নির্মাণ করেন। বাঁধমুড়ার বাসভবন তিনকড়ি নির্মাণ করেন। তিনকড়ি বাজনায় দক্ষ ছিলেন। দাশরথি বলতেন: "যদি আমি ছড়াকাটি, সন্ন্যাসি (সমসাময়িক পাঁচালী গায়ক) গায় এবং তিনু বাজায়, তা হলে বাংলা দেশে পয়সা রাখি না।" বাঁধমুড়ায় কেবল দাশরথির জন্ম ও বিবাহ হয়েছিল। ১২৬৪ সনে ২ কার্তিক পীলা গ্রামেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাঁধমুড়ার দক্ষিণে ব্রহ্মাণী নদীর উত্তর বাঁধ দিয়ে পূর্বদিকে সিঙ্গিগ্রামে যেতে হয়। গরুর গাড়ীতে দু'ঘণ্টা লাগে। পর্যটক লিখেছেন: "যে স্থানে কাশীরাম দাস বাস করিতেন, সে স্থানে এখন অন্য লোক বাস করিতেছেন। বারোয়ারীতলার কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্বে ঐ স্থান অবস্থিত।…সিঙ্গির অন্যনাম শিবরামবাটী। সিঙ্গির অবস্থান অতি সুন্দর। ইহার উত্তরে সৈয়দপুর বা মালঞ্চ, ঈশানকোণে দেওয়াসীল বা রামচন্দ্রপুর, পূর্বে করুইথান, অনন্তবাটী এবং ওকড়সা, দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীবাটী ও

মুলটী-কৃষ্ণনগর, বায়ুকোণে নারায়ণপুর।" গ্রামের দক্ষিণে প্রান্তর মধ্যবর্তী 'কেশেপুকুর' অর্থাৎ কাশীরাম দাস নিখাত পুষ্করিণী। "বাঙ্গালা সাহিত্য সেবীদিগের নিকট কেশেপুকুর পরমতীর্থ। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন এই পুষ্করিণী পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তিনি ভক্তিগদগদচিত্তে এই জল মস্তকে প্রদান করিয়া পান করিয়াছিলেন। আমি কিঞ্চিৎ জল মস্তকে দিয়া পরে করপুটে এই পবিত্র জল পান করিয়া লইলাম"। বৃক্ষতলে গ্রামের প্রাচীন দেবস্থানে ক্ষেত্রপাল পূজিত হন, পূজায় বলিদান হয়। বুড়োশিবের নবরত্ন মন্দির ১২৩৫ সনে প্রতিষ্ঠিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও কাশীরাম দাসের লুপ্ত কীর্তি ও পুঁথিপত্র উদ্ধারের জন্য সিঙ্গি যান। সিঙ্গিগ্রামের আধক্রোশ দূরে শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্বশুরালয়। তিনি অনুসন্ধানকালে শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকতেন এবং প্রত্যহ বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করে রামলাল গরাই-এর বাড়ি আসতেন। রামলাল গরাই-এর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে কাশীরাম দাসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাশীরাম দাসের মৃত্যুর পর তাঁর অনেক হাতেলেখা কাগজপত্রপুথি গরাইদের বাড়িতে ছিল। এই গরাইগৃহ থেকেই কাশীরাম দাসের নৈষধকাব্যের অনুকরণে লিখিত 'নলদময়ন্তী' কাব্যখানি পাওয়া যায়। বাকি পুথিপত্র রামলাল নাকি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়ে দেন।

পর্যটক লিখেছেন: "শুনিলাম পূর্বে সিঙ্গিগ্রাম সর্ববিষয়ে গৌরবান্বিত ছিল। এই গ্রামে এককালে ২২টী চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। কমলাকান্ত তর্কপঞ্চানন, রামগতি তর্কালঙ্কার, গৌরীকান্ত ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের কথা অনেকেই জানেন। পণ্ডিত ভূপতিনাথ ন্যায়পঞ্চাননের টোল কাশীরাম দাসের বাটীর নিকটে অবস্থিত ছিল। কাশীরাম সর্বদাই টোলে যাইয়া বসিয়া থাকিতেন ং প্রয়োজন মত ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের তামাক সাজিয়া দিতেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কথকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সেখানে তাঁহার কথকতা হইত। বালক কাশীরাম সেই স্থানেই তাঁহার সহিত গমন করিতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সমস্ত চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। দেবদ্বিজে তাঁহার বিশেষ ভক্তি ছিল। এই প্রকার পণ্ডিত সংসর্গে এবং ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের প্রসাদে কাশীরাম দাস মহাভারতে পাণ্ডিত্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (পঞ্চানন বন্দোপাধ্যায়: 'রাঢ়-ভ্রমণ': সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ১৩১৪ সাল)।

শ্রীখণ্ড। কুলীনগ্রাম। ক্ষীরগ্রাম কেতুগ্রাম
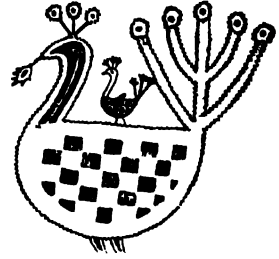
শ্রীখণ্ড ও কুলীনগ্রাম পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণবসংস্কৃতির মহাকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। কেতুগ্রামের কথা পরে বলছি। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য যখন জন্মাননি, তার আগে বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে গুণরাজখান বা মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য লিখে ভাগবত-ভক্তির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন। যবন হরিদাসের সিদ্ধির স্থানও কুলীনগ্রাম। শ্রীচৈতন্য তাই নিজেই বলেছেন—"কুলীন গ্রামের মধ্যে যে হয় কুক্কুর, সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর।" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ মন্তব্য করেছেন—"কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়, শূকর চরায় ডোম সেই কৃষ্ণ গায়।" মেমারি স্টেশনের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে কুলীনগ্রামে মাঘমাসে গ্রামদেবতা গোপালের বেশ বড় উৎসব হয়। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর বয়সে শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বড় ছিলেন এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে প্রিয়তম বলে গণ্য হতেন। তাঁর সময় সেই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষকাল থেকে আজ পর্যন্ত নবদ্বীপের মতো শ্রীখণ্ডও পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে বৈষ্ণবসংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে আসছে। আরও মনে হয়, নবদ্বীপের মতো শ্রীখণ্ডেও তান্ত্রিকধর্মের প্রাবল্য ছিল এবং তার মধ্যেই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তি ও প্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। বাঙালী সংস্কৃতির এই অন্যতম বৈশিষ্ট্য শ্রীখণ্ডের ইতিহাসে জাজ্বল্যমান।

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন নাম বৈদ্যখণ্ড। উত্তররাঢ়ের বৈদ্যপ্রধান স্থান বলে নাম ছিল বৈদ্যখণ্ড। সেখানকার বৈদ্যরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে সমাজে অগ্রগণ্য ছিলেন। স্বভাবতঃই

গৌড়-দরবারে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল এবং 'সরকার' উপাধি আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। নরহরি সরকারের অগ্রজ মুকুন্দদাস গৌড়দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন। বৈদ্যদের মতো ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যেও অনেকে গৌড়দরবারের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী ছিলেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত, বর্ধমান জেলার উত্তরপ্রান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস, গ্রাম ঝামটপুর। ঝামটপুর থেকে মাইল তিনেক দূরে নৈহাটি গ্রাম। এখানে বল্লালসেনের একটি তাম্রপট্টলিপি পাওয়া গিয়েছে। মনে হয়, এই নৈহাটিতেই বল্লালসেনের গুরুপুরোহিতদের বাস ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজা দনুজমর্দনের অনুরোধে একজন সদ্‌ব্রাহ্মণ 'সুরতরঙ্গিনী নিবাসপর্যুৎসুক' হয়ে শিখরভূম (পঞ্চকোট- মানভূম) থেকে এই 'নবহট্টক' গ্রামে (নৈহাটি) এসে বাস করছিলেন। ইনি সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর প্রপিতামহ পদ্মনাভ। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর কথা সকলেই জানেন। মহাকবি মহাপণ্ডিত এই দুই ভাই ছিলেন বাংলার বিখ্যাত সুলতান হুসেনশাহের ডান হাত, বাঁ হাত। এঁরা ছিলেন ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। সনাতন ছিলেন হুসেনশাহের 'সাকর মল্লিক' বা চীফ সেক্রেটারি আর রূপ গোস্বামী ছিলেন 'দবীর খাস' বা প্রাইভেট সেক্রেটারি। নৈহাটির এই ব্রাহ্মণদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল গৌড়দরবারে। শ্রীখণ্ডের বৈদ্যরাও এইসময় থেকে রাজদরবারে তাঁদের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পান। অনেকে গৌড়দরবারে রাজকাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহাকবি দামোদর। ইনি গৌড়দরবার থেকে 'যশোরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন এবং কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে হুসেনশাহের উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ এই যশোরাজ খান বা দামোদরেরই দৌ[illegible]। নৈহাটির ব্রাহ্মণ ও শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদের মতো পূর্ব-দক্ষিণ বর্ধমানের কুলীনগ্রামের কায়স্থ মালাধর বসুও বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। সুলতান তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'গুণরাজ খান'—"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান"। কুলীনগাঁয়ের এই কায়স্থদের বংশধররা দীর্ঘকাল গৌড়দরবারে কাজ করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরের নবহট্টক-নৈহাটি, বৈদ্যখণ্ড-শ্রীখণ্ড থেকে দক্ষিণের কুলীনগ্রাম পর্যন্ত বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থবংশের অনেকের সঙ্গে মুসলমান-রাজত্বের প্রায় প্রারম্ভ থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং তাঁরা অনেকেই নবাব-দরবারে গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনে এই কারণে তাঁদের সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। এই ধরনের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল বলেই নৈহাটির সনাতন ও রূপ, শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন

বা কুলীনগাঁয়ের মালাধর বসুর বৈষ্ণবধর্মমত রাঢ়ীয় উচ্চসমাজে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।

রাঢ়দেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাববিস্তারের ইতিহাস আলোচনায় এই অর্থনৈতিক-সামাজিক পটভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যে-কোনো প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানীর চোখে রাঢ়ীয় সমাজের লোকসাধারণের স্তরে লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের বিচিত্র প্রাধান্য অত্যন্ত সহজে নজরে পড়বে এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য যে সমাজের উচ্চ ও মধ্যস্তরের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ, তাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার একমাত্র কারণ না হলেও, অন্যতম প্রধান কারণ হল, চৈতন্য-নিত্যানন্দের কালে রাঢ়দেশে যাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরা সমাজের প্রতিপত্তিশালী অবস্থাপন্ন শ্রেণীভুক্ত এবং ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থ বণিক বংশজাত। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের মানবতার ও প্রেমের আদর্শকে সামাজিক ক্ষেত্রে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেও তাঁরা খুব বেশি আশানুরূপ কৃতকার্য হতে পারেননি। রাঢ়দেশে বিশেষ করে তাই আজও লৌকিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রচণ্ড প্রাধান্য সর্বত্র দেখা যায়।

শ্রীখণ্ড অঞ্চলেই একসময় তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল বলে মনেহয়। শ্রীখণ্ডের চারিদিকে এখনও বিখ্যাত সব তান্ত্রিক পীঠস্থান রয়েছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাসের ফুল্লরা, মাঝিগ্রাম, উজানি-মঙ্গলকোটের শাকম্ভরী ও ভ্রামরী-মঙ্গলচণ্ডী,—সবই তান্ত্রিক দেবী। শ্রীখণ্ডকে যেন তান্ত্রিক দেবদেবী এখনও বেষ্টন করে রেখেছেন। শ্রীখণ্ডের মধ্যেই এখনও উত্তরদিকে রয়েছেন অনাদিলিঙ্গ শিব, প্রাণতোষণীতন্ত্রমতে ইনিই দেবতা 'ভীরুক', কেতুগ্রামের বহুলা দেবীর ভৈরব। বর্তমান শিবমন্দিরটি মহারাজা রাজবল্লভের তৈরি, শিলাফলক থেকে জানা যায়। গ্রামের পুবদিকে রয়েছেন গ্রাম্যদেবী কালী। পশ্চিমে বহুপ্রাচীন একটি মন্দির, খণ্ডেশ্বরীতলা। বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে খণ্ডেশ্বরী। পঞ্চমুণ্ডির আসন বলে কথিত তান্ত্রিক সাধনার স্থানও আছে শ্রীখণ্ডে। এসব তান্ত্রিক সাধনার পূর্বস্মৃতি নিঃসন্দেহে বহন করছে। তার মধ্যে একদিকে আছে বড়ডাঙা, নরহরির ভজনস্থান, পূর্বাচার্যদের মিলনক্ষেত্র।

নরহরি সরকার ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সাধনায় তান্ত্রিক পদ্ধতির কোনো প্রভাব ছিল কিনা বলা যায় না। নরহরি সরকার ও লোচনদাসের রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভজনপদ্ধতি, রাধাভাব ও নাগরভাব পদের মধ্যে বাউল-বাউলিনীর কথা ইত্যাদির মধ্যে কোনরকম তান্ত্রিক সহজসাধনধারার প্রভাব যে একেবারে নেই, এমন কথা বলা যায় না। নরহরি-রঘুনন্দনের অনুবর্তীদের সাধনায় তান্ত্রিকরীতির প্রভাব আরও

অনেক বেশি স্পষ্ট। লোকানন্দ ও লোচনানন্দ হলেন নরহরির দুটি প্রধান শাখা। লোকানন্দ বিধিমার্গে গৌরাঙ্গ উপাসনার অঙ্গগুলি প্রকাশ করেছেন, আর লোচনানন্দ রাগমার্গে গৌরাঙ্গভজনের তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন। গৌরাঙ্গ উপাসনার রীতি লোকানন্দ তাঁর 'ভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থে নির্দেশ করে গিয়েছেন। উপাসনার পদ্ধতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং নরহরি সরকার ঠাকুরই নাকি এই উপাসনাপদ্ধতির কথা নিজমুখে বলে গিয়েছিলেন। পদ্ধতির মধ্যে আগাগোড়া তান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের বেশ প্রাধান্য দেখা যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল, তান্ত্রিক পদ্মমণ্ডলের ছয়কোণে শ্রীচৈতন্যের ছয়জন প্রধান পার্শ্বচরকে প্রতিষ্ঠা করে উপাসনা করার প্রথা। যেমন, সামনে গদাধর পণ্ডিত, দক্ষিণে স্বরূপ ইত্যাদি। নরহরির আসন সর্বপ্রধান, একেবারে মণ্ডলকেন্দ্রে, কিন্তু নিত্যানন্দ অদ্বৈত মাধবেন্দ্র সকলে বাইরে। 'ভক্তিচন্দ্রিকা'র ঐতিহাসিক মূল্য কতখানি সঠিক বলা যায় না। না বলা গেলেও, নরহরির কোনো অনুবর্তীর রচনা যে তাতে সন্দেহ করবার কারণ নেই। প্রশ্ন হল, শ্রীচৈতন্য উত্তরসাধকদের মধ্যে এই তান্ত্রিক প্রভাব কোথা থেকে এল হঠাৎ এবং হঠাৎ-ই বা আসবে কেন?

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও তাঁর শিষ্য লোচনদাসের রচিত পদাবলীর মধ্যে সহজমতের বেশ প্রভাব আছে দেখা যায়। তান্ত্রিক সাধনধারার প্রভাব প্রসঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা উচিত। রাঢ়দেশে বড়ু চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের সহজসাধনের ধারার উত্তরাধিকারী হওয়া শ্রীখণ্ডের নরহরি ও কোগ্রামের লোচনদাসের পক্ষে আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাস যে সহজপন্থী ছিলেন তা তাদের পদাবলী থেকে বুঝতে পারা যায়। যেমন

> অহোনিশি যোগ ধেআই।
> মন পবন গগন বহাই ॥
> মূল কমলে কয়িলে মধুপান।
> এবে পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥…
> ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
> মন পবন তাতে কৈল বন্দী ॥
> দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট
> এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদের মধ্যে 'সহজ' কথার অন্ত নেই। বৌদ্ধ সহজযানীদের এই সাধনপদ্ধতির ধারা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বড়ু ও দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্তনে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল রাঢ়দেশে। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে যদি সেই সাধনার উত্তরসাধক হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এই কারণেই মনে হয় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের উপর তান্ত্রিক সহজযানের সাধন-ধারার প্রভাব ছিল কিছুটা।

নরহরি সরকারের পদগুলিতে চণ্ডীদাসের প্রভাব এত বেশি যে অনেক সময় মনে-হয় সেগুলি একসুরে, এমনকি একভাষায় পর্যন্ত রচিত। যেমন, রাধামোহন ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদামৃতসমুদ্রে' নরহরি ভণিতায় যে পদটি আছে :

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি।
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে।
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল
মরমে রহল মোর কানুপ্রেম-শেল।...

পড়লেই মনে হয় চণ্ডীদাসের পদ পড়ছি। দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃতে' উদ্ধৃত এই পদটি এদিক দিয়ে আরও লক্ষ্য করার মতো :

সই কত না সহিব ইহা
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
যেদিন দেখিব আপন নয়ানে
কহে কার সনে কথা
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা।

'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে নরহরি সরকারের অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৩৩৪ সাল থেকে প্রকাশিত (শ্রীখণ্ড থেকে) 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মাধুরী' মাসিক পত্রিকায় (রাখালানন্দ ঠাকুর শাস্ত্রী সম্পাদিত) নরহরির অনেক পদ প্রকাশিত হয়েছে

ধারাবাহিকভাবে। বর্তমানে (১৯৫২-৫৩) এই বংশেরই অন্যতম প্রবীণ বংশধর গৌরগুণানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণবসাধনার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকেও নরহরির কয়েকটি পদ শুনেছি। তার মধ্যে এই পদাংশগুলি বিশেষভাবে বিচার্য :

বামেতে ডাহিনে সমুখে পিছনে
জলের ভিতর গোরা।
এ জন্মের মত অঞ্জন হইয়ে
লাগিয়ে রহল পারা ॥
তোরাও দেখিবি তখনি ভুলিবি
আমার মতন হবি।
বাউলিনী হঞা কাঁদিয়া বেড়াবি
যাচিয়া যৌবন দিবি ॥
পরাণ সহিতে টানাটানি হবে
গরলে ভরিবে দেহা।
কহে নরহরি তখনই জানিবে
নবীন গৌরাঙ্গ লেহা ॥

অথবা এই পদটি

রসের ভ্রমরা মোর গোরা।
কিবা জানে পিরীতি নব নব যুবতী
বদন কমল মধু চোরা ॥…
হিয়ায় ধরয়ে হিয়া গৌরাঙ্গ রসিয়া গো
সঘনে কাঁপই মোর দেহা।
নরহরি প্রাণ বঁধু কত না জানয়ে গো
অমিয়া পাথার তার লেহা ॥

নরহরি সরকারের এই নাগরভাবে ভজনপদ্ধতিতে সহজসাধনের প্রভাব এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দরকার হয় না। এই কারণেই বৃন্দাবনদাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' নরহরির কথা একেবারে উল্লেখ করেননি। নরহরির এই

সহজধর্মানুরাগ ও নাগরভাব তিনি সমর্থন করতেন না। লোচনদাস তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং 'চৈতন্যমঙ্গলে' তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন :

শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমাব।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাঁহার॥
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুমতি জনে না বুঝান প্রেম বিন্দু॥ ··
ক্ষণে রাধাকৃষ্ণরসে নির্মল পিরীতি।
শ্রীখণ্ডভূখণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি॥···
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যাব।
রাধাপ্রিয় সঙ্গী তিঁহো মধুব ভাণ্ডার॥
এবে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমেব ভাণ্ডারে অধিকারী॥

—চৈতন্যমঙ্গল সূত্রখণ্ড

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল-সম্প্রদায়ের উপর এই কারণেই মনেহয় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর, তাঁর শিষ্য লোচনদাস ও তাঁদের অনুবর্তীরা বেশ প্রভাব বিস্তার করেছেন। বৈষ্ণবসংস্কৃতিতে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশের এইটাই হল বিশিষ্ট দান। এইদিক দিয়ে রাঢ়দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধাবা তাঁরা চৈতন্য ও তাঁর পরবর্তী যুগেও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

বৈদ্যখণ্ড বা শ্রীখণ্ড উত্তররাঢ়ের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব-যুগে। লোচনদাস কোগ্রাম থেকে শ্রীখণ্ডে গিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্য। নরহরি সরকার নবদ্বীপে থেকে লেখাপড়া করতেন। শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বয়সে তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নবদ্বীপেই তাঁর সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। চৈতন্যবিষয়ক প্রথম পদরচয়িতাদের মধ্যে নরহরি সরকার অন্যতম। নরহরির অন্যান্য পদাবলীর কথা আগে বলেছি। নরহরির শিষ্য লোচনদাসেরও কাব্যপ্রেরণার উৎস শ্রীখণ্ড। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন চিরঞ্জীব সুলোচন দামোদর রামচন্দ্র গোবিন্দ বলরামদাস রতিকান্ত শচীনন্দন কানাই ঠাকুর নয়নানন্দ রায়শেখর জগদানন্দ প্রভৃতি আরও অনেকের কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়েছিল শ্রীখণ্ডে। এত ভক্ত ও কবির আবির্ভাবকেন্দ্র বলে গোপালদাস 'নরহরির শাখা নির্ণয়ে' বলেছেন "ক্ষিতি নবখণ্ড মাঝে খণ্ড মহাস্থান, সর্বত্র সৌরভ যার মলয়জ সমান।"

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নরহরি প্রথম যে পদটি রচনা করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পদটি এই :

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি।
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু
ভাষায় রচনা হইলে বুঝিবে লোকসকলে
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু।

নরহরির ভণিতায় সহজসাধন ঘটিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। শ্রীসুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে একটি পদ উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে, পদটি নরহরির লেখা না হওয়াই সম্ভবপর। পদটি এই :

সহজ মানুষ কোথায় নাই
খুঁজিলে তাহারে নিকট পাই।
মরা মানুষ হয়্যা যদি কাডয়ে বা
তবে সে লাগিবে প্রেমের বা
কহে নরহরি অমিঞা রাশি
সদা রহু মন সহজে পশি।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের উপর সহজসাধনের প্রভাব পড়া যে আদৌ বিচিত্র নয়, একথা আগে আলোচনা করছি। স্থান ও কাল উভয়দিক দিয়েই বরং তাঁর পক্ষে সেই সাধনধারার ঐতিহ্যপুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। চণ্ডীদাসের প্রভাব তাঁর পদাবলীতে যে খুব বেশি, তা যে কোনো পাঠক একবার পড়েই বুঝতে পারবেন। সুতরাং উদ্ধৃত পদটি, অথবা নরহরি-ভণিতায় অন্যান্য সহজসাধনের পদগুলি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের রচনা হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে। শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবিরা পদাবলী সাহিত্যে একটা বিশেষ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্য ও নরহরির মিলন হয় নবদ্বীপে। এই প্রথম মিলনের কথা নরহরি তাঁর একাধিক পদে প্রকাশ করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি যে নাগরভাবে শ্রীচৈতন্যকে ভক্তি নিবেদন করতেন, তাও তাঁর পদাবলী থেকে বোঝা যায়। এই জন্যই শ্রীখণ্ডের

নরহরি সরকার বৃন্দাবনের 'মধুমতী' বলে বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। 'শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকা'য় বলা হয়েছে :

পুরা মধুমতী প্রাণসখীবৃন্দাবনেস্থিত।
অনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥

শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে এসে নরহরিব কাছে মধুপানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন বলে কথিত আছে। যে পুষ্করিণীর জল অঞ্জলিভরে নরহরি তাঁদের পান করতে দিয়েছিলেন আজও তা 'মধুপুষ্করিণী' নামে খ্যাত। উদ্ধবদাসের পদে আছে :

কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া।···
মধুমতীর মধু দান সপার্ষদে করি পান
উনমত অবধূত রায়।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়,
উদ্ধব দাস রস গায়॥

নরহরির পিতা নরনারায়ণ দেব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁব তিন পুত্রের মধ্যে নরহরি কনিষ্ঠ এবং মুকুন্দ জ্যেষ্ঠ। মুকুন্দদাস গৌড দরবারে রাজবৈদ্য ছিলেন। নরহরি পিতার কাছে শ্রীখণ্ডেই থাকতেন এবং তাঁর কাছেই শৈশবে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি শিক্ষা করেন। পরে নবদ্বীপ যান শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য। রাজবৈদ্য মুকুন্দদাসের অর্থেই সংসার চলত এবং তাঁদের কুলদেবতা গোপীনাথের সেবা হত। নবদ্বীপে না গেলে তখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ হত না বলে সকলেই নবদ্বীপ যেতেন :

চতুর্দিক হইতে লোক নবদ্বীপ যায়।
নবদ্বীপে পড়িবে সে বিদ্যারস পায়॥

শ্রীখণ্ড থেকে নবদ্বীপ মাত্র বারো-তেরো ক্রোশ দূরে, একবেলার বা এক দিনের পথ। সুতরাং তখনকার যাতায়াত কবাও কষ্টকর ছিল না। নরহরি হয়ত তাই করতেন। মুকুন্দ বিবাহ করেন, নরহরি অবিবাহিতই ছিলেন। মুকুন্দপুত্র রঘুনন্দন বাল্যকাল থেকে নরহরির সাহচর্যেই পালিত হন। তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষা দুই-ই তাঁর কাছে হয়।

নরহরির সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপে মিলন হয়েছিল কিনা, তাই নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যে মিলন হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

নরহরি শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। নবদ্বীপে থেকে যখন তিনি অধ্যয়ন করতেন, তখন অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস হরিদাস মুরারীগুপ্ত গদাধর প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তখন চৈতন্যের দর্শনলাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে রঘুনন্দনশিষ্য রায়শেখরের এই পদটি উল্লেখ করা যায়:

রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাঁহার ভ্রাতা
নাম তাঁর নরহরি দাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সুপ্রচার পদবী যে সরকার,
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে,
ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ পাইয়া পঁহু শ্রীগৌরাঙ্গ
কত সুখে জুড়াইল প্রাণ॥

নীলাচলে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গৌড়ের বৈষ্ণবরা যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে মিলিত হয়েছিলেন, তখন কুলীনগ্রাম ও শ্রীখণ্ডের ভক্তরাও সেখানে গিয়েছিলেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' তার বর্ণনা আছে:

প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন গ্রামবাসী।
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিয়া তাঁহা আসি॥
মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্যের ঠাঁই আইলা নীলাচল যাইতে॥

প্রথম থেকেই নরহরি নাগরভাবেই যে চৈতন্যকে দেখতেন এবং ভাবোন্মত্ত সংকীর্তনেই তিনি তা প্রকাশ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের মতভেদও ছিল। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন:

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।

'খণ্ড সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্তন' কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নরহরির ভজনস্বাতন্ত্র্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তির মধ্যে। তা ছাড়া, কীর্তনগানের এক বিশেষভঙ্গির প্রবর্তকও তিনি ছিলেন বলে মনে হয়। বাংলা দেশের কীর্তনগানের বিবিধ ঢঙের মধ্যে 'মনোহরশাহী' ও 'রানীহাটি' (রেনেটি) ঢঙই প্রসিদ্ধ। মনোহরশাহী বর্ধমান জেলার উত্তরে, রানীহাটি দক্ষিণে। কুলীনগ্রাম রানীহাটি পরগণার অন্তর্গত। উত্তর

ও দক্ষিণের এই দুই ঢঙের বা রীতির মধ্যে উত্তররাঢ়ের মনোহরশাহী কীর্তনে শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের বিশেষ দান আছে। শ্রীখণ্ডে কীর্তনশিক্ষার টোলও ছিল শুনেছি। এখনও গৌরগুণানন্দ ঠাকুর নিয়মিত কীর্তনগান করেন এবং ছাত্রদের কীর্তন শিক্ষা দিয়ে থাকেন (১৯৫২-৫৩)। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর কীর্তন গানের দক্ষতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

নরহরি সরকারের অন্যতম কীর্তি গৌরাঙ্গপূজা প্রবর্তন এবং গৌরমূর্তি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা। মুরারিগুপ্ত বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়াও গৌরাঙ্গমূর্তি পূজা করতেন। অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতও শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় গৌর-নিতাইয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।[১] শ্রীচৈতন্যের তিনটি নদীয়া-নাগর মূর্তি নির্মাণ করে নরহরি সরকার একটি নিজগ্রাম শ্রীখণ্ডে, একটি গঙ্গানগরে এবং সবচেয়ে বড় মূর্তিটি দাস গদাধরের শিষ্য বিষ্ণানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা কাটোয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন।

কাটোয়ায় সবচেয়ে বড় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করার প্রধান কারণ, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান কাটোয়া এবং এইদিক দিয়ে বৈষ্ণবতীর্থ হিসেবে কাটোয়ার প্রাধান্য বেশি। এখন দু'টি মূর্তি শ্রীখণ্ডে আছে, বড়টি আছে কাটোয়ায়। জীবনের শেষ অবস্থায় গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার যুগলমূর্তি স্থাপনেরও ইচ্ছা হয়েছিল নরহরির মনে। কথিত আছে, সন্ন্যাসগ্রহণ করে শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাত্রার সময় নরহরিকে নদীয়ায় শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে কাতর হয়ে হয়ত ঠাকুর নরহরি যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই বাসনা নরহরির জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়নি। নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের পুত্র কানাই ঠাকুর পরে এই বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের মূর্তি এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি প্রথম শ্রীখণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

শ্রীখণ্ডের দক্ষিণে বড় ডাঙা নামক স্থানে নরহরি সরকার ঠাকুর ভজন করতেন। আরও অনেক বৈষ্ণব আচার্য সাধনা করে এইখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে শোনা যায়। এই বড়ডাঙাতেই রঘুনন্দন ও অভিরাম গোস্বামীর মিলন হয়। বড়ডাঙাতেই নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব হয়। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে বলা হয়েছে :

কার্তিকে শ্রীদাস গদাধর সঙ্গোপনে।
প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে॥

১ S. K. De: Vaishnava Faith & Movement, P. 333 fn.

২. মৃণালকান্তি ঘোষ—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর: শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩৩৬ সাল।

কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা।
সে দিবস হৈতে কারো সনে নাই কথা ॥
মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে।
অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এই স্থানে ॥

যে বৎসর কার্তিক মাসে দাস গদাধরের তিরোভাব হয়, সেই বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীদিনে নরহরি সরকার ঠাকুরেরও তিরোভাব হয়। অগ্রহায়ণ মাসের এই তিথিতে প্রতি বৎসর বড়ডাঙার মহোৎসব হয়। ঠাকুর নরহরির প্রথম বার্ষিক উৎসব শ্রীখণ্ড গ্রামের গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রঘুনন্দন ও শ্রীনিবাসের চেষ্টায় তাঁর দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব 'বড়ডাঙাতে'ই অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই বড়ডাঙাতেই উৎসব হচ্ছে। নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহান্ত আচার্য কবি কীর্তনিয়া বাউল প্রভৃতির সমাবেশ হয় উৎসবে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে তাঁদের সুদীর্ঘ নামের তালিকা আছে :

প্রভু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।
কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল পরমানন্দময় ॥
প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র।
ভুবন মোহন যেঁহো গুণের সমুদ্র ॥

এখনও শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙায় মহোৎসবের সময় নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব ও বাউলরা আসেন এবং কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠান চলতে থাকে। কীর্তন ও বাউল গানের সুরে শ্রীখণ্ড গ্রাম মুখর হয়ে ওঠে।

ক্ষীরগ্রাম

ক্ষীরগ্রাম একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। একান্নপীঠের মধ্যে অন্যতম বলে কথিত। কাটোয়া থেকে বর্ধমানের দিকে রেলপথে শ্রীখণ্ড কৈচোর ও নিগন স্টেশন। শ্রীখণ্ডের পরে কৈচোরে নেমে প্রায় তিন মাইল দূরে ক্ষীরগ্রামে যেতে হয়, এবং নিগন স্টেশনে নেমে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রাম মঙ্গলকোটে যেতে হয় (পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ক্ষীরগ্রামে ক্ষীরদীঘি পুকুরের দক্ষিণদিকে মধ্যস্থলে দেবী দক্ষিণ-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের খণ্ড পড়েছিল। ক্ষীরগ্রামপীঠের দেবীর নাম 'যুগাদ্যা' (যোগাদ্যা), ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক, বর্তমানে ক্ষীরেশ্বর নামে পরিচিত। ক্ষীরদীঘি থেকে খানিকটা দূরে ঈশানকোণে ক্ষীরেশ্বরের মন্দির।

যুগাদ্যাদেবী। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যাদেবীর মহাপূজা হয় এবং সেই উপলক্ষে বেশ বড় মেলা হয় গ্রামে। লোকপ্রবাদ এই যে পীঠস্থ দেবীর পূর্বে কোনো মূর্তি ছিল না এবং তখনও দেবীর পূজা ও মেলা হত। ক্ষীরগ্রামের রাজা হরিদত্তকে দেবী উগ্রচণ্ডা মূর্তিতে স্বপ্নে দেখা দেন। মূর্তি কষ্টিপাথরের সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভূজা মূর্তি। এই উগ্রচণ্ডা দেবীর পূজা হরিদত্ত ও সামন্তবংশীয় উগ্রক্ষত্রিয়দের পূজা। রাজা হরিদত্তের বিধানমতে উগ্রচণ্ডাদেবী যুগাদ্যা নামে পূজিত হন। আজ পর্যন্ত বর্ধমানের যে সমস্ত গ্রামে উগ্রক্ষত্রিয়দের বাস আছে, সেখানে বৈশাখী সংক্রান্তির আগের দিন যুগাদ্যার পূজা হয়ে থাকে। যেমন মঙ্গলকোট থানার কোঁয়ারপুরে, ভাতার থানার নাসিগ্রামে, বর্ধমান থানার কুড়মুন ও কলিগ্রামে, গলসি থানার মল্লসারুলে, রায়না থানার আনগুনী দেরিয়াপুর শাকটিয়া বোকড়া পাঁইটা শেরপুর উচালন্ ও কাটলবিল গ্রামে, আরামবাগ থানাব মলয়পুব গ্রামে, বাঁকুড়া জেলার কোটালপুর ছাতারকানালি ঈশ্বরপুর বাদড়া প্রভৃতি গ্রামে, যুগাদ্যার পূজা হয়ে থাকে। বর্ধমানের বিশিষ্ট উগ্রক্ষত্রির সম্প্রদায়ের সঙ্গে উগ্রচণ্ডা তথা যুগাদ্যাদেবীর সম্পর্ক যে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠতা পবিষ্কাব বোঝা যায়।

ক্ষীরগ্রামের যুগাদ্যাদেবীর শাঁখাপরার কাহিনী নিয়ে কবি কৃত্তিবাস যুগাদ্যা-বন্দনায় লিখেছেন এবং প্রায় তিনশো বছর আগে বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য যুগাদ্যা-বন্দনা রচনা করেছেন। এমন কি ইংরেজিতে মহিলাকবি তরু দত্ত[১] যুগাদ্যার শাঁখা-পরার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে বলছি। ক্ষীরগ্রামের বর্তমান বসতি থেকে কিছুদূরে ক্ষীরদীঘির দক্ষিণদিকে ধামাচ নামে বেশ বড একটা পুষ্করিণী আছে। সেখানে শাঁখারীঘাট নামে একটি ঘাটও আছে। কবি কৃত্তিবাস ও বাঞ্ছারামের যুগাদ্যা-বন্দনায় পাওয়া যায় যে এই ঘাটে পরমাসুন্দরী এক যুবতী দেবীরূপ ধারণ করে গাত্রমার্জনা করছিলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী ঘাটের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন দেখে স্নানরতা যুবতী তাকে ডেকে শাঁখা পরেন এবং বলেন যে শাঁখার দাম যুগাদ্যা-দেবীর পূজারী তাঁর পিতাকে বললে তিনি দিয়ে দেবেন। যুবতীর কথামতো শাঁখারি

১ তরু দত্ত (১৮৫৬-৭৭) রামবাগান দত্ত পরিবারেব রসময় দত্তব পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের কন্যা। গোবিন্দচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তরু আবাল্য ইউরোপীয় ধারায় শিক্ষিতা হয়েও মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় ছিলেন বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতিতে নিষ্ঠাবতী। এটি তাঁর মাতার প্রভাবে হয়। দত্ত পরিবার বর্ধমান জেলার অজপুর (মেমারি) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেইজন্য তরুর এই কবিতা রচনায় আঞ্চলিক প্রভাব স্বীকার্য। তরুর এই রচনা অনবদ্য হয়ে উঠেছে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ('যোগাদ্যা') অপূর্ব অনুবাদে।

পূজারীর কাছে শাঁখার দাম চাইলে তিনি বলেন : 'আমার কোনো মেয়ে নেই, তুমি কাকে শাঁখা পরিয়েছ জানি না। কাজেই দাম আমি দেব না।' শাঁখারী গরিব লোক, টাকার জন্য তাগিদ দিতে থাকে। পূজারী তখন মন্দিরের কুলুঙ্গির দিকে হঠাৎ চেয়ে দেখেন সেখানে পাঁচটা টাকা রয়েছে। তখন তাঁর মনে অন্যরকম সন্দেহ হয়। শাঁখারীকে তিনি বলেন, আগে ঘাটে চলো, কে মেয়েটি আমি দেখব, তারপর শাঁখার দাম দেব। তা না হলে তোমাকে শাস্তি দেব। শাঁখারী তখন পূজারীকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে গেল, কিন্তু সেই যুবতীকে আর দেখতে পেল না। তখন শাঁখারী কেঁদে ফেলল। কান্নার পরে দেখা গেল পুকুরের মাঝখান থেকে দুটি নতুন শাঁখাপরা হাত উপরদিকে তোলা। তখন শাঁখারী ও পূজারী উভয়েরই জ্ঞান হল যে ইনিই যুগাদ্যাদেবী। শাঁখারী শাঁখার দাম নিল না। যুগাদ্যার মন্দিরের কুলুঙ্গিতে এখনও পাঁচটি টাকা থাকে। কে শাঁখারী, কোন্ গ্রামে তার বাড়ি জানা যায়নি, তবে প্রত্যেক বছর বৈশাখী পূজার দিন শাঁখা ও অন্যান্য জিনিসপত্রসহ 'মাসির বাড়ির ঝাঁপি' নামে একটি উপহার গোবর্ধনপুর থেকে আসে। এটি শাঁখাপরা ঘটনার স্মরণে চলিত প্রথা।

ক্ষীরগ্রামের আরও কয়েকটি প্রথা আছে যা সংস্কৃতিবিজ্ঞানীদের কৌতূহল উদ্রেক করবে। যেমন ময়ূরনাচ। প্রত্যেক বছর ২৭ বৈশাখ মাদল-মৃদঙ্গ বাজিয়ে যজ্ঞকুণ্ড থেকে যুগাদ্যাদেবীর মন্দির পর্যন্ত স্থানে স্থানে এই নাচের অনুষ্ঠান হয়। সামন্ত ও দত্তবংশের পুরুষদের মাথায় ফুলের ডালি থাকে এবং অন্য লোকেরা সেই ডালিতে নানারঙের পতাকা ঠেকায়। লগনসা নামে আর একটি অনুষ্ঠান হয় ১৫ বৈশাখ। ১৫ বৈশাখ পর্যন্ত ক্ষীরগ্রামে বিবাহ অন্নপ্রাশন উপনয়ন সাধভক্ষ ইত্যাদি কোনো সামাজিক শুভকার্য সম্পন্ন হয় না। উত্তরদ্বারী ঘরে ক্ষীরগ্রামে কেউ বাস করে না। বৈশাখের প্রথম পাঁচদিন লেখাপড়া নিষেধ। সমস্ত বৈশাখ মাস সকলে লাল কালিতে লেখে, কালো কালিতে লেখে না, ছাতি মাথায় দেয় না, কেউ সলতে পাকায় না, অগ্নে কাঠি দেয় না, কলাই ভাঙে না, ধান ভানে না এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রীলোক গ্রামে থাকে না। গ্রামের মেয়ে হলে শ্বশুরবাড়িতে যায়, বধূ হলে বাপের বাড়ি যায়। লগনসা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইদিন আচার্য ঠাকুর তালপাতায় লিখে সেই বর্ষের ফলাফল প্রচার করেন এবং কে রাজা ও কে মন্ত্রী হবে বলে দেন। যে-বছর তিনি 'মঙ্গল' বা 'শনি' মন্ত্রী হবে বলে প্রচার করেন, তখন উপস্থিত গ্রামবাসীরা সকলে মিলে বলেন, 'আচার্য এবছর খারাপ মন্ত্রী দিয়েছে, বছরটা খারাপ যাবে। অতএব আচার্যকে প্রহার করো, ওর পাঁজি ছিঁড়ে ফেলে দাও।'

অতঃপর আচার্যকে প্রহারের অভিনয় করা হয় এবং আচার্য ভয় পাওয়ার ভান করে কিছু দূরে পালিয়ে গিয়ে তালপাতায় লেখা পাঁজিটি ফেলে দেন। যে-বছর আচার্য ভাল মন্ত্রী হবে বলেন, সে বছর গ্রামের লোকজন আচার্যকে কাঁধে করে নৃত্য করেন।

ক্ষীরকলসী ও হাল-লাঙলের অনুষ্ঠানটিও তাৎপর্যপূর্ণ। চৈত্রসংক্রান্তির দিন যজ্ঞকুণ্ড থেকে হোমের জলভরা ঘট এনে যুগাদ্যার মন্দিরের বাইরে পুবদিকে স্থাপন করা হয়। স্থানটিকে পরামর্শ-স্থান বলে। সেখান থেকে পূজারী গ্রামবাসীদের কাছে যুগাদ্যার মহাপূজার কথা একমাস আগে প্রচার করেন। তারপর সেই ঘটের জল ফুল বেলপাতা কলা আম্রশাখা একটি তামার কলসীতে ঢেলে রাখা হয়। ২৭ বৈশাখ ও সংক্রান্তির আগের দিনের হোমের ঘটের সমস্ত জিনিস ঐ তামার কলসীতে ঢেলে রাখা হয়। এই কলসীকে 'ক্ষীরকলসী' বলে। মহাপূজার আগের দিন এই ক্ষীরকলসী নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রদক্ষিণকালে তার পশ্চাতে মামা-ভাগনে সম্পর্কীয় দুটি এঁড়ে গরুসহ নতুন হাল-লাঙল অনুগমন করে। উল্লেখ্য হল, সমস্ত বৈশাখমাস ক্ষীরগ্রামে হলচালনা নিষেধ এবং বারমাসের বারোটি সংক্রান্তির দিনেও ক্ষীরগ্রামবাসীরা হলচালনা করে না। একথাও স্মরণীয় যে কেবল বৈশাখসংক্রান্তির দিন ছাড়া অন্য কোনো দিনে যুগাদ্যাদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায় না।[১]

কেতুগ্রাম

কাটোয়া-আহমদপুর রেলপথে দশমাইল দূরে নিরোল স্টেশনে নেমে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম। প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বামপদ পড়েছিল বলে এটি একটি পীঠস্থান। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক। কেতুগ্রাম বেশ প্রাচীন গ্রাম। প্রবাদ, একদা এই গ্রামে ভূপাল নামে তিলিবংশজাত এক রাজা ছিলেন। চন্দ্রকেতু নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। এই চন্দ্রকেতুর নামে কেতুগ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন যে কেতুগ্রামই নান্নুরে বিশালাক্ষী-বাশুলীদেবীর উপাসক চণ্ডীদাসের জন্মস্থান ও আদি বাসস্থান। কেতুগ্রামের উত্তরদিকে চণ্ডীদাসের জন্মভিটা ছিল এবং সেই জায়গাটিকে স্থানীয় লোক আজও চণ্ডীভিটা বলে। কেতুগ্রামের লোকপ্রবাদ এই যে চণ্ডীদাস গ্রামের

১ ক্ষীরগ্রামে প্রচলিত প্রথা-অনুষ্ঠানের নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য, অন্যান্য অঞ্চলের প্রথাদির সঙ্গে, সমগ্রভাবে এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' আলোচনা করা হবে।—লেখক

নীচজাতীয় এক বিধবাকে বিবাহ করেন। এই কারণে গ্রামের লোক তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি তাঁর পূজিত বিশালাক্ষীদেবীকে নিয়ে কেতুগ্রাম থেকে বীরভূমের নান্নুরে চলে যান। গ্রামের লোক তীরধনুক নিয়ে নান্নুর আক্রমণ করে এবং নান্নুরবাসীর প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে আসে। কিছুদিন পরে বিবাদ মিটে যায় এবং কেতুগ্রামবাসী গ্রামে বহুলাক্ষীদেবীর প্রতিষ্ঠার জন্য চণ্ডীদাসকেই পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কেতুগ্রামের পাশে মডাঘাটে ছিলেন বহুলাক্ষী তাঁকে গ্রামের মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখনও নান্নুরে দুর্গাপূজার সময় বিশালাক্ষীদেবীর চারদিন ধরে পূজা হয় এবং মহানবমী পূজার দিন কেতুগ্রামের ত্রিলিবংশের পূজাই সর্বাগ্রে গৃহীত হয় এবং তাঁদেরই প্রেরিত ছাগল প্রথম বলিদান দেওয়া হয়। এই প্রথা আজও প্রচলিত।

চণ্ডীদাসের বংশে কেতুগ্রামে নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন নামে এক পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি তাঁর রচিত 'গণমার্তণ্ড' ব্যাকরণের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের পাঁচ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম গোপীনাথ। তাঁর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র নয়ন, নয়নের পুত্র কুমুদ, কুমুদের পুত্র শ্রীহরি, শ্রীহরির পুত্র শ্যামাদাস বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাবাগীশের পুত্র গোপাল সার্বভৌম, গোপালের তিনপুত্রের মধ্যে অন্যতম কুশল তর্কভূষণ, কুশলের পুত্র নৃসিংহ। কুশলের পরিচয় দিয়ে নৃসিংহ লিখেছেন :

চণ্ডিদাস কুলাজার্ক কুশলস্তর্কভূষণঃ।
নৃসিংহ তৎসুতং বক্তিগণবৃত্তি নতং হরি ॥

কেতুগ্রামে নৃসিংহ তর্কপঞ্চাননের ভিটা এবং টোলবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে কেতুগ্রামের চণ্ডীদাসই নান্নুরের বিখ্যাত চণ্ডীদাস এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তাঁরই রচনা। চণ্ডীদাস ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। এইদিক দিয়ে এবং নৃসিংহ থেকে দশপুরুষ আগেকার কাল গণনা করে চণ্ডীদাসের সময় পঞ্চদশ শতাব্দী অনুমান করা যায়। এই চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক দ্বিজ চণ্ডীদাস নন। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য কিনা বিচারসাপেক্ষ।[১]

১ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : 'কেতুগ্রামের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫ সাল। 'হিমাচল' (মাসিকপত্র) জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সাল, 'কেতুগ্রামের কবি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
এই গ্রন্থে বাঁকুড়া জেলার 'ছাতনা' ও বীরভূম জেলার 'চণ্ডীদাস-নান্নুর' গ্রামের বিবরণ দ্রষ্টব্য।
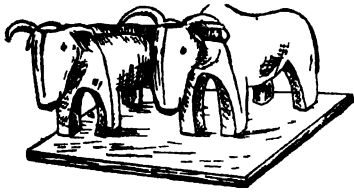
উজানিনগর-কোগ্রাম

ধনপতি সদাগর এই বলে খুল্লনার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন : 'সাধু ধনপতি আমি বসি হে উজানী। গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী।' উজানিনগরে লক্ষপতি ধনপতি সদাগরের বাস ছিল। সেই উজানিনগর, বর্তমান কোগ্রাম যার একাংশ মাত্র। যেখান থেকে ধনপতি সদাগর পায়রা উড়িয়েছিলেন এবং যে পায়রা উড়ে গিয়ে খুল্লনার আঁচলে পড়েছিল। যেখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা বাস করতেন। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থলের যে উজানি থেকে ধনপতি ও তাঁর পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রা করেছিলেন, যেখানকার মঙ্গলচণ্ডীকে উপেক্ষা করে ধনপতি বলেছিলেন খুল্লনাকে, 'কেমন দেবতা এই পূজিস ঘটবারি, স্ত্রীদেবতার আমি পূজা নাহি করি'। উজানি ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের বাসস্থান, কবি লোচনদাসের জন্মস্থান। তান্ত্রিক পীঠস্থান ও বৈষ্ণব শ্রীপাট দুই-ই।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত উজানি কোগ্রাম (কোগাঁ নামে পরিচিত)। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থলে, অজয়নদের তীরে কোগাঁ। কুনুর একটি ছোট নদী, কোগাঁর দক্ষিণ ও পূর্বদিক বেষ্টন করে অজয়ে মিশেছে। অজয় উত্তরবাহিনী। একদিকে বীরভূম জেলার নানুর থানা আর একদিকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানা। একদিকে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলীকীর্তনে মুখর হয়ে উঠেছিল পরিবেশ, আর একদিকে বৈষ্ণবদের 'বড়াইবুড়ী' লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' বিচিত্র রাগরাগিণীতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। 'চৈতন্যমঙ্গল' বৃন্দাবনদাসের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে'র পরবর্তী রচনা। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন লোচনদাসের

গুরু এবং তাঁর নিবাস ছিল কোগ্রামে। কাব্যের শেষে লোচনদাস যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে স্পষ্টই একথা বলা হয়েছে:

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস।
মাতা সতী শুদ্ধমতি সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণকাম।
কমলাকর দাস নামে মোর জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গৌর গুণগাথা।...
মাতৃকুল পিতৃকুলে বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে।...
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।

চৈতন্যমঙ্গল—শেষখণ্ড

আধুনিক বাংলার প্রবীণ পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (১৮৮৩-১৯৭০)ও নিবাস ছিল কোগ্রাম। নিষ্ঠুর অজয় কোগ্রামকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলেছে। অজয়ের বাঁক থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় কোগ্রাম দুর্ধর্ষ নদের ধ্বংসোন্মুখ পাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে তার পর্ণকুটিরসহ কাঁপছে। কবি কুমুদরঞ্জনের ঘরবাড়ি সব অজয়ের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, পর্ণকুটির বেঁধে তিনি সরতে সরতে ক্রমে দক্ষিণবাহিনী কুনুরের কোলের দিকে যাচ্ছেন, তবু তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় কোগ্রাম তিনি প্রাণ থাকতে ছাড়বেন না। আমরা কবিগৃহেই অতিথি হয়েছিলাম (১৯৫২-৫৩)। তাঁর ...ই ঘুরে ঘুরে গ্রাম দেখেছি এবং গ্রামের কথা শুনেছি। কথা প্রসঙ্গে কবি বললেন, 'তখন তুমি জন্মাওনি, প্রায় বছর চল্লিশ আগেকার কথা। উত্তররাঢ় ভ্রমণে বেরিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১] সদলবলে কোগ্রাম এসেছিলেন। আমি যুবক, ঘুরে ঘুরে তাঁকেও গ্রাম দেখিয়েছিলাম।'

বাঁশের কলম দিয়ে তেরেট পাতায় বড় বড় পাতাযোড়া অক্ষরে গান লিখতেন লোচনদাস। তাঁর বাড়ির কুলতলায় একখানি পাথরের উপর বসে পাতাযোড়া অক্ষরে তিনি যখন চৈতন্যমঙ্গল লিখতেন তখন অজয়ের কিরকম রূপ ছিল তা এখন ঠিক বলা যায় না। অল্পবয়সেই লোচনের বিবাহ হয়েছিল। আমদপুরের কুকুটে

১ উজানি সম্বন্ধে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎকালের বিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ এই লেখার শেষে সংযোজন করা হয়েছে।—লেখক

গ্রামে ছিল তাঁর শ্বশুরবাড়ি। বিবাহের পর তিনি শ্রীখণ্ডনিবাসী নরহরি সরকার ঠাকুব ও রঘুনন্দনেব কাছে বিদ্যাভ্যাস করতে যান। কিংবদন্তী আছে, বিবাহিত হয়েও লোচনদাস দাম্পত্য জীবনযাপন কবেননি বলে তাঁর স্ত্রী গ্রামের নাম রেখেছিলেন 'কুগ্রাম'। লোচন তাকে 'কোগ্রাম' কবেন এবং এখন সকলে 'কোগাঁ' বলেন। উজানিব একাংশ কোগ্রাম। মঙ্গলকোটসহ আশপাশের কয়েকটি গ্রাম জুড়ে ছিল উজানিনগব। লোচনদাসের আসল বাস্তুভিটা বা বসতবাড়ির কোনো অস্তিত্ব নেই এখন কোগ্রামে, অজয়ের গর্ভে সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে, যেমন কবি জয়দেবের অনেক স্মৃতিচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়েছে কেন্দুবিল্বগ্রামে। লোচনদাসের পাট আছে কোগাঁয়, তার মধ্যে লোচনদাসেব সমাধিও আছে। প্রতি বৎসর উৎসবের সময়ে অনেক বৈষ্ণব ও বাউলেব সমাবেশ হয় কোগাঁয়।

উজানিনগবেব বর্ণনা কবেছেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। নীলকণ্ঠেরও[১] একটি গান আছে উজানি সম্বন্ধে। গানটি এই :

বলে পবম্পব উজানিনগব
অতি প্রাচীন শহব শুনি,
নয় সামান্য স্থল পরম নির্মল
পূর্বে অজযেব জল বহিত উজানি।...
চণ্ডীব আভাস তাই কবি প্রকাশ,
অত্র স্থানে ছিল শ্রীমন্তের বাস,
সাধুবংশোদ্ভব মঙ্গলাবি দাস,
তাদেরি পূজিতা ঐ মঙ্গলজননী।...
এই ধামের গুণ বর্ণিযে বেড়াই
শ্রীবৃন্দাবনে যিনি ছিলেন 'বড়াই'
'লোচন'রূপে হেথায় অবতীর্ণ তিনি।

নীলকণ্ঠের এই গানটি এখন এই অঞ্চলেব লোকমুখে শোনা যায়, বিশেষ করে গ্রাম্য উৎসবপার্বণের সময়। কবিকঙ্কণ বর্ণিত উজানিনগরের রূপ এই :

উজানিনগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।

১ নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২) বর্ধমান জেলার ধরণী গ্রাম নিবাসী সংগীত রচয়িতা, যাত্রার অধিকারী ও গায়ক। কৃষ্ণযাত্রার দূতীর ভূমিকায় কবিবর দাশরথি রায়ের ভাবরূপের উত্তরসূরী ও রূপকার।

করে শিবপূজা উজানির রাজা
কৃপা কৈল দশভূজা।
উজানির কথা গড়চারি ভিতা
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে একমাস।

মনে হয় বিক্রমকেশরী উত্তররাঢ়ের কোনো সামন্তরাজা। বর্তমান কোগ্রাম মঙ্গলকোট আড়াল প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে ছিল সেকালের উজানিনগর, দুর্গ ও পরিখাবেষ্টিত। সেকালের গ্রাম্য দুর্গগুলি বেউড়বাঁশের বনে ঘেরা থাকত। বাঁশবন অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। ঘনরামও 'ধর্মমঙ্গলে' এই বাঁশগড়ের কথা বলেছেন :

বেড়ুবাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বারবদ্ধ পাষাণে সম্মুখে দিল হানা॥

উজানিনগর সম্বন্ধে মুকুন্দরাম বলেছেন : "বিক্রমকেশরী, তাঁহার নগরী আছে কত সদাগর।" উত্তররাঢ়ের সদাগরপ্রধান স্থান ছিল উজানি। একথা মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন হাতেলেখা পুঁথিতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। ১৭০০ শকের হাতে-লেখা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুঁথিতে আছে :

গন্ধবাণ্যা জাতি উজয়নি স্থিতি
দত্তকুলে উৎপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম ধনপতি॥

ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' পুঁথিতে আছে, "শুনহ সনকা এই কহিএ তোমারে। লখিন্দরের বিভা দিব উজানিনগরে।" নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণের' পুঁথিতে আছে, "মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর। কি কথা কহিব আমি উজানিনগর।" ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে' আছে "সাধু ধনপতি বৈসে উজানিনগরে।" বংশীদাসের 'পদ্মপুরাণে' আছে :

উজানিনগর তথি গন্ধবণিক জাতি
সাহেরাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বিপুলা রূপে জিনি চন্দ্রকলা
সেহি কন্যার যোগ্য লখিন্দর।

বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গলে' আছে ঃ

চম্পকনগরের রাজা উজানিতে গেলা।
সাত শত চলিয়াছে সোনারূপার দোলা ॥

'চম্পকনগর'ও বর্ধমানে। উজানি ধনপতি শ্রীমন্তের বাসস্থান নয় শুধু, লখিন্দরের শ্বশুরবাড়ি, বেহুলারও বাপের বাড়ি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রায় সকলেই এই কথা বলেছেন। উত্তররাঢ়েই যে উজানি ও চম্পকনগর দুয়েরই অবস্থান, তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় মুকুন্দরামেব 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে। জনার্দন পণ্ডিতের পাত্রনির্বাচন থেকে বণিকদের না৽ ও বাসস্থানের একটি তালিকা দিচ্ছি এখানে ঃ চম্পকনগরী—চাঁদসদাগর, বর্ধমান--ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাতগাঁ—রাম দাঁ, বড়শূল—হরি দত্ত, ফতেপুর— রাম কুণ্ডু, কর্জনা—হরি শাহা, ভাল্লকি—সোম চন্দ্র।

স্থানগুলি বর্ধমান ও হুগলি জেলায়। খুল্লনার পাত্রনির্বাচন-প্রসঙ্গের চেয়ে ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্নস্থান থেকে যে বণিকদের সমাগম হয়েছিল তার অনেক বেশি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। তালিকাটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য আছে। বণিকদের নামধাম এইভাবে দেওয়া হয়েছে ঃ বর্ধমানের ধুস দত্ত ; চম্পাইনগরের চাঁদসদাগর, লক্ষ্মীসদাগর ; কর্জনার নীলাম্বর ও তাঁর সাত ভাই ; গণেশপুরের সনাতন চন্দ ও তাঁর ভাই গোপাল, গোবিন্দ ; দশঘরার বাসুলা ; সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা ; সাঁকোর শঙ্খ দত্ত, বিষ্ণু দত্ত ও তাঁর সাত ভাই ; কাইতির যাদবেন্দ্র দাস ; জাড়গ্রামের রঘু দত্ত ; তেঘরার গোপাল দত্ত ; ত্রিবেণীর রাম রায় ও তাঁর দশ ভাই ; লাউগাঁর রাম দত্ত ; পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ ; সাতগাঁর রাম দাঁ ; বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবন্ত খাঁ ; খণ্ডঘোষের বাসু দত্ত ; গোতানের মধু দত্ত ও তাঁর ভাই, ইত্যাদি ঃ

একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাত শত বেনে আইসে ধনপতি ধাম ॥

প্রধানত রাঢ়দেশের বর্ধমান ও হুগলি অঞ্চলের বণিকদেরই নাম করেছেন কবিকঙ্কণ। সাতশত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতির গৃহে উজানিতে। কেবল কল্পিত সমাগম হলে এত বিস্তারিত বিবরণ মুকুন্দরাম কষ্ট করে দিতেন না। বিশেষ করে কবিকঙ্কণের সামাজিক বাস্তবতাবোধ এত সজাগ যে তিনি বণিকদের বাসস্থানের পরিষ্কার ভৌগোলিক নির্দেশ পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। বর্ধমানের উজানি চম্পাইনগর কর্জনা থেকে হুগলির সপ্তগ্রাম পর্যন্ত বণিকদের যে প্রতিপত্তি ছিল তা বোঝা যায়। এই বণিকরা কারা ? প্রধানত বাংলার সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিকেরা।

বর্ধমান ও হুগলি জেলা কেন্দ্র করে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী সংঘবদ্ধ বণিকসমাজ গড়ে উঠেছিল একসময়। মধ্যযুগের বাংলার অর্থ নৈতিক সামাজিক ইতিহাসে এই সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিকদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগে একালের মতো 'অবাধ বাণিজ্য' বলে কিছু ছিল না, সামন্তরাজাদের বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট। সাধারণত মধ্যযুগের ভূপতি ভূস্বামীরা বণিকদের সুনজরে দেখতেন না এবং নানাভাবে তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি খর্ব করার চেষ্টা করতেন। প্রধানত নদনদীর তীরে, জলপথে চলাচলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই বণিকরা বসতি স্থাপন করতেন। পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক ও তাম্বুলিবণিকরা প্রধানত নদনদীবহুল বর্ধমান ও হুগলি জেলায় এইভাবে একাধিক বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তার মধ্যে অনেক বসতি ক্রমে বাণিজ্যপ্রধান কেন্দ্ররূপে 'নগর'বলে পরিচিত হয়েছিল। কতকটা মধ্যযুগীয় 'গিল্ডে'র মতো তাঁরা দলবদ্ধভাবে 'সমাজ'ও গঠন করেছিলেন। মধ্যযুগের শেষে দেখা যায়, বাংলার সুবর্ণবণিক সমাজে এইভাবে দু'টি প্রধান সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল, একটি বর্ধমানের কর্জনা কেন্দ্র করে রাঢ়ী সমাজ আর-একটি সপ্তগ্রামিক সমাজ। রাষ্ট্রদুর্যোগে অথবা নদনদীর গতিপরিবর্তনের ফলে বাণিজ্যিক বিপর্যয়ে এই ধরনের 'সমাজ' ভেঙে গিয়েছে, আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে। সুবর্ণবণিক কুলজীতে বর্ধমানের 'কর্জনা'র সমাজ-ভাঙার কথা লেখা আছে :

> চৌদ্দশত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জনা,
> রাজপীড়ায় পীড়িত হইল সর্বজনা।
> বিশেষ বণিক সব ছিল সুখবাসী,
> পরিবার সহিত হইল নানাদেশী।
> নিকটে রহিল কেহ, কেহ গেল দূরে,
> নিবাস নিয়ম নাই কেবা তত্ত্ব করে।[১]

আসলে বাণিজ্যিক প্রাধান্যটাই বণিকসমাজের কাছে অগ্রগণ্য। বৈদেশিক আক্রমণ, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রাকৃতিক পরিবর্তনাদির (নদনদীর গতি) ফলে রাঢ়দেশের বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন কমতে থাকে, বণিকসমাজেরও তেমনি ভাঙন ধরতে থাকে। তারপর পর্তুগীজ ডাচ ফরাসী ইংরেজ আমলে এই বণিকরা ক্রমে তাদের পশ্চাদনুসরণ করে সপ্তগ্রাম থেকে হুগলি চুঁচুড়া হয়ে ক্রমে কলকাতা মহানগরীতে আসেন। ইংরেজ

[১] নিমাইচাঁদ শীলের 'সুবর্ণবণিক' ও কুঞ্জলাল ভূতির 'সুবর্ণবণিক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আমলে বাণিজ্যের অনেক বেশি সুযোগ ও স্বাধীনতা পেয়ে তাঁরা কলকাতার সমাজেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।

বর্ধমান জেলার গল্‌সি থানার অন্তর্গত মল্লসারুল গ্রামে আনুমানিক ষষ্ঠ খ্রীস্টাব্দের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে তাতে এই অঞ্চলের মহত্তরদের ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নাম আছে। তার মধ্যে এই নামগুলি উল্লেখ্য মনে হয় বণিকশ্রেণী প্রসঙ্গে :

বক্কত্তকবীথী-সম্বন্ধ অর্ধকরক-অগ্রহারেব মহত্তর হিম দত্ত ;
বটবল্লক অগ্রহাবের মহত্তর ষষ্ঠী দত্ত ও শ্রীদত্ত ;
গোধগ্র।ম অগ্রহারের মহি দত্ত ও বাজ্যদত্ত—

এই গ্রামগুলি অধিকাংশ এখনও বর্ধমানে আছে, যেমন 'বক্কত্তক' (অধুনা বাকৃতা), গোধগ্রাম (অধুনা গোর্গা) ইত্যাদি। মহত্তরদেব মধ্যে এই হিমদত্ত ষষ্ঠীদত্ত শ্রীদত্ত মহিদত্ত প্রভৃতি কারা? বণিকদের আদিপুরুষ ছাড়া তাঁবা অন্য কেউ নন। সুতরাং প্রায় দেড়হাজার বছব ধবে বর্ধমানে তথা উত্তববাঢ়ে এই গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি সদাগরবা যে বাস করছেন তাব প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে। শত শত বৎসর ধরে বাণিজ্য করে তাঁরা বংশানুক্রমে বিবাট সঞ্চিত মূলধনের মালিক হবেন, তাতে আশ্চর্য হবাব কিছু নেই। এই কারণে ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর, চাঁদ সদাগব, লখিন্দব প্রভৃতি বাংলা মঙ্গলকাব্যেব সদাগর-নায়কবা বর্ধমান জেলার এই সব অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়াই সম্ভব বলে মনে হয়। সাতশত ধনিক বণিক যে উজানিতে ধনপতিগৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন, দেড়-হাজার বছরের বাণিজ্যের ইতিহাসে তাও আদৌ অসম্ভব নয়। বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ইতিহাস যেদিন সত্যিই লেখা হবে সেদিন চম্পাইনগব, উজানিনগবের মতো আরও অনেক মধ্যযুগীয় নগরের ইতিহাস এবং চাঁদসদাগব ধনপতিসদাগরের মতো আরও অনেক সদাগরেব লক্ষ লক্ষ টাকা পুঁজিসঞ্চয়েব কাহিনীও নতুন করে লেখা হবে। তখন একথাও মনে হবে যে মঙ্গলকাব্যের কবিদের উজানিনগরের বর্ণনা, বা মধুকর দুর্গাবর শঙ্খচূড় চন্দ্রপাল ছোটমুটী গুয়াবেথী নাটশালা প্রভৃতি সদাগরী ডিঙার বর্ণনা কেবল নিছক কবিকল্পনা নয়, তার মধ্যে অনেকখানি ঐতিহাসিক সত্যও লুকিয়ে আছে।

প্রাচীন গৌড় ও রাঢ়ের ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রিক সীমানা তেমন নির্দিষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। সুতরাং বণিকরা গৌড়দেশ থেকে, অথবা রাঢ়দেশ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছেন কি না তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। গল্সী-মল্লসারুল কেন্দ্র থেকে

কর্জনা উজানি বর্ধমান চম্পাইনগর সাঁকো প্রভৃতি অঞ্চল খুব বেশি দূর নয়। মল্লসারুল তাম্রশাসনের মহত্তরদের মধ্যে যে দত্তদের নাম আছে তাঁরা এই সদাগরজাতিরই পূর্বপুরুষ বলে মনে হয়। মনে হবার একাধিক কারণ আছে। মল্লসারুল তাম্রশাসনের প্রায় একহাজার বছর পরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বণিকদের নামধাম বসতির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তার মধ্যেও 'দত্ত' উপাধিধারী অনেকের নাম আছে। গন্ধবণিক তাঁরা। আজও অজয় ও দামোদরের দুই তীরবর্তী অনেক গ্রামে গন্ধবণিক সুবর্ণ-বণিক তাম্বুলিবণিক প্রভৃতিদের বাস আছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে আজও অত্যন্ত অবস্থাপন্ন এবং গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বলে গণ্য। গ্রামের মধ্যে বিরাট বিরাট অট্টালিকার অধিকাংশই আজও এই বণিকদের অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নরূপে দাঁড়িয়ে আছে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কবি ঘনরাম লাউসেনকে উজানি-কোগ্রামের পাশে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বুলির গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন :

> গুরুগণি কর্জনা রাখিয়া দুইজনে।
> প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনীবদনে॥...
> হরিদাস তাম্বুলিসনে পথে দেখা।
> মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা॥

আজও যদি কেউ বর্ধমান জেলার মানকর গ্রামে যান তাহলে তাম্বুলিপাড়ায় পা দিলেই তাম্বুলিবণিকদের অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখে বিস্মিত হবেন। তেমনি অজয়-নদের ওপারে কেউ যদি বীরভূম জেলার কীর্ণাহার ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে যান, তাহলে এখনও 'দত্ত' উপাধিকারী গন্ধবণিকদের সমৃদ্ধি দেখে স্তম্ভিত হবেন। বর্ধমান ও হুগলি জেলার একাধিক গ্রামে আজও এই বণিকজাতির অতীত প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায়। বসতিগুলি সবই প্রায় নদীর তীর ধরে গড়ে উঠেছিল। শীর্ণকায় খাল বা শুকনো খাত ছাড়া সেই নদীর চিহ্ন নেই আজ। নদনদীর ভাঙা-গড়ার সঙ্গে বণিকদের ভাগ্য গড়েছে ভেঙেছে। ক্রমে নদীর তীর ধরেই সপ্তগ্রাম-হুগলি থেকে কলকাতা শহর ও অন্যান্য স্থানে তাঁরা আবার বাসা বেঁধেছেন।

এই বণিকজাতির প্রায় দেড়-হাজার বছরের একটা ইতিহাসের আভাস পাওয়া যাচ্ছে এখানে এবং এই রাঢ়দেশেই। তার মধ্যে বর্ধমান জেলার দামোদর অজয় খড়্গেশ্বরী (খড়িনদী) গাঙুর প্রভৃতি নদীর তীরবর্তী এই অঞ্চলগুলিতে বণিকজাতির পুরুষানুক্রমিক বসতির আভাস আরও অনেক স্পষ্টতর বলে মনেহয়। বিপ্রদাস মুকুন্দরাম ঘনরাম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের কবিরা তার বিবরণ দিয়েছেন। মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে মুকুন্দরাম-ঘনরাম পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর বা ত্রিশচল্লিশ

পুরুষের ব্যবধান। তার কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। কিন্তু তাম্রশাসনোল্লিখিত মহত্তররা যদি সকলেই নির্বংশ না হয়ে থাকেন তাহলে ত্রিশ-চল্লিশ পুরুষ পরে ধনপতি-সদাগর ও চাঁদসদাগরের কাহিনী মিথ্যা না হবার সম্ভাবনাই বেশি। অন্তত তাঁদের ধনদৌলত সঞ্চয় ও বাণিজ্যের কাহিনী অবাস্তব নয়। যে সাতশত প্রতিষ্ঠিত বণিকপরিবারের প্রতিনিধিদের সমাগম হয়েছিল ধনপতিগৃহে উজানিতে, তাঁরা কেউ হঠাৎ গজিয়ে ওঠেননি। তাঁদের স্থানীয় বসতিও এক-আধ শতাব্দীর নয়। বাংলার সদাগরদের প্রাচীন বসতি .ও বাণিজ্যকেন্দ্রের ভৌগোলিক সীমানার নির্দেশ যদি এইভাবে পাওয়া যায়, তাহলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা প্রায়ান্ধকার দিক অনেকটা আলোকিত হয়ে ওঠে। ধনপতি-শ্রীমন্ত, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনীর উৎপত্তিকেন্দ্র এবং চণ্ডী মনসা প্রভৃতি অনার্য দেবীপূজার সামাজিক প্রচলনেব পূর্ব-সংঘাতকেন্দ্র কোথায়, তারও আভাস পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত তথ্যাদি থেকে মনেহয়, এই কেন্দ্র রাঢ়দেশের মধ্যস্থলে কোথাও।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে বর্ধমানের এই অঞ্চলেই অনার্য দেবদেবী, অনার্য পূজাপদ্ধতি ও ধর্মাচরণের সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর সংঘাত ও বিরোধ হয়েছিল প্রথমে। বাঢ়ের সীমান্ত বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার ভিতর দিয়ে এই বিরোধেব ধারা প্রবাহিত হয়ে এসে হয়ত নিষ্পত্তিকালে রাঢ়কেন্দ্র বর্ধমানে তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। শিবের মতো দেবতারা অনেক আগেই এই সংঘাতের স্তর অতিক্রম করে এসেছিলেন। বাংলায় আর্যসংস্কৃতির বিস্তারের আগেই শিব হিন্দুদেবতামণ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন। চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। উদীয়মান বণিকজাতির পক্ষে মধ্যযুগে রাজধর্মেব অনুগত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অনার্য-সংস্কৃতির বাহক তাঁরা ছিলেন না। বৈদিকযুগ থেকেই আমরা দুঃসাহসী বণিক অভিযাত্রীর সন্ধান যখন পাই, তখন অনেকটা বোঝা যায় যে, এই সব বণিকজাতি প্রাগার্য সমাজভুক্ত নন। আর্যসুলভ ধর্মাচরণ, আচারব্যবহারই তাঁদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল বলে মনে হয়। তাঁরা ছিলেন বাংলার আর্য-সংস্কৃতির উত্তর-সাধক। তারই প্রতিভূ বলে তাঁরা গণ্য হতেন। শিবভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত অনেক আগেই তাঁরা হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেই সমস্যা মিটে যায়নি, বিশেষ করে বাংলা দেশে। বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিতে অনার্য-উপাদানের প্রাধান্য ছিল বেশি। চণ্ডী মনসা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রতিপত্তি খর্ব করা সহজসাধ্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ বা রাঢ়-দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরলে আজও পরিষ্কার দেখা যায়, এই সব জনদেবতার প্রাধান্য এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, চণ্ডী ও মনসার তো আছেই। বীরভূম

বাঁকুড়া জেলায় এমন গ্রাম আছে কিনা সন্দেহ যেখানে একাধিক স্থানে চণ্ডী ও মনসা প্রতিষ্ঠিত নেই। উল্লেখ্য হল, যেখানে ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন সেখানে চণ্ডী বা মনসা আছেন এবং প্রস্তরখণ্ডরূপে তাঁরা বিরাজ করছেন। বীরভূম বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানের ভিতব দিয়ে হুগলি-হাওড়া পর্যন্ত এই চণ্ডী-মনসা-ধর্মবাজের বেশ কযেকটি বিস্তৃত প্রতিপত্তিকেন্দ্রের বৃত্তরেখা টানা যায। নৃতত্ত্বের সাংস্কৃতিক সূত্র অনুযায়ী এই সব তথ্যাদি থেকে এইটুকু অনুমান কবা যায যে, ধর্মরাজ ও চণ্ডী-মনসাদি দেবতাব উৎপত্তি ও প্রচার হয়েছে এই অঞ্চলের একাধিক কেন্দ্র থেকে। অধিকাংশ সংস্কৃতি-বিজ্ঞানী আজকাল কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের এককেন্দ্রিক বিকাশে (Single Origin) বিশ্বাস করেন না, বহুকেন্দ্রিক বিকাশে (Multiple Origin) বিশ্বাস কবেন। তাই মনেহয, রাঢদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত একাবিক কেন্দ্রে এই আর্য অনার্যের আদর্শসংঘাত হযেছিল, ধর্ম চণ্ডী মনসাদি দেবদেবী নিযে। ব্রাহ্মণ-প্রধান ও বণিকপ্রধান গ্রাম্যসমাজগুলিই সংঘাতের অন্যতম কেন্দ্র হযে উঠেছিল। এই সংঘাতেব ফলে ধর্মরাজ শিবে পরিণত হযেছেন এবং চণ্ডী শীতলা মনসাদি দেবতা সমাজেব সর্বজনপজ্য হযেছেন। চণ্ডীমঙ্গল মনসামঙ্গল শীতলামঙ্গল ইত্যাদিব কাহিনীর মধ্যে এই সংঘাতেব রূপই ফুটে উঠেছে। সংঘাতকেন্দ্রেব মধ্যে বর্ধমানে উজানিনগর চম্পাইনগব ইত্যাদি অন্যতম। কাহিনীব মূল কাঠামোটি হযত অনেক আগে থেকে লোকমুখে লোকগাথা ইত্যাদিব মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। পরে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে গৃহীত হযেছে।

রাঢেব আবও অন্যান্য কেন্দ্রেব মতো উজানিনগরেও বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদেব প্রাধান্য ছিল মনে হয। বৌদ্ধ জৈন বৌদ্ধতান্ত্রিক ও হিন্দুতান্ত্রিকদেব বেশ প্রতিপত্তি ছিল এই অঞ্চলে। তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও পাওযা যায। 'পীঠমালা' গ্রন্থে উজানির উল্লেখ আছে :

উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বব শুভ যাঁবে সেবি॥

'তন্ত্রচুড়ামণির' মতেও দেখা যায, উজানিতে দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ও ভৈরব কপিলাম্বর বিবাজ করেন। 'শিবচবিত' গ্রন্থে উজানি মহাপীঠ বলে উল্লেখ করা হযেছে। 'কুব্জিকাতন্ত্রে' মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান নির্দেশ করা হযেছে। 'মঙ্গলকোষ্ঠ' নামে বিখ্যাত তান্ত্রিক কেন্দ্র ছিল ওড্ডিযানে, উত্তর-পশ্চিমে (ওড্র-উড়িষ্যা বা উজানি নয়)। বৌদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রে এই 'মঙ্গলকোষ্ঠের' উল্লেখ আছে। মনেহয, পরবর্তীকালে বাংলা

দেশে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাই উত্তর-পশ্চিমের 'মঙ্গলকোষ্ঠে'র অনুকরণে বাংলা 'মঙ্গলকোট' ও 'উজানি' নামকরণ করেন। সেই মঙ্গলকোটের দেবী বলে চণ্ডীর নাম হয় 'মঙ্গলচণ্ডী'। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দেওয়া নাম যদি হয়, তাহলে উজানি-কোগ্রাম-মঙ্গলকোট অঞ্চলে একসময় বৌদ্ধ তন্ত্রযানীদের যে প্রাধান্য ছিল মনে হয়। কোন্ সময় ছিল? পালরাজত্বকালে। মুসলমানদের অভিযানকাল পর্যন্ত হয়ত তার সামাজিক প্রভাব ছিল। বাকি তার যে লোকায়ত রূপ ছিল তা সহজিয়া সাধকরা এবং অজয়ের ওপারের দ্বিজ চণ্ডীদাস থেকে এপারের লোচনদাস পর্যন্ত প াবলী রচয়িতারা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন সহজেই। শ্রীখণ্ডের ইতিহাসও তাই।

উজানি-মঙ্গলকোটের তান্ত্রিক প্রাধান্যের স্মৃতি একটি নামের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের কবিরা চিরস্থায়ী করে রেখে গিয়েছেন। নামটি হল 'ভ্রমরার দহ'। আমার মনেহয়, নামটি তন্ত্রপ্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যদিও সহজে তা মনে হবার কথা নয়। উজানিনগরে যখন বণিকদের বসতি ছিল তখন তাঁদের বাণিজ্যডিঙা সব এই ভ্রমরার দহে নোঙর করা বা ডোবানো থাকত। ধনপতি দত্ত এই ভ্রমরার দহ থেকে ডিঙায় চড়ে সিংহলে বাণিজ্যযাত্রা করেছিলেন। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত দত্তও এই ভ্রমরার দহে সাতখানা সমুদ্রগামী পোত ভাসিয়ে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করেন:

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায়॥ —কবিকঙ্কণ

সদাগররা যখন স্বগ্রামেই থাকতেন, বাণিজ্যে যেতেন না, তখন ডিঙাগুলি ভ্রমরার জলে ডোবানো থাকত। বাণিজ্যযাত্রার আগে নৌকাগুলি জল থেকে তুলে মেরামত করে গাবকালি করা হত। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরি নামিয়ে ডিঙা তুলতে হত:

পূর্ব হইতে ছিল ডিঙা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে।
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুইজন॥

অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গমস্থলের পাশেই 'ভ্রমরার দহ'। গ্রামের লোকের এখনও সমাগম হয় এখানে। কিন্তু 'ভ্রমরার দহ' নাম কেন? 'ভ্রমরা' কি? দেবী চণ্ডী

ও দুর্গার একনাম ভ্রমরা বা ভ্রামরী। 'পীঠনির্ণয়ে' 'ভ্রমরাম্বা' দেবীর উল্লেখ আছে। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে দেবী বিন্ধ্যবাসিনীকে ভ্রমরবাসিনী বলা হয়েছে। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' দেবীর ভ্রমরার রূপধারণ ও ভ্রামরী নামের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্‌পদম্‌॥
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্‌।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্বতঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৯১ অঃ

অর্থ: "অসুর অরুণ নামে অসুর যখন ত্রিভুবনের বিপুল বাধা সৃষ্টি করবে, তখন আমি অসংখ্য ষট্‌পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্তি ধারণ করে, ত্রৈলোক্যের হিতার্থে তার বিনাশ করব। তখন লোকে আমাকে 'ভ্রামরী' বলে স্তব করবে।" উজানির দেবী মঙ্গলচণ্ডী ভ্রামরী বা ভ্রমরা নামেও খ্যাত ছিলেন এবং তাঁরই নামে ঐ দহের নাম হয়েছে।

উজানি-কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে একটি অতিসুন্দর বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি এখনও আছে। লোচনদাসের পাটের কাছে একটি জৈন তীর্থংকরের মূর্তি ছিল, সেটি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' জন্য সংগ্রহ করে এনেছিলেন। বুদ্ধমূর্তিটি রাখালদাস অনেক চেষ্টা ও অনুনয়বিনয় করেও স্থানান্তরিত করতে পারেননি। কবি কুমুদরঞ্জনের মুখে শুনেছি অজয় ও কুনুরের গর্ভ থেকে প্রচুর বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং যে, ছোটবড় ভাঙাচোরা নানারকমের মূর্তি। চামুণ্ডার মূর্তি, মহিষমর্দিনীর মূর্তি ইত্যাদি। অনেক মূর্তি গ্রামের বাইরে চলে গিয়েছে, বিতরণও করা হয়েছে। যে বুদ্ধমূর্তিটি এখনও আছে তার অনাড়ম্বর চালচিত্র ও প্রভামণ্ডল থেকে বোঝা যায়, বেশ প্রাচীন মূর্তি। পালযুগের মূর্তি, নবম-দশম শতাব্দীর পরের নয়। জৈনমূর্তিটি তীর্থংকর শান্তিনাথের মূর্তি বলে নির্ধারিত হয়েছে (রাখালদাস)। এরকম আরও অনেক বৌদ্ধ ও জৈনমূর্তি এখান থেকে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে একটি জৈন দিগম্বর মূর্তি (কবি কুমুদরঞ্জনের মুখে শুনেছি) কোগ্রাম-মঙ্গলকোটের অনতিদূরে নবোডিহি গ্রামে (এখন শঙ্করপুর বলে পরিচিত) 'ন্যাংটেশ্বর' শিব বলে পূজিত হচ্ছেন। দিগম্বর জৈন তীর্থংকরের 'ন্যাংটেশ্বর' নামটি যথার্থ হয়েছে। পাথরের বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবমূর্তিও অনেক পাওয়া গিয়েছে উজানি থেকে।

এই সমস্ত পাথুরে নিদর্শন, 'ভ্রমরার দহ' নাম, মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাহিনী ইত্যাদি থেকে এইটুকু বেশ বোঝা যায় যে, মঙ্গলকোট-কোগ্রাম-উজানি অঞ্চলে একসময় চণ্ডী-মনসা-ধর্মরাজ ইত্যাদির অনার্য পূজারীদের বেশ প্রাধান্য ছিল। তন্ত্রযানী বৌদ্ধধর্মের প্রসারও হয় সেইজন্য এই অঞ্চলে। তারপর হিন্দু তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সহজিয়া বাউলরা তা আত্মসাৎ করে ফেলেন অনায়াসে। আদর্শগত সংঘাত ও বিরোধ যে হয়নি তা নয়। শৈবধর্মী বাংলার সদাগররা সহজে লোকায়ত ধর্মকে মানতে চাননি। লোকসাধারণের প্রতিনিধি নারী বা নায়িকার মাধ্যমে এই লোকায়ত ধর্মের প্রচার করা হয়েছে। সেই সংস্কৃতি-সংঘাত ও সমন্বয়ের বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে (রাঢ়দেশে) উজানি-কোগ্রাম-মঙ্গলকোটও অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এই অঞ্চলের বণিকজাতির আধিপত্য এই সংঘাতের অন্যতম কারণ।

সং যো জ ন

বাংলা ১৩২০-২১ সালে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকজন সঙ্গীসহ (হরিদাস পালিত, মণীন্দ্রমোহন বসু) উজানি-মঙ্গলকোট পর্যটন করেন। তিনজনের স্বাক্ষরিত একটি বিবরণ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কার্যবিবরণে (১৩২২ সাল) প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত হল:

"উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগবতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজানি বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেরই তীর্থস্থান।··মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া পূর্বমুখে প্রবেশ করিতে হয়। বর্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ঘে ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফুট। মন্দির মধ্যে কাঠের সিংহাসনের উপরে পিত্তলময়ী দশভুজা মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান রহিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তরের বৃষ। বামে প্রস্তরের পলতোলা কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গমূর্তি, ইহারই নাম কপিলেশ্বর। বুদ্ধমূর্তিটি উর্ধ্বে ১′—৯″, প্রস্থে ১′, পুরু ৩″।···মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরপূর্বকোণে গমন করিলে 'লোচনদাসের পাটে' উপস্থিত হওয়া যায়। লোচনদাসের সমাধিগৃহটি ক্ষুদ্র ও ইষ্টকনির্মিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণমুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। এই সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ১৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২ ফুট ১ ইঞ্চি। গৃহের মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (Pyramidal) সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধিগৃহপ্রবেশের দ্বারের উভয়পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরের দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আবদ্ধ রহিয়াছে। মূর্তিদ্বয় অতি সুন্দর

ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।” বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগৃহীত জৈন তীর্থংকরের মূর্তি সম্বন্ধে রাখালদাস লিখেছেন, “মূর্তিটি দিগম্বর, কাল প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় ২৩।।০ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৪।।০ ইঞ্চি, স্থূলতায় ৩ ইঞ্চি। মূর্তির মস্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঢক্কা কোন অদৃশ্য বাদক কর্তৃক ধ্বনিত! হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে দুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তন্নিম্নে মালাহস্তে দুইটি উড্ডীয়মান অপ্সরা মূর্তি, তাহাদের নিম্নে, মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দেবমূর্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শ্মশ্রুবিমণ্ডিত, তাহার এক হস্তে গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা। দ্বিতীয় মূর্তিটি ধ্যান মুদ্রায় অবস্থিত। তৃতীয়টির দক্ষিণ হস্তে গদা আর বামহস্তে জানুদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মূর্তির দক্ষিণহস্তে অভয়মুদ্রা, বাম হস্তে বরদমুদ্রা এবং তাহার শ্মশ্রুও বিদ্যমান রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচটি মূর্তিব মধ্যে প্রথমটির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট। দ্বিতীয় মূর্তির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিম্ন মূর্তির দুই হস্তেহ পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্থটি পুরুষের উর্ধ্বাঙ্গের মূর্তি, তাহাব দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ডল রহিয়াছে। সর্বনিম্ন মূর্তির উপরার্ধ কোনো স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি এবং নিম্নার্ধ সর্পপুচ্ছবৎ, তাহার দক্ষিণ হস্তে অসি ও বামহস্তে চর্ম বিদ্যমান। এই নয়টি মূর্তিই আসনে উপবিষ্ট। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে এই মূর্তি নয়টি নবগ্রহের। ইঁহাদের নিম্নে তীর্থংকরের দুই পার্শ্বে দুইটি চামরধারী পুরুষমূর্তি, তাঁহারই ন্যায় দুইটি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহাব মধ্যভাগে তীর্থংকরের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগমূর্তি। এই লাঞ্ছন দেখিয়া মূর্তিটিকে ষোড়শতম তী'ংকর শান্তিনাথ অবধূত বলা হইয়াছে (Indian Antiquary, Vol. 2, P. 138)।’
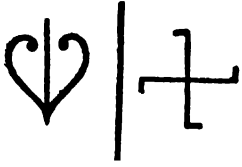
মঙ্গলকোট

বর্ধমানের মঙ্গলকোট পশ্চিমবাংলার ঐতিহাসিক মুসলমান সংস্কৃতিকেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু মুসলমানযুগ থেকে এই অঞ্চলের ইতিহাস শুরু হয়নি। তার পূর্বেও একটা ইতিহাস ঐতিহ্য ছিল এই অঞ্চলের। পাণ্ডুয়া ভুরশুট ইত্যাদির মতো মঙ্গল-কোটেরও ছিল। উজানিপ্রসঙ্গে বলেছি, পালযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিকরাই হয়ত উত্তর-পশ্চিমের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র 'উড্ডিয়ান' ও 'মঙ্গলকোষ্ঠের' অনুকরণে রাঢ়ের উজানি ও মঙ্গলকোটের নামকরণ করেছিলেন। কোনো হিন্দু-সামন্তরাজার গড়বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ ছিল মঙ্গলকোটে (বিক্রমকেশরীর ?) এবং তারই পাশে নদীতীরে উজানিতে বাংলার হিন্দু সদাগররা একটি বিখ্যাত বাণিজ্যনগর গড়ে তুলেছিলেন।

উজানির ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন দুর্ধর্ষ অজয়ের গর্ভে যেমন বিলীন হয়ে গিয়েছে, মঙ্গলকোটের তা যায়নি। কুনুরের মধ্যস্থতায় মঙ্গলকোট তার কীর্তির ধ্বংসাবশেষসহ আজও টিকে রয়েছে। মঙ্গলকোটের মাটিতে পা দিলেই তা বোঝা যায়। গ্রামের পথে পথে, পথের আশেপাশে ইঁটপাথরের অফুরন্ত টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। সরু সরু পথ, যেন ইঁট দিয়ে গাঁথা। অথচ পাকা ইঁটের পথ নয়, কাঁচা পথ। ইঁটগুলো সব সমাধিস্থ ঘরবাড়ির নিদর্শন। বেশ প্রাচীন সুসমৃদ্ধ জনপদের ছাপ মঙ্গলকোটের সর্বাঙ্গে।

স্থানীয় কোনো হিন্দু সামন্তরাজার গড়দুর্গ ছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু কে সেই রাজা, তাঁর নাম গোত্র কি, ইতিহাস কি, তা জানবার কোনো উপায় নেই। কবিরা বিক্রমকেশরী রাজার কথা বলেছেন :

বিক্রমকেশরী তাঁহার নগরী
আছে কত সদাগর

কে এই বিক্রমকেশরী? রাজার কাব্যিক বিশেষণ, না রাজা নিজে? জানবার উপায় নেই। অর্বাচীন 'বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য' গ্রন্থে এই বিক্রমকেশরী ও তাঁর পূর্বের এক শ্বেতরাজার উল্লেখ আছে:

শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যসন্ধো মহোদারঃ সত্যবাগ্‌দান তৎপরঃ ॥
রাজ্য কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অস্য প্রতিষ্ঠিতম্ ॥

শ্বেত নামে এক মহাদানশীল উদার রাজা ছিলেন, মঙ্গলকোটে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি শৈবধর্মী ছিলেন। রাঢ়ের সদাগররাও শৈবধর্মী ছিলেন। রাজনীতি তথা রাজার বাণিজ্যনীতির সঙ্গে তাঁদের বিরোধ থাকলেও, রাজধর্মের সঙ্গে বিরোধ ছিল না। বিরোধ ছিল লৌকিক ধর্মাচরণের সঙ্গে। কেউ কেউ বলেন, মঙ্গলকোটে হয়ত গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের এক শাখার বংশধররা রাজত্ব করতেন (বর্ধমান গেজেটিয়ার)। অনুমান সত্য হতেও পারে, কারণ অমরাগড ভাল্কী দিগনগর মঙ্গলকোট গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজাদের স্মৃতিবিজড়িত। সদ্‌গোপ রাজারাও শৈবধর্মী ছিলেন। এ ছাড়া মঙ্গলকোটে নূতনহাটের কাছে হুসেন সাহের আমলের প্রাচীন মসজিদে পাথরের উপর একটি খোদিত লিপি আছে। তাতে শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম আছে। কে এই চন্দ্রসেন? বাংলার রাজকাহিনীতে এঁরও কোনো পরিচয় নেই। তবু বর্ধমানের সেনভূম সেনপাহাড়ী ইত্যাদি নামের সঙ্গে যে 'সেন' জড়িত আছে, মনেহয় তা সেনবংশের রাজাদের স্মৃতি বহন করছে। বাংলার সেনরাজাদের পূর্বপুরুষরা রাঢ়দেশেই প্রথমে এসেছিলেন। চন্দ্রসেন তাঁদের বংশের কেউ হতে পারেন এবং তাঁর রাজধানী এই অঞ্চলে থাকা আশ্চর্য নয়। আবার বিক্রমকেশরী নামেও কোনো সামন্তরাজা থাকতে পারেন, হয়ত গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজবংশধরই কেউ। এখন কোনো প্রমাণ নেই তার। 'বিক্রমাদিত্যের ডাঙা' বা বিক্রমজিতের বাড়ির ঢিবি আছে একটি মঙ্গলকোটে এবং সেই ঢিবি কেন্দ্র করে এই কিংবদন্তী। এরকম অনেক বিক্রমাদিত্য ও অনেক রাজা বহু গ্রামের ঢিবির তলায় বিরাজ করছেন, জনমনের কল্পনারাজ্যে। ধনদৌলত ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি যাঁর থাকে, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা যিনি, তিনি সাধারণ মানুষের কাছে 'রাজা'। আজও অসহায় দরিদ্র যারা, তারা ধনীদের 'রাজা' বলে।

সুতরাং মধ্যযুগে 'রাজা' হওয়া 'খুব কঠিন ছিল না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ স্থানীয় জমিদার-জায়গীরদার ও সামন্তরা সহজেই জনসাধারণের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব পেতেন, সম্রাটের শীলমোহরের প্রয়োজন হত না তার জন্য। গ্রামে গ্রামে যে রাজার প্রাচুর্য দেখা যায় বাংলা দেশে এবং সেই রাজাদেব স্মৃতিবিজড়িত অসংখ্য ঢিবি, মজা দীঘি-পুষ্করিণী অথবা ভাঙা অট্টালিকা, তাব অধিকাংশই অখ্যাত স্থানীয় সামন্তদের স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া কিছু নয়। তাঁদের অখণ্ড প্রতাপের যুগ শেষ হয়েছে, আজ কেবল শূন্য ঢিবিতে কিংবদন্তীর ঘুঘু বিচবণ করছে, সেই 'এক যে ছিল রাজার'!

সেইরকম একজন সামন্তরাজা হয়ত মঙ্গলকোটেও ছিলেন। প্রতাপপ্রতিপত্তি হয়ত তাঁর একটু বেশিই ছিল। হতে পারে, তিনি গোপভূমের শৈবধর্মী সদ্‌গোপ রাজাদের বংশধর, অথবা সেনরাজবংশের কেউ। সেনবংশীয় কেউ হলেও শৈবধর্মী হওয়াই সম্ভবপর। যেই হন তিনি, মঙ্গলকোটে বেউড়বাঁশবেষ্টিত দুর্গে তিনি বাস করতেন। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল তার সীমানা। থাকাই স্বাভাবিক, কারণ রাঢ়দেশের অভ্যন্তরে এই সব দুর্গম অঞ্চলেব সামন্তরা একরকম নিশ্চিন্তেই বাস করতেন, রাষ্ট্রদুর্যোগেব ঝড়ঝঞ্ঝা তাঁদের বিশেষ স্পর্শ করতে পারত না। অতএব

রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে একমাস—

এই ধরনের গড়বেষ্টিত বিস্তৃত রাজধানী গড়ে, গদীয়ান হয়ে বসে রাজত্ব করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। উজানি-মঙ্গলকোট যে সত্যই সুসমৃদ্ধ সুবিস্তৃত জনপদ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবিকঙ্কণ যে প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে। "স্থান মঙ্গলকোট, উজাবনী গ্রাম" এই কথা থেকেই বোঝা যায়, উজানি ও মঙ্গলকোট পৃথক ছিল। উজানির বণিকপল্লীর পাশে কায়স্থপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া পার হয়ে মঙ্গলকোটে রাজদর্শনে যেতে হত:

বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া ॥
প্রবেশে ব্রাহ্মণপাড়া হয়ে হরষিত।…
কাড়িয়া জাঙ্গাল এড়ে বামন শাসন।
ভূপতির দ্বারে আসি দিল দরশন ॥

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও উজানি-মঙ্গলকোটের এই সামাজিক রূপ অনেকটা বজায় ছিল। আরও আগে, মুসলমান অভিযানের পূর্বে মঙ্গলকোটের সমৃদ্ধি অনেক বেশি ছিল বলে মনেহয়। মুসলমান অভিযানের প্রথম পর্বে রাঢ়দেশের সংঘাতকেন্দ্রের মধ্যে মঙ্গলকোট ছিল অন্যতম। কোন্ সময় এই অভিযান হয় রাঢ়দেশের এইসব অঞ্চলে ?

বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর সময় নয়। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'-তে বখ্‌তিয়ারের অভিযানের যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তাতে মনেহয় তিনি দক্ষিণ বিহার থেকে বাংলার রাজধানী নদীয়ায় হঠাৎ অতর্কিতে ছদ্মবেশে এসে এটি দখল করেছিলেন। রাঢ়দেশ সম্পূর্ণ জয় করে আসেননি। লক্ষোর বা নগরে (বীরভূম জেলার রাজনগরে) একটি মুসলমান ঘাঁটি ছিল বটে, কিন্তু তার প্রভাব কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা যায় না।[১] বখ্‌তিয়ারের পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিল্‌জী (১২১৩-২৭ খ্রীঃ) যখন গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন, তখন গঙ্গরাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমের (১২১১-৩৮ খ্রীঃ) বীর মন্ত্রী বিষ্ণু বাংলাদেশ অভিযান আরম্ভ করেন। পশ্চিম সীমান্তে মুসলমান ঘাটি লক্ষোর (রাজনগর) গঙ্গমন্ত্রী দখল করেন এবং উড়িষ্যার যাজপুর পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন। এই গঙ্গ-অভিযানের ফলে মুসলমান অভিযাত্রীদের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয় এবং তাঁরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এই সময় ইসলামের মর্যাদা ও সুলতানের সম্মান রক্ষার জন্য রীতিমতো জিহাদের (ধর্মযুদ্ধের) জিগির তোলা হয়! গিয়াসউদ্দীন লক্ষোর অভিযান করে পুনরুদ্ধার করেন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর। গঙ্গসেনার সঙ্গে সুলতান সেনাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয় রাঢ়দেশে (১২১৪-১৫ খ্রীঃ)। লক্ষোর পুনর্দখল করে গিয়াসউদ্দীন গঙ্গসেনাদের প্রায় বিষ্ণুপুর পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। বীরভূমের রাজনগর থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও দক্ষিণ-উড়িষ্যা পর্যন্ত সুলতান গিয়াসউদ্দীনের এই অভিযানের সময় অজয় ও দামোদরের মধ্যবর্তী যে সমস্ত অঞ্চল সুলতানের পদানত হয়, তার মধ্যে মনেহয় মঙ্গলকোট অন্যতম। এই সময় থেকেই মঙ্গলকোটের মুসলানযুগের ইতিহাসের সূচনা হয়। জিহাদের জিগির তুলে সুলতান তখন নিরুৎসাহ ইসলামধর্মীদের উৎসাহিত করছিলেন। রাঢ়দেশে এই জিহাদে যারা অনেকটা সহজে আত্মসমর্পণ করেছিল, তারা হিন্দুসমাজের অবহেলিত সম্প্রদায়,—বৌদ্ধতান্ত্রিক ও অন্যান্য লৌকিক ধর্মপন্থীরা। তবু রাঢ়দেশে ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা উৎসাহী গাজীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তার কারণ রাঢ়ের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক

১ বীরভূম জেলার 'রাজনগর' দ্রষ্টব্য।

ঐতিহ্য বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি প্রাচীন ও দৃঢ়মূল ছিল। দুই ধর্মের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল রাঢ়ের যেসব কেন্দ্রে, মুসলমান অভিযানের প্রথমপর্বে, তার মধ্যে মঙ্গলকোট অন্যতম। সংঘাতের প্রাথমিক পর্ব শেষ হবার পর, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যুক্তধারার মিলনও হয়েছে রাঢ়দেশে। বর্ধমানে পীর ও পীরস্থানের সংখ্যা অল্প নয়। হিন্দুরা যেমন পীরস্থানে পূজামানত করেন, মুসলমানরাও তেমনি ধর্মরাজ মনসাদির কাছে পাঁঠাবলি দেন ও মানত করেন। এই মিলন ও সমন্বয়ের নিদর্শন মঙ্গলকোটেও রয়েছে।

মঙ্গলকোট আঠার আওলিয়ার স্থান বলে পরিচিত। 'আলি' অর্থে সাধুপুরুষ, বহুবচনে 'আওলিয়া'। আঠারজন মুসলমান সাধুপুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত মঙ্গলকোট বাংলার মুসলমানদের অন্যতম তীর্থস্থান বললেও বিশেষ ভুল হয় না। মঙ্গলকোট-নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে ইতিহাস বলেছিলেন তা সংক্ষেপে এই: মঙ্গলকোটে বিক্রমজিৎ নামে এক হিন্দুরাজা ছিলেন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময় সতেরজন (না, আঠার ?) ধর্মযোদ্ধা বা গাজীসাহেব কাফেরদের পরাজিত করে মঙ্গলকোট দখল করতে আসেন। ধর্মযুদ্ধে গাজীরা একে-একে নিহত হন, মঙ্গলকোটে তাঁদের সমাধি আছে। শেষে গজনবী নামে একজন গাজী বা পীর মঙ্গলকোট অধিকার করেন এবং হিন্দুরাজা নিহত হন। গাজী ও পীরদের মধ্যে তিনি নাম করেছিলেন এঁদের: ১. মহম্মদ ২. হাজি ফিরোজ ৩. গোলাম পঞ্জতন ৪. মহম্মদ ইসমাইল গাজী ৫. আবদুল্লা গুজরাটি ৬. মকদুম বিলায়েৎ ৭. গজনবী। মঙ্গলকোটের আঠারজন আওলিয়ার সকলের নাম জানা যায় না। পীর পঞ্জতনের মেলা হয় আজও মঙ্গলকোটে। আমরা যে সমাধিগুলি দেখেছি মঙ্গলকোটে, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল, দানেশমন্দ খাঁয়ের সমাধি, আবদুল্লা গুজরাটির সমাধি, শাহ জাকের আলির সমাধি।

দানেশমন্দ খাঁ মহাপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দুমুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তাঁর মতো পাণ্ডিত্য উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন আর কারও ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর সমাধির গায়ে শিলাফলকে উৎকীর্ণ নাম হল 'হামিদ দানেশমন্দ বাঙ্গালী'। তিনি নিজেকে সর্বাগ্রে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে নিশ্চয় গর্ববোধ করতেন এবং হিন্দু-মুসলনান সকলের উপরে তাঁর 'বাঙালী' পরিচয়টিই বড় ছিল বলে দানেশমন্দ নামের পাশে 'বাঙ্গালী' লিখতেন। শোনা যায়, দানেশমন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়

পেয়ে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে ৯৪,০০০ মুদ্রা দান করেন এবং সেই অর্থ দিয়ে তিনি মঙ্গলকোটের মসজিদ নির্মাণ করেন। দানেশমন্দের সমাধিলগ্ন শাহজাহানের আদেশে তৈরি একটি প্রাচীন মসজিদ আছে, এখন পুনর্গঠিত।[১] মসজিদের গায়ে শিলাফলকে যে লিপি খোদিত আছে, তার একাংশ হল (অনুবাদ) :

"এই মসজিদ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট সাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছে। যদি এর নির্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে ওকে বয়তুল আতিক বলবে, বলে সম্বোধন করবে, হিঃ ১০৬৫।"

হিজরি ১০৬৫, অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ সালে মসজিদটি তৈরি। এই মসজিদটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ আছে মঙ্গলকোটে। তার মধ্যে একটি মসজিদ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়, ষোলইঞ্চি লম্বা ও তিনইঞ্চি পুরু টালির মতো ইট দিয়ে গাঁথা। খিলানের গাঁথনির দক্ষতা জীর্ণতার মধ্যেও বোঝা যায়। স্থানীয় প্রবীণরা কেউ মসজিদটি সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না। মঙ্গলকোটে নূতনহাটের কাছে আর-একটি প্রাচীন মসজিদ আছে, হুসেনশাহের আমলে তৈরি। হুসেনশাহী মসজিদ বলে খ্যাত। মসজিদটি বিশাল একটি উঁচু মৃত্তিকাস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় বিশহাত হবে। অনেকে মনে করেন, এটি বৌদ্ধদের স্তূপ হতে পারে। হওয়া আশ্চর্য নয়, যদিও খননের আগে কিছু বলা যায় না। তবে এতখানি উঁচু একটি বিরাট স্তূপের ভিত্তির উপর মসজিদ প্রতিষ্ঠার কারণ কি বোঝা যায় না। একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের খোন্তাকোদালই এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে। মসজিদের খিলান ইট লতাপাতাফুলের চমৎকার নক্সা এবং প্রচুর বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আরও বিস্ময়কর। এই মসজিদেই চন্দ্রসেনের নামোৎকীর্ণ শিলাফলক আছে। বড় বড় শিলাখণ্ডগুলি মসজিদের সঙ্গে গাঁথা, অনেক শিলাখণ্ড চারিদিকে ছড়ানো। মূর্তি বা অন্যান্য নিদর্শন এই ধ্বংসস্তূপ থেকে আর-কিছু পাওয়া গেছে কিনা, কেউ বলতে পারেন না। না পারলেও, মসজিদের চারিদিকে ও দেযালের গাযে গাঁথা শিলাখণ্ড ইত্যাদি দেখে মনে হয়, হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো ধর্মস্থানের ধ্বংসের স্মৃতিচিহ্ন হতে পারে। তাই দিয়েই মসজিদ তৈরি হয়েছিল।

গাজীপীরসাহেবদের কীর্তিকাহিনী মঙ্গলকোটের এইসব নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। মঙ্গলকোট যে রাঢ় অঞ্চলের মুসলমানসমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান

১ দানেশমন্দ সম্রাট শাহজাহানের দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং শাহজাহান তাঁর গুরুর সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে একবার মঙ্গলকোটে এসেছিলেন শোনা যায়। পরবর্তী সংযোজিত অংশ দ্রষ্টব্য।

কেন্দ্র ছিল, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মতো মহাপণ্ডিত যেখানে বাস করতেন, আঠারজন আওলিয়া এসেছিলেন যেস্থানে, সেখানে যে মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদি ছিল এবং রীতিমতো বিদ্যাচর্চা হত, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। সংঘাতের পর তাই হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির আদর্শ-সমন্বয়ও হয়েছিল মঙ্গলকোটে। আজও মঙ্গলকোট মুসলমানপ্রধান এবং কাজী নওয়াজ খোজা সাহেব, খোন্দকার মোফজুলুখ কাদির, মোল্লা আবদুল হাই, মৌলানা মহম্মদ প্রভৃতির পরিবার ও বংশধর যাঁরা মঙ্গলকোটে বাস করেন তাঁদের উদার ও নির্বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই বিস্ময়কর। মঙ্গলকোট শুধু বাঙালী মুসলমানদের কাছে পবিত্র স্থান নয়। এখানকার মেলায় ও উৎসবে বাংলার বাইরে থেকেও মুসলমানরা আসেন। 'হামিদ দানেশমন্দ বাঙালীর' তিরোধান উৎসব হয় ফাল্গুন মাসে। শাহ জাকের আলি কাদেরির মৃত্যুবার্ষিকীও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মকদুম শাহ আবদুল্লা গুজরাটিরও মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব হয়। পীর পঞ্জতনের মেলা হয়। এইসব উৎসব-মেলায় দেশ-বিদেশের মুসলমানরা মঙ্গলকোটে সমবেত হন। কারণ 'আঠার আওলিয়ার' স্থান মঙ্গলকোটকে তাঁরা পবিত্রস্থান বলে মনে করেন। হিন্দুদেরও উৎসব-মেলা হয়। হিন্দুদের গ্রাম্যদেবতাও গ্রামের মধ্যস্থলে আপন মহিমায় বিরাজ করছেন দেখেছি। রাজনীতির কাটাখাল দিয়ে কোনো বিদ্বেষের স্রোত প্রবেশ করে মঙ্গলকোটের পরিবেশকে কলুষিত করতে পারেনি। দানেশমন্দের সর্বশাস্ত্রচর্চা সার্থক হয়েছে মঙ্গলকোটে সবদিক দিয়ে, মৌলানা হামিদ দানেশমন্দ 'বাঙ্গালীর'।

সং যো জ ন

এস. এস. এম. আন্ওয়ারুল মজিদাল হুসেন বৈশাখ ১৩২১ সালের মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) 'মঙ্গলকোট সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ' নামে প্রবন্ধ লেখেন (৭০৯-১৬ পৃষ্ঠা)। গুরুত্ববোধে প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

"...মোসলেমবিজয়ের পর হইতেই মঙ্গলকোট হইতে চিরদিনের জন্য হিন্দুপ্রাধান্য লুপ্ত হইয়াছে। তদবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যা বুদ্ধি আভিজাত্য ঐশ্বর্য প্রতাপ প্রতিপত্তি সম্ভ্রম সদাচার ও জনসংখ্যা—সকল বিষয়েই মোসলেমগণই এখানে নিরবচ্ছিন্ন আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মঙ্গলকোটের মোখাদেমগণ বঙ্গদেশে সকল বিষয়েই বরেণ্য ও সুপরিচিত। এখানে বহুসংখ্যক মোসলেম সাধুপুরুষের সমাধি আছে; তন্মধ্যে মঙ্গলকোটের বাজার নামক স্থানের সুপ্রসিদ্ধ সমাধি মন্দিরটি

পরলোকগত মৌলানা মখদুম হামেদ দানেশের মন্দির। মখদুম হামেদ দানেশমন্দ, হিজরীর দ্বিতীয় সহস্রের, সমগ্র মোসলেম-জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আউলিয়া, ও এমামতরিকা জনাব হজরৎ সেখ আহমদ সর্হিন্দী মরহুম মগফুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই মখদুমের নিকট তৈমুরবংশাবতংস দিল্লীশ্বর সম্রাট সাহাবদ্দিন মহম্মদ শাহজাহান দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুপবিত্র সমাধিমন্দিরের নানাস্থানে স্থাপিত আরবী অক্ষরখোদিত প্রস্তরফলকগুলি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, ধর্মপ্রাণ সম্রাট শাহজাহান স্বীয় ধর্মগুরুর শুভাশীর্বাদ লাভেচ্ছায় মণিময় ময়ূরসিংহাসন ও ভূস্বর্গ দিল্লী ত্যাগ করিয়া একবার মঙ্গলকোটে শুভাগমন করিয়াছিলেন, এবং ধর্মগুরুর অতিথি-শালা ও মাদ্রাসার ব্যয়নির্বাহার্থ প্রভূত জায়গীর দিয়া গিয়াছিলেন। ঐসকল জায়গীর বহুকাল পর্যন্ত মখদুমের স্থলাভিষিক্তগণের ভোগদখলেই ছিল। এক্ষণে বৃটিশ আইনের আবর্তে পতিত হইয়া ঐ সমুদয় সম্পত্তি মুড়াগাছির বাবুদিগের অধিকারে আসিয়াছে। সম্রাট শাহজাহান মঙ্গলকোটে আসিবার সময় মঙ্গলকোটের দুই ক্রোশ পশ্চিমে জাহানাবাদ নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, এবং আধ্যাত্মিক ধনে ধনবান গুরুর নিকট পার্থিব আড়ম্বরের সহিত গমন করা নিতান্ত অকর্তব্য বুঝিয়া, জাহানাবাদ হইতে দীন হীনভাবে পদব্রজে মঙ্গলকোটে আগমন করেন। বলা বাহুল্য যে, জাহানাবাদে তখন কেহ লোকজন বাস করিত না, এবং তখন উহার জাহানাবাদ আখ্যাও ছিল না, তখন উহা নদীতীরস্থ নিবিড় জঙ্গলময় স্থানমাত্র ছিল। সম্রাটের শিবির-সংস্থাপনের পর হইতেই পার্শ্ববর্তী গ্রামের আদিবাসীদিগের যত্নে ঐ স্থানে গ্রাম বসিয়াছে ও জাহানাবাদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই গ্রাম নীল ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্রস্থান ছিল; নীলকর সাহেবদিগের কুঠি ও কারখানা প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; অবশ্য তাহাদের আর সে পূর্বাবস্থা নাই।...

"সে যাহা হউক, মখদুম সাহেবের পবিত্র সমাধি-মন্দির এক্ষণে নিতান্ত জীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। যে বাটীতে সমাধি-মন্দির বিদ্যমান, সেই বাটীটি খুব প্রকাণ্ড ও চতুর্দিকে ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। বাটীটি ৭।৮ বিঘার কম হইবে না। এই বাটীর মধ্যে পুস্তকাগার, মাদ্রাসা, অধ্যাপকদিগের আবাসভবন, অতিথিশালা, নহবৎখানা, অন্দরমহল ও মসজিদ—এই সমস্ত পুণ্যকীর্তি বিরাজিত ছিল; অধুনা ঐ সমুদায় পুণ্যকীর্তির চিহ্নগুলি মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে ঐ প্রকাণ্ড বাটীতে দিবাভাগে প্রবেশ করিতেই ভয় হয়।...এই সমাধি বাটীর ঈশান কোণে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে; তাহার

উপর হইতে তলদেশ পর্যন্ত পাকা ও চতুর্দিকেই সোপানবলী দ্বারা সুশোভিত। এই পুষ্করিণীর তলদেশে কি আছে দেখিবার জন্য, সম্প্রতি গ্রামের লোক মিলিয়া কৌতূহল-পূর্ণ চিত্তে ইহার জল 'দুণী' দ্বারা মারিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, চতুর্দিকের সোপানশ্রেণীর উপর হইতে নিম্নদিকে বহুদূর পর্যন্ত গিয়া হঠাৎ শেষ হইয়াছে। যেখানে সোপানগুলি শেষ হইয়াছে, সেইখানে চারিদিকের ইটের গাঁথনী ঠিক খাড়াভাবে নিম্নমুখী হইয়া তলদেশ স্পর্শ করিয়াছে। এই খাড়াভাবে গাঁথনীর উচ্চতা ৪।৫ হাত। আবার এই খাড়াগাঁথনীর গায়ে, মাঝে মাঝে চারিদিকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকোটের কয়েকজন লোকের মুখে শুনিলাম যে ঐ সকল প্রকোষ্ঠ মখদুম সাহেবের ও তাঁহার নিকট দীক্ষিত শিষ্যগণের গুপ্ত ভজনাগার।… মঙ্গলকোটবাসীদিগের এই কথায় ষোল আনা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই।…

"এই সমাধিক্ষেত্রে কেবল যে মখদুম সাহেবই সমাহিত আছেন তাহা নয়; তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণ, শিষ্য-প্রশিষ্যাদি স্থলাভিষিক্তগণ, এই মহাশ্মশানে সমাহিত আছেন।…"

মন্তেশ্বর | বরাকর
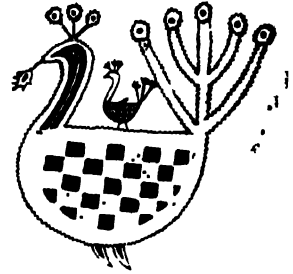
মন্তেশ্বর বেশ বড় গ্রাম। কালনা মহকুমার মধ্যে এরকম বর্ধিষ্ণু গ্রাম খুব অল্পই আছে। গ্রামের প্রতিপত্তিশালী বাসিন্দারা হলেন উগ্রক্ষত্রিয়। বিভিন্ন পাড়ায় গ্রামটি বিভক্ত—উত্তরপাড়া মাইচপাড়া ধাওড়াপাড়া জোকারীপাড়া হাটপাড়া। গ্রামের কাছে খড়্গেশ্বরী বা খড়িনদী। ব্রাহ্মণ চাষী তিলি কুম্ভকার ও তন্তুবায়দেরও বাস আছে গ্রামে। ব্যগ্রক্ষত্রিয় ডোম বাউরি চর্মকারদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। গ্রাম্য দেবদেবীর মধ্যে মুক্তেশ্বর শিব চামুণ্ডা সিদ্ধেশ্বরী এবং ধর্মরাজ প্রধান। চামুণ্ডার উৎসবই সবচেয়ে জমকাল গ্রাম্য উৎসব। উৎসবের বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ।

মন্তেশ্বর থানায় বিভিন্ন গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রতিপত্তি এখনও বেশ অক্ষুণ্ণ আছে দেখা যায়। ধর্মরাজের উৎসবেও বিশেষ ভাটা পড়েনি। মন্তেশ্বর গ্রামে দু'টি ধর্মঠাকুর আছেন, একটির সেবায়েত পরামাণিক, দ্বিতীয়টির সেবায়েত ব্যগ্রক্ষত্রিয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হয় গ্রামে। বাণফোঁড়া কাঁটাঝাঁপ আগুনঝাঁপ ইত্যাদি হয়। মদের হাড়ি মাথায় নিয়ে উন্মত্ত নৃত্য করা আজও উৎসবের অঙ্গরূপে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা চলে। বলিদান তো হয়ই। কিন্তু তার চেয়েও বৈশাখী শুক্লাষ্টমীতে মন্তেশ্বর গ্রামে যে চামুণ্ডার উৎসব ও পূজা হয় তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অনেক বেশি বলে মনেহয়। চামুণ্ডার পূজা বর্ধমান জেলায় একাধিক স্থানে হয়। কোথাও মন্তেশ্বরের মতো এরকম উৎসবের কথা শুনিনি। মনেহয় যেন চামুণ্ডার উৎসবের আদি

অকৃত্রিম রূপ অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আজও মন্তেশ্বরের গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে রয়েছে।

মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা-উৎসবের বিবরণ দেবার আগে চামুণ্ডার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। চক্রবর্তী ব্রাহ্মণরা মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার পূজারী। যে ধ্যানে তাঁরা এই চামুণ্ডার পূজা করেন তার মর্মার্থ এই: শ্যামবর্ণ মেঘের মতো দেবীর গায়ের রং। তাঁর চক্ষু তিনটি। নগ্নবেশ মুণ্ডমালাশোভিত নতকুচ। চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে দেবী নৃত্য করছেন। পদতলে তাঁর শব ও মহাকাল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তাঁকে আরাধনা করছেন। মোক্ষদাত্রী তিনি—কালীমূর্তিতে অভয়বর দিচ্ছেন। ডানহাতে তাঁর পানপাত্র অসি ডমরু ও শূল। বামহাতে ত্রিশূল দিয়ে চণ্ডমুণ্ডকে বধ করছেন এবং অনামিকাতে কামড় দিয়ে জগতের ভয় হরণ করছেন। এই হল মন্তেশ্বরের চামুণ্ডার ধ্যানের মর্মার্থ।

পুরাণে 'চামুণ্ডা'র উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তা এই: অসুরপতি দুই ভাই শুম্ভ ও নিশুম্ভের সর্বময় কর্তৃত্বে সন্ত্রস্ত হয়ে স্বর্গের দেবতারা দেবী ভগবতীর শরণাপন্ন হন। দেবী দুর্গা-অম্বিকা তাঁদের অভয় দিয়ে বলেন ভয় নেই, অসুর নিধন করতে হবে। দেবীর রূপের কথা শুনে শুম্ভ প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর পাণিপ্রার্থী হয় এবং দূত পাঠায় তাঁর কাছে। দেবী বলেন দূতকে— শুম্ভই হো'ক আর নিশুম্ভই হোক এখানে এসে তাঁকে যে যুদ্ধে জয় করতে পারবে, তারই পাণিগ্রহণ করবেন তিনি। ক্রুদ্ধ শুম্ভের আদেশে চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। তাদের রণমূর্তি দেখে দেবীর মুখ তৎক্ষণাৎ কালীবর্ণ হয়ে যায়। পরক্ষণেই তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ললাট থেকে করালবদনা কালী আবির্ভূত হন। হাতে তাঁর অসি পাশ ও বিচিত্র খট্বাঙ্গ। ভূষণ নরমালা, বসন ব্যাঘ্রচর্ম। শরীরের মাংস শুকনো। বদনমণ্ডল বিস্তৃত। মূর্তি ভয়াবহ লোলজিহ্বা, রক্তবর্ণ চক্ষু:

ভ্রূকুটিকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥
বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮৭ অঃ

এই মূর্তি ধারণ করে দেবী অসুরসেনাদের উপর পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেন এবং চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে নিহত করে, তাদের মুণ্ডসহ দেবী অম্বিকার কাছে উপস্থিত হয়ে উপহার দিলেন। তখন তিনি বলেন :

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণ—ঐ

"দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়কে গ্রহণ করে আমার কাছে এসেছ, সেই হেতু চামুণ্ডা নামে তুমি লোকের কাছে খ্যাত হবে।" এই হল চামুণ্ডার উৎপত্তির পুরাণকাহিনী। কাহিনীর মধ্যে যে সাংস্কৃতিক সত্য রূপকের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে তা হল আর্য ও অনার্যের সংগ্রাম এবং অনার্য দেবতার আর্যীকরণ। কালী বা চামুণ্ডা কোনকালেই আর্যদেবতা ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দু দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব পৌরাণিক কাহিনী রচিত হয়েছে। কাহিনীর বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে অনার্যদের পরাজয়ের কথা সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, প্রধানত অনার্য দেবদেবীর মাধ্যমেই। হিন্দুধর্মের এই সংস্কৃতিসমন্বয়ের কৌশল সত্যই অভিনব।

চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি ও রূপের বর্ণনা আছে আগমশাস্ত্রে ও পুরাণে। 'অংশুভেদাগম' 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' ও 'পূর্বকারণাগম' থেকে চামুণ্ডার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা উদ্‌ধৃত করেছেন শ্রীগোপীনাথ রাও তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু আইকনোগ্রাফি' গ্রন্থের .ধা (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পরিশিষ্ট 'গ', পৃ ১৫১-৫২) 'অগ্নিপুরাণেও' (৫০ অধ্যায়) চামুণ্ডার বিভিন্ন রূপের বর্ণনা আছে। তার মধ্যে চামুণ্ডার সাধারণ রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে :

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্যান্নির্মাংসা তু ত্রিলোচনা
নির্মাংসা অস্থিসারা বা ঊর্ধ্বকেশী কৃশোদরী ॥
দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে।
শূলং কর্ত্রী দক্ষিণেঽস্যাঃ শবারূঢা বিভূষণা ॥

"চামুণ্ডার তিন নয়ন কোটরে মগ্ন, দেহে মাংস নেই, অস্থিচর্মসার। কেশ ঊর্ধ্বগ, উদর কৃশ, পরিধান দ্বীপিচর্ম। বামহাতে কপাল পট্টিশ, ডানহাতে শূল ও কর্ত্রী।

ভূষণ অস্থি এবং আসন শব।" এই হল চামুণ্ডার সাধারণ রূপ। এ ছাড়াও আরও নানারকমের রূপ আছে চামুণ্ডার। যেমন:

গজচর্মভৃদূর্ধ্বাস্তপাদা স্যাদ্রুদ্রচর্চিকা।
সৈব চাষ্টভুজা দেবী শিরো-ডমরুকান্বিতা॥
তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নটেশ্বর্য্যথ নৃত্যতী।
ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী॥
নৃবাজিমহিষেভাংশ্চ খাদন্তী চ করে স্থিতান।
দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্॥
বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাঞ্চ খেটকম্।
খট্বাঙ্গঞ্চ ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ড কাহ্বয়া॥
সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা।
এতদ্রূপা ভবেদন্যা পাশাঙ্কুশযুতারুণা॥
ভৈরবী রূপবিদ্যা তু ভুজৈর্দ্বাদশভির্যুতা।
এতাঃ শ্মশানজা রৌদ্রা অম্বাষ্টকমিদং স্মৃতম্॥
ক্ষমা শিবাবৃতা বৃদ্ধা দ্বিভুজা বিবৃতাননা।
দন্তুরা ক্ষেমকারী স্যাদ্ভূমৌ জানুকরা স্থিতা॥

চামুণ্ডার 'রুদ্রচর্চিকা' মূর্তি উর্ধ্বাস্তপাদশালিনী ও গজচর্মপরিধানা এবং অষ্টবাহু-বিশিষ্টা। 'রুদ্রচামুণ্ডা' নাটের ঈশ্বরী ও নৃত্যরতা। ইনিই মহালক্ষ্মী, চতুর্মুখী এবং সর্বদা উপবিষ্ট হয়ে হস্তস্থিত নৃবাজী, মহিষ ও গজ ভক্ষণ করছেন। এঁর বাহু দশ ও নয়ন তিন। দক্ষিণ হস্তে শস্ত্র অসি ডমরু। বামহস্তে ঘণ্টা খেটক খট্বাঙ্গ ত্রিশূল। ইনিই 'সিদ্ধচামুণ্ডা' নামে সিদ্ধযোগেশ্বরী, সর্ব-সিদ্ধিপ্রদাযিকা। 'রূপবিদ্যা' ভৈরবী দ্বাদশভুজা। শ্মশানে এঁর আবির্ভাব। 'ক্ষমা' দ্বিভুজা, বৃদ্ধা ও শিবা-পরিবৃতা। 'দন্তুরা' জানুকরস্থিতা। এই হল চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তির বিবরণ। বর্ধমান জেলার একাধিক স্থানে যে চামুণ্ডার মূর্তি দেখা যায় এবং আজও যে চামুণ্ডার পূজা হয় কাঞ্চননগরে বা মন্তেশ্বরে, তা রুদ্রচর্চিকা রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি। বর্ধমান জেলার অট্টহাসে চামুণ্ডার একটি দন্তুরামূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত বিশেষ চামুণ্ডা মূর্তি দেখে মনেহয়, একসময় বর্ধমান জেলায় ব্যাপকভাবে চামুণ্ডাপূজার প্রচলন হয়েছিল।

এইবার মন্তেশ্বরের চামুণ্ডাপূজার বিবরণ দেব এবং তারপর তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। চামুণ্ডাপূজা মন্তেশ্বরের সর্বজনীন গ্রাম্য উৎসব

বলা চলে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই এই উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন অ-ব্রাহ্মণ জাতির বিশেষ অধিকার এই উৎসবের মধ্যে এমনভাবে স্বীকার করা হয়েছে যে, উৎসবের প্রধান বিশেষত্ব হিসাবে প্রথমেই সেটা নজরে পড়ে। বৈশাখী শুক্লপক্ষে উৎসব হয়। প্রথমে হয় ঘাটপূজা। সপ্তমীর রাতে মন্তেশ্বরের গাঁয়ের পুকুরে চামুণ্ডার মূর্তিটি ডুবিয়ে রাখা হয়। পরদিন দ্বিপ্রহরে পুকুর থেকে তোলা হয় সেই মূর্তি। প্রথমে মেড়তলার (পূর্বস্থলী থানার) ভট্টাচার্যদের পূজা ও বলিদান হয়। তারপর সন্ধ্যার সময় মাইচতলায় (মঞ্চমাইচ) আনা হয় এবং সেখানে পূজা ভোগ ও বর্ধমানের রাজাদের মহিষ বলিদান হয়। তারপর ছাগল শুয়োর ভেড়া ইত্যাদিও বলিদান দেওয়া হয়। তারপরদিন পূজার পর চামুণ্ডাদেবী গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয়রা পুরোহিতসহ চামুণ্ডাদেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। গ্রামের মধ্যে গ্রাম্য পথের ধারে ধারে মাটির বেদী তৈরি করা হয় বলিদানের জন্য এবং সারা গ্রাম জুড়ে ব্যাপকভাবে বলিদান দেওয়া হয় প্রদক্ষিণের সময়। দশমীর দিন সন্ধ্যার সময় দেবী নিজের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

উৎসবের বিশেষত্বগুলি লক্ষণীয়। প্রথম বিশেষত্ব, চামুণ্ডাদেবীকে মন্দিরের বাইরে এনে পূজা ও উৎসব। সপ্তমী থেকে দশমীর সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বাইরে থাকেন, ঘাট থেকে মাইচতলায় আসেন, গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং অবশেষে পূজান্তে দশমীর সন্ধ্যায় নিজের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মনেহয় যেন ব্রাহ্মণ পূজারীর তত্ত্বাবধানে মন্দিরে অবস্থান অনেক পরবর্তী ঘটনা। তার আগে চামুণ্ডাদেবীর একটা ইতিহাস ছিল, যখন তিনি প্রধানত অ-ব্রাহ্মণদেরই পূজ্য দেবী ছিলেন এবং হয়ত গ্রামের মধ্যে, কি উপান্তে, কি নদীতীরে শ্মশানে, এমন কোনো স্থানে তিনি বিরাজ করতেন। উৎসবের দ্বিতীয় বিশেষত্ব দেবীর গ্রাম-প্রদক্ষিণ। প্রদক্ষিণ ব্যাপারটাই অনার্যদের উৎসবের প্রধান লক্ষণ। 'যাত্রা বা জাত' কথার মধ্যে আজও সেই প্রাগার্যদের উৎসবের গ্রাম-প্রদক্ষিণের বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তৃতীয় বিশেষত, ধীবর ও ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতসহ দেবীকে বহন করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। মনেহয় যেন দেবী তাদেরই স্কন্ধে চড়ে গ্রাম-প্রদক্ষিণ করেন, যারা তাঁর আদি অকৃত্রিম পূজারী। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীসহ কাঁধে চড়লেও, সেই সুদীর্ঘকালের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে পারেননি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিভাবে জাতীয় উৎসবপার্বণের বিভিন্ন স্তরে শিলাগাত্রের ফসিলের মতো লিপ্ত হয়ে থাকে, এসব তারই নিদর্শন। চতুর্থ বিশেষত্ব, ব্যাপক নির্বিচার বলিদান। কেবল ছাগল ভেড়া বলিদান দেওয়া হয় না, মহিষ শুয়োর পর্যন্ত বলি দেওয়া হয়। দু'দশটা নয়, শত শত। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে

নয়—সর্বত্র, গ্রামের পথের ধারে ধারে বেদী করে। মনেহয় যেন, নরবলির ভয়াবহ তাণ্ডবলীলার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের একটা বৈকল্পিক সমাধান সবেমাত্র করা হয়েছে, তাই বিকল্পের মধ্যে এখনও তার সেই আদিম প্রচণ্ডতার রেশটুকু বজায় রয়েছে, যেমন আছে জামালপুরের বুড়োরাজের উৎসবে।

মন্তেশ্বর গ্রামের চামুণ্ডাপূজার এই বিশেষত্ব থেকে শুধু মন্তেশ্বরের নয়, সারা বর্ধমান জেলার, তথা উত্তররাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা দিক বিশেষভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে। চামুণ্ডা হিন্দুদেবী হলেও, একেবারে বৌদ্ধপ্রভাবমুক্ত নন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ যাই হন তিনি, অনার্য বৈশিষ্ট্যও তাঁর অল্প নয়। চীনের নিষিদ্ধ শহর পিপিঙে যে সব দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে চামুণ্ডার মূর্তিও আছে। অধ্যাপক ক্লার্ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Two Lamaistic Pantheons'-এর দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় এই চামুণ্ডার মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন।[১] মহাপণ্ডিত অভয়াকর গুপ্তের 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থেও চামুণ্ডার বিবরণ আছে।[২] 'চামুণ্ডা' যে বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবদেবীমণ্ডলে গৃহীত হয়েছিলেন তা বেশ বোঝা যায় এবং চামুণ্ডার পূজা পূর্বভারত থেকে নেপাল তিব্বত হয়ে চীন পর্যন্ত-বিস্তারলাভ করেছিল। তাছাড়া 'পঞ্চবুদ্ধ-কিরীটিনম্' মহাকালের যে মূর্তি 'সাধনমালা'র একাধিক সাধনে বর্ণনা করা হয়েছে তা চামুণ্ডার ভৈরবমূর্তি ছাড়া কিছু নয়। বৌদ্ধ 'সাধনমালা'য় একথাও বলা হয়েছে যে, মহাকাল সপ্তদেবী পরিবৃতা হয়ে থাকবেন। পূর্বে মহামায়া, দক্ষিণে যমদূতী, পশ্চিমে কালদূতী, উত্তরে মহাকাল নিজে। প্রত্যেকেরই মূর্তি ভয়াবহ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চর্চিকা, উত্তর-পশ্চিম কোণে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তর-পূর্ব কোণে কুলিশেশ্বরী থাকবেন। এঁদেরও প্রত্যেকের মূর্তি ভয়াল। সপ্তমাতৃকার রূপায়ণের কথা মনে পড়ে। পল্লব এবং চোল ভাস্কর্যে, গোড়ার দিকে, দক্ষিণভারতে এই সপ্তমাতৃকার মূর্তির মধ্যে চামুণ্ডা তরুণীরূপে রূপায়িত হয়েছেন, নাগকুচবন্ধ ও কপাল-যজ্ঞোপবীতসহ। পরবর্তী চালুক্য ভাস্কর্যে এবং উড়িষ্যায় ও বাংলা দেশে চামুণ্ডা অস্থিচর্মসার কোটরাক্ষীরূপে রূপায়িত হয়েছেন। মনে হয় পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকরা পূর্বভারতে সপ্তমাতৃকাকে মহাকাল-পরিবৃত সপ্তদেবীতে পরিণত করেন। তার মধ্যে চর্চিকা-রূপে চামুণ্ডারও স্থান ছিল। বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধদের এই চর্চিকারূপী চামুণ্ডাই তিব্বত হয়ে চীন পর্যন্ত যাত্রা করেন। প্রধানত পালযুগে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর মধ্যে এই পারস্পরিক মিলনমিশ্রণ একাত্মীকরণ ঘটতে থাকে।

১ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'নিষ্পন্নযোগাবলী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২ ঐ : ধর্মধাতুবাগীশ্বরমণ্ডলম, পৃ ৬২

বরাকর

বরাকর নদী মানভূম ও বর্ধমান জেলার মধ্যে সীমারেখা টেনে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। নদীর বামতীরে বহুদূর থেকে বরাকরের দেউলগুলি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে উড়িষ্যার রেখ-দেউলের নিদর্শনের মধ্যে বরাকরের এই মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখ্য। পাথরের তৈরি মন্দির বলে আজও প্রত্যেকটি মন্দির প্রায় অবিকৃত রয়েছে। মনে হয় যেন মন্দিরগুলি পশ্চিমবঙ্গের সীমানাস্তম্ভ। মন্দিরের শিখরের ক্রমসূক্ষ্মায়মান শুণ্ডাকার গড়ন অনেকটা বেগুনের মতো দেখতে বলে বরাকরের দেউলের স্থানীয় নাম বেগুনিয়া মন্দির। অনেকদিন আগেই বরাকরের মন্দিরগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেগলার সাহেব বরাকরের মন্দির সম্বন্ধে প্রথমে লেখেন এবং তাঁর বিবরণ ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। বেগলারের পর ব্লক বরাকরের মন্দির সম্বন্ধে আলোচনা করেন ১৯০২-৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে (বাংলা বিভাগ)। ১৯২২-২৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে দীক্ষিত মন্দিরের শিলালিপি ও মন্দির সম্বন্ধে আবার আলোচনা করেন।

বরাকর দেউলের স্থানীয় 'বেগুনিয়া মন্দির' নামটি সত্যই সুন্দর। শিল্পশাস্ত্রকারেরা মন্দিরের গড়ন-প্রসঙ্গে 'শুকনাস' (শুকপাখির নাকের চঞ্চুর মতো বাঁকানো), 'গজপৃষ্ঠ' (হাতির পিঠ থেকে পিছনের মতো আপসে ঢালু) ইত্যাদির কথা বলেছেন। তা যদি বলা যায় তাহলে রেখমন্দিরের টেপারি' শিখরকে 'বেগুনিয়া' বা বেগুনের মতো বলা যাবে না কেন? চারটি মন্দির আছে বরাকরে এক জায়গায়। তার মধ্যে চতুর্থ মন্দিরটি (পথ দিয়ে ঢুকতে একেবারে শেষের যেটি), কারও মতে, সবচেয়ে প্রাচীন। রথ-বিন্যাস, শিখরের পগ ইত্যাদি দেখে কেউ মনে করেন, উড়িষ্যার প্রাচীনতম রেখ-মন্দিরের (ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দির) সঙ্গে এই মন্দিরটির গড়নের সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই চতুর্থ মন্দিরটিকে অষ্টম-নবম শতাব্দীর বলা যায়। তা যদি হয়, তাহলে এই মন্দিরটিকে পশ্চিমবঙ্গের রেখদেউলের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলতে হয়। কিন্তু বরাকর মন্দিরের উপরে যে আমলক আছে তার খাঁজগুলি 'কনভেক্স' নয়, 'কনকেভ'। উড়িষ্যার রেখ-মন্দিরের আমলকের খাঁজ 'কনভেক্স' বা বহিঃবর্তুলাকার, বরাকর মন্দিরের আমলকের খাঁজ অন্তঃবর্তুলাকার বা কন্‌কেভ। সুতরাং বরাকর মন্দিরের একটি অন্যতম অঙ্গের গড়ন উড়িষ্যার মতো নয় দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের মন্দিরের মতো হঠাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত থেকে আমলকের বিশেষ গড়ন প্রক্ষিপ্ত হয়ে বরাকরে এল কেন এবং কি করে?[১]

১ এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বাংলার মন্দির সম্বন্ধে সমগ্রভাবে সমীক্ষা ও আলোচনা করা হয়েছে—লেখক

বরাকরের একটি মন্দির থেকে শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। ১৯২২-২৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে দীক্ষিত এই শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১৯৩৬ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (২য় খণ্ড) চক্রবর্তী লিপিতত্ত্বের দিক থেকে বরাকরের শিলালিপি সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। দু'টি শিলালিপির মধ্যে প্রথমটিতে বলা হয়েছে, ১৩৮২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, বুধবার, রাজা হরিশচন্দ্রের প্রিয়তমা ভার্যা হরিপ্রিয়া দেবতা শিবের উদ্দেশে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয় শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, ১৪৬৮ শকাব্দে নন্দ নামে একজন সৎ ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী মন্দিরটিকে সংস্কার করে দেন। ১৩৮২ শকাব্দ বা .৩৬২ খ্রীস্টাব্দ, এবং ১৪৬৮ শকাব্দ বা ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দ, এই দু'টি তারিখ শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। শিলালিপি থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে হরিশচন্দ্র নামে কোনো এক রাজা ছিলেন, এবং হরিপ্রিয়া নামে তাঁর রানী ছিলেন। তাঁরা শিবের উপাসক ছিলেন, একথাও জানা যায়। লিপিতত্ত্বের দিক থেকে বরাকরের শিলালিপির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন। বরাকর লিপির ছাঁদ (প্রথম শিলালিপি) আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথির লিপির ছাঁদ একই ধরনের, দু'য়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। বরাকরেব দ্বিতীয় শিলালিপির ছাঁদ এবং এসিযাটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় রক্ষিত রঘুনন্দনের 'ধর্মপূজাবিধি'র লিপির ছাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পুঁথির প্রাচীনত্ব লিপিব এই ছাঁদ থেকে বিচাব করা যেতে পাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাজা হরিশচন্দ্র কে? বর্ধমানের গোপভূম অঞ্চলে হরিশচন্দ্র নামে কি কোনো রাজা ছিলেন? সঠিক বলা যায় না, যদিও কেউ কেউ সেরকম আভাস দিয়েছেন। থাকলেও তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। আরও বোঝা যায়, তিনি শৈব ছিলেন। গোপভূমের রাজ-বংশের বিভিন্ন শাখায় শৈব উপাসনার বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। গোপভূম অঞ্চলে শিব ও শক্তির আধিপত্যও সবচেয়ে বেশি মনে হয়। একথা আগে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। বরাকর কি তাহলে শৈব উপাসনার বড় কেন্দ্র ছিল? পঞ্চদশ শতাব্দীতে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। সব মন্দিরেই এখনও শিবলিঙ্গ আছে, গণেশ ও দুর্গাও আছে। বোঝাযায়, শিব ও শক্তি উভয়েই ছিলেন এখানে। কিন্তু চতুর্থ মন্দির যদি অষ্টম-নবম শতাব্দীর হয়, তাহলে তখন ঐ মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশে নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না। তাছাড়া বরাকরে যে সব পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়, তার সংখ্যাও কম নয়। মূর্তিগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষ্ণুর মূর্তি এবং কয়েকটি

জৈনমূর্তিও আছে। এত ভাঙাচোরা বিকৃত মূর্তি যে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। বড় বড় ভারি মূর্তি। গড়নও খুব স্থূল। বেশ প্রাচীন বলেই মনে হয়, যদিও লিপি ছাড়া কেবল গড়ন দেখে প্রাচীনত্ব বিচার করা ঠিক নয়। বরাকরের মূর্তিগুলির মধ্যে একাধিক প্রাচীন জৈনমূর্তি আছে। যদি থাকে তাহলে চতুর্থ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-কালের সমসাময়িক হতে পারে মূর্তিগুলি। এসব থেকে বরাকরের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারারও একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধারাটি মোটামুটি এইভাবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে: পালযুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল বরাকর অঞ্চলে। তারপর শৈব ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। বিষ্ণুপূজাও যে প্রচলিত ছিল, তাও বোঝা যায়। জৈনধর্ম প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য হল: বরাকর-সংলগ্ন মানভূম জেলার পার্শ্বনাথ পাহাড়ই জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের সাধনার স্মৃতিবিজড়িত স্থান। জৈন তীর্থংকর মহাবীরও রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম-প্রচারের জন্য নিজে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং রাঢ়ের রূঢ় আদিম অধিবাসীরা তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। কাহিনীগুলি একেবারে কাল্পনিক নয়। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ও প্রচারকেন্দ্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সেকালের উত্তররাঢ় ছিল এবং বরাকর অঞ্চলও ছিল মনে হয়।

বরাকর থেকে মাইল চারেক দূরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। শক্তিপূজার অন্যতম কেন্দ্র বলে বিখ্যাত। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা এই মন্দির] নির্মাণ করে দেন। মন্দিরের বিশেষত্ব নেই, প্রাচীনও নয় খুব। কিন্তু স্থানটির বিশেষত্ব প্রাচীনত্ব দুই-ই আছে। হয়ত একসময় এখানে তান্ত্রিকদের একটা বড় ঘাঁটি ছিল। মানভূম ও উত্তররাঢ়ের সীমানা জুড়ে এরকম ঘাঁটি আরও অনেক ছিল। তাই আদিবাসীদের নরবলির উপাদানও তান্ত্রিক বা শক্তিসাধনার মধ্যে সহজেই মিশে যায় এখানে। কল্যাণেশ্বরী ও কাত্রাসগড়ের (মানভূম) নীলকণ্ঠেশ্বরী বা বিন্ধ্যবাসিনীর পূজায় একসময় নরবলির প্রচলন ছিল, এরকম কিংবদন্তী শোনাযায়। কাত্রাসগড় পর্যন্ত আমি গিয়ে পুরোহিতের কাছে অনুসন্ধান করে এসেছি (১৯৫৩)। তাঁরা এই কথাই বলেন। তাই থেকে মনে হয়, জৈন বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হলেও বরাকর থেকে মানভূম জুড়ে তান্ত্রিকদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল পরে। তাতে আদিবাসীদের ধর্মাচরণের প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। নরবলি তার মধ্যে প্রধান। উত্তররাঢ় ও ছোটনাগপুর জুড়ে এই যে সংস্কৃতির প্যাটার্ন দেখা যায়, এর মধ্যে বরাকর একটি 'ডিজাইন' ছিল মাত্র। বরাকরের দেউলের চেয়েও বরাকরের সংস্কৃতিধারা তাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দামিন্যা-দামুন্যা | বাঘনাপাড়া

দামুন্যা কোথায়? দামোদরের দক্ষিণে, হুগলি ও বর্ধমান জেলার সীমানায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দামুন্যা গ্রাম।

ধনি ধনি কলিকালে রত্না নদীর কূলে
অবতাব কবিলা শঙ্কর
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিল ধাম
তীর্থ কৈলা সেই ত নগর।

গোতানের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দামিন্যার উত্তর-পূর্বে রত্নাকর, মুকুন্দরামের রত্না। চার-পাঁচশো বছর আগে, মুকুন্দরাম ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আমলে, দক্ষিণরাঢ়ের দামুন্যা গ্রামের কি অবস্থা ছিল, তার আভাস কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া গেলেও, এখন কিছু বোঝা যায় না। স্বগ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়ে মুকুন্দরাম নানাস্থানে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। দামুন্যা যাবার দুর্গম পথ দেখে বোঝা যায় আজও, কি ভয়ানক দুর্ভোগই না তখন ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। দামুন্যা যাবার পথে এইটুকুই ছিল আমাদের সান্ত্বনা। প্রথমে বর্ধমান থেকে দামোদর পার হয়ে, আরামবাগ রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে, উচালন থেকে বেঁকে ছোটবৈনান ও দামুন্যার পথে আমরা যাত্রা করলাম (১৯৫২-৫৩)। যাত্রা শুভ হল না। সারাটা পথ কেবল দক্ষিণ-দামোদরের গ্রামপরিক্রমণ হল। অবশেষে ছোটবৈনান পৌঁছে শোনা গেল যে মুকুন্দরামের বংশধরেরা অনেকেই সেখানে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে

সবচেয়ে প্রবীণ যিনি তিনি ছোটবৈনানেই থাকেন। মুকুন্দরাম-পূজিত চণ্ডীদেবী পালা করে ঘুরে ঘুরে বংশের বিভিন্ন শাখার গৃহে অবস্থান করেন। ছোটবৈনান পরিক্রমান্তে পথের অনেক কষ্ট সহ্য করে, খাল-বিল-আল-মাঠ পেরিয়ে অবশেষে দামুন্তায় উপস্থিত হলাম :

সহর সিলিমাবাজ তাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্তায় চাষ করি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥

চক্রবর্তীবংশ কতদিন ধরে দামুন্যায় বাস করছেন, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কবিকঙ্কণের এই উক্তি থেকে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার সময় যদি মোটামুটি ১৫৭৪ থেকে ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হয়, তাহলে ষোডশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কবির বাল্যকাল অনুমান করা যেতে পারে। তার ছয়সাত পুরুষ আগে হলে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চক্রবর্তীবংশ দামুন্যায় বাস করছেন দেখা যায়। অর্থাৎ পাঠান আমল থেকে মুকুন্দরামের পূর্বপুরুষরা দামুন্যাবাসী হয়েছেন। তার আগে তাঁরা কোথায় ছিলেন জানা যায় না। মনেহয়, দক্ষিণরাঢ়ের কোনো রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রধান অঞ্চলে চক্রবর্তীবংশের পূর্বনিবাস ছিল। সেখান থেকে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যেকোনো কারণেই হোক, তাঁরা দামুন্যায় উঠে আসেন। ঠিক সেইসময় দামুন্যার গ্রাম্যসমাজের চেহারা কেমন ছিল অনুমান করা কঠিন। কারণ কবিকঙ্কণ দামুন্যার যে গ্রাম্যসমাজের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন তা ষো. শ শতাব্দীর শেষকালের বলে মনে হয় :

কাটাদিয়া বন্দ্যঘাটি বেদান্তনিগম-পাঠী
কুশাল পণ্ডিত মহাশয়
দামুন্যা নগরবাসী বন্দ্যঘাটি বাগালপাশী
কুলক্রমা তিন মহাশয়।
নিজ বৃত্তি অনুপন্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামুন্যাতে বৈসে কবিরাজ
কুলে শীলে গুণে বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাঢ়া
সুপণ্ডিত সুকবি-সমাজ ॥

মুকুন্দরামের এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দক্ষিণরাঢ়ের বিদ্যাসমাজের মধ্যে দামুন্যার সমাজ বেশ প্রতিষ্ঠা

অর্জন করেছিল। মুকুন্দরামের বংশেও অনেক পণ্ডিত জন্মেছিলেন এবং কবি নিজেও বেশ পণ্ডিত ছিলেন। একথা আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি নিজেই বলেছেন :

তনু সুত গুণধাম গুণিরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।
অনুজ মুকুন্দ শর্মা সুকবি সুকৃতকর্মা
নানা শাস্ত্রবিদ্যায় বিদ্বান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দক্ষিণরাঢ়ের গ্রাম্যসমাজ ও বিদ্যাসমাজগুলি যে পাঠান ও মোগল আমলের সন্ধিক্ষণের বিপর্যয়ের মধ্যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কোনো কোনো সমাজে ভাঙনও ধরেছিল, তা মুকুন্দরামের দামুন্যাবর্ণনা থেকে অনেকটা আন্দাজ করা যায়। বিপর্যয় নানাদিক থেকে দেখা দিয়েছিল এবং দেওয়াই স্বাভাবিক। মোগল অভিযান ও পাঠান রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় সামন্তরা জায়গীরদার ও জমিদারেরা চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিলেন। ফিউডালিজমের বা সামন্তপ্রথার এইটাই অন্যতম বিশেষত্ব। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কোনো কারণে শৈথিল্য বা দৌর্বল্য দেখা দিলে, সামন্তরা তাঁদের বাইরের নামমাত্র বশ্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে যে যার কর্তৃত্ব নিয়ে কাটাকাটি করতে আরম্ভ করেন। দেশের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখড়ের প্রাণ যায়," কথাটার উৎপত্তি হয়েছে এই ধরনের অবস্থা থেকে। ক্ষুদে সামন্তরাজারা যখন জমিদারী রাজ্য ও কর্তৃত্ব নিয়ে মারামারি করেন, তখন সাধারণ প্রজাদের দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। ঠিক এই ধরনের সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল পাঠানমোগল যুগের সন্ধিক্ষণে। মুকুন্দরাম তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

উজীর হৈল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবে হৈল অরি
কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায়ে কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি।
সরকার্য হৈল কাল খিলভূমি করে লাল
বিনি উপকারে লিখায় ধুতি
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কা প্রতি। ইত্যাদি।

স্তরবিন্যস্ত সামন্তসমাজের প্রত্যেকটি স্তর তার নিচের স্তরকে নির্মমভাবে শোষণ করতে আরম্ভ করল। শিকদার ডিহিদার উজীর কোটাল থেকে আরম্ভ করে পোদ্দার পর্যন্ত সকলে লুটতে লাগল। মুকুন্দরাম সপরিবারে দেশত্যাগী হলেন। গ্রাম ছাড়ার আগে তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কেউ কেউ তাঁকে গ্রাম ছাড়তে নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি না-ছেড়ে পারলেন না। স্ত্রী-পুত্র-ভাই সঙ্গে নিয়ে দামুন্যা ছেড়ে ভেলিয়া গ্রামে পৌঁছলেন। দুর্বৃত্তরা পথে তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করল, যদু কুণ্ডু তাঁকে আশ্রয় দিলেন—"দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।" মুড়াই নদী (মুণ্ডেশ্বরী) বেয়ে মুকুন্দরাম ভেণ্ট্যা গাঁয়ে পৌঁছলেন এবং তারপর দ্বারকেশ্বর পার হয়ে পাতুলে এলেন। পাতুল থেকে দামোদর পার হয়ে গেলেন গোচড্যা গ্রামে। এই গোচড়্যা গ্রামে চণ্ডীদেবী তাঁর মায়ের রূপ ধরে তাঁকে দেখা দেন। চণ্ডীর আদেশ পেয়ে, শিলাই নদী পার হয়ে, কবি আরড়া গ্রামে পৌঁছলেন। আরড়া ব্রাহ্মণভূমির মধ্যে, স্থানীয় ভূস্বামীও ব্রাহ্মণ। তাঁর দ্বারস্থ হয়ে আত্মপরিচয় দিতে সুধন্য বাঁকুড়া রায় তাঁকে অবিলম্বে দশ আড়ি ধান মেপে দিয়ে ছেলেদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। সুখেদুঃখে কবির দিন কাটতে থাকে। বাঁকুড়া রায়ের পর রঘুনাথ রায় রাজা হন। এর মধ্যে স্বপ্নে চণ্ডীদর্শনের কথা কবি প্রায় একরকম ভুলে গিয়েছিলেন বলা চলে। যদিও নন্দী তাঁকে স্বপ্নের কথা প্রায় মনে করিয়ে দিত, তবু তাঁর কাব্যরচনার অবসর হয়নি এর মধ্যে। তল্পিদার ডামাল নন্দীর অনুনয় ব্যর্থ হল। অবশেষে পুত্রের মৃত্যুতে কবি সচকিত হয়ে ওঠেন। মনের দুঃখে একদিন তিনি রাজার কাছে দুঃখ করে বলেন :

কি আর কহিব কাজ কহিতে বড়ই লাজ
গীত না করিয়া মৈল ছাল্যা
শুন রঘু নরপতি দুঃখে কর অবগতি
আকাল বিকাইল মোর হালা॥

কথা শুনে রঘুনাথ তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে বলেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। এই কাহিনী থেকে যে নির্মম সত্য প্রকাশ পেল তা এই :

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশেও কাব্যরচনা করা সম্ভব হয় না, যদি না রাজারাজড়ার পোষকতা ও অনুমতি পাওয়া যায়। মধ্যযুগের ইতিহাসের এইটাই বিশেষত্ব পেট্রন চাই সবার আগে, সাহিত্যেও।

মধ্যযুগের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম দামুন্যাবাসী হয়ে দামুন্যাকে ধন্য করে গিয়েছেন। ভাঙামোড়া (হুগলি) নিবাসী অম্বিকাচরণ গুপ্ত লিখেছেন যে বৃদ্ধবয়সে

মুকুন্দরাম দামুন্তায় ফিরে এসেছিলেন।[১] ফিরে আসার পর তদানীন্তন ডিহিদার তাঁকে দামুন্তা গ্রামে ষোল বিঘা নিষ্কর বাস্তু জমি, কিছু ধানি জমি এবং চারিদিকের বহু গ্রামের সভাপণ্ডিতের পদ দান করেন। সেই সমস্ত জমির যে সনদ আছে তাতে কুতব খাঁ নামক কর্মচারীর স্বাক্ষর দেখা যায়। একথা কতদূর সত্য বলা যায় না। হয়ত মুকুন্দরামের পুত্র শিবরাম দেশে ফিরে এই সম্পত্তি পেয়েছিলেন। মুকুন্দরামের বংশধররা এখন বর্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনানে এবং পৈতৃক গ্রাম দামুন্যায় বাস করেন। কেউ কেউ বলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহে ও হুগলির রাধাবল্লভপুরেও তাঁর বংশধররা আছেন।

মুকুন্দরাম পূজিত চণ্ডীদেবী ও তাঁর পুঁথি সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। ছোটবৈনানে আমরা ধাতুনির্মিত যে ছোট চণ্ডীমূর্তি দেখেছি, তা মূর্তি হিসাবে খুবই সুন্দর, কিন্তু সেটা মুকুন্দরামের আমলের কি না বলা যায় না।[২] মুকুন্দরামের বংশধররা বলেন যে, বংশানুক্রমে তাঁরা কবিকঙ্কণের আমল থেকে এই মূর্তি পূজা করে আসছেন এবং পালাক্রমে এই মূর্তি এখন ছোটবৈনান ও দামুন্যায় বিরাজ করেন। বর্তমানে কবির বংশররা মুকুন্দরাম থেকে অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। দ্বাদশ পুরুষ ধরে বিগ্রহের পূজা চলছে, এরকম অনেক বিগ্রহ ও বংশ বাংলা দেশে এখনও আছে। সুতরাং কবিকঙ্কণের বংশধর বা জ্ঞাতিদের কথা মিথ্যা না হতেও পারে। ছোটবৈনানের চণ্ডীমূর্তির বৈশিষ্ট্য এই: চার হাতের উপরের দু'হাতে পদ্ম (বামে) ও চক্র (দক্ষিণে), এবং নিচের দু'হাতে ত্রিশূল। বামে সিংহ, দক্ষিণে মহিষাসুর। দক্ষিণ পা মহিষের উপর, বাম পা মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপর।

দামুন্যায় মুকুন্দরামের জ্ঞাতি চক্রবর্তীদের ঘরে যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তা অনেকে মনে করেন কবিকঙ্কণের কাব্যের মূল পুঁথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু অর্থ ব্যয় করে এই পুঁথি প্রকাশ করেছিলেন। পুঁথি আসল কি নকল সে সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্য উল্লেখ করাই সমীচীন মনে হয়। সুকুমারবাবু লিখেছেন: "১৩৫১ সালে দামিন্যায় গিয়া এই পুঁথি পরীক্ষা করিয়া আসিয়াছি। পুঁথি তেরেট পাতায় লেখা। অর্বাচীন হাতের ছাঁদ। মলাট চামড়ায়। পুঁথির বয়স দেড়শত বৎসরের অনধিক। লিপিকাল ছিল বলিয়া শেষের পাতাটি ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করা হইয়াছে। তাহা না হইলে শেষ পাতার পরবর্তী শাদা পাতাগুলি ও মলাট থাকিত না। এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রিত না করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সুবুদ্ধির পরিচয় দিবেন।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। মন্তব্য অনাবশ্যক।

১ 'কবিকঙ্কণ' ও তাঁহার 'চণ্ডীকাব্য'—প্রদীপ, অগ্রহায়ণ ১৩১২ সন।

২ এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য: শ্রীসুকুমার সেন 'চণ্ডীমঙ্গল': সাহিত্য অকাদেমি, বৈশাখ ১৩৮২ সন।

বাঘনাপাড়া

পশ্চিমবাংলার বৈষ্ণব শ্রীপাটগুলির মধ্যে বর্ধমান জেলার বাঘনাপাড়ার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কাটোয়া বা অম্বিকা-কালনার তুলনায় বাঘনাপাড়ার গুরুত্বটা কম নয়, যদিও গুরুত্বটা অন্যদিক দিয়ে বিচার্য। বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে বাঘনাপাড়ার গোস্বামীরা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, খড়দহ শান্তিপুর জীরাট প্রভৃতি অঞ্চলের গোস্বামীদের মতো। বৈষ্ণবসমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। প্রায় শ্রীচৈতন্যের কাল থেকেই বাংলা দেশে তাঁদের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে দেখা যায়।

বাঘনাপাড়ার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি চমৎকার কিংবদন্তী শুনেছি গোস্বামীদের মুখে। একটি কিংবদন্তী হল, শাপগ্রস্ত ব্যাঘ্রপাদ মুনি ব্যাঘ্রকলেবর ধারণ করে এখানে তপস্যা করেন। কঠোর তপস্যার ফলে তিনি শাপমুক্ত হন। এই ব্যাঘ্রপাদ মুনির স্মৃতিবিজড়িত গ্রাম বলে এর নাম হল বাঘনাপাড়া। দ্বিতীয় কিংবদন্তীর উৎপত্তি 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থ থেকে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলে আগে গভীর জঙ্গল ছিল এবং তাতে বাঘও বাস করত। রামচন্দ্র গোস্বামী (বাঘনাপাড়ার গোস্বামীবংশের প্রতিষ্ঠাতা) জঙ্গলের হিংস্র বাঘকেও হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করেন বলে এই গ্রামের নাম হয়েছে বাঘনাপাড়া। দুটি কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথমটি চিরাচরিত ধারায় রচিত, অর্থাৎ একজন ঋষি বা মুনির স্মৃতি গ্রামের সঙ্গে জড়ানো দরকার, তা না হলে গ্রামের প্রাচীনত্বের আভিজাত্য থাকে না। গ্রামের নাম যখন বাঘনাপাড়া, তখন মুনির নাম ব্যাঘ্রপাদ বা ঐ জাতীয় ব্যাঘ্রসংশ্লিষ্ট কিছু হওয়া দরকার। তাই থেকে শাপভ্রষ্ট ব্যাঘ্রপাদ মুনির তপস্যার স্থান হয়েছে বাঘনাপাড়া। বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে এই কিংবদন্তীর বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় কিংবদন্তীর কল্পনাবিলাস যতই উগ্র হোক, তবু তার মধ্যে বাস্তবতার গন্ধ আছে। বাঘনাপাড়া অঞ্চল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেই জঙ্গলে যে বাঘের বাস ছিল, একথা যে অতিরঞ্জিত নয় তা এ অঞ্চলে আজও এলে পরিষ্কার বোঝা যায়। বাঘনাপাড়া গ্রাম প্রধানত গোস্বামীদের চেষ্টায় এখন বেশ সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হলেও, একসময় যে শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিবেষ্টিত ছিল, বিশেষ করে তিনচারশো বছর আগে, তাতে সন্দেহ নেই। বাঘনাপাড়া কেন, গঙ্গার পুবে ও পশ্চিমে অনেক পাড়াই তখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং য বাঘ-ভাল্লুকের বাস ছিল।

রামচন্দ্র গোস্বামী বনের বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। এই কিংবদন্তীর একটা অর্থ আছে। তার আগে রামচন্দ্র গোস্বামী ও বাঘনাপাড়ার

গোস্বামীদের বংশপরিচয়ের প্রয়োজন। বংশীবদন গোস্বামী হলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর, তাঁর পুত্র চৈতন্যদাস। চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী ও শচীনন্দন গোস্বামী :

বংশীবদন গোস্বামী
|
চৈতন্যদাস
|
রামচন্দ্র গোস্বামী ও শচীনন্দন গোস্বামী

নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবী দীক্ষা দেন রামচন্দ্র গোস্বামীকে এবং পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাই বৃন্দাবন থেকে বলদেব বিগ্রহ নিয়ে এসে বাঘনাপাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সাতচল্লিশ বছর পরে, অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে। এই বংশলতা থেকে বাঘনাপাড়ার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। বংশীবদন ও বংশীদাসের জীবনচরিত 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থে বাঘনাপাড়ার যে ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে কেনেডি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন :

> In a book called Vamsisiksha, which is largely descriptive of the life of a Brahmin friend and disciple of Chaitanya named Vamsivadan, or Vamsidas, we get an illustration of the sect's growth. This disciple, to whose care Chaitanya had committed his mother and sister, migrated from Navadwip after Chaitanya's death and established himself at a place called Baghnapara. Here he set up a temple and gathered about him a considerable Vaishnava community. His sons and grandsons followed in his steps, increased their following and thus established the line of Baghnapara Goswamins. (Kennedy : The Chaitanya Movement P. 64).

এই বংশীবদন গোস্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য যখন তীর্থযাত্রা করেন তখন নবদ্বীপে তাঁর মা ও স্ত্রীর দেখাশুনার ভার দিয়ে যান বংশীবদনের উপর। শোনা যায়, এই সময় নাকি বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহবেদনায় কাতর হয়ে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি তৈরি করান। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর বংশীবদন ও অন্যান্য পার্ষদদের উপর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ভার পড়ে। খড়দহে নিত্যানন্দ বসবাস করেন বলে, বাঘনাপাড়ায় আসেন বংশীবদন। বাঘনাপাড়ায় এসে তিনি মন্দির ও

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেককে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। তখন থেকে বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তারপর বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস ও তাঁর পুত্র রামাই-এর সময় বাঘনাপাড়ার প্রতিপত্তি আরও অনেক বেড়ে যায়।

তাহলে বৈষ্ণবকেন্দ্র হিসাবে বাঘনাপাড়ার ইতিহাস প্রায় চারশো বছরের দেখা যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বংশীবদন বাঘনাপাড়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তার বছর চল্লিশ পরে রামাই গোস্বামী নিত্যানন্দের স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষিত হন এবং বৃন্দাবন থেকে বিগ্রহ এনে প্রতিষ্ঠা করেন। বাঘনাপাড়ার উৎসবের মধ্যে রামাই এর তিরোভাবের উৎসবই প্রবল। মাঘ মাসের কৃষ্ণাতৃতীয়া তিথিতে বেশ জাঁকজমকসহ রামাই-এর তিরোভাব উৎসব হয়। পশ্চিমবাংলার নানাস্থান থেকে বৈষ্ণব মহান্ত বাবাজী বৈরাগী গোস্বামীরা উৎসব উপলক্ষে বাঘনাপাড়ায় সমবেত হন। মেলা ও ফলারের ভোজের মধ্যে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। রামকৃষ্ণ জীউর দোলযাত্রা উপলক্ষেও বাঘনাপাড়ায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

বাঘনাপাড়ার বাঘপ্রসঙ্গে আগে বলেছি যে, বাঘের একটা তাৎপর্য আছে। সাংস্কৃতিক তাৎপর্য। রামাই গোস্বামী বাঘনাপাড়ার বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করেছিলেন। বাঘমাত্রই যে জগাই-মাধাই-এর মতো উদ্ধারকাতর, তা নয়। তাহলে বাঘ-উদ্ধারের কাহিনীর তাৎপর্য কি? চারশো বছর আগে বংশীবদন ও তাঁর বংশধরদের সঙ্কীর্তন ও খোলকরতালের শব্দে বাঘনাপাড়া হঠাৎ যখন মুখর হয়ে উঠেছিল, তখন চারিদিকের জঙ্গলের বাঘ তাই শুনে কি মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তা আজ কল্পনা করা যায় না। খোলকরতালের ঐ শব্দে বাঘের পক্ষে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আখড়ায় অনবরত কীর্তন হতে থাকলে তা খুবই সম্ভবপর। একে বাঘতাড়ানো কীর্তন বলা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্যের তীর্থযাত্রাকালেও দেখা যায় তিনি ও তাঁর সহচরবৃন্দ এইরকম সঙ্কীর্তন করে পথের অনেক বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বাঘের প্রতিপত্তি এইভাবে নামসঙ্কীর্তনের ফলে বাঘনাপাড়ায় কমে যাওয়া আশ্চর্য নয়। তাছাড়া গোস্বামীদের বসবাসের পর নিশ্চয় লোকবসতি আরও অনেক বাড়তে থাকে। লোকের বসবাস বাড়লে বাঘের বাস এমনিতেও কমে যায়। বাঘনাপাড়ার বাঘের সঙ্গে হরিনামের সম্পর্ক এইধরনের মনে হয়।

বাঘের গল্পের এই একটা দিক মাত্র। এ ছাড়াও আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, যার সঙ্গে রামাই-এর বাঘ-উদ্ধারের কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে। গোস্বামীরা আসার আগে বাঘনাপাড়ায় অন্য লোকের বসতি ছিল নিশ্চয়। কারণ গোস্বামীরা যে

একেবারে জঙ্গল হাসিল করে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলেন তা নয়। নিরীহ কীর্তনপ্রিয় গোস্বামীদের পক্ষে তা করা সম্ভবও নয়। কি জাতীয় লোকের বাস ছিল? বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল না তখন বাঘনাপাড়া, ধর্মকেন্দ্র ও বিদ্যাকেন্দ্রও ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থাদির বাস ছিল বলে মনে হয় না। এখন অবশ্য বাঘনাপাড়া ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। তখন ছিল অব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম। অর্থাৎ গ্রামে জেলে বাগদি ইত্যাদিদের বাস ছিল বেশি। বাঘনাপাড়া গ্রামের দক্ষিণ থেকে পুবে বইত বল্লুকা নদী। এই বল্লুকা নদীই ধর্মপূজার আদিপীঠস্থান বলে প্রসিদ্ধ। হরিশচন্দ্র রাজ়ার কাহিনী থেকে জানা যায়, বল্লুকা নদীর তীরে ছদ্মবেশী ধর্মের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রামাই পণ্ডিতের নামে প্রসিদ্ধ 'শূন্যপুরাণে'ও দেখা যায়—"বৈকুণ্ঠেতে জীয়ে ধর্ম, বল্লুকাতে স্থিতি"। ধর্মমঙ্গলসাহিত্যে যে সৃষ্টিতত্ত্বের উপাখ্যান আছে তাতেও দেখা যায় যে আদিদেব সর্বপ্রথম বল্লুকাকেই সৃষ্টি করেন। ধর্মের নিন্দুক মার্কণ্ডমুনি কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্তি পাবার জন্য বল্লুকা নদীর তীরেই চন্দনকাঠের ধুনো জ্বেলে ধর্মপূজা করেন। ধর্মপূজাবিধানেও আছে—"শনিবার ব্রত করিল বল্লুকার তীরে"। সুতরাং বল্লুকানদীর তীর ধরে যে ধর্মপূজার প্রাচীন ইতিহাস জড়িত তাতে সন্দেহের কারণ নেই। বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়েই বল্লুকা নদীর প্রবাহ। এই বল্লুকার তীরেই বাঘনাপাড়া গ্রাম। বাঘনাপাড়ার অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে ধর্মপূজার যে রীতিমতো প্রতিপত্তি ছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ধর্মের এই পূজারীদের বৈষ্ণবরা কি চোখে দেখতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'। এই 'পাষণ্ড'দের বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঘের চেয়েও ভয় করতেন। গোস্বামীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ হওয়াও স্বাভাবিক। পরে রামাই গোস্বামী এই শ্রেণীর পাষণ্ডদের কাউকে কাউকে যদি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকেন, তাহলে তারই প্রতীকোপাখ্যান হিসাবে বাঘকে হরিনাম শুনিয়ে উদ্ধার করার কাহিনীর উৎপত্তি হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বল্লুকার তীরে বাঘনাপাড়ার ধর্মপূজার ঐতিহ্য আজও বিখ্যাত গোপেশ্বর শিবের গাজন ও পূজার মধ্যে বেঁচে রয়েছে। কারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সহজে মরে না, রূপান্তরিত হয়। গোপেশ্বর শিব গোস্বামীবাড়ির প্রাঙ্গণেই আজ বিরাজমান। চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবের সময় খুব ধুমধাম হয়। আগে পিঠবাণ হত, এখনও কপালবাণ হয়। কালীপূজা দুর্গাপূজাও হয়, তবে পূজাতে পশুবলি হয় না। এইভাবে অব্রাহ্মণ 'পাষণ্ড'দের পূজাকে বৈষ্ণব রূপ দেওয়া হয়েছে, যাকে 'বৈষ্ণবায়ন' (Vaishnavisation) বলা যায়।

কুড়মুন-পলাশী

কুড়মু' গ্রাম বর্ধমান শহর থেকে প্রায় মাইল দশ উত্তর-পূর্বে। পাশের পলাশী গ্রাম রেভারেণ্ড লালবিহারী দে'র (১৮২৪-৯৮) জন্মস্থান। একাধিক পলাশী নামের জন্য কুড়মুনসহ কুড়মুন-পলাশী বলে খ্যাত। এই গ্রাম্য পরিবেশই 'বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ' গ্রন্থের উপজী'ব্য। রামমোহন রায় দ্বিতীয় বিবাহ করেন কুড়মুন গ্রামের শ্রীমতী দেবী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যাকে। গ্রামের ঈশানেশ্বর পাড়ায় তাঁর শ্বশুরালয়। কুড়মুন ও পলাশী দুটি গ্রামই বেশ প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। গ্রামের মধ্যে পা দিলেই তার আভাস পাওয়া যায়। কুড়মুনের কোল ঘেঁষে খড়্গেশ্বরী নদী প্রবাহিত। পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ বদলেছে, গ্রামের বসতিও সরে এসেছে। পুরাতন সেই ব'সতির চিহ্নগুলি বর্তমানে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে নদীর দিকে যেতে দেখা যায়। গ্রাম সম্বন্ধে প্রচলিত একটি ছড়ায় আজও কুড়মুনের এককালীন সমৃদ্ধির স্মৃতি ভেসে আসে—"বারো আহার, তেরো দীঘি, নবুড়ি গড়ে ছ'বুড়ি ডোবা, তিনশো-ষাট পুষ্করণী, এই নিয়ে কুড়মুন জানি।"

দলিলপত্রে কুড়মুন গ্রামের প্রাচীনত্বের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তা প্রায় তিনশো বছরের। ঈশানেশ্বর শিবের গাজনতলার মন্দিরের শিলালিপির তারিখ ১৬৬৭ শকাব্দ, ইংরেজি ১৭৪৫ সাল। গ্রামের প্রাচীন মুসলমান মুন্শী পরিবারের তায়দাদের তারিখ বাংলা ১০৯৪ সন, ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দ। কুড়মুনবাসী মোল্লা জাহেদ আলির মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষকে বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গমরায়ের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ কৃষ্ণরাম রায় নিষ্কর সম্পত্তি দিয়েছিলেন, মখতুম সাহেবের আস্তানার 'চেরাগি ফকিরান খরচ সুরতে', ১০৯৪ সনে (তায়দাদ নং ২৫৪১৩, বর্ধমান সদর)। তায়দাদ ও লিপি ছাড়াও আরও অন্যান্য যে সমস্ত পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে তাতে মনেহয় কুড়মুন

গ্রাম আরও বেশি প্রাচীন। গ্রামের মধ্যে 'ফকিরডাঙা' নামে একটি স্থানে বেশ উঁচু একটি ঢিবি আছে। ইটপাথরের গৃহের ধ্বংসাবশেষ মনেহয়, কারণ এখনও পাথরের স্তম্ভের বড় বড় খণ্ড ও অজস্র ইটের টুকরো তার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে দেখা যায়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস, এখানে শাহজাহানের আমলের একটি মসজিদ ছিল। ভগ্নাবশেষ ও তার অবস্থান দেখে বোঝা যায়, এটি বেশ বড় মসজিদ ছিল এবং ফকিরডাঙায় একসময় মুসলমান পীরফকিরদেরও বসতি ছিল। এখনও কুড়মুনের মুসলমানপাড়া এই ফকিরডাঙার কাছে। এখানকার গ্রাম্যপথের উপর মাটি খুঁড়ে অনেক কবরও পাওয়া গিয়েছে। কবর ছাড়া পথের মধ্যে মধ্যে পুরনো পাতকুয়োর ভাঙা পাটা এমন কি সম্পূর্ণ পাতকুয়ো পর্যন্ত বেরিয়েছে। দেখে মনেহয়, যেন একটা পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রামের মধ্যে এই পাতকুয়োগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঠিক এইরকম সব নিদর্শন বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামেও দেখেছি। গ্রামগুলি মোগল আমলেই বেশ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। মঙ্গলকোটের মতো কুড়মুনও মুসলমানপ্রধান সমৃদ্ধ গ্রাম। মোগলযুগে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার ও রাজকর্মচারী এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। অন্তত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানরা কুড়মুন গ্রামের অন্যতম বাসিন্দা। এখন মুসলমান-পরিবারের সংখ্যা অনেক কম এবং প্রাচীন পরিবারের মধ্যে মুনশী ও মোল্লাবংশই অন্যতম। মোল্লারা গ্রামস্থ পীর মখদুমসাহেবের খাদেম বা সেবায়েত।

গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় ও রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা প্রাচীনদের অন্যতম। 'মণ্ডল' উপাধিধারী উগ্রক্ষত্রিয়রাই ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত গাজনের পরিচালক এবং ঘোষাল ব্রাহ্মণরা পূজারী। মণ্ডলদের পূর্বপুরুষ সন্তোষ মণ্ডল (যিনি ঈশানেশ্বরের শিবের উৎপত্তির কিংবদন্তীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট) বাংলা ১১৬১ সনে যে জীবিত ছিলেন, মুন্সী পরিবারের একটি প্রাচীন তায়দাদ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১১৬১ সনের একটি তায়দাদে দেখা যায় যে বর্ধমানরাজ মদদ্মাস দিচ্ছেন সেখ আজিমুদ্দিন ও তস্য পুত্র কলিমুদ্দিনকে এবং সন্তোষ মণ্ডল তার অন্যতম সাক্ষী। সন্তোষ মণ্ডল যদি তখন বৃদ্ধও হন, তাহলে তাঁর কাল ১১০০ সনের পূর্বে বলে মনে হয় না। কিংবদন্তী হল, এই সন্তোষ মণ্ডল স্বপ্ন দেখে খড়িনদীর কলমিসায়রের দহ থেকে ঈশানেশ্বর শিবকে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সন্তোষ মণ্ডলের বংশধররাই বংশপরম্পরায় ঈশানেশ্বরের গাজন পরিচালনা করেন। সুতরাং কুড়মুন গ্রামের ঈশানেশ্বর শিবের বিখ্যাত গাজনোৎসব প্রায় আড়াইশো বছরের প্রাচীন উৎসব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

হাডি বাগদি ডোম প্রভৃতি জাতির বাস এককালে গ্রামে খুব বেশি ছিল। এখনও কুসম্যেটে তেঁতুলে ও দুলেদের বাস যথেষ্ট আছে গ্রামে। গ্রামের উত্তরে হাডিদেরও বাস আছে এবং হাডিদের মেযেরা আজও গ্রাম্য ধাত্রীর কাজ করে। গ্রামের পশ্চিমে একসময় বিশাল ডোমপাড়াও ছিল, এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন। হাডি বাগদি ও ডোমরা ছিল প্রধানত ধর্মঠাকুরের পূজারী। দুলেপাড়ায় এখনও এক ধর্মরাজ আছেন, তবে ঈশানেশ্বরের প্রভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছেন। পূজা দুলেরাই করে। এ ছাড়া, কুডমুনের পূর্বপাড়ায় বুডিগাছতলায় 'কালাচাঁদ' নামে আরএক ধর্মঠাকুর আছেন, সেবায়েত তন্তুবায়, 'দেযাসী' বলা হয়। এখন ব্রাহ্মণে পূজা করেন। বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায় উৎসব হয়। ঈশানেশ্বরের গাজনের সময় এখনও সন্ন্যাসীরা বুডিগাছতলায় কালাচাঁদের মন্দিরের সামনে জমায়েত হন। বর্ধমান-তথা রাঢদেশের আরও অন্যান্য অনেক গাজনের মতো, কুডমুনের ঈশানেশ্বর শিবের গাজনও পূর্বের ধর্মের গাজনের রূপান্তর বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। শিবের অধিকাংশ ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসীরা প্রধানত গোপ বাগদি দুলে ডোম প্রভৃতি সম্প্রদাযের, বিশেষ করে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা। এছাড়া কালাচাঁদ ধর্মের মন্দিরে যে একাধিক কূর্মমূর্তি ধর্মঠাকুর দেখা যায়, তার কারণ পূর্বে গ্রামের মধ্যে একাধিক স্থানে ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ক্রমে তার পূজা বন্ধ হওযার জন্য অথবা পূজারীবংশ লোপ পাওযার জন্য মূর্তিগুলি একটি মন্দিরে এসে জমেছে। একদা সকল ধর্মরাজের এক বিরাট সমবেত গাজনোৎসব হত মহাসমারোহে। তারপর গ্রামের প্রধানরা বোধ হয় একে শিবের গাজনে রূপান্তরিত করেন, সকল জাতির হিন্দুর সমাবেশের জন্য। গ্রামের মণ্ডলদের কথা সকলেই মেনে নিয়েছেন। তারপর থেকে চৈত্রসংক্রান্তির ঈশানেশ্বরের গাজন হয়েছে প্রধান গাজন এবং কালাচাঁদ ধর্মের বৈশাখী উৎসব হয়েছে গৌণ। আর দুলেরা তাই চৈত্র ও বৈশাখের উৎসবের আরও পরে ধর্মপূজার বিধান করেছে জ্যৈষ্ঠে। ব্রাহ্মণরা ক্রমে গ্রামের মণ্ডল উগ্রক্ষত্রিযদেরও দেযাসী তন্তুবাযদের কাছ থেকে ঈশানেশ্বর ও কালাচাঁদের পূজার কর্তৃত্ব অনেকাংশে অধিকার করেছেন। তার ফলে একসময়ের আপসরফার জন্য মনেহয়, ঈশানেশ্বর শিব এখন দুই স্থানে থাকেন। ১৩ চৈত্রের রাত্রি থেকে উৎসবান্ত পর্যন্ত মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিব গাজনতলার মন্দিরে থাকেন এবং বাকি সময় থাকেন ব্রাহ্মণপাড়ার মন্দিরে। ব্রাহ্মণত্বের চাপে আরও একটি ঘটনা ঘটেছে। ঈশানেশ্বর শিব বাটীয় ব্রাহ্মণদের মতো উচ্চবর্ণের কুলীন অভিজাত দেবতায় পর্যবসিত হয়েছেন। কিন্তু শিব তো তা হতে পারেন না। তাঁর উপর অধিকার সকলের সমান থাকা উচিত, বিশেষ করে

গাজনের সন্ন্যাসীদের। কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো কুলীন ব্রাহ্মণ নন। অথচ তাঁরা শিবকে কাঁধে করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবেন, শিবকে স্পর্শ করবেন, মাথায় ফুল চাপাবেন। অতএব স্বয়ং ঈশানেশ্বর শিব এক পুত্রের জন্ম দিলেন, তিনিও শিব, নাম গাজনেশ্বর। এই গাজনেশ্বরই জাতিধর্মনির্বিশেষে সন্ন্যাসীদের স্কন্ধে চেপে গ্রাম-গ্রামান্তর প্রদক্ষিণ করেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত ও স্পর্শিত হন।

কুড়মুনের গাজন এ-অঞ্চলের বিখ্যাত গাজন। আগেই বলেছি, ১৩ চৈত্র রাত্রি থেকে ঈশানেশ্বর ও গাজনেশ্বর মণ্ডলদের তত্ত্বাবধানে শিবতলার মন্দিরে অবস্থান করেন। শিবতলা ও গাজনতলা গ্রামের ঠিক মাঝখানে। ২৫ থেকে ২৮ চৈত্র (মাস বাড়লে ২৬ থেকে ২৯) চারদিন শিব গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গাজনেশ্বরই পালকি করে পাশাপাশি গ্রামে যান, সন্ন্যাসীরা পালকি বহন করেন। ২৮ বা ২৯ কুড়মুন পলাশী পাঁড়ুই গ্রামের সন্ন্যাসীরা গাজনতলায় জমা হন। নানারঙে মুখ চিত্রিত করে, সেজেগুজে, নাচতে নাচতে তাঁরা আসেন। আগে যে মুখোস পরে নৃত্যের প্রচলন ছিল তা বেশ বোঝা যায়। এখন মুখোস করাও শক্ত, খরচও বেশি, তাই মুখ চিত্রিত করা হয়। এইদিন কুড়মুনের পুব পশ্চিম ও উত্তরপাড়া থেকে মাটির পুতুলপ্রতিমা নিয়ে এসে গাজনতলায় তিনদিকের তিনটি বাঁশের গ্যালারিতে সাজানো হয়। কুম্ভকার ও পটুয়ারা এই সব পুতুল তৈরি করে এবং এগুলিকে 'ছবি' বলা হয়। সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে পুতুল তৈরি হয় এবং পাড়ায় পাড়ায় তার প্রতিযোগিতা হয়। গাজনতলায় পুতুল সাজানো হলে, সকলে একমত হয়ে যে-পাড়ার কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন সেই পাড়ার মৃৎশিল্পীদের কাঁধে করে নৃত্য করা হয়। এই তাঁদের পুরস্কার। তার আগে পাড়ায় পাড়ায় 'খেস্তা' গান বলে একরকম গান হত। ঠিক কবিগান নয়, অথচ গানের টেকনিক অনেকটা কবিগানের মতো। একপাড়ার গায়করা অন্য পাড়ার একটা পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গান গেয়ে আসতেন, তারপর আর-একদিন সেই পাড়ার লোক এসে এই পাড়ায় উত্তর দিয়ে যেতেন। এখনও খেস্তা গান হয় কিন্তু তার পূর্বেকার গৌরব আর নেই বিশেষ। পরদিন অর্থাৎ ২৯ বা ৩০ চৈত্র প্রত্যুষে শ্মশান-সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ড নিয়ে উৎসব-নৃত্য করেন।

আসল নরমুণ্ড, নকল বা মাটির নয়। রাঢ়দেশের গাজনে আসল নরমুণ্ড নিয়ে উৎসব এখনও হয়। কুড়মুন গ্রামে হয়, পাশের পলাশী গ্রামেও হয়। শুনেছি, পূর্বস্থলী থানায় মেঢ়তলার গাজনেও নরমুণ্ডের নৃত্যোৎসব হয়। মুণ্ডনৃত্য করার অধিকার সব সন্ন্যাসীর নেই, কেবল শ্মশান-সন্ন্যাসীদের আছে। মণ্ডলদের যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়ে গ্রামের শ্মশান কিনতে হয় : মণ্ডলরা অনুমতি দিলে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের

প্রধান যিনি (বর্তমানে পরামাণিক) তিনি অধিকার মেনে নেন। সাধারণত এই অধিকার বংশানুক্রমিক। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা নরমুণ্ড গ্রাম্য শ্মশান থেকে সংগ্রহ করে পুঁতে রাখেন মাটির তলায়। মধ্যে মধ্যে গিয়ে দেখে আসেন বা পাহারা দেন। একে 'শ্মশান-জাগানো' বলে। হাতে তলোয়ার নিয়ে নৃত্য হয়, নরমুণ্ডে তেলসিঁদুর লেপন করে রাখতে হয়, এবং উৎসবের দিন শেষরাত্রে গাজনতলায় নিয়ে এসে নৃত্য করা হয়। গ্রামে মড়কমহামারী হলে সদ্যোমৃতের টাটকা মুণ্ড তলোয়ার দিয়ে কেটে এনে আগে সন্ন্যাসীরা নৃত্য করতেন শুনেছি। এখনও ঐরকম অবস্থার সৃষ্টি হলে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। ভোর-রাত্রে শ্মশান-সন্ন্যাসীদের এই দৃশ্যটি সত্যিই বীভৎস ও ভয়াবহ দেখায়। মনেহয় একদল উন্মত্ত কাপালিক যেন নরমুণ্ডের নৃত্যোৎসবে মেতে উঠেছে। শিব শ্মশানে মশানে থাকেন, ভূতপ্রেত তাঁর সহচর। শ্মশান-সন্ন্যাসীরা তাই শিবের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় এবং অন্যান্য শ্মশান-সন্ন্যাসীদের চেয়ে তাঁদের সম্মানও তাই বেশি। কুড়মুনের উগ্রক্ষত্রিয় গোপ প্রভৃতিরা শৈবতান্ত্রিক ছিলেন। হাড়ি বাগদি ডুলে ডোম প্রভৃতি নিরঞ্জন ধর্মপন্থীদের উৎসবের সঙ্গে শৈবতান্ত্রিক উৎসবের মিলনমিশ্রণে ঈশানেশ্বর শিবের গাজন গড়ে উঠেছে। আগাগোড়া গাজনের সমস্ত অনুষ্ঠান দেখলে এই কথাই মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুর ও শিবের গাজন-উৎসব-অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে যেমন ঐক্যের সূত্র আছে, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও আছে। নরমুণ্ড ও শ্মশানের মৃতদেহ নিয়ে নৃত্যোৎসব, সর্বত্র গাজনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ নয়। বর্ধমানের কুড়মুনে, কাটোয়া-কেতুগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে, মুর্শিদাবাদের কাঁদিতে নরমুণ্ড ও মৃতদেহ নিয়ে উৎসব প্রচলিত। অন্যত্র এই ও ঐম অনুষ্ঠান ক্রমে 'সভ্য' হয়েছে খানিকটা, কিন্তু নানারকমের দৈহিক নির্যাতনের মধ্যে, যেমন বাণফোঁড়া ইত্যাদি, এখনও তার অবশেষ দেখা যায় (যেমন বাঁকুড়ার পাঁচাল গ্রামে)। আবার কোথাও গাজন উৎসব আরও মার্জিত। শক্তিপূজায় নরবলি পশুবলি থেকে কুমড়োবলি পর্যন্ত অগ্রগতি যেমন অনুষ্ঠানের বৈষ্ণবায়ন ও ভদ্রলোকায়ন (Bhadra-lokisation বলা যেতে পারে) বলে চিহ্নিত করা যায়, গাজনের এই ক্রমরূপান্তরকেও তাই বলা যেতে পারে। এবিষয় বিস্তারিত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আমরা পরে করব (এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে)।

কুড়মুনে নদীতীরে একসময় গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতিদেরও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শীলদের একটি ভগ্ন ইঁটের মন্দির আজও তার সাক্ষী দিচ্ছে। এই শীলদের ভদ্রাসনের সীমানার ভিতরের পুকুর থেকে দ্বারস্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া

ঈশানপাড়ায় ঈশানেশ্বর শিবের যে মন্দির আছে, তার মধ্যে একটি চমৎকার পাথরের দেবীমূর্তি আছে। খুব প্রাচীন মূর্তিটি ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণী সপ্তমাতৃকার এক মাতৃকা। সপ্তমাতৃকার মূর্তি বাংলা দেশে যা পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে চামুণ্ডার বিভিন্ন রকমের মূর্তিই (দন্তুরা চর্চিকা ইত্যাদি) বেশি। বর্ধমানেও চামুণ্ডামূর্তি অনেক পাওয়া গিয়েছে। বারাহী মূর্তিও অনেক পাওয়া গিয়েছে বাংলা দেশে। হুগলি জেলার দ্বারবাসিনীতে একটি বারাহী মূর্তি আছে। ব্রহ্মাণীর মূর্তি খুব বেশি পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে একটি মূর্তি (দেবগ্রাম-নদীয়ার) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মিউজিয়মে আছে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর মূর্তি খুবই দুষ্প্রাপ্য। রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়মে একটি মাত্র ইন্দ্রাণীর মূর্তি আছে।[১] কুড়মুনের ইন্দ্রাণী মূর্তিটি দুষ্প্রাপ্য তো বটেই, অনেক বেশি (রাজশাহীর মূর্তির চেয়ে) সুন্দর ও নিখুঁত। বর্ধমানে 'ইন্দ্রাণী' নামে প্রাচীন পরগণাও ছিল, কাটোয়া অঞ্চলে। চামুণ্ডার পূজারও খুব প্রচলন ছিল। ইন্দ্রাণীর মূর্তিও পাওয়া গেল কুড়মুনে। এইসব নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে একসময় সপ্তমাতৃকার পূজার বেশ প্রচলন হয়েছিল রাঢ়দেশে এবং সেটা আদৌ উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রতিপত্তির সাক্ষী নয়।

১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'বাংলার ইতিহাস'—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫৫, প্লেট সংখ্যা ৬৭ চিত্র সংখ্যা ১৬৩ দ্রষ্টব্য।

তারাপীঠের তারা। বীরভূম

আকালীপুরের কালী। বীরভূম

পাবিস মন্দিরের টেরাকোটা, ছিন্নমস্তা।   বীরভূম
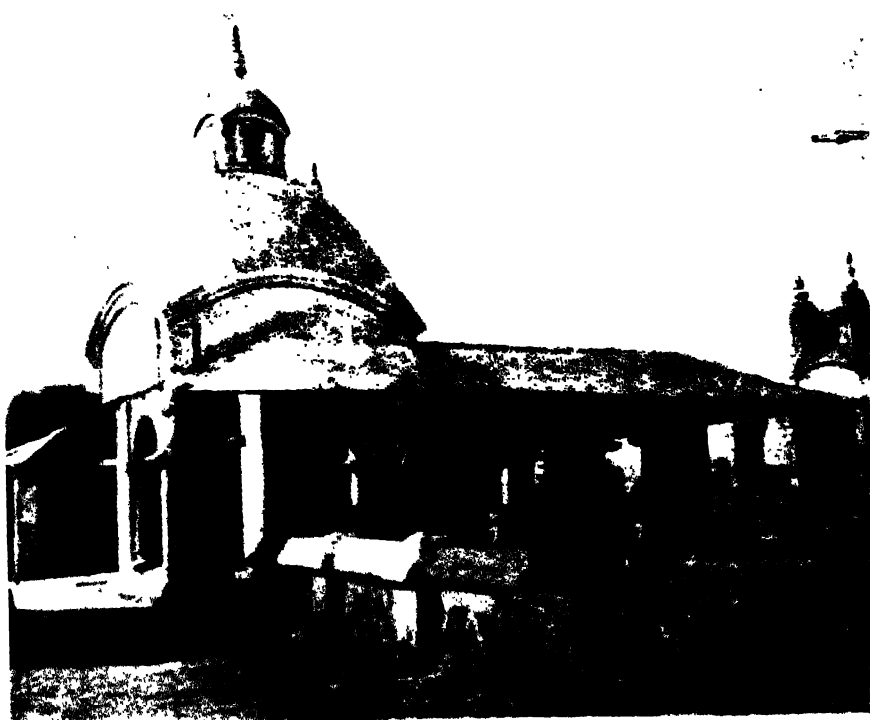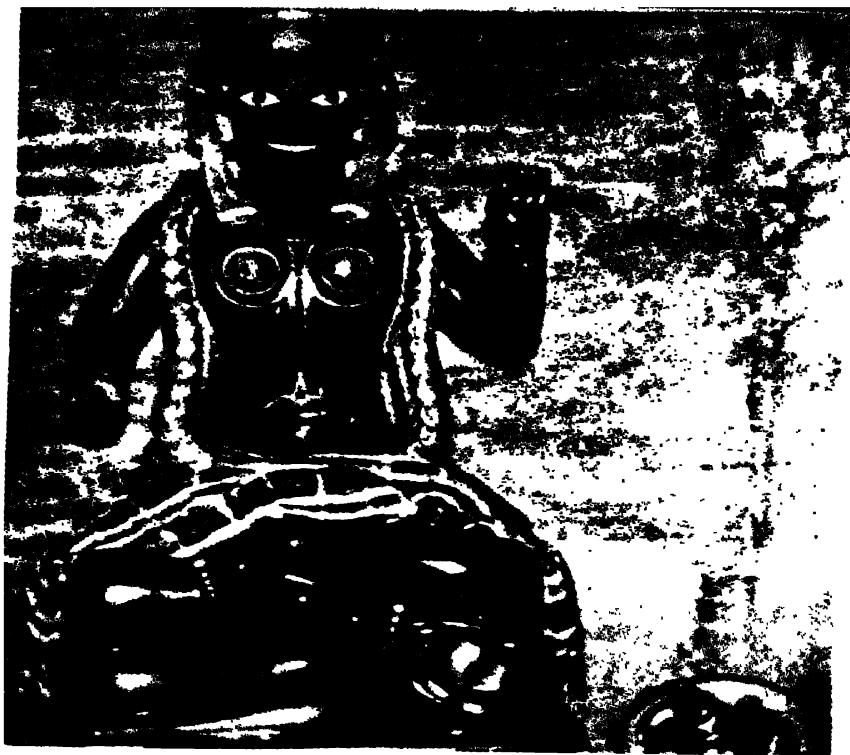
জয়দেব-কেঁদুলির মন্দিরের টেরাকোটা।   বীরভূম

বরাকবেব কয়েকটি মূর্তি। বর্ধমান

পাতুনের মূর্তিস্তূপ, ধর্মরাজ শিব ইত্যাদি। বর্ধমান

বারাগ্রামের মহাপ্রভু সেবা। বীরভূম

নানুরের বাশুলি-বাগীশ্বরী বীরভূম

পাইকোডেন স্তূপাকার মূর্তি । বীবভূম

পাকবিরড়ার জৈনমূর্তি । পরুলিয়া

ছাতনার বীরস্তম্ভ। বাঁকুড়া
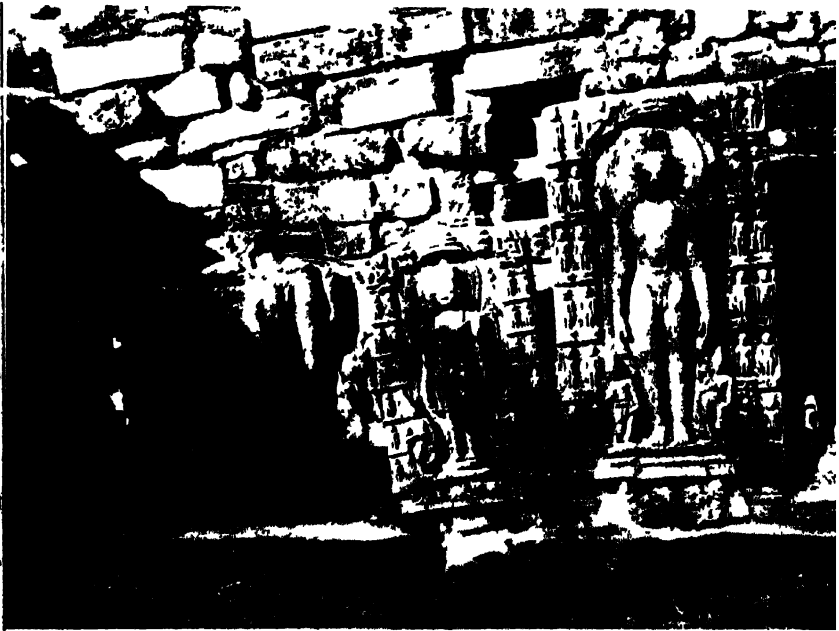
বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজ-মন্দির, মণ্ডপের তলায় কাঠের ঘোড়া। বাঁকুড়া

কুডমুনেব নবমুণ্ডসহ গাজন । বধম ন

এক্তেশ্ববেব গাজন । বাঁকুড়া

পাঁচালের গাজনে বাণবিদ্ধ ভক্ত্যাদের যাত্রা মধ্যে লেখক

বাহলাডার গাজনে আগুনপড়া। বাঁকুড়া

ঘুরিষার পণ্ডিত রামময় পঞ্চতীর্থ। বীরভূম

ঘুরিষার চারচালা মন্দির বীরভূম

গর্দভরূপী 'বাবু' মেমসাহেবের কৃপাপ্রার্থী
সুরুলের মন্দির । বীরভূম
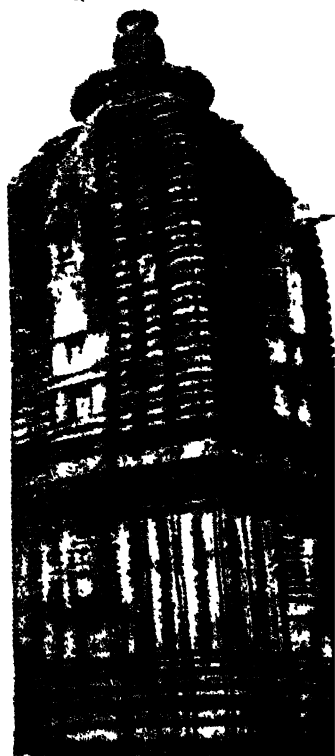
বরাকরের দেউল । বর্ধমান

সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির। বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রেখদেউল। বাঁকুড়া

পাকবিড়ার জৈনমূর্তি (ভৈরব)। পুরুলিয়া

বুধপুরের গণেশমূর্তি। পুরুলিয়া

ইলামবাজারের মন্দিরে টেরাকোটা জগদ্ধাত্রী। বীরভূম
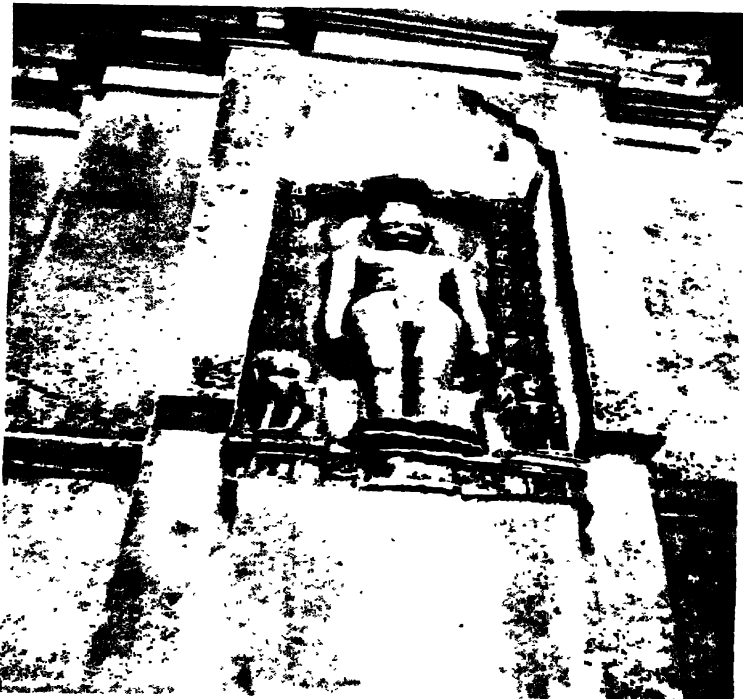
ধরাপাট মন্দিরের গায়ে জৈনমূর্তি। বাঁকুড়া

বেলিয়াতোড়বাসী (বাঁকুড়া) শ্রীযুক্তা স্বজনকুমারী মিত্র
শিল্পী যামিনী রায়ের ভগিনী

হীপ সাহেবের কুঠি, সোনামুখী। বাঁকুড়া

সুরুল গ্রামের পথে, দূরে সরকারবাড়ি। বীরভূম

আরস্কিন সাহেবের ভাঙাকুঠি, ইলামবাজার। বীরভূম

বাহুলাড়ার মন্দির । বাঁকুড়া

বোড়াম-দেউলঘাটা । পুরুলিয়া

সুশুনিয়ার শিলালিপি। বাঁকুড়া

রামাই পণ্ডিতের আশ্রম, ময়নাপুর। বাঁকুড়া

পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ

পুরুলিয়ায় জৈনমূর্তিসংগ্রহ

শ্রী
ম
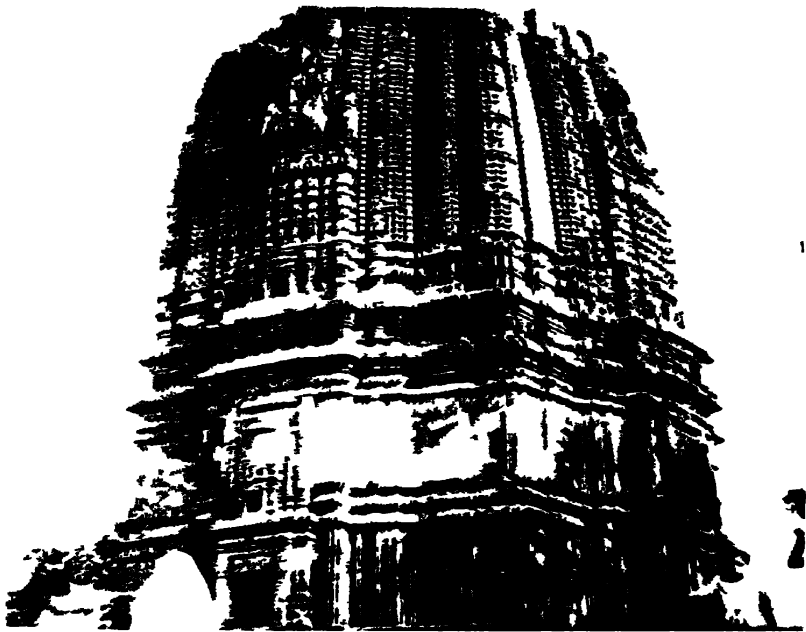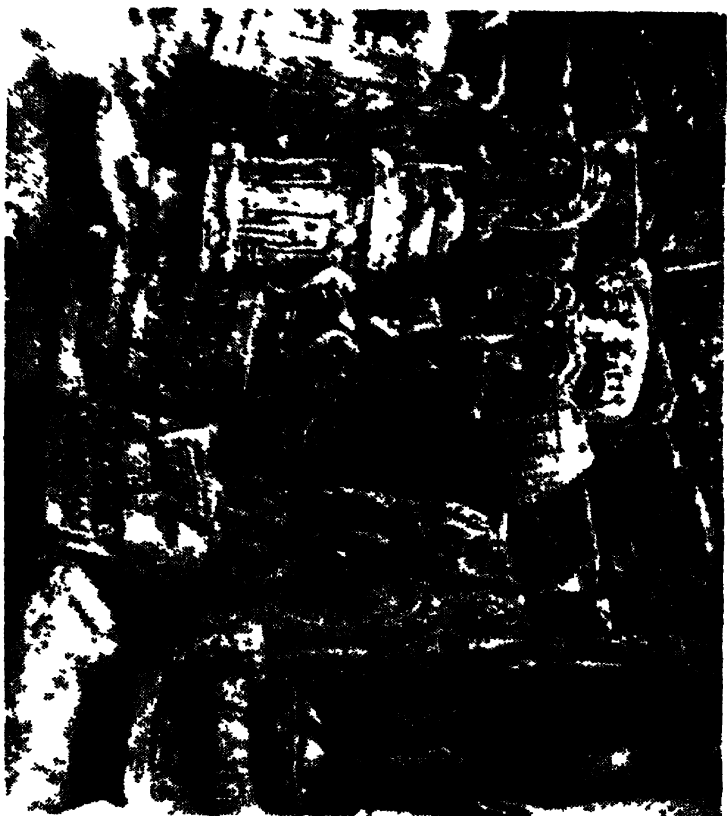
নগর | রাজনগর

বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর, নগর বা লখ্‌নোর। মুণ্ডারী অভিধানে 'বীর' কথার অর্থ জঙ্গল। জঙ্গলাকীর্ণ দেশ বলে নাম 'বীরভূম'। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজারা বীরভূমে রাজত্ব করেছেন বলে লোকের বিশ্বাস, বীরের দেশ থেকে বীরভূম নাম হয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের দেশেও তো বীর থাকতে বাধা নেই। হিন্দু বীর রাজারা ছিলেন, দুর্ধর্ষ পাঠান জায়গীরদাররা ছিলেন। তাঁদের রাজধানী ছিল নগর বা রাজনগর। আজ কেউ নেই, রাজ্য নেই, রাজাও নেই, জায়গীর নেই, জায়গীরদারও নেই। অগ্রগামী ইতিহাসের নিষ্ঠুর চাকার তলায় একে-একে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আছে কেবল রাজনগর, আর বিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে অতীত স্মৃতির এলোমেলো টুকরো।

এইসব টুকরো স্মৃতি জড়ো করে রাজনগরের কাহিনী রচনা কর । সিউড়ি থেকে প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে রাজনগর। বীরভূমের অন্যতম ঐতিহাসিক স্থান রাজনগরে যুগের পর যুগের অনেক পদচিহ্ন দেখা যায়। শক্ত রাঙামাটির পথের কাব্যিক সৌন্দর্য থাকলেও পথচলার ক্লান্তি আছে। পাথুরে ঝাঁকুনি খেয়ে হয়রান হয়ে, রঙিন ধুলোয় বৈরাগীর মতো গৈরিক বেশ ধারণ করে যখন রাজনগরে উপস্থিত হলাম তখন দু-একটিমাত্র ছবি তোলার পর ক্যামেরা গেল অচল হয়ে। কালীদহের কূলে সঙ্গীদের নিয়ে বসে বসে 'স্কেচ' করা ছাড়া আর উপায় ছিল না (১৯৫২-৫৩)।[১]

প্রথমেই মনে হয় বীরদেশের বীর রাজারা কারা? কোনো প্রামাণিক ইতিহাস নেই। শোনা যায়, সিউড়ি থেকে ছয় মাইল আ..জ উত্তর-পশ্চিমে, ভাণ্ডীরবন

১ রাজনগরে দ্বিতীয়বার গিয়েছি ১৯৬১ সালে, তখনও বিশেষ পরিবর্তন কিছু লক্ষ্য করিনি।—গ্রন্থকার

থেকে প্রায় আধমাইল দূরে বীরসিংহপুর বা বীরপুর নামে যে গ্রাম আছে, বীরভূমের বীর রাজারা মুসলমান অভিযানের সময় নগর রাজধানী ছেড়ে সেইখানে চলে আসেন। মাঠের জঙ্গল ও ইঁটপাটকেলের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্থানীয় লোকেরা বলেন যে, ঐখানে রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। কিন্তু বীরসিংহ কে? দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'রামচরিত' কাব্যে বাঙালী কবি সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের মিত্রসামন্তরাজাদের একটি নামের তালিকা দিয়েছেন। যেমন—

বন্দ্যগুণসিংহবিক্রমশূরশিখরভাস্করপ্রতাপৈস্তৈঃ।
স মহাবলৈরুপেতো জেতুং জগতীমলম্ভূষ্ণুঃ॥ (রামচরিত—২।৫)
প্রাপ্তপ্রবর্ধিতার্জুনবিজয়োঽর্থিতবর্ধনঃ সোমমুখশ্চ।
অনুগতমাতুলসূনুপ্রবলভুজালম্ব নো রাম॥ (২।৬)

অর্থাৎ সেই (রামপাল) প্রকাণ্ড বল বা সেনাযুক্ত বন্দ্য (ভীমযশাঃ), গুণ (বীরগুণ), সিংহ (জয়সিংহ), বিক্রম (বিক্রমরাজ), শূর (লক্ষ্মীশূর ও শূরপাল), শিখর (রুদ্রশিখর), ভাস্কর (ময়গলসীহ—সিংহ) ও প্রতাপ (প্রতাপসীহ—সিংহ) নামক বীরশ্রেষ্ঠ সামন্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমস্ত জগৎ জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যিনি অর্জুন (নরসিংহার্জুন ও চণ্ডার্জুন) ও বিজয় (বিজয়রাজাকে) মিত্ররূপে পেয়ে (দেশ-কোষাদিদ্বারা) তাঁদের সংবর্ধিত করেছিলেন, যিনি বর্ধনের (দ্বোরপবর্ধনের) সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, যিনি সোমকে (সামন্ত-প্রধানভাবে) সঙ্গে নিয়েছিলেন, সেই রামপাল অনুরক্ত মাতুলপুত্রদের প্রবল বাহুবলকেও অবলম্বন করেছিলেন (রাধাগোবিন্দ বসাক: 'রামচরিত, ৪১-৪২ পৃঃ)। এর মধ্যে টীকাকারের নির্দেশ অনুসারে দেখা যায় যে মেদিনীপুর মানভূম বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলের স্বাধীন সামন্তরাজা অনেকে ছিলেন। বীরগুণকে টীকাকার কোটাটবী নামক স্থানের 'কণ্ঠীরব' বা সিংহ বলে নির্দেশ করে 'দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী' বলে বিশেষিত করেছেন। মনেহয়, উড়িষ্যার কাছাকাছি বাংলা ভূভাগের কোনো অটবীরাজ্য ছিল কোটাটবী (ময়ূরভঞ্জ-ভঞ্জভূম?) এবং বীরসিংহ সেখানকার রাজা ছিলেন। লক্ষ্মীশূর অপরমন্দারের (গড মন্দারন, আরামবাগ) সামন্ত ছিলেন, রুদ্রশিখর তৈলকম্প-তেলকুপির (মানভূম), প্রতাপসিংহ ঢেক্করীর (কাটোয়া-বর্ধমান), ভাস্কর উচ্ছালের (বীরভূম?)। বীরসিংহ নামে কোনো রাজা বীরভূমে ছিলেন বলে সন্ধ্যাকরনন্দী বা তাঁর টীকাকার উল্লেখ করেননি। তাহলে বীরসিংহ নামে কথিত হিন্দু রাজা কে? পুরাণকাররা রাঢ়দেশের গভীর অরণ্য, কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি, লৌহখনি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তাঁরা খুব সুদক্ষ তীরন্দাজ ও পরিশ্রমী চাষী। বীরদেশে

বীরভূম
০ ১২৮ ২৫৬
কিলোমিটার
সদর
মহকুমা
থানা
রেলপথ
রাস্তা
মুরারই
নলহাটি
রামপুরহাট
মল্লারপুর
সিউড়ি
রাজনগর
সাঁইথিয়া
নানুর
লাভপুর
দুবরাজপুর
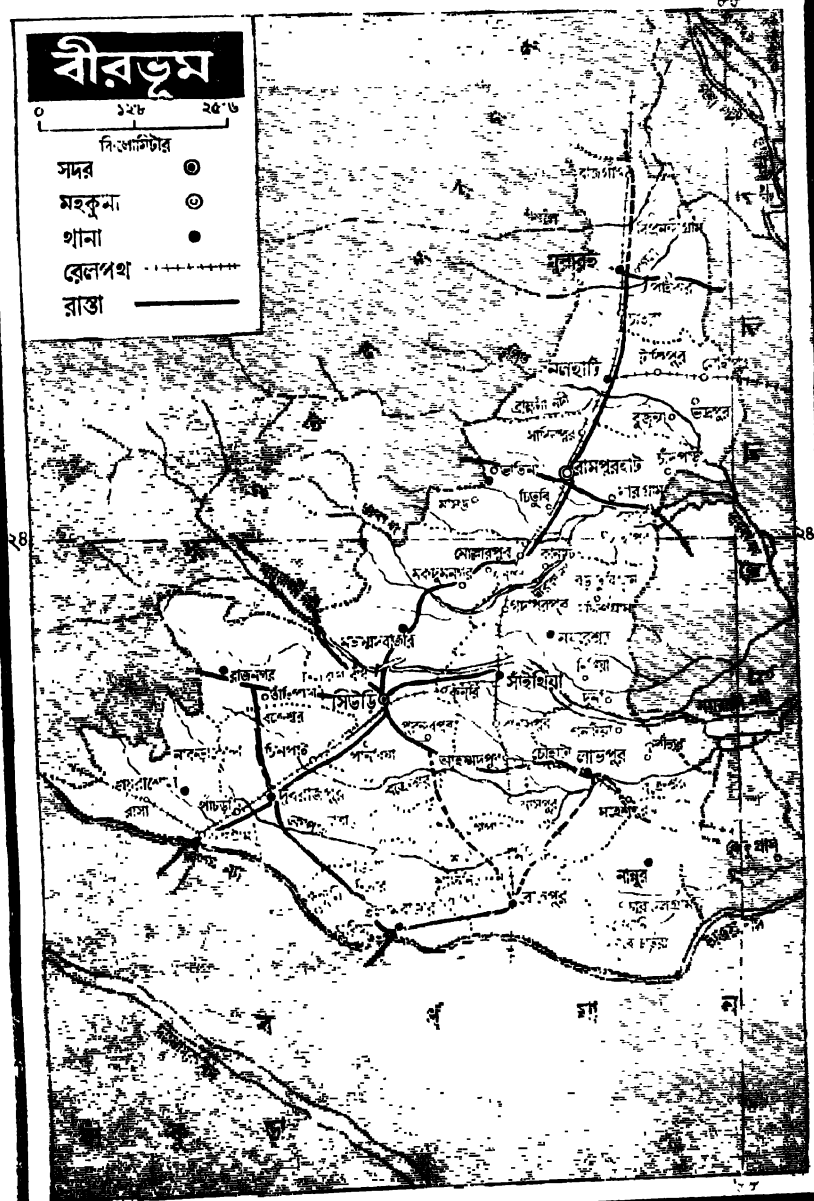
'নগর', 'সিপুল্য' প্রভৃতি নগরের কথাও তাঁরা বলেছেন। হয়ত স্থানীয় কোনো কৌম বা 'গণের' রাজা ছিলেন 'বীরসিংহ'। 'বীরের সিংহ' অর্থাৎ জঙ্গলের সিংহের মতো তিনি পরাক্রমশালী ছিলেন। মুসলমান অভিযানের পর তাঁর 'নগর'-ত্যাগের কাহিনী মিথ্যা নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে রাঢ়দেশের সকল সামন্তের কথা সন্ধ্যাকরনন্দী উল্লেখ করেননি। আশেপাশে একাধিক সামন্ত রাজা ছিলেন এবং বীরভূমে যে কেউ ছিলেন না তা মনে হয় না।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বীরভূম জেলা বিজয়ী মুসলমানদের করতলগত হয়। বীরভূম হল সীমান্ত-প্রদেশ, তাই বীবভূমে তাঁরা একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। অনেকে বলেন, লক্ষোর (লক্ষোটি বা লক্ষ্মণাবতী নয়) বীরভূম সীমান্তের অন্তর্গত এবং মুসলমানদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। স্টুয়ার্ট লক্ষোর ও নগর-রাজনগর অভিন্ন বলে মনে করেন। ব্লকম্যান সাহেব মনে কবেন, লক্ষোর বীরভূমের দুবরাজপুরের কাছে কোনো স্থান (এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৮৭৩)। মনোমোহন চক্রবর্তীও লক্ষোর প্রসঙ্গে নগর-রাজনগরের কথা উল্লেখ করেছেন (এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৯০৮)। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান শাসকদের অন্যতম প্রধান শাসনকেন্দ্র বীরভূমের রাজনগর। পশ্চিমবঙ্গের প্রায়-স্বাধীন মুসলমান জায়গীরদারদের মধ্যে রাজনগরের 'রাজারা' ছিলেন অন্যতম। এদিকে মেদিনীপুরের সামন্তরাজাদের বাদ দিলে, বাংলার পশ্চিমসীমান্তের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন—বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজারা এবং বীরভূম-রাজনগরের মুসলমান রাজারা। শুধু যে শক্তিশালী ছিলেন তাঁরা তা নয়, তাঁদের মতো স্বাধীনচেতা সামন্ত রাজা বাংলা দেশে আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। মোগলযুগেও রাজনগরের পাঠান ও বিষ্ণুপুরের হিন্দু সামন্তরাজারা মাথা হেঁট করেননি এবং কোনোদিন তাঁরা প্রাদেশিক নবাবের সামনে হাজিরা দেননি, অথবা রাজস্ব দিতে যাননি। স্বাধীন বাজ্যের প্রতিনিধির মতো তাঁদের প্রতিনিধিরা নবাব-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। মুতাক্ষরীণ-কার লিখেছেন: "বাংলার জমিদারদের মধ্যে মুর্শিদাবাদের এত কাছাকাছি ও এত শক্তিশালী বীরভূমের রাজাদের মতো আর কেউ ছিলেন না। তাঁদের নিজেদের সৈন্য-সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল এবং চারিত্রিক উদারতায় ও স্বাধীনতাপ্রিয়তায় তাঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ" (সায়র-উল-মুতাক্ষরীণ, ২য়, ১৯৩-৯৪)। 'রিয়াজ' ও স্টুয়ার্টও তাই বলেছেন। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজা ও রাজনগরের মুসলমান রাজা ছিলেন বাংলার স্বাধীন সামন্তরাজাদের দুই স্তম্ভস্বরূপ। বাংলার সীমান্তে ছিলেন বাংলার স্বাধীনতা-

রক্ষার দুই পরাক্রমশালী প্রহরী—হিন্দু ও মুসলমান সামন্ত-রাজা। কেউ কোনদিন নিজেদের মধ্যে লড়াই করেননি এবং বিদেশীর আক্রমণ দু'জনেই সমানভাবে প্রতিরোধ করেছেন। মারাঠাদের লুঠতরাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে দু'জনেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেছেন এবং শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জুলুম-জবরদস্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দুজনেই পথের ভিখারী হয়েছেন। একজন হিন্দু ও আর-একজন মুসলমান সামন্ত রাজা। বাংলার ইতিহাসের একটা লুপ্ত অধ্যায়, আজ মনেহয় রূপকথা। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর গৌরবময় স্মৃতিকথা আজ বেদনায় বিষণ্ণতায় ম্লান।

বীরভূমের পাঠান মুসলমান রাজাদের ব্রিটিশরাজের বিরোধিতা প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড লঙ তাঁর Selections from Unpublished Records of Government (1748-67) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন :[১]

> The Birbhum Raja was a Mohomeden, fond of plunder, and a bitter enemy to the English. Jaffir Ali Khan pronounced him a traitor.
>
> Many of the Dutch, after the defeat of Bidarra, took refuge in Birbhum Telingas or Sepahis at the same time ran away to the Raja s service. The Raja himself fled from Nagore. In 1763 the Raja, at the head of 300 horse, 400 foot, and 5 pieces of cannon, had an action with the English near Suri ; he was defeated ; soon after Kamdar Khan came at the head of 6000 Patan horse, some Portuguese a.. Armenians, 1000 Sepahis with cannon to within 5 coss of Suri. On this the English nailed up the guns, burnt Suri Fort and retreated.

রাজনগরে মুসলমান রাজাদের ব্রিটিশ-বিরোধিতার এই ইতিহাস তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্রিটিশের চক্রান্তে এবং ব্রিটিশের তাঁবেদার এদেশীয় সামন্তদের শত্রুতার ফলে ক্রমে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে প্রায় পথের ভিখিরি হয়ে যান। ও'ম্যালি লিখেছেন :

> 'Their last home was sold for debt in 1888, and in the same year the Titular Raja, Muhammad Johar-ul-Zaman Khan, who succeeded in 1855, died a pauper, leaving his children destitute
> (O' Malley : Birbhum District Gazetter, 1910, P. 122)।

---

১. Rev, James Long-এর Selections-এর বিষয়-সংখ্যা ৩৫৭, ৪১৭, ৫০১, ৫১০, ৫৩৬ দ্রষ্টব্য।

ব্রিটিশ ও মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বীরভূমের পাঠান রাজারা রাজনগরের প্রায় ৩২ মাইল জুড়ে বাঁধ ও পরিখা তৈরি করেছিলেন। শেরউইল (Sherwill) তাঁর রেভিনিউ সার্ভে রিপোর্টে লিখেছেন যে বাঁধের উচ্চতা ১২ ফুট থেকে ১৮ ফুট পর্যন্ত ছিল, এবং তার বাইরে ছিল গভীর পরিখা। একাধিক প্রবেশদ্বার ছিল এই ব্যূহের চারিদিকে এবং দ্বারগুলির পাথর বাঁধানো প্রত্যেক ফটকে শতাধিক সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত। দ্বারগুলিকে বলা হত 'ঘাট' এবং যারা পাহারা দিত তাদের বলা হত 'ঘাটোয়াল'। ক্যাপটেন শেরউইল এই ধরনের প্রতিরোধব্যবস্থাকে নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন বলেছেন, কারণ শত্রুদের অশ্বারোহী ঘাটগুলি এড়িয়ে সহজেই বাঁধের পাশ (flank) দিয়ে নগরে প্রবেশ করতে পারত। এই সমালোচনা ঠিক বলে মনে হয় না, কারণ তখন, এমন কি এখনও অনেকটা, রাজনগরের চারিদিক গভীর জঙ্গলাকীর্ণ, এবং জঙ্গলের পথ অশ্বারোহীর পক্ষে সুগম নয়।

প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে (১৮৭২-৭৩) শতাধিক বছর আগে রাজনগরের এই প্রতিরোধ-বাঁধ ও গড়খাইয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :

> To the West of Seuri is the great fort, if fort it can be called, of Nagor. The whole Pargana is enclosed by a low earthen rampart overgrown with dense scrub and bambu jangal ; the ramparts, have a shallow ditch in front, about 20 feet wide now in places, but which once must have been both wider and deeper. The line of ramparts is very irregular both in plan and in profile. As a general rule, however, the height is about 15 feet above the ditch, and the width at base about 80 ; the top has been naturally rounded by the weather. (A. S I. Report 1872-73, P. 146).

রাজনগরের জীর্ণ রাজপ্রাসাদ ও ইমামবাড়ার পাশে দাঁড়িয়ে, ভগ্ন মসজিদ ও মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দিকে চেয়ে, এই অতীত ইতিহাসের কথা মনে পড়ছিল। কোথায় রাজনগরের পাঠান জায়গীরদারদের সেই ঘাটোয়াল, পাইক নায়করা? ব্রিটিশ আমলের গ্রাম্য চৌকিদারে পরিণত হয়েছে তারা এবং ঘাটোয়ালী অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে সর্বস্বান্ত হয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তারা হয়েছে ডাকাতের দলের সর্দার। বিখ্যাত সব বীরভূম-বিষ্ণুপুরের ডাকাত, বাংলার রোবিন-হুড, যাদের ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ারা সকলেই

স্বৈরাচারী ছিলেন, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান নির্বিশেষে। তেমনি মধ্যযুগীয় বদান্যতাও প্রায় সকলেরই ছিল, অর্থাৎ জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই 'বেনাভলেণ্ট ডেস্পট' ছিলেন। হিন্দু সামন্তরাজা ও জমিদাররা যেমন মুসলমানদের ফকিরাণ পীরোত্তর ইত্যাদি ভূমি দান করেছেন, মুসলমান সামন্তরাও তেমনি হিন্দুদের দেবোত্তর নানকর দান করেছেন। মন্দির ও মসজিদ উভয়েই যথেষ্ট নির্মাণ করেছেন আজও বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়ায় হিন্দু-মুসলমান সামন্তরাজাদের এই সব বদান্যতার নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। রাজনগরের পাঠান জায়গীরদার রাজা আসাদ উল্লা খাঁ (১৬৯৭-১৭১৮) ও তাঁর বংশধররা এইরকম প্রচুর জমি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে দান করেছিলেন। প্রসিদ্ধ বক্রেশ্বর তীর্থ সম্বন্ধে রাজনগরের মুসলমান রাজার প্রদত্ত একটি সনদ (প্রায় দুশো বছর আগেকার) এখানে আংশিক উদ্ধৃত করছি। সনদখানি বক্রেশ্বরের পাণ্ডা কৃষ্ণবিহারী আচার্যের গৃহে সযত্নে রক্ষিত ছিল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাকে উদ্ধার করেছিলেন :

" বক্রেশ্বরনাথ শিবঠাকুরের নিষ্কর দেবত্তর মুদ্দাতে পুরুস পুরুস হইতে ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া দখলিকার আছে। নীররাজার দত্ত সনন্দ রাখে। এক্ষণে বক্রেশ্বরের মেলাতে হুজুরের লোক-লস্কর হাতী-ঘোড়াতে বাজারে জুলুম হাঙ্গাম করে। এজন্য দরখাস্ত করি বক্রেশ্বরের মেলাতে জুলুম না করে তেঁহার যেমত হুকুম। উক্ত দেবত্তর বৃত্তি বেশাদে কেহ জুলুম হাঙ্গামা করিবে না ও কখন শর্মা মজকুরদিগকে তলপ করিবেক না। যেন পাণ্ডা মজকুর সাবেক সুরত ৺জীয়ের সেবা পূজা করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ভোগদখল করে। পরওয়া লিখি মুন্সী রেযাজউদ্দীন মহম্মদ। ইতি সন ১১৭২ সাল, তাং ৯ই ফাল্গুন

কালীদহের কূলে বসে রাজনগরের এই সব ঐতিহাসিক স্মৃতি টুকরো টুকরো মনে পড়ছিল। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সামন্তরাজাদের কাহিনী। বিশাল কালীদহ, হ্রদের মতো। আজও রয়েছে। ইমামবাড়া আছে। সামনে আছে দ্বাদশ অথবা ছয় গম্বুজ-বিশিষ্ট মতিচূড়া মসজিদ।[১] নহবৎখানা আছে, নহবৎ আজ আর বাজে না কবরখানা আছে, নগর-রাজাদের কবর। সুন্দর পোড়ামাটির কারুকার্যসহ একটি ভগ্ন মসজিদও আছে। তার মধ্যে অতীতকালের সেই নহবৎখানা থেকে যেন সানাইয়ের করুণ সুর ভেসে আসছে মনে হয়।

১ ও'ম্যালি তাঁর বীরভূম গেজেটিয়ারে (১৯১০) লিখেছেন, '.. the ruins of another old mosque called Motichor Masjid, which had 12 domes, but some have fallen down.' (পৃষ্ঠা ১২৩)।

সিউড়ি | বক্রেশ্বর
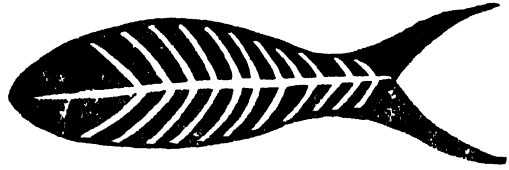
বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ির অদূরে ময়ূরাক্ষী নদী এবং দূরে সাঁওতাল পরগণার পর্বতমালার তরঙ্গায়িত রেখা। শাসনকেন্দ্র শহরে পরিণত হয়েছে, কিন্তু একদা যে সিউড়ি বীরভূমের অখ্যাত গ্রাম ছিল আজও তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সিউড়ি ও তার পরিপার্শ্ব সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সিউড়ি অনুসন্ধানীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র নয়, শাস্ত্রোক্ত পীঠস্থান নয়, তবু বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অফুরন্ত উপাদানকেন্দ্র সিউড়ি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফার্গুসনের ভাষায় 'with an eye in the head' অনুসন্ধান করলে মফঃস্বল শহর সিউড়ির আশপাশে অলিগলিতে বহুশতাব্দীর বিস্তীর্ণ সাংস্কৃতিক উপকরণ কুড়িয়ে পাওয়া যায়।[1]

সাঁওতাল পরগনার পর্বতমালার পরে ভূপ্রকৃতির তরঙ্গবিক্ষোভ ও উত্থানপতন যেন সিউড়ি পর্যন্ত এসে তারপর বাংলার সমতল ভূমির সঙ্গে মিশেছে। প্রকৃতির এই তরঙ্গায়িত রূপের সঙ্গে বীরভূমের, তথা রাঢ়ের সংস্কৃতির ক্রমায়াত ধারার একটা সাদৃশ্য আছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়। সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালী সংস্কৃতি অর্থাৎ আদিঅস্ট্রাল বা নিষাদসংস্কৃতির ধারা যেন উত্থানপতনের বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার সুসমন্বিত সংস্কৃতিগঙ্গায় মিলিত হয়েছে এইখানে। সিউড়ি ও তার

১ প্রায় ষাট বছর আগে ১৩২১ সনে হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন। সমিতির উদযোগে ও হেতমপুরের রাজাদের পোষকতায় শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেন। 'বীরভূম বিবরণ' তিনখণ্ডে তাঁর সংগৃহীত তথ্যাদি প্রকাশিত হয়।

আশপাশে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে আছে যা সংস্কৃতিবিজ্ঞানের (Cultural Anthropology) প্রত্যেক ছাত্রের অনুসন্ধানের খোরাক যোগাতে পারে। যুগে-যুগে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সংঘাত ও সমন্বয়ের বিশেষত্ব অনুসন্ধান করা আধুনিক সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন। সম্প্রতি এ-বিষয়ে অনেক মূল্যবান অনুসন্ধানের কাজও তাঁরা করেছেন। এসিয়া মহাদেশে 'চীনের সংস্কৃতি' সম্বন্ধেও এক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান কাজ করা হয়েছে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি অনেক ভাল কাজ হয়েছে ও হচ্ছে। কেবল শিলালিপি তাম্রলিপি ও পুথিপত্রের মধ্যে ইতিহাসের পরিধি সীমাবদ্ধ নয়। মূর্তিতত্ত্ববিদ্‌রা কালনির্ণয় নিয়ে যে পরিমাণ কালাতিপাত করেছেন, তার শতাংশের একাংশও যদি তাঁরা সামাজিক আচারঅনুষ্ঠান ও অন্যান্য বিচিত্র সাংস্কৃতিক নিদর্শন অনুধাবনে অতিবাহিত করতেন, তাহলে আজ আমরা দেশের গতিশীল ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে অনেক বেশি জ্ঞানলাভ করতে পারতাম। শিলামূর্তি লিপি পুঁথি ও মুদ্রার গুরুত্ব ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের উপাদান হিসাবে কেউই অস্বীকার করবেন না। অলিখিত ইতিহাস এই সমস্ত উপকরণের সাহায্যেই লেখা হয়েছে এতদিন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আচারের অনেক অজানা তথ্য ও রহস্যও তার দ্বারা উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। আজও এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক হাতিয়ার ও উপকরণের অসাধারণ মূল্য আছে। পূর্বে কিংবদন্তী ও কুলজীগ্রন্থের মধ্যে যে ঐতিহাসিক গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান রচনায় সাহায্য করেছে (যদিও ঐতিহাসিক উপাদান তার মধ্যে যে একেবারে নেই তা নয়)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও পুঁথিবিশারদরা এই গবেষণাকে প্রামাণিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু আধুনিকযুগের নৃবিজ্ঞানী, বিশেষ করে সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, শিলালিপি ও পুঁথির ক্ষেত্র ছাড়াও অনুসন্ধানের আরও ক্ষেত্র আছে। মানুষের সমাজ ও তার আচারঅনুষ্ঠানের ক্ষেত্র। শিলালিপি ও পুঁথি লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু মানুষের ধ্যানধারণা আচার-অনুষ্ঠান যুগযুগান্তের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেও আশ্চর্যভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে। হিন্দু চাষী মুসলমান হয়েছে, হিন্দু ও মুসলমান চাষী উভয়েই খ্রীস্টান হয়েছে, নামও তাদের একাধিকবার বদলেছে, মন্দির থেকে মসজিদে এবং মসজিদ থেকে গির্জায় গিয়েছে তারা—কিন্তু সবসময় দেশীয় আচারঅনুষ্ঠানগুলি তাদের সঙ্গী হয়েছে সেগুলি বর্জন করা সম্ভব হয়নি। আজও আমরা যখন বৃক্ষপূজা করি, গঙ্গাস্নান করি, জন্মোৎসব ও শ্রাদ্ধ করি, তাবিজ-মাদুলি-কবচ পরি, স্বস্ত্যয়ন করি, ভূত-প্রেত-পিশাচ স্বচক্ষে দেখি, জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করি,

তখন আমাদের হাজার হাজার বছরের অলিখিত ইতিহাসের স্তরগুলি পাথুরে প্রমাণ ছাড়াও, আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

সিউড়িতে তাই হয়েছিল। সিউড়ির অলিগলিতে পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরলে শুধু সিউড়ির নয়, বীরভূমের বিচিত্র রূপ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে অর্ধবৃত্তাকারে ধাঙড়-পাড়া বাউরিপাড়া ডোমপাড়া মালপাড়া কেওটপাড়া ইত্যাদির অবস্থান। শুধু যে শহরের প্রান্তসীমায় এদের বসবাস তা নয়, শহরের মধ্যেও ইতস্তত হাড়ি বাউরি ডোম প্রভৃতির বাস আছে। এছাড়া বারুইপাড়া চর্মকারপাড়া ইত্যাদিও আছে। পাড়ায় পাড়ায় প্রচুর দেবদেবী ও অসংখ্য মন্দির আছে। দেবদেবী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে মনসা চণ্ডী কালী ও ধর্মঠাকুর শতকরা নিরানব্বই জন। এমন কোনো পাড়া নেই যেখানে মনসা কালী ও ধর্মঠাকুর নেই। বীরভূমের অন্যতম সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব যেন সিউড়ির পাড়ায় পাড়ায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। বাউরিপাড়ায় আছে 'সাঁউডালি পূজা'র স্থান। নিমগাছের তলায় দোচালা পর্ণকুটীর, তার মধ্যে দু'টি মাটির ডেলা দুই বোন মনসা, একপাশে আরও তিনটি মাটির ডেলা হল গোঁসাই, আরএক পাশে আরও দু'টি মাটির ডেলা কালী। মনসা কালী গোঁসাই সকলেই তাল-তাল মৃত্তিকাপিণ্ডে মূর্ত। ভয়ানক জ্যান্ত দেবতা, ভাদ্র ও পৌষসংক্রান্তির বিশেষ পূজার সময় আরও বেশি জ্যান্ত হয়ে ওঠেন। পাশে যে নিমগাছটি আছে তাতেও একজন থাকেন, তাঁকে দেখা যায় না, তাঁর নাম 'ঝেঁটেনি-বুড়ি'। বাঁদরিভূতও ঐ গাছে বিরাজ করেন। উৎসবের সময় 'ঝেঁটেনিবুড়ি' যার স্কন্ধে ভর করেন, তিনি উপস্থিত ব্যক্তিদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান গল্‌গল করে বলে দিতে পারেন। বাঁদরিভূত যার স্কন্ধে ভর করেন, তাঁর হুপ্‌ হুপ্‌ করে বাঁদরের মতো লম্ফঝম্ফ দর্শনীয় ব্যাপার। সারারাত ধরে নৃত্যগীতবাদ্যসহ উৎসব হয়, মুর্গী ছাগল ভেড়া বলিদান হয়। একেবারে খাঁটি 'সাঁওতালী পূজা' (তাই থেকে কি 'সাঁউডালি'?), একটুও বিকৃত হয়নি মনে হয়। সিউড়ি শহরের উপকণ্ঠেই এই পূজার স্থান। এছাড়া ডোমপাড়ায় শ্মশানকালী আছেন, উন্মুক্ত স্থানে নিমগাছের তলায়। পর্ণকুটীর-মন্দিরে এমনি কালী আছেন, সঙ্গে ধর্মরাজ ঠিক আছেন। কেওটপাড়ার অশ্বত্থতলায় কয়েক-খণ্ড পাথর আছে, কি তা কেউ জানে না, অথচ পূজা হয় নিয়মিত। দত্তপুকুরের কাছে রক্ষাকালী পীঠ আছে। পাষাণকালীও আছেন। ধর্মরাজের তো কথাই নেই। শহরের দিকে বারুইপাড়ায় অন্নপূর্ণাসহ শিবমন্দির আছে, কিন্তু ধর্মরাজও আছেন। শহরের মধ্যে রাধাবল্লভের বিশাল মণ্ডপসহ মন্দির আছে। মধ্যে মালিপাড়ায় পুরাতন ধর্মঠাকুরের মন্দিরও আছে। বৃত্তাকারে ক্রমে শহরের কেন্দ্রস্থলে

এগিয়ে এলে মনেহয় যেন সংস্কৃতির একটি পিরামিড সিউড়ি। পিরামিডের পাদমূলে প্রাগৈতিহাসিক নিষাদসংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তি এবং ক্রমে যত শীর্ষস্থানের দিকে ওঠা যায়, তত উচ্চস্তরের সংস্কৃতির (যেমন বৈষ্ণবসংস্কৃতির) নিদর্শন চোখে পড়ে। সাঁওতালি পূজার স্থান থেকে রাধাবল্লভের মন্দির-মণ্ডপ পর্যন্ত কয়েকযুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি স্তরের নিদর্শন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। বীরভূমের যা অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সিউড়িতে তার সবই আছে। আফিস-আদালতে স্কুল-কলেজে অথবা অট্টালিকায় নয়, চারিদিকের বিভিন্ন জাতির পাড়ায় পাড়ায়। ঠিক এই ধরনের নিদর্শনের এমন প্রাচুর্য আর কোথাও দেখা যায় না (১৯৫২-৫৩)।

আশপাশের মন্দিরগুলি অধিকাংশ বাংলা চালাঘর—বাঁকানো চারচালা বাংলা চালাঘর। অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, অনেক মন্দিরের সামনে একটি করে চারচালা মণ্ডপ আছে। বাঁকানো চাল, চারিদিক খোলা। ঠিক তারই অনুকরণে যেন ইটের মন্দিরগুলি হুবহু গড়ে উঠেছে। শিল্পীরা যেন পাশাপাশি বাংলা চালাঘরের 'মডেল' দেখে মন্দির তৈরি করেছেন। একথা বীরভূম বাঁকুড়া বর্ধমানে খুব বেশি করে মনে হয়, সিউড়ির স্বল্পপরিসরের মধ্যে আরও বেশি করে মনে হয়। শহর থেকে স্টেশনের পথে যেতে কাছেই বিখ্যাত 'ঘুনুসা' মন্দিরটি তার অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। মন্দিরের গায়ে ফুলপাথরে উৎকীর্ণ কারুকাজের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব খুব বেশি, ঠিক সিউড়ির প্রধান সাংস্কৃতিক সুরের সঙ্গে একসুরে বাঁধা নয়। কিন্তু চমৎকার নিদর্শন।

বক্রেশ্বর

'গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরং সুসঙ্গতং। তন্নাম স্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ'॥ মহৎ তীর্থক্ষেত্র বক্রেশ্বর গৌড়দেশে অবস্থিত। এই তীর্থের নাম স্মরণ করলে সমস্ত পাপ ও পাতক মুক্ত হয়ে যায়। একদিকে পাপহরা নদী, অন্যদিকে জাহ্নবী বেষ্টিত এই বক্রেশ্বর তীর্থ বক্ষে ধারণ করে গৌড়দেশ ধন্য হয়েছে।

সিউড়ি থেকে প্রায় ষোল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বক্রেশ্বর। বীরভূমের একাধিক পীঠ ও উপপীঠের মধ্যে বক্রেশ্বর অন্যতম। বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধকরা বক্রেশ্বরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অঘোরীবাবা সুপরিচিত। তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা এবং বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা এ অঞ্চলের সর্বশেষ তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বলে কথিত। সাধনক্ষেত্র অথবা তীর্থস্থানরূপে বক্রেশ্বর কতকালের প্রাচীন তার সঠিক কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনেক তীর্থস্থানের

মতো বক্রেশ্বরকেও কেন্দ্র করে অনেক কিংবদন্তী রচিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দেশদেশান্তর থেকে তীর্থযাত্রীরা বক্রেশ্বরে আসেন। সাধকরা আসেন বিভিন্ন তীর্থ থেকে, সুদূর কামরূপ থেকে পর্যন্ত। তান্ত্রিক সাধক ও বাউলরাই আসেন বেশি। তাঁদের দেখা ও সান্নিধ্যলাভ করা ছিল আমার বক্রেশ্বর যাওয়ার উদ্দেশ্য (১৯৫২-৫৩)। অষ্টাবক্রমুনি যেখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এবং যাঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পার্বতীনাথ বলেছিলেন :

সততং ত্বঞ্চ মন্তক্তোহপ্যসৌখ্যেন্দ্রিয়ভূতঃ সদা।
কৃত্বা ভবন্নাম চাগ্রস্থং মম চাত্র স্থিতির্ভবেৎ॥

—"অদ্যাবধি তোমার পূজার পর ভক্তরা আমার অর্চনা করবে এবং তোমার নামেই আমার স্থিতি হবে" এবং "ইদানীং সিদ্ধপীঠস্তু লোকে খ্যাতো ভবিষ্যতি"—এখন থেকে এই ক্ষেত্র সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হবে। দূরদূরান্তর থেকে যেখানে সাধকরা এসেছেন সাধনের জন্য, তা স্বচক্ষে দর্শন করার বাসনা কার না থাকে!

দূর থেকে বক্রেশ্বর যখন দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল (১৯৫২-৫৩) তখন মনে হল যেন বক্রেশ্বর দেবতাদের গ্রাম, মানুষের গ্রাম নয়। মানুষের গ্রাম দেখতে অভ্যস্ত, দেবতাদের গ্রাম দেখিনি। মানুষের গ্রামে দেখেছি মানুষের বসতবাড়ি ও পর্ণ-কুটিরের সমাবেশ, তার মধ্যে হয়ত কোনো দেবালয়ে দেবতা বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরে দেখলাম, ঠিক তার বিপরীত দৃশ্য। অসংখ্য দেবালয়ে দেবতারা বিরাজ করছেন, লোকালয় নেই কোথাও। দেবতা আছেন, মানুষ নেই—দেবালয় আছে, লোকালয় নেই, এরকম বিচিত্র স্থান, তা সে যত বড় তীর্থস্থানই হোক না কেন, সচরাচর দেখা যায় না। সেবায়েত আছেন, পূজারী আছেন, পাণ্ডারা আছেন, দোকানীরা আছেন, তীর্থযাত্রীরা আছেন, দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকালয়ে লোকও আছেন—কিন্তু সকলেই আছেন দেবতাদের প্রয়োজনে। সুতরাং বক্রেশ্বর একরকমের 'দেবগ্রাম'। মানুষের গ্রামে দেবতা থাকেন মানুষের প্রয়োজনে, দেবগ্রাম 'বক্রেশ্বরে' মানুষের বসবাস দেবতার প্রয়োজনে। সবচেয়ে আশ্চর্য হল, কুটির ও মনুষ্যালয়ের সংখ্যার চেয়ে বক্রেশ্বরে সমাধিমন্দির মানতমন্দির এবং দেবালয়ের সংখ্যা বেশি। দূর থেকে দেখলে দেবালয়-গ্রাম ছাড়া আর কিছু মনে হতে পারে না।

দূর থেকে দেখেই রোমাঞ্চ যে হয়নি, এমন কথা বলব না। অসংখ্য মন্দিরের এরকম একত্র সমাবেশ এমনিতেই রোমাঞ্চিত করে তোলে। অধিকাংশই খাঁটি চারচালা বাংলা মন্দির, গ্রামের শিবমন্দিরের মতো। বাহুল্য নেই, আড়ম্বর নেই, কিন্তু দেবালয়ের চালের বঙ্কিমরেখাগুলি বীরভূমের মনুষ্যালয়ের মতো সুস্পষ্ট। ছোট-

বড়-মাঝারি অসংখ্য মন্দির, অতিপ্রাচীন জীর্ণ মন্দির থেকে নতুন হালের তৈরি মন্দির পর্যন্ত। দেবালয় আছে, দেবতা নেই, এমন দেবালয়ের সংখ্যাও বক্রেশ্বরে কম নয়। বাংলা মন্দির ছাডাও ছোট ছোট রেখ-মন্দির অনেক আছে বক্রেশ্বরে। বক্রেশ্বরের মূল মন্দিরটি বৃহৎ মন্দির, কিন্তু বাংলা মন্দির নয়, উড়িষ্যার রেখদেউলের মতো। মনেহয়, বাংলা দেশ ও উডিষ্যার দেবালয়ের একটি মিলনক্ষেত্র বীরভূমের বক্রেশ্বর। বক্রনাথের দেউলের সুউচ্চ শিখর ও আমলক চতুর্দিকের পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে। তারই আশেপাশে অসংখ্য বাংলা মন্দিরের অনাড়ম্বর সমাবেশ দেখে মনেহয় যেন বাংলা ও উডিষ্যার শিল্পীদের শিল্পবিদ্যার লেনদেন বক্রেশ্বরেও হয়েছিল কোনসময়। অন্তত বাঙালী শিল্পীরা দুই দেশেরই দেবালয়-স্থাপত্যরীতির অনুশীলন করেছিলেন বক্রেশ্বরে। প্রায় শতাধিক বছর আগেকার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে (A. S I Report 1872-73) বক্রেশ্বরের এই বর্ণনা পাওয়া যায় :

> there is a tirtha near the village of Tantipara known as the tirtha of Bakeswar. The objects of interest are a number of temples grouped near a number of dirty tanks. There is but one large temple, and this is of the style of the Baijnath ones ; it had a line of inscription over the doorway in modern characters, but the characters are now too worn to be at all legible···The other temples are all very small and very numerous ; they are avowedly modern · Outside, to the left of the long line of temples which line the road, leading straight to the principal shrine, are numerous hot springs··· The temples are built of a variety of materials, brick and stone, both cut and rough ; the cut stone is roughly dressed, not smoothed ; there are traces of an old brick inclosure about the principal temple, which is situated on a high mound.

বক্রেশ্বর "গুহ্যতীর্থং পরং মহৎ" বলে পুরাণে কথিত। প্রকৃতির নিভৃত কোণে বলে নয়, বোধহয় তান্ত্রিক সাধকদের গুহ্যসাধনার অন্যতম কেন্দ্র বলেই বক্রেশ্বর 'গুহ্যতীর্থ'। তীর্থক্ষেত্রের পুবে ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদ, দক্ষিণে পাপহরা নদী। তার পাশেই শ্মশান-ভূমি। মনেহয় যেন শ্মশানের বুকেই এই শৈবতীর্থটি গডে উঠেছে। শ্মশানের রূপটিও ভয়ঙ্কর। গ্রাম্য শ্মশানের মতো হলেও বক্রেশ্বরের শ্মশানের একটি বিকট

বিশেষত্ব আছে। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। মন্দির-এলাকার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে শ্মশানের বুকে একেবারে জলন্ত চিতার পাশে এসে দাঁড়িয়ে চমকে উঠতে হয়। সামান্য শ্মশান নয়, মহাশ্মশান বলে পরিচিত বক্রেশ্বরের এই শ্মশানে, পাপহরার তীরে বহু দূরের গ্রাম থেকে শব বহন করে আনা হয় সংকারের জন্য। সেইজন্য শ্মশানের চিতার আগুন কখনও নিভে যায় না, জলতেই থাকে। শবেরও অভাব হয় না। শবযাত্রীরা যেন তীর্থযাত্রী। সমস্ত তীর্থক্ষেত্রটাই ঘুবতে ঘুরতে হঠাৎ মনেহয় মহাশ্মশান। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড সূর্যালোকেও গা ছমছম্ করে। চারিদিকের অসংখ্য দেবালয়ের মধ্যে দেবতারা সব নির্জনে বসে থাকেন, নির্বাক তাঁরা। 'শব্দ'ই যে ব্রহ্ম তা বক্রেশ্বরে গেলে প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করা যায়। সেবায়েত পূজারী পাণ্ডা বা দু'চারজন যাত্রীদের আলাপ পরিপার্শ্বের নিরেট নিস্তব্ধতার মধ্যে ফিস্‌ফিসানি বলে মনেহয়। পূর্বদিকে বনভূমি তাকে আরও রহস্যময় করে তোলে। একমাত্র শিবাধ্বনি বা শকুনের কুৎসিত আর্তনাদ ছাড়া শব্দব্রহ্মের কোনো পরিচয় কানের ভিতর দিয়ে মর্মে প্রবেশ করে না। এমনকি কোনো এক নির্জন নিভৃত কোণের জীর্ণ দেবালয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে ভ্রাম্যমাণ যাযাবর কোনো পথশ্রান্ত বাউল যখন তার সঙ্গিনীকে নিয়ে একতারা বাজিয়ে গান গায়, তখনও তা নিঃশব্দতার ঐকতান বলে মনেহয়। দিনের আলোয় দ্বিপ্রহরেই যে-বক্রেশ্বরের এই মূর্তি, জানি না গভীর রাতে আজও সে কী মূর্তি ধারণ করে!

শব্দব্রহ্মের সবচেয়ে বড় পরিচয় শিবাধ্বনি ছাড়াও শবযাত্রীদের হরিধ্বনি। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে দেবালয়ের একোণ-সেকোণ থেকে হাই তুলে দু'চারজন জটাজুটধারী সাধু শিবশঙ্করধ্বনি দিয়ে ওঠেন। পাপহরার তীরে মহাশ্মশানে শবযাত্রীদের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। শ্মশানের দৃশ্য দেখা যায় না। আশ্চর্যভাবে আত্মসমাহিত যদি কেউ হতে পারেন তাহলে তীরে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য দেখতে পারেন। উপুড় করে চিৎ করে, উব্‌দোপাব্‌দা করে শবদাহ করা হচ্ছে, মধ্যে মধ্যে বংশদণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে নারকোলের খোল ফাটার মতো মাথার খুলি ফাটার শব্দ হচ্ছে। দেখার মতো দৃশ্য নয়, শোনার মতো শব্দও নয়। সাধুসঙ্গলোভাতুর তন্ত্রাভিলাষীদেরও যে রীতিমতো হৃৎকম্প হয়েছে, তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। হৃৎকম্প হত না শুধু তন্ত্রসিদ্ধ সাধকদের। মহাশ্মশানের মহান নিস্তব্ধতার মধ্যে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সাধকরা কঠোর গুহ্য-সাধনা করেছেন এবং সমস্ত রকমের ভয়ভাবনালোভ জয় করে সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন।

শ্মশানের উপরেই ছিল বিখ্যাত তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ অঘোরীবাবার আস্তানা। এখন আর অঘোরীবাবা জীবিত নেই, তাঁর কোনো উত্তরসাধকও কেউ নেই

বক্রেশ্বরে। অনেক খোঁজখবর করেও কোনো তান্ত্রিক সাধকের সন্ধান পাইনি বক্রেশ্বরে। সেবায়েত ভোলানাথ চক্রবর্তী মশায় বললেন যে, আগেকার সেই সাধকদের মতো এখন আর কোনো সাধক নেই। কচিৎ কখন দু-একজন সাধক অন্য স্থান থেকে বক্রেশ্বরে আসেন এখন হয়ত দু-চারদশ দিন থাকেন তারপর আবার চলে যান। অঘোরীবাবা ছাড়াও প্রমথ চক্রবর্তী নামে আর-একজন তান্ত্রিক সাধক বক্রেশ্বরে তন্ত্রসাধনা করেছিলেন, তাঁর সমাধি আছে। অঘোরীবাবাও অজ সমাধিস্থ হয়েছেন এবং তাঁর সমাধিটি রয়েছে একেবারে শ্মশানের মধ্যে। সাধারণত ঐ স্থানটিতেই নাকি তিনি থাকতেন সাধনা করতেন এবং গভীর রাতে 'চক্রে' বসতেন

তন্ত্র ও মন্ত্রের যুগ নিঃসন্দেহে আজ অস্ত গিয়েছে, তবু আজও কত কথা উপকথা, কত কাহিনী কিংবদন্তীই না বীরভূমের একাধিক সিদ্ধ পীঠস্থানের সাধকদের কেন্দ্র করে রচিত হচ্ছে। তান্ত্রিক সাধনা ও সাধক পুরুষদের রোমাঞ্চকর সব অবিশ্বাস্য কাহিনী যদি কেউ শুনতে চান, বীরভূমের বিখ্যাত পীঠস্থানগুলিতে যাবেন। সাধকরা প্রায় নেই বললেও চলে, কিন্তু সাধনার ঐতিহ্য আজও জাগ্রত রয়েছে লোকের মুখে মুখে অজস্র কিংবদন্তী ও কাহিনীর মধ্যে। বামাক্ষ্যাপার কাহিনী, অঘোরীবাবার কাহিনী ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। অঘোরীবাবার কত কাহিনী যে শোনা যায় তার ইয়ত্তা নেই। 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' রচয়িতার বিবরণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী শিল্পীর স্পর্শ তাকে আরও যেন জীবন্ত করে তুলেছে। পাপহরার শ্মশানেই অঘোরীবাবা থাকতেন, শবসাধনা করতেন। 'চক্রে' বসতেন তিনি গভীর রাতে, মৃতের মাথার খুলিতে কারণপান করতেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্ষণ করতেন সদ্যোদগ্ধ শবের বিস্ফারিত মস্তিষ্কপ্রসূত উত্তপ্ত ঘিলু। ঝড়বিদ্যুতের রাতে যখন তিনি তাঁর চামুণ্ডাদের নিয়ে চক্রে বসতেন তখন উপস্থিত ভৈরব-ভৈরবীরা বিবস্ত্র হয়ে শবাসনে বসে কারণবারি পান করে এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি করত। জলের মতো মদ্যপান করতেন অঘোরীবাবা এবং দিনের আলোয় ও রাতের অন্ধকারে সবসময় বিবস্ত্র হয়ে থাকতেন। দূরদূরান্তর থেকে আরও অনেক সাধক ও ভৈরব-ভৈরবীদের সমাগম হত বক্রেশ্বরে। এখন অঘোরীবাবাও নেই, তাঁর সেই সাধনার কোনো রেশ পর্যন্ত নেই। পরিবেশ কিংবদন্তী ও ঐতিহ্যের মধ্যে কেবল অশরীরী স্মৃতিটুকু রয়েছে।

শৈবতীর্থে শক্তিও বিরাজ করেন। বক্রেশ্বরেও দেবী মহিষমর্দিনী আছেন। পীঠমালাতন্ত্রে তাঁর বর্ণনাও আছে :

বক্রেশ্বরে মনঃ পাতু দেবী মহিষমর্দিনী।
ভৈরবো বক্রনাথস্তু নদী তত্র পাপহরা॥

শিবমন্দির-সংলগ্ন মন্দিরে এখন যে দশভুজা মহিষমর্দিনীর ধাতুমূর্তি আছে তা বেশিদিনের প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রাচীন মূর্তি লোপ পেয়ে গিয়েছে মনেহয়। কিছুকাল আগে 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' পাণ্ডাদের পাড়ার কাছে পুষ্করিণীগর্ভে একটি অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনীর পাষাণমূর্তি পান এবং তাঁরা মনে করেন, এইটিই আসল মূর্তি। মূর্তিটি বক্রেশ্বর তীর্থক্ষেত্রের কাছে ডিহি-বক্রেশ্বরে পূজারীদের বাড়িতেই আছে। মূর্তির দুই পাশে ও ঊর্ধ্বে চালচিত্রাকারে ইন্দ্রাণী বরাহী কৌমারী প্রভৃতি নয়টি শক্তিমূর্তি খোদিত আছে। শ্বেতাঙ্গকুণ্ডের উত্তরতটে বটবৃক্ষমূলে একটি ভাঙা হরগৌরীর যুগলমূর্তি বহুদিন ধরে পড়ে রয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বক্রেশ্বরে গিয়ে মূর্তিটিকে দেখে বেশ প্রাচীন মূর্তি বলেই অনুমান করেছিলেন। ভাঙা মূর্তি মাত্রই, কিংবদন্তী অনুসারে, কালাপাহাড়ের ভাঙা। এখানেও সেই কিংবদন্তী প্রচলিত। শ্বেতগঙ্গার পশ্চিমোত্তর কোণে একটি প্রাচীন শাল্মলী বৃক্ষের তলায়, ইঁটের গোলাকার বেদীর উপরে ভৈরবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বিখ্যাত খাঁকীবাবা তাকে সংস্কার করে একখণ্ড পাথরে নিজের নাম খোদাই করে স্থাপন করেন। খাঁকীবাবাও একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। কিংবদন্তী ঐতিহ্য ইতিহাস, তান্ত্রিক সাধনার ধারা এবং এই সব পাথুরে প্রমাণ থেকে এইটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় যে বক্রেশ্বর একটি শৈব ও শাক্ততীর্থ এবং তার প্রাচীনতাও অতীতের হিন্দুযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আশ্চর্য নয়।

বক্রেশ্বরের কুণ্ডমাহাত্ম্যের মধ্যে অলৌকিকতত্ত্ব থাক বা না-থাক, ভূতাত্ত্বিক বিস্ময় আছে। ভৈরবকুণ্ড জীবিতকুণ্ড অগ্নিকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড শ্বেতগঙ্গা ইত্যাদি ভূতত্ত্বের বিষয়বস্তু। গরম ফুটন্ত জল ও গন্ধকের গন্ধের মধ্যে ভূতত্ত্ব ছাড়া আর কোনো ভৌতিক তত্ত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কুণ্ডগুলি এতবড় পীঠস্থানের মধ্যে থাকায়, সেগুলিও আলৌকিক হয়ে উঠেছে। আসলে বীরভূমের মাটির এই বিশেষত্ব এবং এই ধরনের কুণ্ড আরও অন্যান্য স্থানে আছে। সেইজন্য যেখানেই কুণ্ড আছে ও শিবমন্দির আছে সেইস্থানই 'বক্রেশ্বর' বলে পরিচিত। যেমন দুবরাজপুর স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে দেগঞ্জ গ্রামে এবং রাজনগর থেকে কিছু দূরে একস্থানে কুণ্ড ও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাই কেউ কেউ বলেন, এগুলি পুরাতন বক্রেশ্বর। আসলে বক্রেশ্বরের সঙ্গে ভূগর্ভোত্থিত কুণ্ডের ও প্রস্রবণের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। ইতিহাসে বক্রেশ্বর প্রাচীন শৈবতীর্থ ও শাক্ত পীঠ বলেই পরিচিত এবং বীরভূমের একাধিক পীঠস্থানের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান।

জয়দেব-কেঁদুলি । নানুর
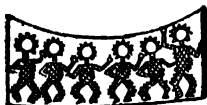
"কেন্দুবিল্বসম্ভবরোহিণীরমণ।" গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভণিতা থেকে জানা যায় যে কবি জয়দেবের জন্মস্থান ও নিবাস ছিল 'কেন্দুবিল্ব' গ্রাম।[১] কেন্দুবিল্ব থেকে কেঁদুলি, বর্তমান নাম 'জয়দেব-কেঁদুলি'। বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে অজয় নদের তীরে কেঁদুলি গ্রাম। বহুকাল থেকে পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেব-স্মারক মেলা হয়ে আসছে এই গ্রামে। রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব মিশ্র। সুতরাং প্রায় আটশত বছরের ঐতিহ্য-বিজড়িত গ্রাম কেঁদুলি। ধারাবাহিক স্মারকমেলারও ইতিহাস প্রাচীনতম। এতকালের প্রাচীন মেলা শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষে বিরল।

প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে নবীন সাহিত্যের সেতুবন্ধন হয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দে। গীতগোবিন্দের পদাবলীর ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, কিন্তু ভাব বাংলা। যেমন—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।

বসন্তরাগ যতিতালবিশিষ্ট এই পদের কোনো টীকা বা ভাষ্য প্রয়োজন হয় না। পরিষ্কার বোঝা যায়, বসন্তের আগমনে মলয় সমীরণ সুকোমল লবঙ্গ-লতাকে বার-বার সাদরে অলিঙ্গন করেছে, কুঞ্জকুটিরে ভ্রমরের গুণ গুণ রব ও কোকিলের সুমধুর কুহুধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই সময় হরি কি করছেন ?

বিহরহি হরিরিহ সরসবসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমংসখি
বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

---

১ সম্প্রতি জয়দেবের জন্মস্থান নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। উড়িষ্যার কয়েকজন পণ্ডিতের ধারণা, জয়দেবের জন্মস্থান পুরী জেলার বালিয়ন্টা থানার অন্তর্গত প্রাচী নদীতীরস্থ 'কেন্দুলী শাসন' (এম. কে. সাহু: Souvenir on Sri Jayadeva, Orissa 1968)।

এই মধুর সময়ে হরি কোনো ভাগ্যবতী যুবতীর সঙ্গে বিহার করছেন এবং প্রেমোৎসবে নৃত্য করছেন। বিরহীজনের কাছে বসন্ত সত্যিই অতি দুরন্ত !

গীতগোবিন্দের এই গীতিময় উচ্ছ্বাস, এই উচ্ছল রসতরঙ্গ, পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর মন্দাকিনী বেয়ে এসে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের প্রাণ সঞ্চার করেছে। গীতিগোবিন্দ বাংলা গীতিকাব্যের অন্যতম প্রধান উৎস এবং গীতিকাব্যই বাংলার ও বাঙালীর প্রাণের কাব্য। অজয়ের তীরে কেঁদুলি গ্রামে পা দিয়েই মনেহয় এই কথা। মনেহয় যেন বাংলার গীতিগঙ্গার উৎস সন্ধানে কেঁদুলি গ্রামে এসে পৌঁচেছি। বীরভূমের একপ্রান্তের একটি উপেক্ষিত গ্রাম, সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন। যেমন নির্জন, তেমনি নিঃস্ব। ধনৈশ্বর্যের চিহ্ন নেই কোথাও। অখ্যাত অজ্ঞাত বাংলার অসংখ্য পল্লীর মতোই কেন্দুবিল্বের শ্রী। ব্রজবাসী মোহান্ত আছেন, তাঁর প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। কয়েকটি মন্দির আছে, তার মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি। এছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে। আর কিছু নেই। গরিবদের জীর্ণ কুটির ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পৌষ-সংক্রান্তির জয়দেব স্মারক মেলায় হঠাৎ যেন এই নগণ্য গ্রামটি কয়েকদিনের জন্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। হাজার হাজার যাত্রীর স্রোত বইতে থাকে গ্রামে। হাজার হাজার বাউল একতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে কেঁদুলিতে এসে জমা হয় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মাথা গোঁজার স্থান নেই, আশ্রয় নেই। বিশাল বটগাছের তলাই হল সবচেয়ে বড় আশ্রয়-শিবির। সাময়িক তাঁবু থাকে কিছু, আর হাজার গরুমহিষের গাড়ি। সেই গাড়ির মধ্যেই যাত্রীরা রাত্রি যাপন করে। মাঘের গোড়ায় যদি ঝড়বৃষ্টি হয় তাহলে যাত্রীদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। হাজার হাজার যাত্রীকে স্বচক্ষে দেখেছি অসহায় প্রাণীর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অনিশ্চিত পরিণামের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে। পালাবার পর্যন্ত পথ নেই। দু'দিকেই (বর্ধমান ও বীরভূম) যে কাঁচাপথ আছে তা সামান্য বৃষ্টিতে দুর্গম হয়ে ওঠে। তাছাড়া, বেওয়ারিস মরুপ্রান্তরে অসংখ্য নরনারীশিশুর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে চোরডাকাতের আতঙ্কে। কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। বিশাল দেবোত্তর-সম্পত্তির মালিক, জয়দেব-কেঁদুলির মোহান্ত থেকে দেশের সর্দার-সামন্তরা সকলেই নির্মম উদাসীন।

ইদানীং দেখেছি (১৯৫২-৫৩) ব্রজবাসী মোহান্ত প্রায় তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন এবং সরকারী পুলিশ কর্মচারী থেকে মহকুমা হাকিম, ম্যাজিস্ট্রেট কেউ এসেছেন খবর পেলে (উপ-মোহান্তদের মারফৎ) তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করেন এবং তাঁদের পিছন পিছন হাতজোড় করে মেলা দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান

এবং খানাটেবিলে স্বহস্তে খাদ্য পরিবেশন করে তাঁদের আপ্যায়ন করেন (একথা এখনও সত্য, ১৯৭২-৭৩-এও)। করুন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু আরও যে অসংখ্য যাত্রী ও দর্শক মেলাতে যান, তাঁদের একেবারে মানুষ বলে গণ্য না করার কি সঙ্গত কারণ থাকতে পারে জানি না। যে-সম্পত্তি মোহন্তরা বংশ-পরম্পরায় ভোগ করে এসেছেন, তাতে কেঁদুলি গ্রাম আজ বীরভূমের শ্রেষ্ঠ বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। কয়েকটি যাত্রীনিবাস, অতিথিশালা অন্তত সেখানে গড়ে উঠতে পারত। যাতায়াতের পথ স্বচ্ছন্দে ভাল হতে পারত। স্থানীয় লোকের জন্য স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। কিন্তু শুনেছি, সারা ইলামবাজার থানা এলাকার মধ্যে আজও একটি হাইস্কুল নেই (১৯৫২-৫৩), আর কেঁদুলির রূপ আজ পরিত্যক্ত গ্রামের মতো করুণ ও ভয়াবহ। বোঝা যায়, একসময় মোহন্তদের সম্পত্তির স্বার্থ ছিল, তাই তাঁরা সম্পত্তিই দেখতেন। আজ নানাকারণে সেই স্বার্থে তাঁদের আঘাত লেগেছে, তাই আজ তাঁরা কিছুই দেখেন না। কবি জয়দেবের স্মৃতি সম্বন্ধে মোহন্তদের যে কোনরকম [illegible] আছে তা মনে হয় না। বর্ধমানের মহারাজার তৈরি মন্দির এবং বর্ধমানবাসী ব্রজবাসীরা তার মোহন্ত ও দেবোত্তরের মালিক কবি জয়দেবের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক নেই। অথচ হাজার হাজার যাত্রী এই গ্রামটিতে আসেন দীর্ঘকাল থেকে, কোনো মোহন্ত বা সামন্তের জন্য নয়, জয়দেবের স্মৃতির জন্য। দেশের পণ্ডিত ঐতিহাসিক সাধক ভক্ত দর্শক এমন লোক অল্পই আছেন যিনি এই কেঁদুলি গ্রামে একবার আসেননি। ভবিষ্যতেও আসবেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ গীতিকবি জয়দেবের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামে তাঁর স্মারকমেলায় অসংখ্য যাত্রীর সমাগম রোধ করাও সম্ভব না। তাই শুধু মোহন্তের নয় দেশের সামন্তদেরও একটা কর্তব্য আছে বলে মনে হয়। প্রতি বছর কিছু সেপাই পাঠিয়ে, একবার মেলায় ঘুরিয়ে গেলে সে-কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। হাজার হাজার যাত্রী ও অতিথিদের জন্য কিছু করা উচিত এবং সবার উপরে, কেঁদুলি গ্রামের জন্য অনেক কিছু করা কর্তব্য। কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রামটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে বলে মনে হয়। তার জন্য নদীর পাড়টি পাথর দিয়ে বেঁধে দেওয়া এখনই প্রয়োজন। তা না হলে, উপেক্ষা ও উদাসীনতার জন্য তো বটেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অজয়ের বন্যায় অদূর ভবিষ্যতে জয়দেবের স্মৃতি-বিজড়িত কেন্দুবিল্ব গ্রামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাংলার মাটি থেকে।

জয়দেব কেঁদুলির মেলার মতো এত বড় মেলা পশ্চিমবাংলায় খুব কমই হয়। দূরদূরান্তর থেকে কারিগর শিল্পী ব্যবসায়ীরা মেলাতে আসেন। বর্ধমান জেলার

দধিয়াবগীতলার শ্রীপঞ্চমীর মেলাও খুব বড় মেলা। অন্নসত্র এই মেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, জয়দেবেরও। বিভিন্ন আশ্রমও প্রতিষ্ঠান থেকে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। মেলা হয় পৌষ-সংক্রান্তিতে যেমন কেঁদুলিতে, অথবা মাঘমাসে যেমন দধিয়াবগীতলায়। নতুন ধান চাষী ও গৃহস্থের ঘরে ওঠে। মেলার আর্থনীতিক বনিয়াদ তৈরি হয়ে থাকে। যে বছর ধান হয়, সে-বছর তো কথাই নেই। এ বছর (১৯৫৩) প্রচুর পরিমাণে ধান হয়েছে, মেলাও জমেছে খুব এবং মেলার অন্নসত্রও। হাজার হাজার যাত্রী কেঁদুলির মেলায় অন্নসত্রে খেয়েছেন দেখেছি। সুতরাং কতশত মণ চাল রান্না হয়েছে যে তার ঠিক নেই।[২]

অন্নসত্র ছাড়া জয়দেব-কেঁদুলির মেলার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব হল আউল-বাউলদের সমাবেশ। জয়দেব-কেঁদুলির অন্যতম আকর্ষণ এই বাউলরা। এর জন্য অনেক্ অনুসন্ধানী ও ঐতিহাসিক কেঁদুলির মেলায় এসেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে সিলভ্যাঁ লেভী পর্যন্ত দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত সকলকেই এখানে বাউল-সান্নিধ্যের জন্য আসতে হয়েছে। বাউলের কথা পরে বলব। পুরো দু'দিন মেলায় ছিলাম এবং অধিকাংশ সময় বাউলদের সংস্পর্শে-ই কাটিয়েছি। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত বাউলদের নৃত্যগীত শুনেছি, বটগাছের তলায়, ছোট ছোট অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আউল বাউল ছাড়া জয়দেব কেঁদুলিতে বাকি যা আছে তার কিছুটা প্রত্নতত্ত্ব, কিছুটা ইতিহাস, আর বেশির ভাগ কিংবদন্তী। কারণ বাংলার বাউলরাই জয়দেবের গীতিগঙ্গার শেষ প্রবাহ মনে হয়। বাউলরাই তাঁর উত্তরাধিকারী। গীতগোবিন্দ আজও কেঁদুলির বালকের দল গান করে বেড়ায়। কিন্তু আউল-বাউলেরা যে একতারা বাজিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে মাঠপ্রান্তর নদনদী পার হয়ে, বীরভূমের এই প্রান্তপল্লীতে হাজারে হাজারে এসে সমবেত হন, মনে হয় তার চেয়ে বড় জয়দেবের স্মৃতির নিদর্শন আর কিছু হতে পারে না।

সকলেই জানেন, কবি জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ছিলেন—

গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥

২ ১৯৬০-৭০-এর দশকে কয়েকবার কেঁদুলির মেলায় গিয়েছি এবং তার ক্রমিক অবনতি দেখে ব্যথিত হয়েছি। অনেক প্রতিপত্তিশালী ধনিক সাধু বাউলদের গুরু হয়েছেন এবং আমেরিকা-বিলেত ফেরত পপুলার বাউল দু-একজনের সাহায্যে গুরুর বিশাল আস্তানায় স্টেজ বেঁধে মাইক সহযোগে বাউলের গান গাইছেন। মেলার মধ্যে অন্যান্য স্থানেও মাইকে বাউল গান হয়। হিপিদের এবং বিদেশী ফোক্-কালচারানুগীদের ভিড়ও বেশ বেড়েছে। বাউলরা ক্রমেই urbanized হয়ে যাচ্ছেন এবং কেঁদুলির মেলার commercialization ও vulgarization চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে।

গোবর্ধন আচার্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ও কবিরাজ (ধোয়ী)—এঁরা ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নস্বরূপ। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। 'সেকশুভোদয়া'য় জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শিতার একটি মনোরম কাহিনী আছে (সেকশুভোদয়া, হৃষীকেশ গ্রন্থমালা, পৃ ৬৯-৭১)। কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

> ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধ্বনিরূগদারিতা চ। তদ্গদগীরিতে সতি সমস্ত নৌকাঃ, গঙ্গায়াং-যদ্ বিদ্যন্তে, শ্রুত্বা তৎসন্নিধানং সমায়াতা চ। তত স্তাং সর্বে সভাসদাঃ পূজয়ামাস তৎক্ষণাৎ। 'ধন্যেয়ং ব্রাহ্মণী। ঈদৃশং ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি দ্বয়োরপি। ধন্যোহসৌ'। (সেকশুভোদয়া : ৭০)

অর্থ পরিষ্কার, টীকা নিষ্প্রয়োজন। সঙ্গীতকলায় জয়দেব ও তাঁর ব্রাহ্মণী পদ্মাবতীর কিরকম পারদর্শিতা ছিল তা এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়। গান শুনে গঙ্গার বুকে যত নৌকা ছিল, কাছে তীরে চলে এসেছিল সব। সভাসদরা শুনে ধন্য ধন্য করে বলেছিলেন, এরকম নাচগান তাঁরা কখনও দেখেননি শোনেননি। জয়দেব ও পদ্মাবতীর এই নৃত্যগীতের কথা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের ভ্রাতা শুক্লধ্বজের সভাকবি রামসরস্বতীও তাঁর 'জয়দেব' কাব্যে উল্লেখ করেছেন :

> জয়দেব মাধবর স্তুতিক বর্ণাবে,
> পদ্মাবতী আগত নাচন্ত ভঙ্গিভাবে।
> কৃষ্ণর গীতক জয়দেবে নিদগতি,
> রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।

মনে হয়, জয়দেব গীতগোবিন্দ গান করতেন আর পদ্মাবতী নাচতেন। তখনকার দিনে কবিদের গায়ন থাকত। সেদিনও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গায় ভারতচন্দ্রের কাব্য নীলমণি সমাদার নামক গায়ন গেয়ে শোনাতেন। জয়দেবের জীবন সম্বন্ধে আর অন্য কিছু জানা যায় না। তাঁর গীতগোবিন্দে যে আত্মপরিচয় আছে তা থেকে তাঁর পিতামাতা বন্ধু গায়ন দোহার, জন্মস্থান নিবাস ও স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা শুধু জানা যায়। যেমন :

> শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রী জয়দেবকস্য।
> পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ কবিত্বমস্তু॥

এই শ্লোক থেকে জানা যায়, জয়দেবের পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, পরাশর প্রভৃতি প্রিয়বন্ধু তাঁর দোহার ও গায়ন। এছাড়া বাকি সব উপাখ্যান। বোঝা যায়, জয়দেব-পদ্মাবতীকে নিয়ে পরবর্তীকালে বিচিত্র সব

কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। বনমালী দাসের 'জয়দেব চরিত্রে' (অষ্টাদশ শতক), কৃষ্ণদাসের 'ভক্তমাল' ও জগন্নাথ দাসের 'ভক্তচরিতামৃতে' (অষ্টাদশ শতকের শেষে) এই সব কাহিনীর বিবরণ আছে। আধুনিককালে শ্রীঅধরচাঁদ চক্রবর্তী 'লীলা ও নিত্যভাবে শ্রীজয়দেব পদ্মাবতী উপাখ্যান' নামে এক বৃহৎ পুরাণজাতীয় কাব্য রচনা করেছেন। কাহিনীগুলির মধ্যে "দেহি পদপল্লবমুদারমে"র কাহিনীটি সবচেয়ে রোমাঞ্চকর। কাহিনীটি হল :

কবি জয়দেব একবার "স্মরগরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং" পর্যন্ত লিখে ভাবতে ভাবতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে স্বয়ং ভগবান কবি জয়দেবের রূপ ধরে পদ্মাবতীর অতিথি হয়ে গীতগোবিন্দের পুঁথি খুলে লিখে দিয়ে যান—'দেহি পদপল্লবমুদারম্'। বোঝা যায়, কাহিনীর মধ্যে ভক্তিরসাপ্লুত লোকচিত্তের কল্পনা পক্ষবিস্তার করেছে, ভক্ত-কবির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে। ইতিহাসের পক্ষে এখানে নীরব থাকা ছাড়া উপায় নেই। কাহিনী যাই হোক, কেন্দুবিল্ব-কেঁদুলির সঙ্গে কবি জয়দেবের স্মৃতি সত্যই আজও জীবন্ত। এই স্মৃতিটুকুই যদি ঐতিহাসিক হয়, তাহলে তার চেয়ে রোমাঞ্চকর আর কিছু নেই। বাংলার গীতিকাব্যের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টার স্মৃতি-বিজড়িত গ্রাম কেঁদুলি গীতিকাব্যের গঙ্গোত্রীর সম্মান স্বচ্ছন্দে দাবি করতে পারে।

জয়দেবের সিদ্ধিলাভের স্থান, পদ্মাসন, কাঙাল ক্ষেপার আশ্রম ইত্যাদি ছাড়া, কেঁদুলির অন্যতম দ্রষ্টব্য হল রাধাবিনোদের মন্দির। মন্দিরটি সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে বলা হয়েছে :

> The existing temple here is supposed to have been erected in the seventeenth century on the site of the poet's house, and apart from its historical interest, is of no mean value from the architectural point of view. It is an example of the Nava-ratna or the nine-towered type of temple, in which one central tower is surrounded by two sets of corner towers at two different levels ··The facade of the temple is richly decorated with brick tiles representing the various incarnations of Vishnu and scenes from the

Ramayana, including the war between the monkeys and the demons. (Archaeological Survey—Annual Report, 1923-24. p. 33).

রাধাবিনোদের মন্দির জয়দেবের বাসগৃহের ভিটের উপর তৈরি বলে জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের গড়ন বাংলার নবরত্ন মন্দিরের মতো এবং মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন আছে। ১৯১৫ সাল থেকে মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত। পোড়ামাটির নিদর্শনের মধ্যে বিষ্ণুর দশাবতার ছাড়া রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনী-দৃশ্যই প্রধান। রামচন্দ্রের বানরসেনা ও রাবণের দানবসেনার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দৃশ্য মন্দিরগাত্রে শিল্পীরা ইটের উপর উৎকীর্ণ করেছেন। মন্দিরের গায়ে দশভুজা মহিষমর্দিনী ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিও খোদিত আছে। জয়দেব-কেঁদুলির অন্যতম দ্রষ্টব্য এই মন্দিরটি। বাংলা নবরত্ন-মন্দিরের মধ্যে রাধাবিনোদের মন্দির একটি প্রাচীন নিদর্শন হিসাবেও তার প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পিছনে একটি পিতলের রথ আছে এবং তার গায়ে সুন্দর এচিং-এর কাজ আছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের কর্মকারদের একটি উল্লেখ্য শিল্পকীর্তি।

চণ্ডীদাস নান্নুর

রবীন্দ্রনাথের কাছে ১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ মাসে নান্নুরের প্রতিনিধিরা চণ্ডীদাস-বিতর্কের মীমাংসার জন্য একবার গিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বলেছিলেন: "তোমরা চণ্ডীদাসকে নিয়ে যেরকম টানাহেঁচড়া আরম্ভ করেছ, আমার মৃত্যুর পরেও লোকে সেইরকম টানাটানি করবে না কি? তার আগে শান্তিনিকেতনের প্রত্যেক ইটটাকে আমি সাক্ষী রেখে যাব যে আমি শান্তি-নিকেতনের।" তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল বোলপুর থেকে নান্নুর যাবার জন্য। দুর্গম পথের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "এক কবি তো বহুদিন গত হয়েছেন, তার জন্য আর এক কবিকে মারা কেন?"

টানা-হেঁচড়ার মধ্যে না যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে না গিয়ে উপায় ছিল না। দুর্গম পথ হলেও বীরভূমের চণ্ডীদাস-নান্নুরে যেতে হল (১৯৫২-৫৩)। অবশ্য পথের কষ্ট হয়নি, কারণ কীর্ণাহার ও নান্নুরের অধিবাসীরা আমার যাতায়াতের ও অনুসন্ধানের যাবতীয় সুব্যবস্থা করেছিলেন। নান্নুরের নাম এখন 'চণ্ডীদাস-

নান্নুর', সরকারী ডাকবিভাগও 'চণ্ডীদাস-নান্নুর' নাম দিয়েছেন। নান্নুর যেতে যেতে মনে পড়ছিল চণ্ডীদাসের কথা

নান্নুরের মাঠে গ্রামের নিকটে
বাসুলী আছ'য়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ যে পাইবে কোথা॥

এ চণ্ডীদাস তাহলে কোন্ 'চণ্ডীদাস'? স্বভাবতঃই এ প্রশ্ন সকলের মনে জাগবে, বিশেষ করে সাধারণ পাঠকদের মনে। যারা ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ নন, অথচ সাহিত্যের অনুরাগী, তাঁরা বাংলার বহু চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে একথা বিশেষ স্মরণীয়। 'রবীন্দ্রনাথ নামে আর কোনো কবি যে কবিতা লিখবেন না বা লেখেননি তা নয়। লিখবেন এবং লিখে তিনি খ্যাতিও অর্জন করবেন, কিন্তু তাঁর খ্যাতি রবীন্দ্রনাথকে দ্বৈতসত্তায় পরিণত করতে পারবে না। বাঙালীর মনে একজন 'রবীন্দ্রনাথ'ই জীবিত থাকবেন। তেমনি বাঙালীর মনে একজন চণ্ডীদাস-ই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন—তিনি বড়ু, দ্বিজ, না দীন, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না কোনদিন। একটার পর একটা আরও একাধিক পুঁথি যে ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে না তা নয়।[১] সেই সব পুঁথির ভাষার তারতম্য থাকবে, ভণিতায় 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' ছাড়াও আরও অনেক নতুন কথাও হয়ত থাকবে এবং কবি চণ্ডীদাস ক্রমেই হয়ত দু'জন তিনজন থেকে দ্বাদশ চণ্ডীদাসে পরিণত হবেন। খণ্ডিত সতীদেহের একান্ন-বাহান্ন পীঠস্থানের মতো বিবিধ তত্ত্ববিদ্‌দের তর্কচক্রে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে হয়ত ভবিষ্যতে বাংলা দেশে 'চণ্ডীদাসে'র একান্ন-বাহান্ন পীঠস্থান গজিয়ে উঠবে। এক-এক জেলার এক-একজন পণ্ডিত-প্রতিনিধি যুক্তির ঢাল-তলোয়ার নিয়ে চণ্ডীদাস বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন। ১৩০৫ সাল থেকে ১৩৪১ সালের মধ্যে যেভাবে 'চণ্ডীদাস' ত্রি-সত্তা প্রাপ্ত হয়েছেন (অর্থাৎ গড়পড়তা বারো বছরে একজন করে), তাতে মনে হয়, এই হারে চণ্ডীদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে থাকলে এই শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডীদাস দ্বাদশসত্তা লাভ করবেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের সত্তা নিয়ে অথবা কোন্ জেলার কবি তিনি, বীরভূমের বাঁকুড়ার না বর্ধমানের, তা নিয়ে আমরা তর্ক করব না।

চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের একটি কথা মনে পড়ে। দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন: "আমি ভাষা বিচার করিয়া কে খাঁটি চণ্ডীদাস, কে দীন চণ্ডীদাস

[১] যেমন সম্প্রতি 'কেতুগ্রামে' পাওয়া গিয়েছে। বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

কে বড়ু চণ্ডীদাস, কে দ্বিজ চণ্ডীদাস, কে বাশুলী-সেবক চণ্ডীদাস, কে তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—এই চণ্ডীদাস-ব্যূহের সমস্যা ভেদ করিতে যাইব না; আমার নিকট চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১৯৩ পৃ।।" ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছেও তাই চণ্ডীদাস এক ভিন্ন দ্বিতীয় নেই। অন্তত 'চণ্ডীদাস' নামোচ্চারণের সঙ্গে বাংলার কাব্যাকাশে যে মূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে-চণ্ডীদাস এক ও অদ্বিতীয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে 'চণ্ডীদাস' নামে একাধিক কবি যে ছিলেন না তা বলা যায় না। হয়ত তিন বা ততোধিক 'চণ্ডীদাস' নামে কবি ছিলেন, বিশেষ করে চণ্ডীদাস যখন আসল নাম বা উপাধি নয়—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস যাই হোক না কেন—তখন থাকা তো খুবই স্বাভাবিক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা, বাশুলী-সেবক 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে একজন কবি ছিলেন এবং থাকলে তিনি বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতেই হয়ত ছিলেন। কিন্তু তবু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বা 'বড়ু চণ্ডীদাস' কেউই বাঙালীর অন্তরে বাসা বাঁধতে পারেনি। একথা সুকুমার সেনও দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "তিরিশ বৎসর হইয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা বৈষ্ণবপদাবলী-ভক্ত তাহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী পদাবলীভক্ত বাঙালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০)।" প্রশংসার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু কেন পদাবলীভক্ত কাব্যামোদী বাঙালীর কাছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রিয় হয়ে ওঠেনি, সে-কথা বিচারসাপেক্ষ। হয়নি তার কারণ কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শুধু কৃষ্ণকীর্তনের গ্রাম্যতাদোষ তার কারণ নয়, সে-দোষ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ও আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। তার কারণ অন্য এবং তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের মধ্যে ভাবগত ও ভঙ্গিগত ব্যবধান বিরাট, তার মধ্যে কোনো সেতুবন্ধনই রচনা করা যায় না। বাঙালীর মন, বাঙালীর প্রাণ তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কোনদিক দিয়েই জয় করতে পারেনি। দীন চণ্ডীদাস যিনি, কোথায় তাঁর ঘর বা বসতি তা আমরা কিছুই জানি না। আমরা জানি বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস ছাড়াও এমন আরও একজন পদকর্তা ছিলেন যিনি শুধু চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে পদ রচনা করতেন। শুধু তাই নয়। বড়ু চণ্ডীদাস যেমন ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করেছেন, দীন চণ্ডীদাসও তেমনি একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণযাত্রা রচনা করেছেন

বলা চলে। কিন্তু আমাদের চণ্ডীদাস, অর্থাৎ দ্বিজ চণ্ডীদাস ধারাবাহিক কৃষ্ণলীলার বই কিছু রচনা করেননি। তিনি রচনা করেছেন সুমধুর সুললিত গীতকাব্যের মালা, যা স্বপ্নভঙ্গ-নির্ঝরের উচ্ছ্বসিত ধারার মতো বাঙালীর মনপ্রাণ উদ্বেল করে তুলেছে। বাংলার গীতিকাব্যের লীলায়িত ধারার যিনি অন্যতম প্রবর্তক, বাংলার অমর পদাবলীর স্রষ্টা সেই চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কথা আমরা বলছি। এই চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুরেরই অধিবাসী ছিলেন বলে মনে হয়। চণ্ডীদাস-নান্নুর তাঁদেরই লীলাক্ষেত্র।

কেন মনে হয় তাই বলছি। নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ, অর্থাৎ জনশ্রুতি মূলহীন নয়! তা জেনেও জনশ্রুতির কথা এখানে উল্লেখ করব না। কীর্ণাহার, নান্নুর ও তার আশপাশে চণ্ডীদাস সম্পর্কে কাহিনী কিংবদন্তীর অন্ত নেই। চণ্ডীদাসের রজকিনীপ্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন কাহিনী, চণ্ডীদাসের মৃত্যুকাহিনী ইত্যাদি অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে নান্নুরে ও কীর্ণাহারে। কাহিনীগুলি অন্যান্য স্থানের চণ্ডীদাস-কাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত মনে হয় নান্নুরে। মানুষের মন কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেবার জন্য আপনা থেকেই যেন কাহিনীগুলির বিকাশ হয়েছে নান্নুরের মাটিতে। কাহিনী সম্বন্ধে এর বেশি আর কিছু বলব না। অন্যান্য নিদর্শন সম্বন্ধে বলব। নিদর্শনগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—১. প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন, ২ ধর্মসাধনার ধারা; এবং ৩. সাহিত্যের ধারা। এই তিনদিক থেকে নান্নুরের বিচার করেছি এবং বিচার করে মনে হয়েছে, বাংলার যিনি সর্বজনপ্রিয় গীতিকবি ও পদকর্তা চণ্ডীদাস, তিনি দ্বিজই হন, আর যাই হন, তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস-নান্নুরের যেখানে বাশুলি মন্দিরাদি আছে এবং যে স্থানটি কবি চণ্ডীদাসের ধর্মসাধনার স্মৃতিবিজড়িত, সেই স্থানটি দেখতে ঠিক একটি স্তূপের মতো। স্তূপটি খনন করা অনেক আগেই উচিত ছিল সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয়নি। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে নান্নুরের স্তূপটির দু-একদিক সামান্য খোঁড়া হয়েছিল এবং তার একটি রিপোর্ট 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় (Excavations at Nanoor: By K G. Goswami,: *March 1950*) প্রকাশিত হয়েছিল। স্তূপটির বেড প্রায় ৫৫০ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ১৭ ফুট এবং খুঁড়ে দেখা গিয়েছে স্তূপটির নিচে পাঁচটি স্বতন্ত্র আবাস-স্তর (occupational levels) সমাধিস্থ হয়ে আছে এবং তার নিম্নতম স্তরটি গুপ্তযুগের। ইঁট, মৃৎপাত্র ছাড়া গুপ্তযুগের আরও যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন নান্নুর গ্রাম থেকে

পাওয়া গিয়েছে তা হল স্বর্ণমুদ্রা। শুনলাম, কিছুদিন আগে একটি ট্যাঙ্ক খুঁড়তে গিয়ে নান্নুরে একসঙ্গে একজায়গা থেকে প্রায় ছয়-সাতটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। তার মধ্যে কয়েকটি স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং একটি এখনও গ্রামে আছে। মুদ্রাটি দেখেছি। একদিকে যোদ্ধার মূর্তি, অন্যদিকে পদ্মাসনা দেবীমূর্তি। গুপ্তযুগের মুদ্রা। ঠিক এইরকম দু-একটি স্বর্ণমুদ্রা মেদিনীপুরের তিলদা গ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে। স্তূপের নিম্নতর স্তর, ইট মৃৎপাত্র ও স্বর্ণমুদ্রার এইসব নিদর্শন থেকে মনে হয় যে নান্নুর অঞ্চলে দেড়হাজার বছর আগে এক সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। গুপ্তবংশের কোনো শাখাবংশ অথবা সামন্ত এই অঞ্চলে কোথাও হয়ত বাস করতেন। এইসব নিদর্শন সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করলে হয়ত গুপ্তরাজবংশের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে অনেক কুয়াশাচ্ছন্ন ধারণা পরিষ্কার হতে পারে। গুপ্তরা যে ভাগবতধর্মী ছিলেন তা বিষ্ণু (বৈদিক ব্রাহ্মণ), নারায়ণ (পাঞ্চরাত্র) কৃষ্ণ-বাসুদেব ও গোপালের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এবং পরে এই বৈষ্ণবধর্মেরই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পালযুগে। শশাঙ্ক ছিলেন শৈবধর্মী এবং বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধে যত অপবাদই থাক তিনি যে বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করেননি তার প্রমাণ রয়েছে। শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণও বীরভূমের এই অঞ্চল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কামরূপের ভাস্করবর্মণ এই সময় এই অঞ্চলে এসে তান্ত্রিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা না করুন, প্রেরণা যুগিয়েছিলেন নিশ্চয়। গুপ্তযুগ ও তার আগে থেকেই বৌদ্ধদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলা দেশে। পালযুগে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বজ্রযান তন্ত্রযান ইত্যাদির বিকাশ হয়। পালযুগের রাজারা কেউ কেউ যে বীরভূমে এইসব অঞ্চলে থাকতেন তার আভাস সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিত' কাব্য থেকে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের ইতিহাস খুব বেশি হলে ৫০০ বছরের বেশি নয় এবং হিন্দু ও মুসলমান যুগের সন্ধিক্ষণের ইতিহাস বলা চলে। তার আগেই রাজা লক্ষ্মণসেনের সভার কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীত হয়েছে। তারও আগে তন্ত্রযানী ও বজ্রযানী বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহারের নানারকম বিকৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা পাওয়া গেলেও সেন-আমলে সাধারণ জনসমাজে তার প্রতিপত্তি বিশেষ কমেনি। এইরকম কোনো ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চণ্ডীদাসের মতো একজন তান্ত্রিক দেবীর পূজারী সহজিয়া সাধক-কবির আবির্ভাব হবে এবং তিনি মানবপ্রেমের গান শোনাবেন তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। বাংলার ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে এইরকম একজন সাধক-কবি চারণ-কবি চণ্ডীদাসই হয়ত শ্রীচৈতন্যের পথ-প্রদর্শক ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য সেইজন্যই হয়ত তাঁর পদাবলীর আবৃত্তি

শুনতে ভালবাসতেন। এই চণ্ডীদাস, যিনি তন্ত্রযানী সহজসাধক হয়েও প্রেমের সুরে বাংলার জাগরণের গান গেয়েছেন, তিনি বীরভূমের চণ্ডীদাস-নান্নুরের অধিবাসী হওয়াই সম্ভব।

ধর্মসাধনার ধারা ও সাহিত্যের ধারার দিক থেকেও তাই মনে হয়। চৈতন্যপূর্ব যুগেই সহজিয়া ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। চণ্ডীদাস তন্ত্রযানী সহজ-সাধক ছিলেন এবং বাঁশুলির পূজক ছিলেন। বাঁশুলি তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা। নান্নুরে যে মূর্তি বাঁশুলি বলে পূজিত হন তা 'বাগীশ্বরী' মূর্তি। কিন্তু তাতে চণ্ডীদাসের ধর্ম অপ্রমাণিত হয় না এবং তার জন্য বাগীশ্বরী-বাইসরী-বাসবী-বাসলী করার কোনো প্রয়োজন নেই। বিশালাক্ষী থেকেই 'বাঁশুলি' হয়েছে মনে হয়। কিন্তু বাগীশ্বরী ও সরস্বতীও তন্ত্র-সম্মতা মহাবিদ্যা। সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় আমরা যে 'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং' বলি, সেই ভদ্রকালী কে? কালী, ভদ্রকালী ও চণ্ডীর ছড়াছড়ি বীরভূমে। কীর্ণাহার থেকে নান্নুরের মধ্যে অসংখ্য কালী ভদ্রকালী আছেন। নান্নুর বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, বিশেষ করে সহজধর্মীদের, একটা সাধন-কেন্দ্র ছিল মনে হয়। চণ্ডীদাসের সাধনার আশ্রম এখানে থাকা অসম্ভব নয়। চণ্ডীদাস বিশালাক্ষী ও বাগীশ্বরী দুয়েরই পূজক হতে পারেন। রজকিনী-প্রেমের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বজ্রযানী বৌদ্ধদের পঞ্চকুলের নাম বজ্র পদ্ম কর্ম তথাগত ও রত্ন। এই পঞ্চকুলের অন্য নামও আছে:

বজ্র = ডোম্বি
পদ্ম = নটী
কর্ম = রজকী
তথাগত = ব্রাহ্মণী
রত্ন = চণ্ডালী

চণ্ডীদাসের বহুপ্রচলিত রজকিনীপ্রেম কাহিনীর মধ্যে বজ্রযানীদের এই পঞ্চকুলের একটি কুল ও বিশেষ সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনে হয়, কবির জীবনের কোনো প্রেমকাহিনী পরে তাঁর বিশেষ কুলসাধনার প্রতীকের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনশ্রুতির বর্ণচ্ছটায় রঙিন হয়ে উঠেছে।
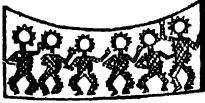
ঘুরিষা । ইলামবাজার । মৌখিরা

"কে তোমরা বাবা, কি জন্য এসেছ? গ্রাম দেখতে? টোল-চতুষ্পাঠী দেখতে, মন্দির দেখতে? কিছুই আর নেই, কি আর দেখবে? মন্দির কয়েকটা আছে, বেশিদিন আর থাকবে না। সব ধ্বংস হয়ে গেছে, যা আছে তাও আর কিছুদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছু থাকবে না। ধ্বংসের যুগ এসেছে বাবা, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কারও এদিকে মন নেই, দৃষ্টি নেই, মমতা নেই, সব যে-যার ধান্ধায় আছে, টাকার ধান্ধা, রাজনীতির ধান্ধা, মানে ভোটের ধান্ধা। এই যে আমার সামনে মন্দিরটা দেখছ বাবা, এটা বীরভূম জেলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির, আমারই পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এও কি আর থাকত! অনেক কষ্টে চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে মন্দিরটা সংস্কার করেছি, সেকথা মন্দিরের গায়ে নতুন ফলকে লিখেও দিয়েছি, প্রতিষ্ঠাতার পুরনো ফলকটিও আছে। আমি এই গ্রামের প্রাচীন পণ্ডিত বংশের শেষ বংশধর, মানে আর কেউ সংস্কৃত চর্চা করবে না। সকলেই এখন কেরানী হতে চায় বাবা, কেউ আর পণ্ডিত হতে চায় না। রোগশোকে জরাজীর্ণ আমি, সরকারের কাছ থেকে সামান্য একটা বৃত্তি পাই, তাও প্রায় একবছরের ওপর পাইনি, লিখতে লিখতে ডাকখরচেই বৃত্তির টাকা প্রায় শেষ হয়ে গেল। কোনো সাড়াশব্দ নেই, অথচ কত হাঁকডাক, দেশের উন্নতির কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আর কদিনইবা বাঁচব? কিছু নেই শরীরে, মরে যাব বাবা, মরে যাব, সব ধ্বংস হয়ে যাবে।"

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, সোমবার, বেলা দ্বিপ্রহর। ঘুরিষা গ্রামে পৌঁছলাম। ইলামবাজার থেকে চার মাইল পশ্চিমে, ইলামবাজার থানার মধ্যেই ঘুরিষা গ্রাম। ইলামবাজার অনেকবার গিয়েছি, কিন্তু ঘুরিষায় যাওয়া হয়নি। বড়রাস্তা থেকে ঘুরিষা গ্রাম অনেক দূরে এবং গ্রামটি এত বড় (বীরভূমের কয়েকটি বড় গ্রামের মধ্যে অন্যতম) যে তার সমস্ত পাড়া প্রদক্ষিণ করতে হলে কমপক্ষে চার-পাঁচ মাইল

পথ হাঁটতে হয়। গ্রামের ভিতরের পথ ভাল, কিন্তু কাঁচা, একটু বৃষ্টি হলে জীপের পক্ষেও অচল হয়ে ওঠে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে আমরা যখন পণ্ডিতপাড়ায় বাংলার প্রাচীনতম চারচালা মন্দিরটির কাছে পৌঁছলাম, তখন দেখি একটি পুরনো একতলা বাড়ির বাইরের বারান্দায় বসে এক অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তেল মাখছেন। হঠাৎ আমার মনে হল, এই বোধহয় সেই বৃদ্ধ যার কথা আমি মনে মনে ভেবেছি। সঙ্গীরা সকলে মন্দিরের দিকে গেল, আমি সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার প্রাচীন পণ্ডিতবংশের মধ্যে কেউ আছেন কি, যাঁর সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে পারি? সঙ্গে সঙ্গে অশীতিপর বৃদ্ধ কম্পমান দুই হাত তুলে খুব উচ্চকণ্ঠে যে-ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ জানালেন তা গোড়াতেই উদ্ধৃত করেছি। মনে হল বৃদ্ধের অস্থিচর্মসার বুকের মধ্যে অনেকদিনের অনেক ক্ষোভ জমা হয়ে আছে, সমাজের বিরুদ্ধে, সমাজনায়কদের বিরুদ্ধে, সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং আমাদের দেখা মাত্রই তার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌গীরণ হল, উষ্ণ প্রস্রবণের মতো। বৃদ্ধ পণ্ডিতমশায়ের নাম রামময় পঞ্চতীর্থ, পিতার নাম রামব্রহ্ম পঞ্চতীর্থ, পিতামহ রামনাথ বিদ্যারত্ন। এঁরই পূর্বপুরুষ রঘুত্তোম আচার্য প্রতিষ্ঠিত ঘুরিষার সুপ্রাচীন চারচালা মন্দির।

পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে আমরা যখন কথাবার্তা বলছিলাম তখন গ্রামের কিছু লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধের অভিযোগের প্রতি যে দু-একজন সবচেয়ে বেশি সহানুভূতি প্রকাশ করছিলেন তাঁরা মুসলমান। আমরা বুঝতেই পারিনি, কারণ কারও মুখে দাড়ি পর্যন্ত ছিল না, এবং তাঁদের হাবভাবে মনে হয়েছিল যে তাঁরা পণ্ডিতমশায়ের নিকট আত্মীয়-বন্ধুর মতো কেউ হবেন। পণ্ডিতমশায় বললেন "এরা মুসলমান এবং ঘুরিষা গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তোমরা বুঝতে পারনি। আমাদের সঙ্গে এদের এইরকমই সম্পর্ক, ঠিক নিকট-আত্মীয়ের মতো। কত জায়গায় তো কত দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, আমাদের এখানে ওসবের বালাই নেই। এই মন্দির সংস্কারের কাজে ওরাও আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। গ্রামে হিন্দুদের সংখ্যাও অনেক, সকল জাতের হিন্দুই আছে, ব্রাহ্মণের সংখ্যাও যথেষ্ট। আমাদের এটা পণ্ডিত পাড়া। আগে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরবাস ছিল এখানে, টোল-চতুষ্পাঠীও অনেক ছিল, এখন আর কিছু নেই।"

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মন্দিরের দিকে চেয়ে পণ্ডিতমশায় বললেন: "এই মন্দির প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো। বীরভূম জেলায় এত পুরনো মন্দির আর আছে কিনা জানি না, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও আছে কিনা সন্দেহ। মন্দিরের গায়ে পুরনো যে লিপি ছিল সেটা একটু নষ্ট হয়ে গেছে, তুলে নিয়ে সামনের ঘরের দেয়ালে লাগিয়ে রেখেছি। সকলেই লিপিটা ভুল লিখেছে। আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা লিখে নাও।"

সঙ্গে সঙ্গে ডাইরির পাতাটা তাঁর কাছে এগিয়ে দিয়ে বললাম : "আপনি নিজে লিখে দিন, কারণ বলেদিলেও লিখতে হয়ত ভুল করব।" হাসতে হাসতে বৃদ্ধ নিজেই লিখে দিলেন :

রঘুত্তোমাচার্য্য বিচিত্র মন্দিরম্
রঘুত্তোম প্রীতিসমৃদ্ধি বর্দ্ধনম্।
হরাস্ত্র কামাস্ত্র তিথি প্রবর্ত্তিতে
শাকে বিনির্ম্মিতং ন নাম শিল্পিনা॥

১৫৫৫ শকাব্দে (১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে) এই মন্দির পণ্ডিতমশায়ের পূর্বপুরুষ রঘুত্তোম আচার্য প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরনির্মাতা শিল্পীদের নাম নেই, লিপিতে একথাবও উল্লেখ আছে। রামচন্দ্রের একটি স্বর্ণমূর্তি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে কথিত, শোনা যায় যে মারাঠা বর্গীরা মূর্তিটিকে নিয়ে চলে যায় (১৭৪২-৪৮)। দীর্ঘকাল মন্দিরে কোনো বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। পণ্ডিতমশায় বললেন, সস্ত্রীক তিনি ১৩৭১ সনে, ৩০ চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তিতে, মন্দিরে শিবের পশুপতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। মন্দিরের গায়ে এই মর্মে তাঁর রচিত একটি লিপিও আছে। মন্দিরের পুব ও উত্তরদিকের দেয়ালে সুন্দর পোড়ামাটির কাজ আছে, বাকি দুদিকের দেয়ালে কিছু নেই। পৌরাণিক চিত্রাবলীই প্রধান, কিন্তু পুবের দেয়ালে মধ্য-সারিতে দেবী ছিন্নমস্তার একটি মূর্তি আছে, যা অন্য মন্দিরে সহজে দেখা যায় না।

ঘুরিষার পণ্ডিতবংশের এই চারচালা শিবমন্দিরের কাছে একটি নবরত্ন গোপালের মন্দির আছে। মন্দিরটি গন্ধবণিক ক্ষেত্রমোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত। গড়নাদি দেখে মনে হয় উনিশ শতকের মধ্যকালের, লিপির ফলকটি নেই। মন্দিরের গায়ে কারুকার্যের মধ্যে উল্লেখ্য মূর্তি হল ত্রিপুরা-ভৈরবী ষোড়শী মূর্তি, মহাদেবের উপর দণ্ডায়মান তারামূর্তি, সঙ্গে নীল সরস্বতী একজটা পিঙ্গলাক্ষী উগ্রজটা, দুর্গার কোলে মাতৃস্তন-পানরত গণেশ। মন্দিরের গায়ে এরকম পোড়ামাটির মূর্তির সমাবেশ বিশেষ দেখা যায় না। বীরভূমের তন্ত্রসাধনার ধারা বৈষ্ণব কৃষ্ণলীলার মধ্যেও প্রকট।

ইলামবাজার

বীরভূম ও বর্ধমানের সীমানা নির্দেশ করে অজয় নদ ইলামবাজারের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তার ফলে ইলামবাজার ক্রমে একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান হয়ে উঠেছে। একদিকে নদী, অন্যান্য দিকে তিনটি বড় রাস্তা বোলপুর পানাগড় ও

দুবরাজপুরেব দিকে গিয়েছে। একসময় ইলামবাজার লাক্ষাশিল্পের জন্য বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল। উনিশ শতকে ইয়োরোপীয় বণিকরা (যেমন David Erskine) ইলামবাজারে নীল, কয়লা, রেশম প্রভৃতি ব্যবসার বেশ বড় ঘাঁটি গড়ে তোলেন এবং তাঁদের বাণিজ্যেব কৃপায় স্থানীয় লোকজনেব কিঞ্চিৎ উপকারও হয়। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন স্থানীয় বণিকরা। যেমন পূর্বোক্ত ঘুরিষার নবরত্ন গোপালের মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা গন্ধবণিক ক্ষেত্রমোহন দত্ত লাক্ষাশিল্পের ব্যবসায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন এবং তারই কিয়দংশ দেবদেবীর পূজায় ও দেবালয় নির্মাণে ব্যয় করেন। পশ্চিমবঙ্গে বণিকদের প্রতিষ্ঠিত এরকম অনেক দেবালয় আছে, জমিদারদেব তো আছেই। ইলামবাজারে ইয়োরোপীয় বণিকদের ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতি উনিশ শতকের শেষদিক থেকে হতে থাকে। তার ফলে ইলামবাজারেব অতীতের সমৃদ্ধি ম্লান হয়ে যায়।

লাক্ষার কলকারখানা একে-একে বন্ধ হয়ে যায়, লাক্ষাশিল্প লুপ্ত হয়ে যায়। ইলামবাজারের লাক্ষাশিল্পীরা নানারকমের গহনা খেলনা পুতুল ইত্যাদি গড়তেন এবং বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে সেগুলি বিক্রি করতেন। ১৯৫০-এর দশকেও বীরভূমের বিভিন্ন মেলায় ইলামবাজারের শিল্পীদেব লাক্ষার তৈরি ছোট ছোট পুতুল পাখি গহনা ইত্যাদি দেখেছি, তারপরে আর কোথাও দেখিনি। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ৩০।৪০টি শিল্পী-পরিবার ইলামবাজারে ছিল। বর্তমানে একটি পরিবারও নেই যাঁরা এই কাজ করেন।

• ইলামবাজারের মন্দিরেব মধ্যে তিনটি মন্দিরে আজও পোড়ামাটির সুন্দর কারুকাজের নিদর্শন দেখা যায়। হাটতলায় একটি ছয়কোণা (hexagonal) মন্দির আছে, দেখলে মন্দির বলে মনে হয় না, গোলাঘর মনে হয়। অসম্পূর্ণ গঠন, টিনের চাল দেওয়া। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে, এবং কে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বা কেন করেন, তা স্থানীয় লোক কেউ বলতে পারেন না। তাঁরা শুধু এইটুকুই জানেন যে প্রতি বছর ২০ জ্যৈষ্ঠ অষ্টপ্রহর কীর্তন হয় এখানে। মন্দিরের দেয়ালে পোড়ামাটির কারুকার্য এখনও অনেকটা অবিকৃত অবস্থায় আছে। পোড়ামাটির মূর্তির মধ্যে দেবদেবী জীবজন্তুর সঙ্গে সাহেবদের চিত্রও দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে একটি শিবমন্দিরে ভাল পোড়ামাটির কাজ আছে এবং তার মধ্যে দুদিকের দেয়ালে বেশ বড় (প্রায় দু'ফুট × দেড় ফুট) দুটি জগদ্ধাত্রী ও দুর্গামূর্তি আছে। মন্দিরের গায়ে এত বড় পোড়ামাটির মূর্তি বিশেষ দেখা যায় না। নারায়ণ-মন্দির বলে কথিত একটি পঞ্চরত্ন মন্দিরের গায়ে একটি লিপিতে শকাব্দ ১৭৬৮, সন ১২৫৩

উল্লেখ আছে। মন্দিরের গায়ে দেবদেবী ও সাহেবদের চিত্রাবলী অনেকটা অক্ষত অবস্থায় আছে এখনও।

মৌখিরা

ইলামবাজারের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে মৌখিরা গ্রাম, বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তে। গ্রামটিকে একটি মন্দিরপ্রধান গ্রাম বলা যায়। অন্তত কুড়িটি শিবমন্দির আছে এখানে, ১৭৪৬ শকাব্দে তৈরি (১৮২৪ খ্রীস্টাব্দ)। একটি অদ্ভুত গড়নের শিবমন্দিরে সুন্দর কয়েকটি ইয়োরোপীয় মহিলার চিত্র আছে, বেশ বড়, প্রায় একফুট দীর্ঘ। মূর্তিগুলির বাস্তবতা বিশেষ লক্ষণীয়। বীরভূমের এইসব অঞ্চলে অধিকাংশ মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির সাহেব-মেমদের চিত্রাবলী দেখা যায়, যা অন্য জেলায় এই পরিমাণে দেখা যায় না। এর ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেরণা বীরভূমের ইয়োরোপীয় বণিকরাই দান করেছেন।[৪] তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন সুরুলের জন চীপ, গণুটিয়ার সিল্ক-ব্যবসায়ী ফরাসী ফ্রাশার্ড (Frushard), মহম্মবাজার-দেওচার লোহা-ব্যবসায়ী ম্যাকে (D. C. Mackay), এবং ইলামবাজার কয়লা-নীল-লাক্ষা ব্যবসায়ী ডেভিড আরস্কিন। এঁদের ভগ্ন কুঠি, জীর্ণ বাস-ভবন ইত্যাদির নিদর্শন এখনও এইসব স্থানে দেখা যায়।[৫]

৪. এ ছাড়া দুবরাজপুর হেতমপুর ও বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলে মন্দিরগায়ের পোড়ামাটির কাজে ইয়োরোপীয় দৃশ্যাবলীর প্রাচুর্য উল্লেখ্য।

৫. পুরাতন জেলা-গেজেটিয়ারে বীরভূমের এই ইয়োরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পাইকোড়

অন্ধকার শ্রীপঞ্চমীর রাত। গরুর গাড়িতে করে মুরারই স্টেশন থেকে পাইকোড় চলেছি (১৯৫২-৫৩)। কাছেই ভাদীশ্বর গ্রাম। গ্রামবাসী একজন বললেন: "এই গাছতলায় আছে বিশাল হরগৌরী মূর্তি।" গাড়ি থেকে টর্চ ফেলতেই মূর্তিটি চোখে পড়ল। পাশেই গ্রাম্য মন্দিরে সপ্তফণাবিশিষ্ট মনসামূর্তি। লীলাসন ভঙ্গিতে দুই পদ্মের উপর উপবিষ্ট মনসার শুধু মাথায় নয়, হাতেও সাপ, বুকেও সাপ, ঘটেও সাপ, পাশে নাগিনী। গ্রামের উত্তরপ্রান্তে ষষ্ঠীতলায় একটি ভগ্নস্তূপ আছে, 'এক-যে-ছিল-রাজার' প্রাসাদস্তূপ। স্তূপের চারিদিকে বড় বড় টালির মতো ইঁট ছড়ানো। প্রায় সাড়ে-এগারো ইঞ্চি লম্বা ও সাড়ে-নয় ইঞ্চি চওড়া ইঁট। স্তূপের অবশেষ দেখে মনে হয় দশম-একাদশ শতাব্দীর স্মৃতিচিহ্ন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

মধ্যে গোপালপুর গ্রামে রাতে অবস্থান করে ষষ্ঠীর দিন সকালে পাইকোড় পৌঁছলাম (১৯৫৩)। এই বিশেষ দিনটাতে যে-কোনো উপায়ে পাইকোড় পৌঁছনোর একটা উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীপঞ্চমীর সময় পাইকোড়ে বহুকালের প্রাচীন একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শুনেছিলাম। উৎসবটির বিশেষত্ব আছে, তাই স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা ছিল। 'বাণব্রতের উৎসব'। জানি না বাংলার আর কোথাও এই উৎসব হয় কিনা। পরে নলহাটি-আজিমগঞ্জ লাইনে লোহাপুরের পাশে প্রসিদ্ধ বারাগ্রামে যখন গিয়েছিলাম, তখন সেখানেও এই উৎসবের কথা শুনেছিলাম। তাতে মনে হয়, শুধু পাইকোড়ে নয়, বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-সাঁওতাল পরগণার এই মিলনক্ষেত্রের

কয়েকটি অঞ্চলে এখনও উৎসবটি পালন করা হয় এবং হয়ত এককালে আরও বেশি হত। উৎসবের উৎসটি আজ বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের অরণ্যে হারিয়ে যেতে বসেছে।

প্রায় বছর পঞ্চাশ আগে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পাইকোড়ের শ্রীহৃষীকেশ পাণ্ডা ও শ্রীকুলেশ পাণ্ডার কাছ থেকে এই বাণব্রতের 'পাঁচালী' ও বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন।[১] কিন্তু বাণব্রতের অনেক ছড়া ও মন্ত্র, অনেক আচার-অনুষ্ঠান তাঁর কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। যে-কোনো দর্শকের কাছেই তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

উৎসব হয় শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার সময়, কিন্তু উৎসব উপলক্ষে সমারোহে পূজা হয় গ্রামের বুড়ো শিবের ও ক্ষ্যাপাকালীর। প্রধান হোতা দেয়াসী ও বালাভক্ত। জাতিবর্ণনির্বিশেষে আরও অনেকে ভক্ত হন। চতুর্থীর দিন শ্মশানে গিয়ে একটি নরমুণ্ডের কঙ্কাল কুড়িয়ে এনে তাতে তেল-সিঁদুর লেপন করা হয় এবং পরে একজন ভক্ত সেই নরমুণ্ড একহাতে, আর অন্য হাতে একটি বেল নিয়ে কয়েকজন ভক্তসহ নৃত্য করতে থাকেন। শ্রীপঞ্চমীর দিন শিবের অভিষেক হয়। ভক্তরা নদীতে স্নান করতে যাবার সময় শিবমন্দিরের আঙিনায় দাঁড়ান এবং পাণ্ডা মন্দিরের পৈঠায় দাঁড়িয়ে বেত ঘুরিয়ে মন্ত্রপাঠ করান। তারপর 'দণ্ডবতী' পাঠ করে ভক্তরা চলে যান। নদীর ঘাটে পাণ্ডা 'ঘাট-শুদ্ধি' মন্ত্র পাঠ করান। ষষ্ঠীর দিন গদাধর শিবকে নদী থেকে তোলা হয়। পরে বাণফোঁড়া হয় এবং দেয়াসী কলার ভেলার সঙ্গে গাঁথা তিনটি খাঁড়ার উপর চড়ে ভক্তদের স্কন্ধে অনেকটা পথ প্রদক্ষিণ করে ক্ষ্যাপাকালীর প্রাঙ্গণে আসেন। সেখানে 'পাঁচালী' পাঠ হয় এবং ভক্তরা পরে পাণ্ডার বাড়ি এসে কোনো স্ত্রীলোকের কাছে ষষ্ঠীর কথা শোনেন। কয়েকটি ছড়া ও মন্ত্র আংশিক উদ্ধৃত করছি—

দণ্ডবতী

আদি বন্দ অনাদি বন্দ
মূল ধর্মের পাট
ত্রিশ কোটি দেবতা বন্দ
বৃদ্ধ মা বাপ।

১ 'বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ডাইনে দামোদর বন্দ
বামে হনুমান।
শিরে তুলি বন্দি
গোসাঞী জাজ্বল্যমান।
আকাশে চণ্ডিকা বন্দ
পাতালে বাসুকীনাথ।
আপন আপন গুরুর চরণে
দ্বাদশ প্রণাম ॥

পাঁচালী

দুয়ার ঘুচাও গোসাঞী হুড়ুক ধুরুকে।
গোসাঞী দেখি আমি শমন তুরুকে ॥
শমন তুরুকে মার ঘোর তালি,
পূজ দেবতা মার তালি,
শঙ্কর পূজে দাও করতালি।—ইত্যাদি

এই সব মন্ত্র ছড়া ও পাঁচালীর মধ্যে এমন অনেক শব্দ (হুড়ুক বুরুক তুরুক ইত্যাদি) ও দেবদেবীর নাম (ধর্ম গোসাঞী হনুমান চণ্ডিকা ইত্যাদি) আছে যার সঙ্গে 'বাণব্রত' উৎসবের সম্পর্ক নেই। বুড়ো শিব ও ক্ষ্যাপাকালীর পূজার সঙ্গেও তার যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। এমনকি পাণ্ডারাও অনেক কথার, অনেক অনুষ্ঠানের, মন্ত্রের ও ছড়ার অর্থ বা তাৎপর্য কি বলতে পারেন না। তাঁরা কেবল 'বহুকাল থেকে চলে আসার' কথা বলেন। কিন্তু এইসব শব্দ ও দেবদেবীর নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মনে হয়, পাইকোড়ের 'বাণব্রত' অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাঁওতালী উৎসবের অনুষ্ঠানাদি ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। দণ্ডবতী মন্ত্র ও পাঁচালীর কোনো কোনো অংশ পাঠ করলে সাঁওতালদের 'বোঙ্গা-বন্দনা' ও সাঁওতালী ওঝাদের ঝাড়ন-মন্ত্রাদির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। সন্দেহ হয়, অনেক সাঁওতালী শব্দ পর্যন্ত বাণব্রতের মন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। ধর্ম গোসাঞী হনুমান চণ্ডী ইত্যাদি বিখ্যাত সাঁওতালী বোঙ্গা (দেবতা)। হুড়ুক ধুরুক ইত্যাদি শব্দও যেন সাঁওতালী শব্দের প্রতিধ্বনি। সাঁওতালী উৎসবের সঙ্গে তান্ত্রিক ও শৈব উৎসবের ধারাও মিলিত হয়েছে। জাগ্রত ক্ষ্যাপাকালী, নরমুণ্ডসহ নৃত্য, শিবের গাজন ইত্যাদি তার নিদর্শন। "বল মন হরিবোল, হরি বল

ভক্ত ভাই, নেচে-গেয়ে ঘর যাই”—মন্ত্রের মধ্যেও হিন্দু-বৈষ্ণব ধারার ছাপ স্পষ্ট। ষষ্ঠীর ব্রতকথাও বিচিত্র দৃষ্টান্ত। মনেহয় রাঢ়ের সীমান্তে একাধিক সংস্কৃতিধারার মিলন-মিশ্রণ হয়েছে পাইকোড়ের বাণব্রত উৎসবে এবং তার মূল অতীতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

পাইকোড়ের উৎসব-অনুষ্ঠানই শুধু প্রাচীনতার সাক্ষী নয়, অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যবান নিদর্শনও তার সাক্ষী। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দু'টি শিলালিপির কথা—একটি কলচুরীরাজ কর্ণদেবের, আর একটি বিজয়সেনের। দু'টি শিলাস্তম্ভের উপরেই কোনো দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল মনে হয়। বিজয়সেনের শিলাস্তম্ভের উপরের মুণ্ডহীন মূর্তিটি যে মনসামূর্তি (ভাদীশ্বরের মনসা মূর্তির মতো) তা পরিষ্কার বোঝা যায়। কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভের উপরের মূর্তিটি ভেঙে গিয়েছে, বোধহয় পাশের ভগ্নমূর্তির স্তূপের মধ্যে পড়ে আছে। কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভের গায়ে খোদাই করা কারুকার্য (মঙ্গলকলস, পদ্ম, কীর্তিমুখ) অতি সুন্দর। শিল্পী যে কর্ণদেবের চেদীরাজ্যের নন, এই বাংলা দেশের তাতেও সন্দেহ নেই, কারণ রাজমহল পাহাড়ের কালো আগ্নেয় পাথরের (basalt stone) উপর এই ধরনের কারুকাজ বাঙালী শিল্পী ছাড়া ভিন্নদেশী শিল্পীর পক্ষে করা সম্ভব নয়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের রিপোর্টেও এই কথা বলা হয়েছে:

> The carving of this pillar has been done so beautifully as to entitle the sculptor to a high rank. It is very probable that the artist belonged to Bengal, rather than to the Chedi country, firstly because the polish and finish of the black basalt stone from Rajmahal hills used in the sculpture indicates a thorough mastery over the material, which cannot be acquired without the efforts of generations; and secondly, the inscription engraved on the pillar is not in Central Indian script, but in the Proto-Bengali characters prevalent in N.E. India. (Archaeological Survey of India—Annual Report, 1921-22, p 79),

কলচুরীরাজ কর্ণদেবের শিলালিপিতে ছয়টি লাইন আছে। খোদাইয়ের ভঙ্গি দেখে মনে হয়, সযত্নে খোদাই করা নয়, ব্যস্তভাবে খোদাই করা। অক্ষরগুলিও দশম-একাদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত আদি-বঙ্গাক্ষর। পাঠোদ্ধার করা খুব

কঠিন। 'বীরভূম বিবরণে' (২য় খণ্ডে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ লিপিবদ্ধ আছে। স্পুনার (পূর্বোক্ত রিপোর্ট, ১৯২১-২২, ৮০ পৃষ্ঠা) এইভাবে পাঠোদ্ধার করেছেন

১ম। শ্রীশ্রীগণপতি

২য়। — — — —

৩য়। ওঁ দেব-দ্বিজ-গুরু (ভজঃ) স্তরি·· দয় ভক্তিনাস্ত

৪র্থ। নেহয়ন— — (শ্রদ্ধ) য়া-স্মিন্ কর্মণি রাজশ্রী কর্ণদেব

৫ম। ওঁ স্বস্তি সমৃদ্ধ রাজ্য-শ্রী-চেদী র (আজ্য) শ্রী-কর্ণদেব (স্য) জ্য নস্তর কীর্তি প্রশস্তি (?)

৬ষ্ঠ। শ্রীবিশ্বকর্মা চরণ-প্রসাদাৎ দেবীমূর্তি নৃমিত— —পতিয় শ্রীকাতি— —

ভাবার্থ হল: কলচুরীরাজ কর্ণদেবের আদেশে কোনো ভাস্কর কোনো দেবীমূর্তি নির্মাণ করছেন। অন্য শিলালিপিটিতে আছে—"রাজেন্দ্র শ্রীবিজয়সেন।"

পাইকোড়ে কলচুরীরাজ কর্ণদেবের এই শিলালিপি থেকে বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ আলোকিত হয়ে ওঠে। বাংলার গৌরবময় পালযুগের অবসানকালের ইতিহাস। একাদশ শতাব্দীতে বাংলার বাইরে থেকে উপর্যুপরি অভিযান চলতে থাকে বাংলার উপর এবং এই অভিযান প্রতিরোধ করে পালসাম্রাজ্যের শক্তিও ক্ষয় হতে থাকে। মহীপালের রাজত্বকালে কলচুরীরাজ গাঙ্গেয়দেব অভিযান করেন (আ ১০২৬ খ্রী)। মহীপালের পর তাঁর পুত্র নয়পাল প্রায় পনের বৎসর রাজত্ব করেন (আ ১০৩৮-১০৫৫ খ্রী)। এই সময় গাঙ্গেয়দেবনন্দন কর্ণদেব বা লক্ষ্মীকর্ণ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু কর্ণদেব প্রথমে মগধ পর্যন্ত অভিযান করেছিলেন এবং যুদ্ধে প্রথমে পরাজিত হয়ে তিনি বহু বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করেছিলেন।

মগধে তখন ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ)। তিব্বতী কাহিনীতে বলা হয়েছে, এই সময় নাকি প্রধানত দীপঙ্করের মধ্যস্থতাতেই যুদ্ধবিরতি ঘটে এবং কলচুরীরাজ ও পালরাজাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি হয়। তার কিছুদিন পরে দীপঙ্কর এদেশ ছেড়ে তিব্বতে চলে যান (৫৯ বছর বয়সে) এবং তিব্বতেই মারা যান (৭৩ বছর বয়সে)। আনুমানিক ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে দীপঙ্কর তিব্বতযাত্রা করেন মনে হয়। এদিকে সন্ধিচুক্তি হলেও, কলচুরীরাজ অভিযানের লোভ সংবরণ করতে পারেননি বেশিদিন। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে (আ ১০৫৫-৭০ খ্রী)

কর্ণদেব মগধ ছাড়িয়ে গৌড় ও বঙ্গদেশে অভিযান করেন। কলচুরী দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, কর্ণের দাপটে বঙ্গের রাজারা নাকি ভয়ে কাঁপতেন (পূর্ববঙ্গের 'চন্দ' অথবা 'বর্মণ' রাজারা) এবং গৌড়ের রাজা করজোড়ে থাকতেন। এই দ্বিতীয় অভিযানের সময় কর্ণদেব যে মগধদেশ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁচেছিলেন, বীরভূমের পাইকোড় শিলালিপিটি তার ঐতিহাসিক সাক্ষীস্বরূপ আজও পুকুরপাড়ে নারায়ণচত্বরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে (১৯৫৩)। শিলালিপিটি যে অবহেলার বস্তু নয়, তা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয় অভিযানেও যে কর্ণদেব পাল-রাজাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিত' কাব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয়, দ্বিতীয়বারেও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং সন্ধির পর তাঁর কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ হয়েছিল। 'রামচরিত' কাব্যে আছে :

> সংগরবিতরণজিতকর্ণঃ ক্ষোণীং যৌবনশ্রিয়োদুহে।
> অশ্রান্তদানবারাতিশয়ো যোভূদবৃষানুচরঃ। (১।৯)

অনুবাদ : "যিনি স্বপরাক্রমে (ডাহলাধিপতি) কর্ণ নামক রাজাকে রণে পরাজিত করিয়াও রক্ষা করিয়াছিলেন, যাহার নানাপ্রকার (ভূম্যাদি) দান অবিচ্ছিন্ন থাকিত এবং যিনি ধর্মানুগত ছিলেন, সেই (বিগ্রহপাল) যৌবনশ্রী নাম্নী (কর্ণদুহিতার) সহিত পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। অথবা যৌবনশ্রী সহ পৃথিবীরূপিণী দ্বিতীয় পত্নীকে স্বীকার করিয়াছিলেন "।—রাধাগোবিন্দ বসাক : 'রামচরিত'।

মনে হয়, কর্ণদেব কিছুদিন রাঢ়দেশের এই অঞ্চল দখল করেছিলেন, সন্ধিশর্তেই হোক বা বলপ্রয়োগেই হোক এবং সেই সময় দেবদেবীও কিছু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাইকোড়ের শিলালিপিতে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। পালরাজাদের এই পতনের সময় রাঢ়ে একাধিক সামন্ত স্বাধীনভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে ঢেক্করীর বা ঢেকুরের ঈশ্বর ঘোষ অন্যতম। কলচুরীরাজের এই অভিযানের পরে কর্ণাটের চালুক্যরা বাংলা দেশ আক্রমণ করেন এবং চালুক্য অভিযানের সময় কর্ণাট-ক্ষত্রিয় সেনবংশের প্রতিষ্ঠা হয় বাংলা দেশে।

পালরাজাদের পর এই সেনবংশই বাংলার রাজা হন এবং তাঁদেরই পূর্বপুরুষ বিজয়সেনের শিলালিপি পাইকোড়ে আছে। শিলালিপি ছাড়াও পাইকোড়ে পাল-যুগের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। পাইকোড়ের বুড়োশিবের মন্দিরটিকে একটি ছোটখাট মিউজিয়ম বলা যায়। এত বিচিত্র মূর্তির

একত্র সমাবেশ একটি গ্রাম্য দেবমন্দিরে আর কোথাও দেখিনি। মনসা বিষ্ণু গণেশ সূর্য ও নানারকমের তান্ত্রিক দেবীমূর্তি তার মধ্যে আছে। খুব ছোট তিন-চার ইঞ্চি মূর্তি থেকে তিন-চার ফুট পর্যন্ত বড় বড় মূর্তি। বুড়ো শিবের মন্দির ছাড়া নারায়ণচত্বরে উন্মুক্ত বেদীর উপর গাছতলায় প্রচুর ভাঙা মূর্তি আছে, তার মধ্যে মুণ্ডভাঙা নৃসিংহ মূর্তি ও কতকগুলি দেবীমূর্তি উল্লেখযোগ্য। গ্রামের প্রান্তে জয়দুর্গা আছেন, চমৎকার মহিষমর্দিনী মূর্তি। মূর্তিগুলি অধিকাংশই পাল-যুগের, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। মূর্তির সমাবেশ থেকে কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আধিপত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। তবু মনে হয়, পালযুগের অন্যতম সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পাইকোড় এবং বৌদ্ধ তন্ত্রযানী ও হিন্দু তান্ত্রিকদের বেশ প্রাধান্য ছিল সেখানে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মেরও প্রতিপত্তি কম ছিল না। পালরাজারা নিজেরা বৌদ্ধ হলেও কোনো বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি যে বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন না, তার প্রমাণ পাইকোড়ে এখনও যেরকম পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

নলহাটি। ভদ্রপুর। বারাগ্রাম
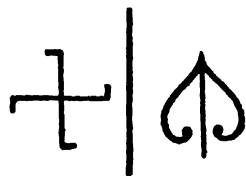
পীঠমালা মহাতন্ত্রে বলা হয়েছে—"নলাহট্যাং নলাপাতো যোগেশো নাম ভৈরবঃ। কালিকা দেবতা তত্র, তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।" তন্ত্রপীঠের প্রাধান্য বীরভূমের এই অঞ্চলে খুব বেশি। এদিকে কংকালীতলা সাঁইথিয়া লাভপুর, ওদিকে নলহাটি তারাপীঠ। তান্ত্রিক ধর্মসংস্কৃতির প্রতিপত্তি যেখানে এত বেশি, সেখানে পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক বিনাশও খুব স্বাভাবিক। পীঠস্থানগুলি কেন্দ্র করে অনেক রোমাঞ্চকর কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। পৌরাণিক অতিকথায় তাদের প্রকৃত ইতিহাস আজ রহস্যাবৃত। কিন্তু রহস্যের অন্তরালে দৃষ্টি প্রসারিত করলে বাংলার পালযুগের কথাই মনে পড়ে পীঠস্থান প্রসঙ্গে।

পাইকোড়-মুরারই ঘুরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে নলহাটি পৌঁছলাম এবং নলহাটি থেকে পুবে ভদ্রপুরে (নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে)। স্টেশনের পশ্চিমে নলহাটি গ্রাম। গ্রামের পশ্চিমে একটি ছোট টিলা, টিলার উপরে নলহাটির পার্বতী মন্দির। কেউ বলেন, সতীর দেহাংশ নলা (নলো, কনুইয়ের নিম্নভাগ) এখানে পড়েছিল বলে নলহাটিতে দেবী কালিকা ও ভৈরব যোগেশ বিরাজ করেন। কেউ বলেন, দেবীর ললাট পড়েছিল বলে দেবীর নাম ললাটেশ্বরী। নলহাটেশ্বরী থেকে ললাটেশ্বরী বা তার বিপরীত কিছু যাই হোক হয়েছে, কারণ তন্ত্রে নলাপাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড়ে অধিষ্ঠিতা বলে দেবী পার্বতী নামেও পরিচিত। টিলার উপরেই দেবীর মন্দির, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন টিলারই বক্ষভেদ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ একটি বাংলা মন্দিরের মতো গড়ন। মধ্যে কোনো দেবীমূর্তি নেই কিছু, পাষাণখণ্ডের মাধ্যমেই দেবীর পূজা হয়। দেবমন্দিরের অনতিদূরে একটি মসজিদ ও সমাধি। পার্বতী এবং পীর যেন পাশাপাশি বিরাজ করছেন নলহাটিতে।

রামপুরহাট মহকুমায় ঘুরে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ-বর্জিত যে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন দেখেছি, মনেহয় যেন নলহাটির পার্বতী সেই একই বন্ধনে বাঁধা। ইতিহাসের কোন্ পর্বে ঠিক কোন্ সময় এই বন্ধন হয়েছিল আজ আর তা কেউ বলতে পারেন না, জানেনও না, জানার তেমন আগ্রহও নেই। বাংলার এই পশ্চিম সীমান্তে, বীরভূমের এইসব অঞ্চলে বখ্‌তিয়ারের অভিযানের পর থেকেই মুসলমানদের আনাগোনা হয়েছে। রামপুরহাট মহকুমায় এমন অনেক গ্রামে দেখেছি যেখানে এখনও মুসলমানরাই প্রধান। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুসলমান। গ্রামের উৎসব-পার্বণে তাঁরা হিন্দুর মতো যোগদান করেন। কথাবার্তা বলে দেখেছি, গ্রাম্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও মূর্তির মধ্যে কোন্‌গুলি উল্লেখযোগ্য ও দ্রষ্টব্য তা তাঁরা অনর্গল বলে যেতে পারেন। পুকুর কাটতে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে—বিষ্ণুমূর্তি গণেশমূর্তি সূর্যমূর্তি বুদ্ধমূর্তি শক্তিমূর্তি—সাধারণ মুসলমান চাষীরা সেগুলি সযত্নে ঘরে তুলে রেখেছেন। কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় হয়ত কিউরিও-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রিও করেছেন, কিন্তু সকলে তা করেননি। নিজের গ্রামের মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন, হিন্দু ও মুসলমান আমলের, সকলেই রক্ষা করতে আগ্রহী। সম্প্রদায়ভেদে এই বোধশক্তির পার্থক্য নেই।

নলহাটির কথা বলি। পীঠস্থানের বিবরণে নলহাটির উৎপত্তির কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। দেবীর পূজারীরা চোদ্দপুরুষ আগে স্মরনাথ শর্মার স্বপ্নদর্শনের কথা বলেন এবং নলহাটির কোনো 'সাহা' জমিদার দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেন। এ ইতিহাসও তিনশো বছরের বেশি প্রাচীন নয়। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নলহাটির ইতিহাসের জের টানা যায়। প্রায় এইসময় রচিত 'পীঠনির্ণয়' বা 'মহাপীঠ-নিরূপণ' গ্রন্থে 'নলহাটির' নাম পাওয়া যায়। কোনো প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে নলহাটির নাম নেই। পরবর্তীকালের গ্রন্থে 'উপপীঠ' বলে নলহাটির উল্লেখ আছে :

> নলাহাট্যাং নলাপাতো যোগীশো ভৈরবস্তথা।
> তত্র সা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা॥
> কালীঘাটে মুণ্ডপাতঃ ক্রোধীশো ভৈরবস্তথা।
> দেবতা জয়দুর্গাস্যাং নানাভোগপ্রদায়িনী॥
> বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
> নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী॥
> হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
> নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াত। পীঠনির্ণয়—মহাপীঠনিরূপণম্

দীনেশচন্দ্র সরকার বলেন যে, সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এই 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পূর্বের কোনো প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে, এমন কি 'পীঠনির্ণয়ে'র অন্যান্য পুঁথিতেও নলহাটি কালীঘাট বক্রেশ্বর নন্দীপুর ইত্যাদির নাম নেই। তাই মনে হয়, তান্ত্রিক পীঠস্থানরূপে এগুলির তেমন প্রাধান্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে বিশেষ ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের ক্রমাবনতির যুগে, মোগল রাজত্বের শেষে, কেন্দ্রচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন তান্ত্রিক সাধনার ধারা বাংলার পশ্চিম প্রান্তের এই অঞ্চলগুলিতে কোনরকমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। তারমধ্যে নন্দীপুর (সাঁইথিয়া) বক্রেশ্বর নলহাটি ইত্যাদি অন্যতম বলা চলে।

নলহাটি থেকে ভদ্রপুরের পথে যাত্রা করলাম। নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে লোহাপুর স্টেশন থেকে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে ভদ্রপুর গ্রাম। মুর্শিদাবাদ-সীমান্ত এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। ইতিহাস-বিশ্রুত মহারাজা নন্দকুমার-বংশের শাখা-প্রশাখার বংশধররা এই গ্রামে বসবাস করেন। গ্রামের দৃশ্য ও ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে মনে হয় ভদ্রপুর বেশ প্রাচীন গ্রাম।

আনুমানিক ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নন্দকুমারের জন্ম হয় এবং ভদ্রপুরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জীর্ণ রাজবাড়ির সংলগ্ন একটি ইট-কাঠের কঙ্কালসার কক্ষের দিকে চেয়ে গ্রামবৃদ্ধরা বলেন যে, এই ঘরেই নন্দকুমারের জন্ম হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় দানবের কঙ্কালের মতো মহারাজের অট্টালিকা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পায়রা আর চামচিকেরা অতীত স্মৃতির টুকরো নিয়ে ভগ্নস্তূপের মধ্যে কিচিরমিচির করে। ৫ বিশাল ফটকের উন্নতশিরের দিকে দেখিয়ে গ্রামবাসীরা বলেন যে, এখান দিয়ে হাতির পিঠে চড়ে বাড়ির ভিতরে অঙ্গনে যাওয়া হত। ভিতরে দেওয়ানখানা, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির ইত্যাদি। রাজবাড়ির উত্তরাংশে ন'বাড়ি। মহারাজার ন'মধ্যম কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ রায়ের বাড়ির নামই ন'বাড়ি। রাজবাড়ি ও ন'বাড়ির পশ্চিমে ছোট রায়বাড়িতে মহারাজার বৈমাত্রেয় ভাই রঘুনাথ রায় ও তাঁর বংশধররা বাস করেন। ভদ্রপুরের ক্রমাবনতির কথা উল্লেখ করে নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ভদ্রপুর ইতিবৃত্ত' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন (১৩১৭ সনে প্রকাশিত): "এখন আর সেরূপ নাই। ব্রাহ্মণ জাতি চৌধুরী, কায়স্থ জাতি সিংহ ও গন্ধবণিক জাতি পালদিগের এবং মুসলমান জাতি মিরদিগেরই এই গ্রামে আদিম বাস ছিল, ইহা স্পষ্ট জানা যায়। আমারই চক্ষুরগ্রে এই গ্রামের লালাগোষ্ঠী, মজুমদারগোষ্ঠী ও অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়,

স্বর্ণকার ও সূত্রধরবংশ লুপ্ত হওয়ায় ন্যূনাধিক একশত ঘর বস্তী বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে কমিয়া গিয়াছে।" মহারাজা নন্দকুমারের অট্টালিকা থেকে বেগমের কুঠি পর্যন্ত সবই আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে।

সবার আগে ভদ্রপুরে পৌঁছে মনে হয় যেন মহারাজা নন্দকুমারের স্মৃতি সারা গ্রামটিকে আচ্ছন্ন করে আছে। স্থানীয় লোকের দুঃখ হল, ইংরেজের ইতিহাসের নজির ভাল করে যাচাই করা হল না, তখনকার 'দেশপ্রেম' বা 'জাতীয়তাবোধে'র (অষ্টাদশ শতাব্দীর) স্বরূপ কি তা সুস্থ মস্তিষ্কে বিচার করা হল না, নন্দকুমারের প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষপ্রসূত প্রচণ্ড অবিচারকে মাথা হেঁট করে মেনে নেওয়া হল। আজও নাকি স্থানীয় লোকের অনুরোধ সত্ত্বেও ভারত গবর্নমেণ্ট ভদ্রপুর গ্রামে নন্দকুমারের স্মৃতিরক্ষার জন্য কিছু করতে নারাজ (১৯৫৩)। তাঁরা বলেন, মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটায় যে কীর্তি ও স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে তাই যথেষ্ট।

সাম্রাজ্যবাদীর ইতিহাসে নন্দকুমারের চরিত্র যেভাবেই কলঙ্কিত করা হোক না কেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর লোকপ্রিয়তা আজও ম্লান হয়নি। অসংখ্য ছড়া ও গানে তার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। যেমন—

ভাদুরের নন্দকুমার
লক্ষ বামুন করলে সুমার।
কেউ খেলে মাছের মুড়ো
কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো।

অথবা— নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেস্টিংস সাহেব এল জান করিবারে বারি॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গাঙ্গের পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা জোড়া ডিঙ্গি বেয়ে॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে, কাঁদে ফোয়ারায় হাঁস।
যোড়া বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার গুল্‌তি বাঁশ॥

দলিল-দস্তাবেজের মাহাত্ম্য অথবা মহাফেজখানার মাহাত্ম্য ও রহস্য সাধারণ মানুষ জানে না বা বোঝে না। কত জাল দলিলের দৌলতে, মহাফেজখানার অন্ধকারে বসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশের ইতিহাসের কত অধ্যায় যে বিকৃতভাবে রচনা করেছেন, ভবিষ্যতে অনেক দিন পর্যন্ত অনুসন্ধানীদের কর্তব্য হবে তাই প্রমাণ করা। নন্দকুমারের ইতিহাস পুনরালোচনা করার দরকার নেই এখানে। আজ পর্যন্ত এরকম বিচার এই অবস্থায় কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৭৭৫ সালের মে

মাসে মোহনপ্রসাদ অভিযোগ করেন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে, জালিয়াতির অভিযোগ। সুপ্রীমকোর্টের বিচারকরা তাঁর বিচার করেন এবং ১৬ জুন তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তার ২২ দিন পর তাঁকে কলকাতার ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়। জালিয়াতির অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া এবং অত তাড়াতাড়ি সমস্ত বিচার ও দণ্ডবিধানের কাজ শেষ করে ফেলার মধ্যেই ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে নন্দকুমার অবশ্য বাংলা দেশের প্রথম শহীদ নন। একথা ভুল। তাঁর আগে বাংলার সাধারণ চাষী ও মানুষ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল, নন্দকুমারের মতো একজন দেশের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে এইভাবে বিচার করে প্রাণদণ্ড দেওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। বর্তমান যুগে অবশ্য বিরল নয়, কিন্তু তখন বিরল ছিল। দেশের কয়েকজন গণ্যমান্য অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির মধ্যে নন্দকুমার নিঃসন্দেহে অন্যতম ছিলেন। তাঁকে যে-পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছিল তাতে সমস্ত ব্যাপারটি হেস্টিংস ও তাঁর পার্শ্বচরদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। তার মানে এ নয় যে, নন্দকুমার নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র ছিলেন, তাঁর অর্থলোভ ছিল না, তিনি জাল-জালিয়াতি করেননি। নবাবী আমলের শেষে এবং ইংরেজের কোম্পানির আমলে আমাদের দেশে যে সমস্ত পরিবার বা ব্যক্তি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, তাঁরা কেউ সাধুতার জোরে তা করেননি। ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও অসাধুতা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। নন্দকুমার যদি সেই দোষে দোষী হন, তাহলে তার জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন না। এ-সব কথা বাঙালীর আজ মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ভদ্রপুরের কাছে আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত সর্পাসীনা সর্পভূষিতা দ্বিভুজা গুহ্যকালী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি আজও অসম্পূর্ণ রয়েছে (১৯৫০)। ব্রাহ্মণী নদীর পাশে শ্মশান এবং শ্মশানের কোলে কালীমন্দির। শোনা যায়, দেবীপ্রতিষ্ঠার সময় মহারাজা নিজে উপস্থিত থাকতে পারেননি বলে তাঁর পুত্র গুরুদাসকে তান্ত্রিক মতে কালীপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেবীমন্দিরের দক্ষিণে একটি সিদ্ধাসন আছে, 'পঞ্চমণ্ডী' বলে পরিচিত। এই অঞ্চল থেকে বৌদ্ধমূর্তিও কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিগুলি সংগ্রাহক-ব্যবসায়ীদের কৃপায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ভদ্রপুরও মনে হয় তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মতো বৌদ্ধ তন্ত্রযানের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, পরে হিন্দু তান্ত্রিক শৈব ও বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তিও বাড়ে। গুহ্যকালী প্রতিষ্ঠা থেকে মহারাজা নন্দকুমারের শক্তি উপাসনার কথা মনে হয়। বাংলা দেশের অনেক প্রতিপত্তিশালী রাজা ও জমিদারের মতো নন্দকুমারও শক্তির পূজারী ছিলেন।

বৈষ্ণবধর্মের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু এসব আজ ভদ্রপুরের অতীত ইতিবৃত্ত। আজ সেই অতীত সমৃদ্ধির প্রায় সবটাই লুপ্ত। ইতিহাসের উত্থান-পতনের আঘাতের চিহ্ন, আরও অনেক গ্রামের মতো, ভদ্রপুরের বুকেও খোদিত রয়েছে।

বারাগ্রাম

সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াঙ (হিউয়েন সাঙ) যখন বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যটন করেছিলেন তখন পৌণ্ড্রবর্ধন সমতট কর্ণস্বর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। কর্ণস্বর্ণ ও তাম্রলিপ্তি মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে। কর্ণস্বর্ণ রাজ্য তখন বহুদূর বিস্তৃত ছিল। বারাগ্রাম মুর্শিদাবাদ সীমান্তে, বীরভূম জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। শশাঙ্কের আমল থেকে পালরাজাদের কাল পর্যন্ত বাংলার এই অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বীরভূমের বারাগ্রামে আজও তার চমকপ্রদ ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে যথেষ্ট।

নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখা-রেলপথে লোহাপুর স্টেশনের পাশেই বারাগ্রাম। কেউ বলেন, বালানগর' থেকে 'বারা' হয়েছে। 'এক যে ছিল রাজার' কাহিনী এখানকার হাটেমাঠেও লোকমুখে শোনা যায়। আঠারো মহল্লায় বিভক্ত গ্রাম, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা খুব কম, মুসলমানের সংখ্যা বেশি। পশ্চিমবাংলায় কেন এরকম বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম? কেনই বা পূর্ববাংলার তুলনায় পশ্চিমবাংলায় ধর্মান্তরিতের সংখ্যা কম? কৌতূহলী কেউ কেউ এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। এককথায় উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পশ্চিম-বাংলার সামন্ত রাজাদের (যেমন মল্লভূম) সুদীর্ঘ স্বায়ত্ত-শাসনের ঐতিহ্য ছিল, মুসলমান শাসকরা তাঁদের বিশেষ বিব্রত করেননি। হিন্দুধর্মের বনিয়াদ কৌমধর্মের সঙ্গে মিশে এখানে যে-রকম পাকাপোক্ত হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে সেরকম হয়নি। বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং বৌদ্ধদের হিন্দুবিদ্বেষের জন্য ধর্মান্তরিত করাও সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ-প্রাধান্য থাকলেও হিন্দুরা তাকে প্রায় আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের 'ধর্মঠাকুর' বোধহয় তারই বিচিত্র ঐতিহাসিক নিদর্শন। ধর্মের পণ্ডিতরা একধর্মপাশে অবজ্ঞাত মানুষকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে আবদ্ধ করে ইসলামের অভিযান প্রতিরোধ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন শ্রীচৈতন্য তাঁর উদার বৈষ্ণবধর্মের মানবিক আহ্বানে। ধর্মঠাকুর ও শ্রীচৈতন্য প্রধানত পশ্চিমবাংলাকে কিছুটা ইসলামমুক্ত করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকরা যেখানে প্রাধান্য বজায়

রেখেছেন সেখানেই মুসলমান পীর ও সিদ্ধপুরুষদের আস্তানা করা সহজ হয়েছে দেখা যায়। রামপুরহাট মহকুমার একাধিক অঞ্চলের ইতিহাস থেকে এই কথাই মনে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য হল, এই সব অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের তেমন প্রতিপত্তি নেই। বোঝা যায়, প্রতিরোধের প্রাচীর কোনদিক থেকেই শক্ত ছিল না।

কথাটা আরও পরিষ্কার হবে বজ্রযানী বৌদ্ধদের হিন্দুবিদ্বেষের দৃষ্টান্ত দিলে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষ ছিল এবং মনে হয় এই বিদ্বেষ বৌদ্ধধর্মের ভয়াবহ অবনতির যুগেই প্রকট হয়েছিল। এমনভাবে প্রকট হয়েছিল যে, হিন্দু দেবদেবীদের বজ্রযানীরা তাঁদের দেবদেবীর বাহন ও অনুচর করতেও কুণ্ঠিত হননি। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতীয় বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্ব' (ইংরেজী গ্রন্থ), 'সাধনমালা' (ভূমিকা) ও 'নিষ্পন্নযোগাবলী' (ভূমিকা) গ্রন্থের মধ্যে বজ্রযানীদের এই হিন্দুবিদ্বেষের অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

> The Vajrayanists displayed a great hatred towards the gods of the Hindu religion and a large number of remarks made by a number of Vajrayana authors on the Hindu gods in the 'Sadhanmala' fully bears us out······A large number of images were carved by followers of Vajrayana where the Hindu gods were represented in stone and in pictures as humiliated by Buddhist gods. (Sadhanmala, Vol. 2, p. 130-33.)

একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধদের এই শোচনীয় পরিণতি হয়েছিল। তার পরেই মুসলমানদের অভিযান আরম্ভ হয় বাংলা দেশে।* মুসলমান পীর ও গাজীসাহেবের পক্ষে তাই এই বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করা অনেক সহজ হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায় এই রকম বৌদ্ধপ্রধান কেন্দ্রই কিছু-কিছু মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। বারাগ্রাম তারই একটা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বোখারা সমরকন্দ বোগদাদ তেহারান থেকে বারার মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা আসেননি। দু-একজন পীর বা সিদ্ধপুরুষ আসতে পারেন, কিন্তু তাঁদের বংশধররাই বারার মুসলমান অধিবাসী নন। লোহাজঙ্গ সাহেব বা বোগদাদের সৈয়দশাহ গোলাম আলীর বংশধর সকলে নন। স্থানীয় অধিবাসীরাই ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। শোনা যায়, বারায় নাকি একসময় ব্রাহ্মণের বাস ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এখন বারা প্রায় ব্রাহ্মণ-শূন্য গ্রাম। প্রচুর মুসলমান পীরের সমাধি আছে রাগ্রামে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বারার মুসলমান সাধুদের অনেক শিষ্য আছেন। বারার বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে এগুলি যে যুগবিপ্লবের নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই। গ্রামের মধ্যে কেই প্রথমে দেখা

যায় লোহাজঙ্গ পীরের সমাধি এবং তার কাছে আরবী ভাষায় 'নস্‌খ' অক্ষরে উৎকীর্ণ বড় একটি শিলালিপি।[১] লোহাজঙ্গ ছাড়াও আরও অনেক পীর ও সিদ্ধপুরুষের নাম শোনা যায় বারায়, যেমন সুলতান শাহ, ন্যাংটা শাহ, জামাল শাহ, মোখতুম জিলানী, মোখতুম হোসেনী, সৈয়দ শাহ, মেহের আলি, মহরম আলি, লাঙ্গ শাহ, দড়ব শাহ ইত্যাদি। এই সব মুসলমান ধর্মপ্রচারক বারাগ্রামে এসে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের সাহচর্যে সিদ্ধপুরুষ ও ন্যাংটা শাহ হয়েছিলেন কিনা, ভাববার বিষয়।

আরবী শিলালিপি ও পীর-পয়গম্বরের সমাধির অন্তরালে কিন্তু বারাগ্রামের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সমাধিস্থ হয়ে আছে। দেখলে বিস্ময়কর মনে হয়। পালযুগের ভাস্কর্যের এরকম প্রাচুর্য একটি গ্রামের সীমানার মধ্যে আর কোথাও দেখিনি। পদে পদে এক-একটি নিদর্শনের সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে হয়। মাটির তলা থেকে অধিকাংশ নিদর্শনই গ্রামবাসীদের কোদালের মুখে উঠেছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা দু-একবার খোঁজখবর পেয়ে গিয়েছেন এবং 'ভিজিটিঙে'র নামে কেবল চোখের দেখা দেখে এসেছেন। ১৯২০-২১ সালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে (পূর্ব-বিভাগের) বারাগ্রামের মূর্তিভাস্কর্যের ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ খোন্তা-কোদাল দিয়ে খুঁড়ে দেখেননি, এই গ্রামটির মাটির তলায় কি রয়েছে না রয়েছে। গ্রামের লোকরা বলেন, বিশেষ করে যাঁরা খোন্তা-কোদাল নিয়ে কাজ করেন, অর্থাৎ চাষী মজুররা, যে বারাগ্রামে এরকম স্থান খুব কমই আছে যেখানে কোদাল চালালে কিছু পাথর, ইঁট বা মূর্তির টুকরো ইত্যাদি পাওয়া না যায়। প্রচুর পাথরের ভাঙা দরজা ও কার্নিসের টুকরো (চমৎকার কারুকাজ ও খোদাই করা) বারার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, গাছতলায়, খোলা মাঠে, পুকুরপাড়ে,পাড়ায় পাড়ায়। মূর্তির প্রাচুর্য দেখলে সত্যিই স্তম্ভিত হতে হয়। অধিকাংশ মূর্তিই অসাবধান কোদাল-সাবোলের ঘায়ে ভগ্ন ও বিকৃত। কারও মাথা নেই, কারও হাত নেই, কারও পা নেই কারও চালচিত্র নেই, কারও বা পাদপীঠ নেই। না থাকলেও চেনবার মতো দেবদেবীর মূর্তি বারাগ্রামে এখনও এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, তাই দিয়ে একটি মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালা গড়ে তোলা যায়। দরিদ্র গ্রামবাসীর মিউজিয়ম গড়বার সাধ্য নেই। তার উপর বিলাসী সংগ্রাহক ও ব্যবসায়ীর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। গ্রামবাসীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সস্তায় সেইসব মূর্তি তাঁরা কিনে নিয়ে (অনেক ক্ষেত্রে অপহরণ করে) বিক্রি করেছেন।

১ শামসুদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত Inscriptions of Bengal, vol 4 (Rajshahi 1960) এবং Journal of the Asiatic Society of Pakistan, vol II, 1957, appendix দ্রষ্টব্য।

বারাগ্রামের দেবদেবীর মূর্তি-বৈচিত্র্য এত বেশি যে, হঠাৎ কোনো মূর্তিবিদ্যা-বিশারদের পক্ষেও প্রত্যেক মূর্তির সঠিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। মূর্তিবৈচিত্র্যের সামনে প্রথমে বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। মনে হয়, রাজমহল পাহাড় এখান থেকে বেশি দূরে নয় বলে ভাস্করদের উপাদানের অভাব হয়নি এবং মনের আনন্দে তাঁরা পুঁথি দেখে মূর্তি নির্মাণ করেছেন। তার উপর এই অঞ্চলের বজ্রযানী বৌদ্ধদের দেবদেবীর বৈচিত্র্য-বিলাস তাঁদের প্রেরণায় ইন্ধন জুগিয়েছিল খুব বেশি। বারাগ্রামে দেবদেবীর মূর্তি যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু বৌদ্ধ দেবদেবীর সংখ্যা বেশি মনে হয় এবং তার গুরুত্বও বেশি। মূর্তিগুলি বজ্রযানী বৌদ্ধদের। বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি একাধিক পাওয়া গিয়েছে বারায়। বজ্রযান হল কালচক্রযান ও সহজযানের মতো বৌদ্ধ তন্ত্রযানের শাখাবিশেষ। সাধারণভাবে একে তন্ত্রযান বা বৌদ্ধতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। বজ্রযানীদের মূর্তি-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেছেন :

> The Buddhist Pantheon in an elaborate form is a product of the Vajrayana school which most probably took its origin with Asanga in the fourth century. (Nisponnayogabali : intro. p 15).

তন্ত্রযান-বজ্রযানাদির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে অবশ্য। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি ইউয়ান চোয়াঙ যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের কাছে যোগাচার-দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হয়েচে বলে অনেকে মনে করেন না। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিদ্যায়তনের বৌদ্ধ আচার্যদের হাতে যে বৌদ্ধদর্শন নতুন রূপ নিয়ে সমস্ত পূর্ব-ভারত ও তিব্বতে প্রভাব বিস্তার করল, তা এক অভিনব বৌদ্ধদর্শন এবং তাকেই তন্ত্রযান বলা যায়। মনে হয়, বীরভূমের উত্তর প্রান্তের এই সব অঞ্চলে (পাইকোড়, বারা, ভদ্রপুর, আকালীপুর, তারাপুর) অষ্টম-নবম শতক থেকে তন্ত্রযানী বৌদ্ধমতের প্রসার হতে থাকে এবং দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে তার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি (পাইকোড় ও বারাগ্রামের) নির্মিত হয়েছে বলে মনে হয়। কয়েকটি বৌদ্ধ দেবদেবীর পরিচয় থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বারাগ্রামে 'ভুবনেশ্বরী' নামে এক সিংহাসীনা দেবীমূর্তি পূজিত হন। মূর্তিটিকে কেউ বলেছেন 'ভুবনেশ্বরী-গৌরী' মূর্তি, কেউ বলেছেন 'সিংহনাদলোকেশ্বর' মূর্তি,

কেউ বলেছেন 'মঞ্জুবর মূর্তি,' কেউ 'প্রজ্ঞাপারমিতা।' বিশেষজ্ঞদের মতামত অজ্ঞদের মনে কি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে (পূর্ব-বিভাগ, ১৯২০-২১) গ্রামবাসীরা যে 'ভুবনেশ্বরী' এই ভুল নামে পূজা করেন, তাও উল্লেখ করা হয়েছে এবং 'সিংহনাদ লোকেশ্বর' অথবা 'মঞ্জুশ্রী' মূর্তি বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ২৭)। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁর বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের গ্রন্থে (Indian Buddhist Iconography, p. 25) এই পরিচয়ও ভুল বলেছেন। 'সাধনমালা'র ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এই কথিত 'ভুবনেশ্বরীকে' বলেছেন বৌদ্ধ 'মঞ্জুবর'। ধ্যানটি এই :

"..... তপ্তকাঞ্চনাভম্ পঞ্চবীরকুমারম্ ধর্মচক্রমুদ্রাসমাযুক্তম্ প্রজ্ঞাপারমিতান্বিত-নীলোৎপলধারীণম্ সিংহস্থম্ ললিতাক্ষেপম্ সর্বালঙ্কারভূষিতম্..... ওঁ মঞ্জুবর হুম।"

ধ্যানের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীমূর্তির মিল আছে—ধর্মচক্রমুদ্রা, নীলোৎপলের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা, সিংহাসীনা, ললিতভঙ্গি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ঠিকই আছে, কিন্তু মূর্তিটি দেবমূর্তি নয়, দেবীমূর্তি। বিনয়তোষ বলেছেন :

...I am not sure as to the sex of the figure. It is a female figure. We will have no other alternative than to identify the image as that of Prajnaparamita. (Ibid, p. 25 fn).

তাই যদি হয় তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বারাগ্রামের 'ভুবনেশ্বরী' হলেন বৌদ্ধ প্রজ্ঞাপারমিতা। এ-মূর্তি খুব বেশি নেই পশ্চিমবঙ্গে।

বারাগ্রামে আরও একটি বিচিত্র দেবীমূর্তি আছে, দুঃখের বিষয়, মূর্তিটির কোনো হাতই অটুট নেই, সব ভাঙা। সুতরাং কোন্ হাতে কি ছিল জানার উপায় নেই। চতুর্মুখ দেবীমূর্তি, তিনটি মুখ সামনে, একটি পিছনে। পদ্মের উপর বজ্রাসনে উপবিষ্ট। মাথার মুকুটটির গড়ন চৈত্যের মতো। এই লক্ষণগুলি দেখে মনে হয়, মূর্তিটি কোনো বৌদ্ধ দেবীমূর্তি। কেউ এই মূর্তিটির কোনো পরিচয় দেননি। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের উক্ত রিপোর্টে বোধ হয় এই মূর্তিটিকেই 'উষ্ণীষবিজয়া' বলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, মূর্তিটি 'বজ্রতারা' দেবীর। কিন্তু 'সাধনমালা'র ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় মূর্তিটি 'মহাপ্রতিসরা'র মূর্তি। ধ্যান এই :

"মহাপ্রতিসরা গৌরবর্ণা দ্বিরষ্টবর্ষাকৃতিঃ চৈত্যালঙ্কৃতামূর্ধা সূর্যমণ্ডলালীঢ়া বজ্রপর্যঙ্কিনী ত্রিনেত্রা অষ্টভুজা চতুর্মুখা চলৎকুণ্ডলশোভিতা হারনূপুরভূষিতা কনককেয়ূরমণ্ডিত-মেখলা সর্বালঙ্কারধারিণী। তস্যা ভগবত্যাঃ প্রথমমুখং গৌরং দক্ষিণং কৃষ্ণং পৃষ্ঠে

পীতং বামে রক্তং। দক্ষিণ প্রথমভুজে চক্রং দ্বিতীয়ে বজ্রং তৃতীয়ে শরঃ চতুর্থে খড়্গঃ। বামপ্রথম ভুজে বজ্রপাশঃ দ্বিতীয়ে ত্রিশূলঃ তৃতীয়ে ধনুঃ চতুর্থে পরশু। বোধিবৃক্ষোপশোভিতা…"

যদিও হাতে কি ছিল জানাব উপায় নেই, তবু এই ধ্যানের সঙ্গে বারার এই মূর্তির মিল দেখে মনে হয় যে মূর্তিটি মহাপ্রতিসরামূর্তি। তন্ত্রযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর মধ্যে মহাপ্রতিসরা অন্যতম ও প্রধান। চতুর্মুখবিশিষ্ট মহাপ্রতিসরামূর্তি বাংলা দেশে অত্যন্ত বিরল।

এছাড়া বারাগ্রামে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি আরও অনেক আছে। ধ্যানের সঙ্গে মূর্তি মিলিয়ে দু-একটির পরিচয় ঠিক করতে পারিনি। ভগ্নমূর্তির কয়েকটি বিভিন্ন তারামূর্তি বলে মনে হয়। এইসব মূর্তি থেকে এই কথা মনে হয় যে বারাগ্রাম পালযুগে বৌদ্ধতন্ত্রযানের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। তার সঙ্গে এই কথাও মনে হয় যে বীরভূমের কোনো কোনো অঞ্চলে বৌদ্ধতন্ত্রযানের এই প্রভাব-প্রতিষ্ঠার কারণ তার সমাজবিন্যাসে অনুচ্চবর্ণের ও আদিজনগোষ্ঠীর প্রাধান্য।

তারাপীঠ। তারাপুর

যদিও পথ অত্যন্ত দুর্গম, তবু তারাপীঠে যেতেই হল (১৩৫৩ সালে)। বীরভূমের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পাইকোড নলহাটি, ভদ্রপুর আকালীপুর, বাবাগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের স্রোত ক্রমেই যেন তারাপীঠের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। আজও পথ যে-রকম দুর্গম তাতে মনে হয় 'বামাক্ষ্যাপা'র যুগে এ-পথ না জানি কি ছিল। আর তারও আগে, সেই জনশ্রুতির বশিষ্ঠের যুগে এ-পথ অতিকায় দানব ছাড়া মানবের গম্য ছিল বলে মনে হয় না। এ-হেন পথে কেবল তন্ত্রমার্গের নির্বিকার সাধকরাই চলাফেরা করতে পারেন। মাটির পৃথিবীর নশ্বর মানুষ যাঁরা তাঁদের কাছে তারাপীঠের পথ সুগম নয়। এখন অবশ্য অনেক সুগম (১৯৭৫)।

অবশেষে তারাপীঠে পৌঁছলাম। দূর থেকে তারাদেবীর মন্দিরের শিখরটি দেখা যায়। আধুনিককালে তৈরি আটচালা বাংলা মন্দির, অনেক ভাঙাগড়ার পর তৈরি হয়েছে। পাশেই দ্বারকা নদীর কোলে শ্মশান। আজও অসংখ্য শব মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়, দাহ করা হয় না। শৃগাল-শকুনির লীলাক্ষেত্র এবং তান্ত্রিক সাধকের। পীঠের সীমানার মধ্যে চারিদিকে ছড়ানো পর্ণকুটির, আর কিছু আশ্রম। কোনো প্রকৃত তান্ত্রিক সাধক এখন আর তারাপীঠে নেই, পাণ্ডারা বলেন। প্রসিদ্ধ সাধক 'বামাক্ষ্যাপা'র ভক্ত অনেকে আছেন, যাঁদের সাধুদের কয়েকটি সাময়িক আস্তানা নীড়ের মতো গড়ে ওঠে, আবার ভেঙে যায়। পথের ধারে জঙ্গলের মধ্যে, যাবার পথে, তারাপীঠের কোলে এইরকম কয়েকটি সাধুর আশ্রম দেখলাম। যা দেখলাম বর্ণনা করা যায় না। অবর্ণনীয় বীভৎসতা। আগাগোড়া নরমুণ্ড ও কঙ্কাল দিয়ে তৈরি কুটিরে সাধুরা বাস করেন। সে এক

ভয়াবহ দৃশ্য (বর্তমানে এই নরমুণ্ডকুটীর নেই)। মাটির দেয়ালে অজস্র নরমুণ্ড গাঁথা। দরজায় নরমুণ্ড, সামনের প্রাঙ্গণে বৃত্তাকারে আলপনার মতো মুণ্ড বসানো। ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হয় এবং দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে কয়েকজন সঙ্গীসহ না দেখলে আঁতকে ওঠার সম্ভাবনা। সায়াহ্নের বা অন্ধকার মধ্যরাত্রের কথা কল্পনা না করাই ভাল। দুতিনজন সাধুকে দেখলাম, ডাক দিতে এ-কোণ সে-কোণ থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু নির্বাক, একটি কথাও বললেন না। কেবল মুখের দিকে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। চক্ষু দেখে এবং চলার দোদুল্যমান ভঙ্গি দেখে বোঝা যায়, পঞ্চ 'ম' কারের একটিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

এঁরা কেউ তারাপীঠের উত্তরসাধক তো ননই, তান্ত্রিক সাধকও নন। একথা পাণ্ডারা জোর দিয়ে বললেন এবং বোঝাতে চাইলেন যে, তারাপীঠে এসে কপাল কঙ্কাল নিয়ে কারণপানাদি করলেই তান্ত্রিক সাধক হওয়া যায়, এরকম ভ্রান্তধারণা নিয়ে অনেকে এখানে আসেন এবং নিন্দনীয় আচরণ করেন। শেষ জীবনে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গী হয়ে সেবাশুশ্রূষা করেছেন, এরকম দু একজন এখনও যাঁরা তারাপীঠে আছেন তাঁরাও তাই বললেন।

বামাক্ষ্যাপা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী, অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুধু তারাপীঠে বা বীরভূমে নয়, বাংলার সর্বত্র সাধক বামাক্ষ্যাপার নাম সর্বজন পরিচিত। যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী লিখেছেন। তারাপীঠের কাছে আটলা গ্রামে বামাচরণ জন্মেছিলেন। তারপর কিভাবে তিনি তারাপীঠে এসে তারার উপাসনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন, সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। অনেকেই তা জানেন।

তন্ত্রসাধনায় ও তন্ত্রসাহিত্যে বাঙালী সাধকদের একটা বিশেষ দান আছে। তান্ত্রিক নিবন্ধের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ গিরির 'তারারহস্য' ও 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', পূর্ণানন্দ গিরির 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শাক্তক্রম' ও 'শ্যামারহস্য', গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের 'তারারহস্য বৃত্তিকা', জগদানন্দ মিশ্রের 'কৌলাচন দীপিকা', সর্বানন্দের 'সর্বোল্লাসতন্ত্র', শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের 'তন্ত্ররত্ন', কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার,' কৃষ্ণানন্দের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ও প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের 'প্রাণতোষিণী তন্ত্র' ইত্যাদি পণ্ডিতমহলে প্রামাণিক গ্রন্থ বলে গৃহীত। মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম, বিজয় গুপ্ত, ভারতচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী কবিও তান্ত্রিক দেবদেবী ও পীঠস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন তাঁদের কাব্যে। হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদ, বর্ধমানের সাধক

কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিদের পদাবলী আজও বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। অনেক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকও জন্মেছেন বাংলাদেশে। তাঁদের মধ্যে রাঢ়দেশের ব্রহ্মানন্দ, ময়মনসিংহের পূর্ণানন্দ গিরি, ত্রিপুরার মেহার কালীবাড়ির সর্বানন্দ ঠাকুর, ঢাকার মিতরার রাঘবানন্দ, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর গুরু সাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরী, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, ঢাকা-রমনার ব্রহ্মাণ্ডগিরি, বীরভূম-তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা প্রমুখ সাধকদের নাম সর্বজনবিদিত। বাংলার তান্ত্রিক সাধনার এই ঐতিহাসিক ধারার শেষ বিকাশ যে-কয়েক স্থানে হয়েছিল তার মধ্যে 'তারাপীঠ' অন্যতম। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলার তান্ত্রিক সাধকদের শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন বোধহয় বামাক্ষ্যাপা।

'তারাপীঠে'র ইতিহাসের কথা বলি। তারাদেবীর উপাসনার ইতিহাসের সঙ্গে নিশ্চয় তারাপীঠের ইতিহাসও জড়িত। তারার নামেই তারাপীঠ। তারাপীঠের অনতিদূরে তারাপুর গ্রামও তারা নামের সঙ্গে জড়িত। 'তারা', 'তারা' যে কেবল বামাক্ষ্যাপারই মুখের বুলি ছিল তা নয়। বাংলা দেশে এমন কেউ আছেন কি না জানি না, যিনি একবারও ঘটনাচক্রে অববীলাক্রমে 'তারা' নাম উচ্চারণ করেননি। 'তারা' নামের লোকপ্রিয়তা বোধহয় সমস্ত দেবদেবীকে ছাড়িয়ে যায়, এমন কি দুর্গা কালী পর্যন্ত। তা ছাড়া, দুর্গা কালী চণ্ডী চামুণ্ডা সবই 'তারা' ছাড়া কি? যে-গ্রামে তারাপীঠ, তার নামই তো চণ্ডীপুর। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামদুলাল প্রভৃতি সাধক-কবির কণ্ঠে 'তারা' নাম যেমনভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, এমন আর কোনো নাম হয়নি। উচ্চারণের সাবলীলতার দিক থেকে অন্য নামের কোথায় বাধা আছে যেন। 'মা' ও তার সঙ্গে 'তারা' বাংলার শ্যামাসঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে লোককণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজে। সেই তারার নামে তারাপীঠ, তারাপুর। তারা-সাধনায় সাধকরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে অনেকে তারাপীঠকে 'সিদ্ধপীঠ' বলেন। প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থে 'মহাপীঠ', এমন কি 'উপপীঠ' বলেও তারাপীঠের নাম পাওয়া যায় না। আগমবাগীশের গ্রন্থে না, এমন কি ভারতচন্দ্রের পীঠমালার তালিকাতেও না। 'শিবচরিত' গ্রন্থে তারাপীঠকে 'মহাপীঠ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সতীর নেত্রাংশ-তারা এখানে পড়েছিল বলে নাম তারাপীঠ। তারাপীঠের দেবী 'তারিণী' এবং ভৈরব 'উন্মত্ত'।[১] কিন্তু 'শিবচরিত' প্রাচীন গ্রন্থ নয়। সুতরাং শিবচরিতের সাক্ষী থেকে তারাপীঠের ইতিহাস জানার উপায় নেই।

১ শাক্তপীঠ সম্বন্ধে শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ— এসিয়াটিক সোসাইটি জার্নাল, ১৯৪৮, ১৪ সংখ্যা

একমাত্র ভরসা হলেন 'তারা'। কিন্তু তার আগে তারাপীঠের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীর কথা বলি।

ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ তারামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, কামাখ্যা প্রভৃতি বহু স্থানে কঠোর তপস্যা করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তিনি বুদ্ধের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে এইস্থানে (তারাপীঠে) উগ্রতারার সাধনা করতে বলেন। বুদ্ধের আদেশে বশিষ্ঠ উগ্রতারার সাধনা আরম্ভ করেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারাপীঠের সকলের বিশ্বাস, বশিষ্ঠ এইখানেই তারা-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারাপীঠের একটি কুণ্ডকে বশিষ্ঠকুণ্ড বলা হয় এবং লোকের বিশ্বাস এই কুণ্ডে স্নান করলে মৃতবৎসা নারী সন্তান লাভ করেন। বশিষ্ঠের সাধনার স্থানও নির্দিষ্ট আছে তারাপীঠে।

তারাপীঠের এই বুদ্ধ-বশিষ্ঠ কাহিনীটি তন্ত্রগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। 'রুদ্রযামলে'র মতো বিখ্যাত তন্ত্রগ্রন্থেও এই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে দেখা যায়। ব্রহ্মার আদেশে বশিষ্ঠ চীনদেশে বা মহাচীনে গিয়েছিলেন, তারা-সাধনার আচার শিক্ষা করতে, কারণ তন্ত্রমতে চীনাচারই হল তারা উপাসনার শ্রেষ্ঠ আচার। 'চীনাচার' সম্বন্ধে অনেক তন্ত্রগ্রন্থে প্রশংসা করা হয়েছে। 'নীলতন্ত্র', 'তারারহস্য বৃত্তিকা', 'রুদ্রযামল', 'শিবশক্তির সঙ্গমতন্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে চীনাচারকে তারা-সাধনার শ্রেষ্ঠ ক্রম বা পদ্ধতি বলা হয়েছে। বশিষ্ঠ সেই জন্যই চীনদেশে গিয়েছিলেন :

ততো গত্বা মহাচীনদেশে জ্ঞানময়ী মুনিঃ
দদর্শ হিমবত-পার্শ্বে সাধকেশ্বরসেবিতে।

বশিষ্ঠের এই চীনদেশে ও কামাখ্যায় গিয়ে তারা সাধনায় ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী তারাপীঠে প্রচলিত আছে। মূলত তিনটি বশিষ্ঠের তন্ত্রসাধনা, বিশেষ করে তারার সাধন-পদ্ধতি শিক্ষার কাহিনী। তন্ত্রমতে দেখা যায়, তারার সাধনপদ্ধতির মধ্যে চীনাচারই শ্রেষ্ঠ এবং বশিষ্ঠ সেই চীনাচার শিক্ষা করবার জন্যেই চীনদেশে গিয়েছিলেন।

কাহিনীর অন্তরালে একটি বিরাট ঐতিহাসিক সত্য আত্মগোপন করে আছে। তারার সঙ্গে চীনদেশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছিল চীনদেশে, পরিষ্কার বোঝা যায়। চীনদেশ কোথায়? বর্তমান চীনদেশ, না মঙ্গোল-জাতীয় লোকের অন্য কোনো দেশ—যেমন নেপাল ভুটান তিব্বত। তারাতন্ত্রে 'হিমবতপার্শ্বে' বলে চীনদেশের ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নেপাল-ভুটান-

তিব্বত অঞ্চল। এই অঞ্চলেই তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছে মনে হয়। হীরানন্দ শাস্ত্রী তাঁর 'তারা-সাধনা'র উৎপত্তি শীর্ষক একটি মূল্যবান নিবন্ধে বলেছেন :

> Regarding the place of origin of Tara or Tara-worship, I am of opinion that we should rather look towards the Indo-Tibetan borderland or Indian Tibet than any other region. (Archaeological Survey Memoir, No. 20; The Origin and Cult of Tara, p 15)

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীও এই মত সমর্থন করেন। বাগচী 'সম্মোহ-তন্ত্রে'র পুঁথি থেকে নীলোগ্রতারা বা নীলসরস্বতীর উৎপত্তির কাহিনী উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,—'চোলনামঃ মহাহ্রদঃ'—ইত্যাদি উক্তির 'চোল' কথার সঙ্গে হ্রদ অর্থে মঙ্গোলিয়ান 'কোল' 'কুল' কথার সম্পর্ক দেখে মনে হয় কোনো মঙ্গোল অঞ্চল থেকেই তারাদেবীর উৎপত্তি হয়েছে।[২]

এইবার দেখা যাক, মূলত 'তারা' কাদের উপাস্য দেবী ছিলেন, হিন্দুদের না বৌদ্ধদের? বৌদ্ধ 'সাধনমালা'য় মহাচীনতারার দুটি সাধন আছে। একটি ধ্যানে এই রূপকল্পনা করা হয়েছে :

প্রত্যালীঢ়পদাম্ ঘোরাম্ মুণ্ডমালাপ্রলম্বিতাম্।
খর্বলম্বোদরাম্ ভীমাম্ নীলনীরজরাজিতম্॥
ত্র্যম্বকৈকমুখাম্ দিব্যাম্ ঘোরাট্টহাসভাস্বরাম্।
সুপ্রহৃষ্টাম্ শবারূঢ়াম্ নাগষ্টকবিভূষিতাম্॥—ইত্যাদি।

'সাধনমালা'য় মহাচীনতারার এই ধ্যানের সঙ্গে 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের তারার ধ্যান মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তন্ত্রসারের ধ্যান এই :

প্রত্যালীঢ়পদাম্ ঘোরাম্ মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্বাম্ লম্বোদরীম্ ভীমাম্ ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাম্ কটৌ॥
নবযৌবনসম্পন্নাম্ পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাম্ লোলজিহ্বাম্ মহাভীমাম্ বরপ্রদাম্॥—ইত্যাদি।

দুটি ধ্যানের আশ্চর্য মিল আছে। সাধনমালার ধ্যানের ভাষাগত ভুলভ্রান্তি তন্ত্রসারের ধ্যানে সংশোধন করে নতুন দু-চারটি লাইন যোগ করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া বৌদ্ধ মহাচীনতারা ও হিন্দু তারার ধ্যানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

---

২ P. C. Bagchi: Studies in the Tantras, Pt. I. p. 44.

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাই বলেছেন যে, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মহাচীনতারা ও উগ্রতারাই হিন্দু তান্ত্রিকদের তারায় পরিণত হয়েছেন :

> This Ugratara or Mahacinatara of the Buddhists has been incorporated by the Hindus in their Pantheon under the name of Tara and the latter count her among the ten Mahavidya goddesses. (The Indian Buddhist Iconography : Ch. 6. p. 76-78).

সাধনমালার ভূমিকাতেও (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৩৫-৩৮) তিনি তন্ত্রসারের তারা-ধ্যানের বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছেন যে, 'পিঙ্গোগ্রৈকজটাং' ও 'অক্ষোভ্যদেবী-মূর্ধণ্য' প্রভৃতি বর্ণনা থেকে 'একজটা' ও 'অক্ষোভ্য' সম্বন্ধে যে হদিশ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা 'একজটা' এবং তাঁর মাথায় অক্ষোভ্য মূর্তি। হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে অক্ষোভ্য বা একজটার অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধদের 'একজটা' নামে এক দেবী আছেন, তিনি উগ্রতারা, মহাচীনতারা ইত্যাদি নামেও খ্যাত। বাগচী বলেছেন যে, 'অক্ষোভ্য দেবীমূর্ধণ্য' কথা থেকে তারার বৌদ্ধ উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। তাহলে তারা-সাধনা সম্বন্ধে এইটুকু জানা গেল যে, তারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী এবং বৌদ্ধতন্ত্র থেকে তারা হিন্দুতন্ত্রের আরাধ্যাদেবী হয়েছেন। এই তারা-সাধনার উৎপত্তি হয়েছে ভোটদেশে, তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে। বাঙালীর সংস্কৃতিতে এটি একটি বিশিষ্ট 'মঙ্গোলয়েড ট্রেট' বা মঙ্গোল উপাদান।[৩]

৩ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার দেবী 'তারা' সম্বন্ধে তাঁর একটি গবেষণাপত্রে বলেছেন : "It may be mentioned here that the goddess Tara appears to have been originally worshipped by some aboriginal people (probably of Eastern India) and was adopted in both the Brahmanical and Buddhist pantheons in the early centuries of the Christian era. Several goddesses, including a few Mongoloid ones, merged in Tara in the course of time." (*The Sakti Cult and Tara* : D. C Sircar ed, Calcutta University, 1967, p. 133). এই সংকলনগ্রন্থে N. N. Bhattacharya লিখিত 'Chinese Origin of the Cult of Tara' প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৭) দ্রষ্টব্য।

এখন প্রশ্ন হল, কোন সময় তারাসাধনার উৎপত্তি হয়েছে এবং তারাপীঠেই বা কখন হয়েছে? "আর্যনাগার্জুনপাদৈর্ভোটেষু উদ্ধৃতম"—আর্য নাগার্জুন ভোটদেশ থেকে এই তারা-সাধনার পুনরুদ্ধার করেছিলেন। নাগার্জুনের কাল আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী। এই সপ্তম শতাব্দেই হর্ষবর্ধন ও কামরূপের ভাস্করবর্মণ বাংলার শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এই সময় তিব্বতের রাজা স্রঙ-সন-গ্যাম্পো ভারতে (বিহার পর্যন্ত) অভিযান করেন এবং আসাম নেপাল দখল করেন। তিব্বত ও আসামের সঙ্গে এই সপ্তম শতাব্দেই বাংলার (গৌড়-রাঢের) সাংস্কৃতিক সংঘাত হয় এবং সেই সংঘাতের ফলেই তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান নবজীবন লাভ করে। এই সময়ই বৌদ্ধতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয় বলে মনেহয়, বিশেষ করে তারা-সাধনার। তারপর অরাজকতার শেষে পালযুগের শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির মধ্যে পূর্ণবিকাশ হয় বৌদ্ধতন্ত্রের এবং মনে হয় তারা-সাধনারও। যে-অঞ্চলে বৌদ্ধতন্ত্রের বিকাশ হয় তার মধ্যে বীরভূমের এই অঞ্চল অন্যতম—উত্তর-পূর্ব-অঞ্চল। চণ্ডীপুর-তারাপুর ও তারাপীঠ এই অঞ্চলের সীমানার মধ্যেই অবস্থিত। তারা-সাধনার অন্যতম কেন্দ্র এই অঞ্চল হয়ত সপ্তম-অষ্টম খ্রীস্টাব্দে থেকেই ছিল। পরে হিন্দুতন্ত্রের তারাসাধনার যুগে সিদ্ধ নাগার্জুনের ভোটদেশ থেকে তারাসাধনা পুনরুদ্ধারের কাহিনী যোগ করা হয়েছে। মূল কাহিনীর কাঠামো ঠিক আছে। কেবল নাগার্জুনই হয়ত বশিষ্ঠ হয়েছেন। ঐতিহাসিক কাহিনী রূপান্তরিত হয়ে ইতিহাসে এইভাবেই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়।

সুপুর। বোলপুর। সুরুল

কাহিনী কিংবদন্তীর আবরণের তলায় সুপুরের অতীত ইতিহাস চাপা পড়ে রয়েছে, অন্যান্য আরও অনেক গ্রামের মতো। পুরাতন জেলা গেজেটিয়ার, 'বীরভূম বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থে কাহিনীগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে আমরা তার প্রাসঙ্গিক বিবরণ দেব। একটি কিংবদন্তীর নায়ক আনন্দচাঁদ গোস্বামী। এই ব্যক্তি এই অঞ্চলে আঠার শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন, মারাঠা বর্গীদের হাঙ্গামার সময়, অর্থাৎ প্রায় ২৫০ বছর আগে। বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় গৌরবর্ণ ইত্যাদি সবই তিনি ছিলেন, যা না থাকলে সুপুরুষ বা সাধুপুরুষ হওয়া যায় না এবং স্বভাবতই তিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক ছিলেন, সাক্ষাৎ একেবারে ক শ্রীচৈতন্যের অবতার। এই আনন্দচাঁদ নাকি বৈষ্ণবচূড়ামণি হওয়া সত্ত্বেও মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু কাদের সাহায্যে অথবা কি 'অহিংস' উপায়ে তা ঈশ্বরই জানেন। এছাড়া আনন্দচাঁদের সঙ্গে আরএকটি কাহিনীও জোড়া হয়েছে, সেটি মুসলমানদের নিয়ে। পাশের গ্রামের এক খোঁড়া মুসলমান জমিদার একদিন একটি বাঘের পিঠে চড়ে আনন্দচাঁদকে দর্শন করতে আসেন। আনন্দচাঁদ তখন একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ মুসলমান জমিদারকে দেখার পর তাঁর পাঁচিলটা সড়সড় করে সাপের মতো চলতে আরম্ভ করে। এটা অবশ্যই তাঁর অলৌকিক শক্তির গুণে। অতঃপর ঘরে গিয়ে গোস্বামী জমিদারকে ডেকে পাঠান। জমিদার তাঁর অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা হেঁট করে গ্রামে ফিরে যান এবং গোস্বামীর কথা অনেককে বলেন। গল্প শুনে একজন অতিশয় ধর্মান্ধ মুসলমান গোস্বামীর অলৌকিকত্ব যাচাই

করার জন্য একপাত্র গোমাংস কাপড়চাপা দিয়ে নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু গোস্বামীর মন্ত্রবলে গোমাংস পদ্মফুলে পরিণত হয় এবং ধর্মান্ধ মুসলমানটি তাই দেখে বিস্মিত হয়ে দণ্ডবৎ করে ফুলের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ফিরে যান। তারপর আনন্দচাঁদ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচারিত হয়।

কাহিনীগুলি শিশুচিত্ত অপহরণের মতো খুবই রোমাঞ্চকর সন্দেহ নেই, কিন্তু বুনোট অত্যন্ত আলগা বলে ভয়ানক বিসদৃশ মনে হয়। সুপুরে গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়ের সেবা হয়। তাছাড়া শক্তিসাধক ব্রজকিশোর ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত কালী ও শিবমন্দিরও আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবদেবী উভয়েই পাশাপাশি বিরাজ করছেন, কার মাহাত্ম্য বেশি বা কম তা নিয়ে ভক্ত বা ভগবান কেউ মাথা ঘামান না।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী হল, সুরথ নামে এক রাজার রাজধানী সুপুর। সুরথ কর্নাট দেশ জয় করার জন্য অভিযান করে ব্যর্থ হন। দেশে ফিরে এলে প্রজারাও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে শক্তিসাধনা করে ভবানীর কৃপায় স্বরাজ্য সুপুর তিনি ফিরে পান। ভবানীপূজায় লক্ষ পাঁঠাবলি হয়। এই বলির জন্যই এখানকার নাম হয় 'বলিপুর' এবং এই বলিপুর নাম থেকেই 'বোলপুর' নাম হয়। সে যাই হোক সুরথ রাজা কে তা জানা যায়নি। স্থানীয় লোককাহিনীতে সুরথকে একজন অত্যাচারী জমিদার বলা হয়েছে। অত্যাচারিত নরনারীর প্রেতাত্মাগুলি একবার প্রতিশোধ নেবার জন্য সুরথের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লে দেবী চণ্ডীর আবির্ভাব হয় এবং লক্ষ বলি দিয়ে সুরথ সেই দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন।[১]

কিংবদন্তীর মধ্যে সত্যের কঙ্কাল যাই থাকুক, সুপুর প্রাচীন গ্রাম এবং বোলপুরের অনেক আগে বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল বোঝা যায়। সুরথের নামে গ্রামে সুরথেশ্বর শিব আছেন। কয়েকটি দেবদেবীর মূর্তিও গ্রামে পাওয়া গিয়েছে। লোকপ্রবাদ এই যে সাতটি 'স' (শ) নিয়ে সুপুর। এই সাতটি স-শ হল: ১. সুরথেশ্বর শিব। ২. আনন্দচাঁদের শ্যামরায়। ৩. সুবিক্ষা দেবী অর্থাৎ চণ্ডী। ৪. শাঁতার অর্থাৎ পুকুর। ৫. সুন্দরায় অর্থাৎ গ্রাম দেবতা ধর্মরাজ। ৬. শ্মশানকালী এবং ৭. সা-পীর অর্থাৎ মুসলমানদের পীর। লক্ষণীয় হল, এই সাতটি স-শ-এর মধ্যে স্থানিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, একমাত্র 'পুকুর' ছাড়া। শিব আছেন এবং অন্যান্য আরও অনেক স্থানের মতো স্থানীয় রাজা-জমিদারের নামে

১ এমনও হতে পারে যে এই লক্ষ বলি পাঁঠা-বলি নয়, অত্যাচারী রাজা-জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী প্রজা-বলি এবং সেই 'বলি' থেকেও বলিপুর—বোলপুর নাম হয়ে থাকতে পারে।

তিনি সুরথেশ্বর নামে পরিচিত। চণ্ডী অন্যতম গ্রামদেবতা। 'সুহ্ম' রাঢ়েরই প্রাচীন নাম, কাজেই ধর্মঠাকুরের নাম সুহ্ম রায়। শ্মশানকালীও আছেন এবং বীরভূমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের পীরও আছেন। আর বৈষ্ণব আনন্দচাঁদের শ্যাম রায় তো থাকবেনই, কারণ তা না হলে ধর্মের ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

বোলপুর

বোলপুরের সমস্ত খ্যাতি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মকীর্তির জন্য। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের জন্য। তার আগে বোলপুর অতিসাধারণ একটি গ্রাম ছিল, সুপুর-সুরুলের খ্যাতি ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। কোনো শক্তি দেবীর পূজায় বলিদানের প্রাচুর্যের জন্য বলিপুর এবং বলিপুর থেকে বোলপুর নাম হয়েছে কিনা বলা যায় না। তবে বলিপুর নামে গ্রাম এখনও বোলপুরের পাশেই আছে। ক্যাপ্টেন শেরুইলের রিপোর্টে দেখা যায়, উনিশ শতকের মধ্যভাগে বোলপুরে ('the Village of Balpoor') ১৬-১৮টার মতো কাঁচা কুঁড়েঘর ছিল এবং ২৯টা গরু, ২৬টা বলদ ও ৪৭টা লাঙল ছিল। বোঝা যায়, প্রধানত অনুচ্চবর্ণের চাষীদের বাস ছিল বোলপুরে। তারপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে ধীরে ধীরে ধান-চাল-বাণিজ্য-প্রধান নগর হয়ে উঠল বোলপুর এবং দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপনের পর তার প্রাধান্য ক্রমে আরও বাড়তে লাগলো।[২]

রায়পুরের প্রতাপশালী সিংহ-পরিবারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সেই সূত্রেই তিনি বীরভূমের এই অঞ্চলে আসেন। বোলপুর ছিল ভুবনমোহন সিংহের জমিদারী এবং তিনি তা পত্তনিবিলি করলেও পাশের অনেকটা প্রান্তর খাসে রেখেছিলেন, সেখানে নিজের নামে একটি গ্রাম পত্তনের জন্য। তাঁর নামে বোলপুরের একাংশের নাম হয় ভুবনডাঙা। ভুবনডাঙায় বাস ছিল ডাকাতের দলের। বিশাল ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে দুটি মাত্র গাছ ছিল, তার মধ্যে একটি ঐতিহাসিক ছাতিম গাছ, দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনার স্থান। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিতে লিখেছেন :

২ শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় 'Growth of Bolpur Town in the District of Birbhum' প্রবন্ধে বোলপুরের নাগরিক বিকাশ সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন (District Census Handbook—Birbhum, 1961, Appendix III.

"এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁহার নির্জন সাধনার উপযুক্ত জায়গা বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তারপর হইতে ঐ ছাতিমগাছ তলায় মাঝে মাঝে তাঁহার তাঁবু পড়িতে লাগিল। শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। বোলপুর হইতে নানাগ্রামে পথ গিয়াছে, পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারিদিক জনশূন্য। ডাকাইতের পক্ষে এরূপ উপযুক্ত জায়গা আর হইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিমগাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুতিয়া রাখিয়াছিল তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধরা দিল; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল। যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, তাহাই হইল পরম আশ্রয়ের জায়গা- আশ্রম।"

১৮৭৩ সালে, দ্বাদশ বছর বয়সে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম বোলপুরে পদার্পণ করেন, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন: "সন্ধ্যার সময় বোলপুরে পৌঁছিলাম। পাল্কীতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম, একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এই আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে। পরদিন যাহা দেখিলাম তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিকচক্রবালে একটি মাত্র নীল রেখার গণ্ডী আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।...বোলপুরে যখন কবিতা লিখিলাম তখন বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাতা ভরাইতে ভালবাসিতাম। এটাকে বেশ কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইত।"

ছাতিমতলায় দেবেন্দ্রনাথের সাধনস্থান (কাঁচঘর) সম্বন্ধে ১৯০১ সালে জে. সি. ওমান একজন বাঙালীর কথা উদ্ধৃত করে লিখেছেন:[৩]

> The sanctuary or chapel is a marvellous edifice The roof is tiled, but the enclosure is of glass, some painted and some coloured. The Crystal Palace, London, is a glass house. We have not heard of any other house besides it made of glass. Although in magnitude the Shantiniketan

৩ Unity and Minister. 13 October, 1901 : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্ধৃত, ১৫ খণ্ড তৃতীয় ভাগ।

sanctuary cannot be compared with the famous Crystal Palace, it gives the people some idea as to what sort of edifice the latter is. It undoubtedly is an attraction to the villagers, who come to see it in large numbers. This glass hall is about 60 feet long and about 30 feet broad. The pavement is of white marble···There is a holy of holies in the sanctuary, the spot where Debendra Nath used to practise *Yoga* under a great *chittim* tree. Here stands a small elevated seat made of white marble—the *Vedi*—upon which, lost in contemplation, the minister used to hold communion with God. The *Vedi* is deemed so sacred, that no one but the Master has ever presumed to occupy it. The *chittim* tree at Bolpur is in the belief of Debendra Nath's followers destined to become in after years as famous as the Bodhi tree in Bodh Gaya."

দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসাধনার পবিত্রস্থান শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা ভবিষ্যতে গৌতম-বুদ্ধের বোধিবৃক্ষের তুল্য মর্যাদা লাভ করবে, ব্রাহ্মধর্মানুরাগীদের এই বিশ্বাস।

১৮৮৮ সালে পার্ক স্ট্রীটে থাকতে দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্য ট্রাস্টডীড করে উৎসর্গ করে দেন। ট্রাস্টডীডে আছে যে প্রতি বছর '৭ই পৌষ' তাঁর দীক্ষাদিনে (ব্রাহ্মধর্মে) শান্তিনিকেতনে উৎসব হবে এবং এই উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসবে। এই মেলাই 'শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা' নামে পরিচিত। আশ্রমের বিধিনিষেধের মধ্যে প্রধান হল: কোনো ধর্ম বা মানুষের উপাস্য দেবতার কোনো প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এই স্থানে হবে না এবং আশ্রমে আমিষ ভোজন ও মদ্যপান চলবে না। ট্রাস্টডীডে উল্লেখ আছে যে এই আশ্রমে একটি ভাল গ্রন্থাগার ও ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ১৯০১ সালে দেবেন্দ্রনাথের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছে শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তা অনুমোদন করেন। ১৯০১ থেকে ১৯১৬ সালের মধ্যে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত প্রান্তর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কুটীরে কুটীরে ছেয়ে যায়। দেবেন্দ্রনাথ তখন মনশ্চক্ষে দেখতে পান, সমস্ত মাঠ ছেলেতে ছেলেতে ভরে গিয়েছে। অনেক টাকা খরচ করে দেবেন্দ্রনাথ একটি কাচের মন্দির এখানে তৈরি করান। লণ্ডনের

ক্রিস্টাল প্যালেসের মতো এই মন্দির, যদিও আকারে ছোট। আগে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যাতে শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের অনন্তত্বের ভাবটি চাপা না পড়ে, সেইজন্য মন্দিরের এই গড়ন এবং তার অনেকগুলি দরজা, যেগুলি মেলে দিলেই চারিদিক একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। মন্দিরটি তিনি দেখে যেতে না পারলেও, তাঁরই নির্দেশ অনুসারে মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথের ট্রস্টডীডের একাংশ এখানে উদ্ধৃত হল :[৪]

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টডীড

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাং জোড়াসাঁকো, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়
সাং মানিকতলা, কলিকাতা
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
পিতার নাম কৃপানাথ মুন্সী
হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা
স্নেহাস্পদেষু
লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
পিতার নাম ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর
সাকিন সহর কলিকাতা জোড়াসাঁকো, হাল সাং পার্ক ষ্ট্রীট

কস্য ট্রষ্টডীড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিষ্ট্রিক্ট রেজেষ্টারী বীরভূম সব-রেজেষ্টারী বোলপুর পুলিস ডিভিজন বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরের পত্তনির ডৌল খাবিজান মৌজে ভুবননগরের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে প্রথম তপশীলের লিখিত চৌহদ্দির অন্তর্গত

৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭-১৯০৫ : দেবেন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষপূর্তি-উৎসব স্মরণপত্রী : শান্তিনিকেতন, ৭ই পৌষ ১৩৭৪।

আনুমানিক বিশ বিঘা জমি ও তদুপরিস্থিত বাগান ও এমারত যাহা এক্ষণে শান্তিনিকেতন নামে খ্যাত আছে ঐ বিশ বিঘা জমি আমি সন ১২৬৯ সালের ১৮ ফাল্গুন তারিখে শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংদিগের নিকট হইতে মৌরসি পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি বাগান একতলা ও দোতলা ইমারত প্রস্তুতপূর্বক মৌরসি-স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার আছি। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ও অত্র ট্রষ্টডীডের লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থে আমি উক্ত শান্তিনিকেতন-নামক সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর হক হকুক যাহা কিছু আছে ও যাহার মূল্য আনুমানিক ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা হইবেক ঐ সমুদায় সম্পত্তি তোমাদিগকে অর্পণ করিয়া ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতেছি যে, তোমরা ট্রষ্টী স্বরূপে স্বত্ববান হইয়া স্বয়ং ও এই ডীডের সংমত স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে চিরকাল এই ডীডের উদ্দেশ্য ও কার্য্য পশ্চাৎলিখিত নিয়ম-মতে সম্পন্ন করিয়া দখলীকার থাকিবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারীবর্গ বা স্থলাভিষিক্তগণের ঐ সম্পত্তিতে কোনো স্বত্ব-দখল রহিল না। উক্ত সম্পত্তি চিরকাল কেবল নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে।···উক্ত শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন, গৃহের অভ্যন্তরে উপাসনা করিতে হইলে ট্রষ্টীগণের সম্মতি আবশ্যক হইবেক, গৃহের বাহিরে এরূপ সম্মতির প্রয়োজন থাকিবেক না। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোনো সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশুপক্ষী মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোনো চিহ্নের পূজা বা হোমযজ্ঞাদি ঐ শান্তিনিকেতনে হইবে না। ধর্ম্মার্থে বা খাদ্যের জন্য জীবহিংসা বা মাংস-আনয়ন বা আমিষভোজন বা মদ্যপান ঐ স্থানে হইতে পারিবে না। কোনো প্রকার অপবিত্র আমোদ-প্রমোদ হইবে না। ধর্মভাব-উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্ম্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোনপ্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিৎ আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সকপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে। যদি কালে এই মেলার দ্বারা কোনো রূপ আয় হয় তবে ট্রষ্টীগণ ঐ আয়ের টাকা মেলার কিম্বা আশ্রমের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন। এই ট্রষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে

উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিয়া দিবেন এবং ঐ আশ্রমধর্ম্মের উন্নতির বিধায়ক সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।…ইতি সন ১২৯৪ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
বৈশাখ ১৮১০ শকাব্দ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্রমে ১৯০১ সালের ব্রহ্মবিদ্যালয় ১৯২১ সালে 'বিশ্বভারতী' বিদ্যায়তনে পরিণত হয়েছে এবং তার মধ্যে বোলপুরের (town) লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০০ থেকে ৬০০০ হয়েছে। ১৯৪১ সালের মধ্যে বোলপুরের (town) লোকসংখ্যা হয়েছে প্রায় ১৪,০০০, ১৯৬১ সালে ২৬,০০০ এবং বর্তমানে প্রায় ৩৫,০০০। প্রধানত বাণিজ্য-প্রধান নগর বোলপুর এবং বণিকদের মধ্যে প্রধান অবাঙালীরা। সংস্কৃতিতীর্থ শান্তিনিকেতনের (যদিও ট্রস্টডীড অনুসারে ধর্মতীর্থ বলাই সঙ্গত) শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে সমতালে। প্রতি বছর ট্রস্টডীড অনুসারে পৌষ উৎসব হয়, মেলা হয়, তবে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা এসে সেখানে ধর্মবিচার ধর্মালাপ করেন কি না তা বর্তমান ট্রাস্টীরাই জানেন। বহুরকমের জ্ঞানবিদ্যাভবন অতিথিগৃহাদি নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সমাবর্তন উৎসব, পৌষ উৎসব, বসন্ত উৎসব, পল্লী-সংগঠন শ্রীনিকেতন, কারুশিল্প, নৃত্যগীত চিত্রকলা ভাস্কর্য প্রভৃতি নিয়ে বর্তমান সংস্কৃতিতীর্থ শান্তিনিকেতন এবং বর্তমান বাণিজ্যনগর বোলপুরের যে অভিনব সমাবেশ ও সহাবস্থান, তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় যে বিচিত্র সংস্কৃতি-বাণিজ্যের (cultural commerce এবং commercial culture) অভ্যুত্থান ও অগ্রগতি, তা সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সেই ছাতিমতলা আর কাচের মন্দির অথবা 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' অথবা রবীন্দ্রনাথের সেই 'তপোবনের' শিক্ষাদর্শ থেকে বর্তমান শান্তিনিকেতন অনেক অ নে ক দূরে।

সুরুল

শান্তিনিকেতন-বোলপুরের মতো সুরুলের সাংস্কৃতিক অথবা বাণিজ্যিক আভিজাত্য নেই, কিন্তু তার ঐতিহাসিক প্রাচীনতা অনেক বেশি, যদিও বর্তমানে সুরুল একটি অনাদৃত উপেক্ষিত গ্রাম ছাড়া কিছু নয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের মধ্যে সুরুলে অন্তত পঁচিশবার গিয়েছি কিন্তু তার ক্রমাবনতি ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন

লক্ষ্য করিনি। সুরুল অনুচ্চবর্ণ-প্রধান গ্রাম, খুব সুসংবদ্ধ নয়, কিছুটা বিক্ষিপ্ত, বেশ বড় গ্রাম। বাগদি বাউরি হাড়ি ডোম ছাড়া তাঁতি ও অন্যান্য কারুশিল্পীদের বাস আছে গ্রামে, ব্রাহ্মণরাও কিছু আছেন যদিও সংখ্যায় অল্প। সুরুলের জমিদার সরকার-পরিবারও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নন। মনেহয় বীরভূমের আরও অনেক গ্রামের মতো সুরুল একটি বাগদি-বাউরি-হাড়ি-ডোম-প্রধান নগণ্য গ্রাম ছিল, পরে সরকারেরা এখানকার জমিদার হয়েছেন। তাঁদের উপাধি বৃত্তিগত, বর্ণগত নয়, তাঁরাই ব্রাহ্মণাদি পরিবারকে গ্রামে স্থাপন করেছেন, সামাজিক কাজকর্ম সাধনের জন্য এবং সুরুল গ্রামের বর্তমান পত্তন-গড়ন ঘটেছে প্রায় দুশো বছর আগে, ইংরেজদের রাজত্বকালে।

১৭৮২ সালে জন চীপ (John Cheap) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট হয়ে বীরভূমে আসেন এবং সুরুল গ্রামটিকেই তাঁর বসবাসের কেন্দ্র করেন। প্রায় ৪১ বছর, ১৮২৩ সাল পর্যন্ত, রেসিডেণ্টের পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যযুগীয় দুর্গের মতো একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে তিনি সম্রাটের মতো সুরুলে বাস করতেন। তাঁর বাসগৃহটি ঠিক কোথায় ছিল সঠিক বলা যায় না এখন, কিন্তু এখানে যে তাঁর একাধিক বাণিজ্যকুঠি ছিল তার একটির জীর্ণ নিদর্শন এখনও শ্রীনিকেতনের 'ফ্যামিলি অ্যাণ্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ট্রেনিং সেণ্টারে'র সীমানার মধ্যে আছে। 'চীপ সাহেবের কুঠি' নামে এখনও এই স্থানটি পরিচিত। চীপ সাহেব রেসিডেণ্ট হিসেবে কেবল যে কোম্পানির টাকা লগ্নি খাটিয়ে ব্যবসা করতেন তা নয়, তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে এই অঞ্চলে নীলচাষ প্রবর্তন করেন, বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি এনে চিনির কল স্থাপন করেন এবং কয়েকটি বাণিজ্যকুঠিও গড়ে তোলেন। স্থানীয় কারুশিল্পীদের সহযোগিতায় তিনি কুঠিতে নানারকমের জিনিস তৈরি করতেন এবং তাঁর হাউসের জিনিসে তাঁর নাম খোদাই করা থাকত। তাঁর মৃত্যুর পরেও (১৮২৮) প্রায় ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তাঁর কুঠিতে কাজ চলত এবং জিনিসপত্রে তাঁর নাম খোদাই করা থাকত। ৬২ বছর বয়সে ১৮২৮ সালে চীপ সাহেবের মৃত্যু হয়। সিউড়ি থেকে ১১ মাইল পুবে গনুটিয়ায় (রেশমকুঠি ছিল) তাঁর সমাধি আছে।

জন চীপ সাহেব সুরুল-তথা-বীরভূম এই অঞ্চলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁর কুঠিতে কাছারী বসত, গ্রামবাসীদের সমস্ত অভাব-অভিযোগের বিচার হত এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী সকলে হেঁট হয়ে মেনে নিত। এ্যাকে সাহেব, তার উপর যে-সে সাহেব নন। স্থানীয় লোকের কুঠিতে কাজ, পথঘাট তৈরির কাজ, ভৃত্যের কাজ,

কারিগরী কাজ, সবই চীপ সাহেবের কৃপায় হত। পাল্‌কিতে চড়ে চীপ সাহেব যখন গ্রামে যেতেন, তখন দরিদ্র গ্রামবাসী ছেলেমেয়েবুড়োরা পাল্‌কির পিছনে দৌড়ত, মায়েরা শিশুদের তুলে ধরে সাহেব-দর্শন করাত, কারণ তাতে শিশুর মঙ্গল হবে। ভদ্রলোকরা তাঁকে 'Cheap the Magnificent' বলতেন এবং সাধারণ মানুষ বলত 'মহাত্মা'। প্রসঙ্গত ডেভিড হেয়ারের (তিনিও 'মহাত্মা') কথা মনে হয়। এইভাবে আমাদের দেশে অনেক 'মহাত্মা' ব্যক্তির অভ্যুদয় হয়েছে, এবং এই 'Process of Mahatmaization' আমাদের সামাজিক ইতিহাসের একটি ভাল অনুসন্ধানের বিষয়। অসহায় অশিক্ষিত অতিগরিবের দেশে যেকোনো 'ক্ষমতা' (power) থাকলে, আর্থিক ক্ষমতা তো বটেই, যে-কেউ 'মহাত্মা' হতে পারেন।

সুরুল গ্রামের পত্তন চীপ সাহেব করেননি, তাঁর আসার আগেই সুরুল গ্রামের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু গ্রামটি ছিল একটি সাধারণ গ্রামের মতো এবং সেখানে অনুচ্চবর্ণের লোকজনেরই বাস ছিল বেশি। গ্রামের বর্তমান গড়ন, জনবিন্যাস সহ, প্রধানত চীপ সাহেবের আমলেই রূপায়িত হয়েছে। গ্রামের জমিদার সরকার-বংশের প্রতিষ্ঠাও এইসময় থেকে হয়েছে মনে হয়। 'সরকার' উপাধি থেকে মনে হয় যে চীপ সাহেবের বাণিজ্যকুঠিতে এই বংশের পূর্বপুরুষেরা সরকারের কাজ করতেন। সাহেববাড়িতে পারিবারিক সরকারের কাজ করে কলকাতা শহরে তো বটেই, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কতজন যে ধনিক জমিদার, এমনকি রাজা-মহারাজা খেতাবধারী হয়েছেন তা ঐতিহাসিকরা জানেন। সুতরাং সুরুল গ্রামে সরকারদের বিশাল অট্টালিকা, পূজামণ্ডপ, একাধিক সুন্দর মন্দির, বড় বড় দীঘি ও পুষ্করিণী প্রভৃতি দেখে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বর্তমানে অবশ্য সরকার-পরিবারের উত্তরপুরুষদের, স্বাভাবিক কারণেই এবং ঐতিহাসিক নিয়মেই, আগেকার সেই ঐশ্বর্য বা ধনগৌরব কিছুই নেই, যেমন আরও অনেক প্রাচীন পরিবারের নেই। এই পরিবারের অনেকে এখন শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনে কাজ করেন। জমিদার হিসেবে সরকাররাই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের এই গ্রামে এনে বসতির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের একদা-সমৃদ্ধির চিহ্ন অট্টালিকা ও দেবালয়ের মধ্যে এখনও দেখা যায়। এছাড়া সুরুলে বাকি লোকজনের অধিকাংশের মধ্যে দারিদ্র্যের ছাপ গভীর এবং সাধারণভাবে সুরুলকে দরিদ্রপ্রধান গ্রাম ছাড়া কিছু বলা যায় না।

সুরুল গ্রামের দেবালয়গুলি অধিকাংশই এখনও সুরক্ষিত এবং দেয়ালের পোড়ামাটির কারুকার্যও প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। কয়েকটি মন্দিরের ফলক থেকে জানা যায়, অধিকাংশ মন্দির ১৮৩০ সালে তৈরি, চীপ সাহেবের মৃত্যুর দু-তিন বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ মন্দির শিবমন্দির, একটি মনসামন্দির, আর-একটি লক্ষ্মী-জনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির। রাম রাবণের যুদ্ধ, রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রভৃতি গতানুগতিক বিষয়ই মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ইটের ভাস্কর্যে রূপায়িত। কিন্তু বিশেষ উল্লেখ্য হল, মন্দিরের গায়ে সাহেব মেমদের চিত্রগুলি। কয়েকটি চিত্রে তীক্ষ্ণ সামাজিক বিদ্রূপের বিষয়ও প্রতিফলিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মেমসাহেবের সামনে গললগ্নীকৃতবাস দণ্ডায়মান একটি গর্দভের চিত্র। অর্থাৎ একশ্রেণীর বাঙালীর (মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক) সাহেবভজনের দৃষ্টান্ত

সুরুলের মন্দিরের একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হল, চুনবালির পলেস্তারার নিচে ইটের উপরে মন্দিরের গায়ে বাংলা অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি। মনে হয় যে মোটা নরুন দিয়ে খোদাই করা। প্রত্যেকটি ইটের উপর মিস্ত্রিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথায় ইট বসবে, কিভাবে গাঁথা হবে। মিস্ত্রিদের জন্য ইটের উপর খোদাই-করা এরকম নির্দেশ আর কোনো মন্দিরে আছে কিনা জানা যায়নি। বোঝা যায় মন্দির গঠনের অনেক আগে, প্রধান সূত্রধরশিল্পী (Master Builder) তার পরিকল্পনা করতেন এবং মন্দিরের দেয়ালে ইটের ভাস্কর্যের জন্য নির্দেশ দিয়ে দিতেন, এমনকি ইটগুলি দেয়ালে কোথায় কিভাবে গাঁথা হবে, তারও নির্দেশ দিতে   তেন না। শ্রীমুকুলচন্দ্র দে এ বিষয়ে লিখেছেন :

At Surul, on the brick work itself under the lime plaster facade, is found some early handwriting in Bengali, written as if with a thick needle. On each brick were written instruction to the builders of the temple, giving the location of the brick and a number. The discovery of the masons' marks clearly indicates that the temples, or at least the fronts with their terracottas, were planned before the construction of the buildings commenced. Each brick was made according to

a chart and placed together according to the plan of the master-builder. It should be emphasized that these bricks were not those of the terracottas themselves. This adds greater interest to the study of temples, for it shows that the artisans were anxious, as far as the facade was concerned, to produce a perfect work of art and architecture. (Mukul Dev. Birbhum Terracottas).[১]

বাংলার মন্দির স্থাপত্যের বিশেষত্ব বুঝতে সুরুলের মন্দিরগাত্রের এই নির্দেশাঙ্কিত ইঁটগুলি নতুন পথের নির্দেশ দেবে।

---

১ আগে সুরুল গ্রামের মন্দিরগুলি দেখলেও এই লেখাগুলি আমি লক্ষ্য করিনি। মুকুলচন্দ্র দে'র লেখা পড়ার পরে আমি আবার সুরুলে যাই (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)। লেখাগুলি এখনও আছে দেখা যায়। —লেখক

পান্নড়ে। ইটাগড়িয়া

পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকরদের দেখলে বোঝা যায়, সমাজ-জীবন ও আর্থিক-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চিত্রকরদের নানাশ্রেণীর লোকশিল্পীরা কিভাবে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছেন। বীরভূমের চিত্রকরদের অস্তিত্ব আজ প্রায় বিলুপ্ত বলা চলে (১৯৫৩-৫৪)। বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কায়ক্লেশে যে কয়েকঘর চিত্রকর বীরভূম জেলায় জীবনধারণ করেছিলেন, আজ তারা জীবিত থাকলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে তাঁদের বংশানুক্রমিক পেশার পরিবর্তন ঘটছে। বীরভূম মেদিনীপুর বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যেখানে চিত্রকরদের বিচ্ছিন্ন বিরল বসতি আজও আছে, সর্বত্রই প্রায় একই লক্ষণ দেখা যায়।

বীরভূমের কথা বলি। সিউড়ি থেকে মাইল পাঁচ-৬ দূরে পান্নড়ে গ্রাম। এই পান্নড়ে গ্রামেই গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ছবিলাল চিত্রকরের সন্ধান পেয়েছিলেন।[১] তখন ছবিলালরা চিত্রাঙ্কন ও চিত্রপ্রদর্শনবিদ্যার অভ্যাস ছাড়েননি। ছবিলালই তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা বিশ্বকর্মার বংশধর। কুপিত ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে তাঁরা পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু চিত্রবিদ্যার চর্চা ছাড়েননি। একালে চিত্রবিদ্যার চর্চাও তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন। কার অভিশাপে? ব্রাহ্মণের অভিশাপ একালে ফলে না। দারিদ্র্যের চাপে পান্নড়ে গ্রামের চিত্রকররা আজ চাষ করছেন, মজুর খাটছেন, মিস্ত্রীগিরি করছেন। পূর্বপুরুষদের পেশা তাঁরা ভুলে গিয়েছেন।

১ গুরুসদয় দত্ত: পটুয়া সঙ্গীত (পরিচায়িকা)।

Journal of Indian Society of Oriental Arts, Vol I, No 1, June 1933 "The Indigenous Painters of Bengal" by G. S. Dutt.

পাসুড়ের চিত্রকররা আরও কয়েকটি গ্রামের সন্ধান দিলেন। অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে কুনরী স্টেশনে নেমে প্রায় দুই মাইল দূরে ইটাগড়িয়া গ্রাম। সিউড়ি থেকে মাইল সাত-আট পথ হবে। ইটাগড়িয়ায় কয়েকঘর চিত্রকরের অস্তিত্ব আজও আছে, চিত্রবিদ্যার চর্চা বিশেষ নেই। এই গ্রামে প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধ সুদর্শন চিত্রকরের সঙ্গে দেখা হল। চিত্রপ্রদর্শনবিদ্যা গ্রাম থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, পট আঁকতে বা পুতুল গড়তেও বিশেষ কেউ জানেন না। গ্রামের দু-একজন দরিদ্র বালককে সুদর্শনই অবসর মতো দু-একখানা পট এঁকে দিয়েছেন, তাই দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তারা ভিক্ষা করে বেড়ায়। সুদর্শন নিজে এখন দেবমূর্তি গড়েন, দেয়ালচিত্র আঁকেন এবং সেজন্য মধ্যে মধ্যে তাঁকে কলকাতা শহরেও আসতে হয়। জীর্ণ কুটিরের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাগুলির দিকে দেখিয়ে সুদর্শন বললেন: "কয়েকবছর আগেও প্রায় বিশ-পঁচিশ ঘর চিত্রকর ছিল এই গ্রামে, এখন তারা অভাব-অনটনের চাপে সকলেই প্রায় নির্বংশ হয়ে গেছে। এইরকম গ্রাম বীরভূম জেলায় আমি অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি দেখেছি, প্রত্যেক গ্রামে প্রায় বিশঘর করে পটুয়ার বাস ছিল। এখন গ্রামও অনেক লুপ্ত হয়ে গেছে, পটুয়ারা তো গেছেই। আগে আমরা পট আঁকতাম, গ্রামের লোক সেই পট কিনে পুজো করত। ঘটেপটে পূজার প্রচলন ছিল তখন বেশি। এখন হাতে-আঁকা ছবির বদলে ছাপানো ছবিতে কাজ চলে যায়। আগে মালাকাররা ছিলেন সাজসজ্জার রূপকার, এখন তাঁরাও পুজোর পট এঁকে দেন, মূর্তিও গড়েন। তাই আজ আমরা ক্রমে পট আঁকা ছেড়ে চাষবাস মিস্ত্রী-মজুরের কাজ করছি। আগে বারোমাসে তের পার্বণের সঙ্গে ছোটবড় অসংখ্য গ্রাম্য মেলা হত সব জায়গায়। এইসব গ্রাম্যমেলাতে আমরা নানারকমের দেবদেবীর পট এঁকে, কাঠের পুতুল গড়ে বিক্রি করতাম। মেলাতে মেলাতে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান গেয়ে যা রোজগার হত তাতেও স্বচ্ছন্দে আমাদের চলে যেত। এখন অধিকাংশ মেলা উঠে গেছে, যা দু-চারটে আছে তাতে রবার প্লাস্টিকের পুতুল আর সস্তা ছাপা ছবির এত আমদানি হয় যে, আমাদের কাঠের পুতুল বা আঁকা পটের দিকে কেউ ফিরেও চায় না। নানারকমের ভেলকিবাজী, সার্কাস ও সিনেমা ছেড়ে কে মেলার মধ্যে আমাদের পটের গান শোনার জন্য সময় নষ্ট করবে?"

বৃদ্ধ সুদর্শনের এই সুন্দর বিবৃতির পর কোনো সমাজবিজ্ঞানীর আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। পরিষ্কার বোঝা যায়, কেন চিত্রকররা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছেন। চিত্রকর জাতিপ্রসঙ্গে "পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণাঞ্চ কোপতঃ" কথার উল্লেখ করতে দেখলাম বৃদ্ধ সুদর্শনের হাসিখুশি মুখখানি গম্ভীর হয়ে গেল। সুদর্শন বললেন: "হ্যাঁ,

ব্রাহ্মণের অভিশাপে সমাজে আমরা পতিত হয়েছি। হিন্দুর মতো পূজার্চনা করি, অথচ মুসলমানদের মতো নমাজ করি কেন, এপ্রশ্ন ছেলেবেলায় আমার মনে হয়েছিল। আমার পরলোকগত পিতাকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। আমার মনে আছে, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আগে আমরা নমাজ করতাম না, নিজেদের হিন্দু বলেই মনে করতাম। কিন্তু হিন্দুরা আমাদের ঘৃণা করতেন এবং সমাজে কোনো স্থান দিতেন না। তখন মুসলমানরা আমাদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেন। দুঃখে ও অভিমানে আমরা তাঁদের ধর্মই গ্রহণ করি। কিন্তু করলে কি হবে, তার আগে হিন্দুসমাজের আচার অনুষ্ঠানে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, তাই অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আজ তাই আমাদের ঐ নমাজটুকু ছাড়া বাকি সব আচারই হিন্দুর মতো। আমাদের মেয়েরা শাখা-সিঁদুর পরে, আমরা হিন্দু দেবদেবীর ছবি আঁকি, পুজো করি অথচ নমাজও পড়ি। আমাদের নমাজটাই হল ব্রাহ্মণের অভিশাপের প্রত্যক্ষ ফল।"

কথায় কথায় বৃদ্ধ সুদর্শন পট আঁকার পদ্ধতিও বললেন। হাতে তৈরি কাগজের উপর প্রথমে লালরঙ (আলতা ইত্যাদি) দিয়ে রেখাচিত্র এঁকে নিতে হয়, তারপর নীলবর্ণে চিত্রায়ণ চলে। কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে তার উপর মাটির সরা ধরলে যে ভুষো জমে, তাতে ভাল কালো রঙ হয়। নারকেলের মালা পুড়িয়েও কালো রঙ তৈরি করা যায়। বীরভূমের নলহাটি অঞ্চলে একরকমের হলুদ মাটি পাওয়া যেত, তাই দিয়ে হলদে রঙ করা চলত। নীলের জন্য 'নীল' তো আছেই। হরিতাল থেকেও রঙ করা হয়। নীল আর হলুদ মেশালেই সবুজ রঙ তৈরি হত। পট আঁকার জন্য রঙের অভাব হয় না। প্রসঙ্গত তিনি বললেন যে তাঁদের ঘরের মেয়েরাও ছবি আঁকতেন। এখন আর আঁকেন না।

আরও একটি কথা সুদর্শন বলেছিলেন। জাতিপ্রসঙ্গে কথাটা উঠল। সুদর্শন চিত্রকর বললেন: "একসময় আমরা সুরাপান করতাম খুব বেশি। দৈনিক শুঁড়ির দোকানে না গেলে আমাদের চলত না। এ অঞ্চলে ধর্মরাজ ঠাকুরের উৎসবের কথা তো জানেন। ধর্মঠাকুরের উৎসবে সুরা অন্যতম উপকরণ। উৎসবের সময় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বড় মাটির জালা বা ভাঁড় বসানো হত এবং সেটি সুরায় পূর্ণ থাকত। জেলে বাউরি হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতের লোকই উৎসবে যোগ দিত বেশি, কিন্তু আমরা চিত্রকররাই সেই সুরাভাণ্ডে সর্বপ্রথম মাল্য দান করতাম।"

সুদর্শন চিত্রকরের কথা প্রণিধানযোগ্য। ধর্মঠাকুর, সুরাভাণ্ডে মাল্যদান, সুরাপান, যমরাজার পট ও গান ইত্যাদির সঙ্গে বীরভূমের চিত্রকরদের এই সম্পর্ক থেকে তাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক উৎপত্তি-পরিণতি সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা

পরিষ্কার হয়। ধর্মঠাকুরের সঙ্গে চিত্রকরের সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে যমপটের, বিশেষ উল্লেখ্য। চিত্রকররা আদিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী নিষাদজাতির কোনো উপশাখা ছিলেন বলে মনে হয়। পরে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন এবং অন্যান্য অনার্য জাতির মতো হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরেই তাঁরা স্থান পান। স্বভাবতঃই যথেষ্ট সামাজিক নির্যাতন ও অবজ্ঞা যুগে যুগে তাঁদের সহ্য করতে হয়। তবু তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও বংশগত পেশা বজায় রাখতে পেরেছিলেন, প্রধানত প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজে, অন্যান্য সকল জাতির মধ্যে, তাঁদেরও একটা ভূমিকা ছিল। তাঁরা পট আঁকতেন, ঘটে ও পটে গ্রামের পূজা হত। গ্রামের মেলাগুলি ছিল সেকালের পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার অন্যতম ক্ষেত্র। মেলায় মেলায় ঘুরে জীবিকা অর্জন করাও তখন সহজ ছিল। মহাভারত রামায়ণ পুরাণকথা গেয়ে গেয়ে তাঁরা হিন্দুধর্ম প্রচারে সাহায্য করতেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপও তাঁদের আঁকা চিত্রপটে ও রচিত গানে ফুটে উঠত। মুসলমান আমলে তাঁরা হিন্দুসমাজের উপেক্ষার জন্য ধর্মান্তরিত হন এবং ইসলামধর্মের প্রচারক গাজী সাহেবরাও তখন তাঁদের পটচিত্রের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে (গাজীর পট)। মনেহয়, চিত্রকররা তার অনেক আগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ-যুগে আত্মনির্ভর গ্রাম্যসমাজের দ্রুত ভাঙনের সময় তাঁদেরও দ্রুত অবনতি হতে থাকে। ক্রমে বিলুপ্তির পথে তাঁরা এগিয়ে যান, আর্থিক সংকটের চাপে।

উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, মোটামুটি এই দুইভাগে বাংলার চিত্রকরদের সমাজকে ভাগ করা যায়। মেদিনীপুরের চিত্রকররা দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমাজভুক্ত। মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণে চব্বিশ-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর মহকুমা পর্যন্ত এই চিত্রকরসমাজের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিস্তৃত। সুন্দরবনের গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত মেদিনীপুরের চিত্রকররা পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান। কলকাতার কালীঘাটের পটুয়ারাও প্রধানত দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সমাজভুক্ত।

তমলুক ও ঘাটাল মহকুমার বাইরে এখন আর মেদিনীপুরের চিত্রকরদের বিশেষ দেখা যায় না। এই দুই মহকুমার অন্তর্গত দু'টি স্থানের চিত্রকরদের কথাই বলব এখানে।[২] তমলুক মহকুমায় কুমীরমারা গ্রামে চিত্রকরদের বাস আছে। গ্রামটি নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত। চিত্রকরদের স্থানীয় লোকেরা সাধারণত পটীদার বলেন।

২ পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকররা বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর থেকে ২৪-পরগণা পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছেন। সমগ্রভাবে চিত্রকরদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে। —লেখক

কুমীরমারা গ্রামে এখনও সাত-আট ঘর পটীদার বাস করেন। এখন আর পট খেলানো তাঁদের প্রধান বা একমাত্র পেশা নয়। এখন তাঁরা ঠাকুর গড়েন, নানা-রকমের মাটির পুতুল ও চিত্রিত হাড়ি গড়ে হাটে ও মেলায় বিক্রি করেন। বছরের কয়েকমাস যখন প্রতিমা গড়ার কাজ থাকে না হাতে তখন পট খেলিয়ে বেড়ান। এক-একটি পৌরাণিক কাহিনী পালার মতো ছড়া বাঁধা এবং ছবি আঁকা থাকে। যেমন মশানে শ্রীমন্ত, রামচন্দ্রের বনবাস, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, মহীরাবণ বধ, মনসার গান, জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণের পালাগান ইত্যাদি। পট দেখিয়ে পয়সা, চাল-ডাল, বাসন পর্যন্ত ভিক্ষা গ্রহণ করেন। এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই পট আঁকতে জানেন না। দু-চারজন যাঁরা জানেন, তাঁরাও যে পূর্বপুরুষদের মতো সুদক্ষ শিল্পী নন, একথা তাঁরা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন না। প্রধানত পুতুল ও প্রতিমা গড়াই এখন তাঁদের কাজ। তাও নিজেদের তৈরি রঙ তুলি দিয়ে নয়। বাজার থেকে তাঁরা বিলিতি রং ও তুলি কিনে আনেন। ঘরে তৈরি ছাগলের লোমের তুলি বা ভুসো কালি ব্যবহার করা হয় না যে তা নয়। কিন্তু ক্রমেই অঙ্কনের উপকরণের জন্য এঁরা বাইরের বাজারের মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছেন।

চেতুয়া-দাসপুর, চেতুয়া-বাসদেবপুর অঞ্চলেও পটীদার বা চিত্রকরদের বাস আছে। বাসুদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুর গ্রামে পটীদারদের যে পল্লীটি আছে, তার দীনহীন রূপ দেখলেই বোঝা যায় চিত্রকরদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিরকম শোচনীয়। জরাজীর্ণ কয়েকটি পাতার মাটির ঘর, ঝরা পাতার মতো একস্থানে জড়ো করা। পটীদারদের বসতি। মধ্যে মুক্ত অঙ্গন। তার উপর খাটিয়া, চাটাই ও মাদুর পাতা, পুতুল সাজানো। নানারকমের পুতুল, কাঁচা ও পোড়ানো মাটির পুতুল, দু-এক পোঁচ রং দেওয়া। কোনো মেলা বা উৎসব উপলক্ষে তৈরি হচ্ছে। পট দু-চারখানা করে অনেকেরই ঘরে আছে, কারও কারও আবার তাও নেই। অধিকাংশই পিতা-পিতামহের আঁকা পট, এখন ভক্তির ও আসক্তির জিনিস।

বীরভূম অঞ্চলের মতো মেদিনীপুরের পটীদাররাও না হিন্দু, না-মুসলমান। আচার সংস্কার যা কিছু তার সবই প্রায় হিন্দুসমাজের, কেবল মুসলমান-সমাজের বাইরের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য তার উপর আরোপ করা হয়েছে। কুমীরমারা গ্রামের পটীদাররা বলেন যে তাঁরা মুসলমানধর্ম মানতেন, কিন্তু মসজিদে যেতেন না, বাড়িতে নমাজ পড়তেন। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিবাহাদিও হত না, নিজেদের চিত্রকর-সমাজের মধ্যেই বিবাহ হত। মৌলানা এসে অবশ্য কল্মা পড়িয়ে যেতেন। পূর্বে 'সুন্নৎ' করারও রীতি ছিল, এখন নেই। চেতুয়া-বাসুদেবপুরের সংলগ্ন নির্ভয়পুরের

পটীদারপল্লীতে একটি ছোট ভাঙা মস্‌জিদ আছে। অন্য কোথাও চিত্রকর বসতিতে এরকম মস্‌জিদ চোখে পড়েনি। বিশ্বকর্মার পুত্র চিত্রকররা কিন্তু এখনও বিশ্বকর্মার পূজা করেন ভাদ্র সংক্রান্তিতে এবং মেয়েরা ঘরে লক্ষ্মীপূজাও করেন। যাঁরা প্রায় সম্পূর্ণ মুসলমানসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা পূর্ববঙ্গে গাজীর পট দেখিয়ে বেড়ান। জনসমাজে ধর্মকথা প্রচারের এরকম জনপ্রিয় কৌশল মুসলমান পীরগাজীরাও নিজেদের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার থেকেই গাজীর পটের উৎপত্তি, পূর্ববঙ্গে তার প্রসার বেশি। পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকররা মধ্যপথে থেমে রইলেন, এখনও তাই আছেন। আধা-মুসলমান হয়েও তাঁরা চিরদিন হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্যকথা গেয়ে বেড়ান, তাঁদের চিত্র ও মূর্তি আঁকেন। অথচ হিন্দুসমাজে তাঁরা পতিত, নির্বাসিত ও অবজ্ঞাত।

মেদিনীপুরের পটীদারদের সমাজ অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগীরথীর পশ্চিমে ঘাটাল ও আরামবাগ মহকুমায়, পূর্বদিকে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় সবিষা কালীঘাট আখড়া সোনারপুর কলকাতা ইত্যাদি স্থানে পটীদারদের সমাজ ছিল। কলকাতা শহরে একাধিক স্থানে পটুয়াপাড়া ছিল, শুধু কালীঘাটে নয়। তীর্থস্থান হিসেবে কালীঘাট তো ছিলই, চিৎপুরে চিত্রেশ্বরীদেবীর কাছে, মধ্য কলকাতায় পটুয়াটোলা ইত্যাদি অঞ্চলেও ছিল। কলকাতার পটুয়ারা শহরের নতুন ইঙ্গবঙ্গসমাজ ও বাবুসমাজের সংস্পর্শে এসে, কবিয়ালদের মতো বাবুদের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রধানত নানারকম সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রাদি আঁকতে আরম্ভ করেন। বিদেশ থেকে আমদানি ছবির প্রিন্টের প্রভাবও তাঁদের উপর পড়ে। তার ফলে কলকাতায় একটি বিশিষ্ট চিত্রকরগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কালীঘাটের পটুয়ারা অন্যতম।

বীরভূমের ধর্মপূজা
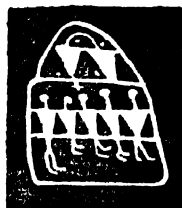
পশ্চিমবাংলার ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজা সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা হচ্ছে, গবেষণার তো শেষ নেই।[১] একদা ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' নিবন্ধ ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানীরা (যেমন শ্রীসুকুমার সেন) ধর্মপূজা প্রসঙ্গে আরও অনেক নতুন কথা বলেছেন এবং নতুন আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিস্তারিত অনুসন্ধান করে কেউ আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে, সমগ্রভাবে এবিষয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। সমগ্রভাবে আঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গের ধর্মপূজার বৈশিষ্ট্য বিস্তার ও পরিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে আমরা পরে (এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড) সবিস্তারে আলোচনা করব।

প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান ছাড়া কেবল অধীত বিদ্যার জোরে এ-বিষয়ে মীমাংসা করা সম্ভবপর নয়। দু-একস্থানের উৎসবের বিবরণ লিপিবদ্ধ করাও যথেষ্ট নয়। সর্বপ্রথম অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, ধর্মঠাকুরের উৎসব কোন্ স্থান থেকে কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত

১ প্রসঙ্গত আমার মনে পড়ে এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ১৯৫১-৫৩ সালে যাঁরা নিতান্ত বালক বয়সে আমার সঙ্গে বিভিন্ন জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এরকম অনুসন্ধানের কাজে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন তাঁরা কেউ কেউ সাধারণ হয়ে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ড' উপাধি পেয়েছেন এবং 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' বইটির কথা যথারীতি ভুলে গিয়েছেন। এরকম একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু দেওয়া অনাবশ্যক। এবম্প্রকার গবেষণা গবেষক কৃতজ্ঞতা সৌজন্যবোধাদি গুণ বঙ্গদেশের 'স্কলার'দের বিশেষত্ব এবং এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ী গবেষণার বৈশিষ্ট্য।—লেখক

(Distribution)। উৎসবের পদ্ধতি ও অনুষ্ঠানাদি সবিস্তারে অনুধাবন করাও প্রয়োজন। তারপর তার উৎপত্তি (Origin), বিকাশ ও বিস্তার (Diffusion) সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সম্ভবপর। এ-কাজ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। করতে হলে বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া হুগলি হাওড়া মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার ধর্মোৎসবের প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করতে হয়, কারণ প্রধানত বাংলার এই অঞ্চলেই (কিছুটা মুর্শিদাবাদেও) ধর্মঠাকুরের উৎসব প্রচলিত। তার মধ্যেও এমন অঞ্চল সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় যেখানে ধর্মরাজের উৎসব অন্যতম প্রধান লোকোৎসব এবং যার বাইরে ক্রমেই ও'র প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে পরে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করলে এও দেখা যায়, ধর্মপূজা ও উৎসব কিভাবে ভিন্ন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব তথ্য বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করলে তবে ধর্মপূজার প্রকৃতি-বিচার করা সম্ভবপর।

প্রথমে বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ির কথা বলি। সিউড়ি শহরের মধ্যে অন্যান্য অনেক দেবতার মন্দির আছে। তার মধ্যে ধর্মরাজের একটি সাধারণ প্রাচীন মন্দির আছে যার গুরুত্ব উৎসবের দিক থেকে অসাধারণ। আজ পর্যন্ত সিউড়ি শহরের সবচেয়ে জমকাল উৎসব এই ধর্মোৎসব। সিউড়ির ধর্মঠাকুর মালিপাড়া বা মালাকার পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত। একাধিক কিংবদন্তী আছে এই ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে। প্রায় একশো সওয়াশো বছর আগেকার কথা। তখন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সিউড়ির অন্যতম উকিল ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময় সেহাড়াপাড়ায় ধর্মপূজা হত এবং পূজা উপলক্ষে কোনো কারণে একবার গণ্ডগোল হয়। ত্রৈলোক্যনাথের উদ্‌যোগে তখন সিউড়িতে ধর্মপূজার ব্যবস্থা হয়। কোনো মুদিখানা থেকে একটি সের পাঁচেক ওজনের পাথর নিয়ে জলে চুবিয়ে তেলসিঁদুর দিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পূজার জন্য ত্রৈলোক্যবাবু একটি টাকা দেন। চার আনার একটি পাঁঠা এবং বারো আনায় পূজার অন্যান্য খরচ তখন স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যেত। আজও ধর্মপূজার পুণ্যার দিনে মুখোপাধ্যায়বংশের কাছ থেকে সর্বপ্রথম একটি টাকা নেবার প্রথা প্রচলিত আছে। ধর্মরাজতলার কাছে যে মালাকররা থাকেন তাঁরা বলেন যে, ধর্মরাজ তাঁদেরই পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত। বাকুই-পাড়ার ধর্মপূজা দেখতে গিয়ে মেয়েরা একবার অপমানিত হন বলে তাঁরা ধর্মশিলা এনে এই ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। সত্য মিথ্যা যাই হক, প্রথম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, পুণ্যার দিন মুখোপাধ্যায়-গৃহ থেকে প্রথমে একটি টাকা নেওয়ার প্রথা। দ্বিতীয়ত, দলাদলির জন্য ধর্মঠাকুরের সংখ্যা সিউড়ির চারিদিকে এত বেশি হলেও, বনেদী ধর্ম-

ঠাকুর বাউরি, হাড়ি-ডোম পাড়ায় অনেক আছেন। তাছাড়া দুর্গোৎসব নিয়ে দলাদলির মতো ধর্মঠাকুরের উৎসব নিয়ে দলাদলিও উল্লেখযোগ্য। ধর্মঠাকুরের অসাধারণ লোকপ্রিয়তার অকাট্য প্রমাণ।

সাধারণত আষাঢ় বা শ্রাবণ-পূর্ণিমায় সিউড়ির ধর্মপূজা হয়। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত বীরভূম জেলার নানাস্থানে ধর্মপূজা হয় এবং পূর্ণিমার পরিবর্তনও দেখা যায় প্রায় এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই হয়েছে। পাশের পাড়ায় বৈশাখী পূর্ণিমায় হয় বলে অন্য পাড়ায় পরবর্তী বা অন্য কোনো পূর্ণিমায় উৎসব হয়। সিউড়িতে পূজার পনের-কুড়িদিন আগে মাটির ভাঁড় আর ফুলের মালা দিয়ে ধর্মতলা সাজানো হয় (মালদহের গম্ভীরা সাজানোর কথা মনে পড়ে)। পরে বাজনা বাজিয়ে একটি ভাঁড় স্থানীয় জমিদার পূর্বোক্ত মুখোপাধ্যায়-গৃহে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাঁরা একটি টাকা দান করেন। তারপর থেকে 'কয়েলির' বা চাঁদা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। পূজার আগের দিন মশাল নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে উপবাসী ভক্ত্যারা কাছে দত্তপুকুরে স্নান করে গলায় মোটা সুতোর পৈতা ধারণ করেন। পরদিন ভোর হবার আগেই ধর্মতলায় প্রচুর কাঠ জড়ো করে অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়। অগ্নিকুণ্ড যখন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয় তখন ভক্ত্যারা অঞ্জলি ভরে সেই অঙ্গার ধর্মরাজের কাছে নিয়ে আসেন। 'ব্যোম্ ব্যোম্' ও 'জয় বাবা ধর্মরাজের জয়' শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। পায়ে করে আগুনখেলা শুরু হয়। একে ফুলখেলা বলে। আগুনখেলার পর কাঁটাখেলা। একজন ভক্ত্যা চিত হয়ে শুয়ে পড়েন, আর একজন তাঁর বুকের উপর চাপানো সের আড়াই ওজনের শুকনো কাঁটার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়াতে থাকে। ভক্ত্যারা একে-একে সকলেই এই কাঁটাখেলায় যোগদান করেন। এই সময় সজোরে ঢাক বাজতে থাকে। খেলা শেষ হলে ভক্ত্যাদের সমবেত নৃত্য শুরু হয়। বেলা একপ্রহরের সময় পূজা হোম যজ্ঞ ইত্যাদি হয়। আগে বলিদান হত, এখন আর হয় না। দ্বিপ্রহরে ধর্মরাজের মাথায় পদ্মফুল চড়ানো হয় এবং ভক্ত্যারা ভাঁড় মাথায় করে দাঁড়ান। ভাঁড়ের কণ্ঠে থাকে ফুলের মালা, ভিতরে থাকে পিটুলি-গোলা (মদ পরিণত হয়েছে পিটুলি-গোলায়)। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করে পদ্মগুলিকে ধর্মরাজের মাথায় সাজিয়ে দেন। প্রচণ্ড জোরে ঢাকঢোল বাজানো হয় এবং সাজানো পদ্ম থেকে একটি ফুল গড়িয়ে পড়ে। 'ফুলপড়া' বলে। মূল দেয়াসীর (ধর্মের পূজারীকে বীরভূমে 'দেয়াসী'—'দেবাংশী' বলে) ভাঁড়ের ভিতর ফুলটি দেওয়া হয়। তারপর বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ভক্ত্যারা দত্তপুকুরের ঘাটে এসে উপস্থিত হন।

কয়েক বছর আগেও এই শোভাযাত্রায় প্রচুর সং, পুতুল ইত্যাদি থাকত। নানা রকমের বিচিত্র সব সং। এখন সাধারণত লাঠিখেলা ইত্যাদি হয়। মধ্যে মধ্যে আশপাশের গ্রামের ধর্মরাজতলা থেকে সং এসে সিউড়ির শোভাযাত্রায় যোগদান করে। দত্তপুকুরের ঘাট থেকে গঙ্গাজল ও দুধভরা ভাঁড় মাথায় করে ভক্ত্যারা যখন ধর্মরাজতলার দিকে যাত্রা করেন, তখনও সং থাকে শোভাযাত্রায়। বাজকাররা এইসময় প্রায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। শোভাযাত্রার সময় রাস্তার মধ্যেই কয়েকপদ অন্তর এক-একজন ভক্ত্যা ধরে তাঁর নাকে প্রচুর পরিমাণে ধূপের ধোঁয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপবাসী ভক্ত্যা মূর্ছা যান। সেই অবস্থায় তাঁকে ধরাধরি করে ধর্মরাজতলায় আনা হয়। বলা হয় 'ধর্মরাজের ভর' হয়েছে। এই সময় গরুর গাড়ির উপর চড়িয়ে নানারকমের সং শোভাযাত্রায় যোগদান করে। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে তৈরি সং সাজানো হয়। আধুনিক সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেও সং গড়া হয়। প্রায় সাতদিন ধরে উৎসব চলতে থাকে। ধর্মরাজের উৎসব উপলক্ষে নানা রকমের সং ছাড়াও কবিগান, বাউলগান, যাত্রা ইত্যাদিও হয়। এরকম সমারোহ সচরাচর আর অন্য কোনো উৎসবে হয় না বীরভূমে।

সিউড়ির কথা বলেছি। তাও সব বলিনি। সিউড়ির বিভিন্ন পাড়ার কথা বলা হয়নি, আশপাশের গ্রামের কথা বলিনি। বীরভূম জেলার আরও অনেক গ্রামে যেসব বিখ্যাত ও অখ্যাত ধর্মঠাকুর আছেন, তাঁদের কথাও বলা হয়নি। সিউড়ির মধ্যেই বারুইপাড়া আছে। সেখানেও ধর্মঠাকুরের বারোয়ারী পূজা হয়। ভক্ত্যা হয় প্রধানত হাড়ি ও মাল জাতির লোকেরা। কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র 'দেয়াসী' নেই, ব্রাহ্মণেই পূজা করেন। সাধারণভাবেই পূজা হয়। কোনো কোনো বছর সং হয়। ভক্ত্যারা উপবাস করে ও ভাঁড়াল আনে। তাছাড়া আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু হয় না। সিউড়ির অনতিদূরেই করিধ্যা গ্রাম। করিধ্যা ও কালিপুর পাশাপাশি গ্রাম, তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত করিধ্যায় ধর্মঠাকুর আছেন, টিনের চালাঘর আছে। কালিপুরেও ধর্মঠাকুর আছেন করিধ্যায় যে পূর্ণিমায় পূজা হয়, তার পরের পূর্ণিমায় কালিপুরে হয়। কিছু কিছু সং হয়। দেবাংশী জাতিতে ডোম। সিউড়ি থানার অধীন পুরন্দরপুর ও পাঞ্জুনিয়া গ্রামেও ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। পুরন্দরপুরের ধর্মরাজ প্রস্তরখণ্ড, কাষ্ঠসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী বা জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পূজা হয়। আগের দিন ভক্ত্যারা বাজনা বাজাতে বাজাতে একটা উন্মুক্ত স্থানে সমবেত হয়। সেখানে নাচগান বাজনা বাজী

ইত্যাদির অনুষ্ঠান গভীর রাত পর্যন্ত হয়। পরদিন দুপুরে ভাঁড়াল আনা হয়। রাতে যাত্রাগান হয়। মধ্যে মধ্যে সং হয়। লাঙ্গুলিয়া গ্রামের ধর্মরাজের সেবায়েৎ বাগদি, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ। ভগবতীর গৃহে ধর্মরাজ বারোমাস থাকেন। পুজোর সময় কাছের খোলা জায়গায় পুজো ও পাঁঠাবলি হয়। কিন্তু ধর্মরাজকে সেখানে ঘর থেকে বাইরে আনা হয় না। ধর্মরাজের আলাদা কোনো মন্দির বা গৃহ নেই। নামডাক আছে, পেটবেদনা, হাত-পা-ফোলার দেবতা হিসাবে। গাজন বা সং এখন আর হয় না। ওষুধ বিতরণ করা হয়।

সিউড়ি থেকে প্রায় বারো মাইল পশ্চিমে তাঁতিপাড়া গ্রাম, রাজনগর থানার মধ্যে। বিশাল সমৃদ্ধ গ্রাম, তন্তুবায়-প্রধান। বীরভূমের তাঁতশিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। কাছাকাছি মাইল খানেকের মধ্যে ধনকুনে গ্রাম। দুই গ্রামেই ধর্মরাজ আছেন এবং সমারোহে ধর্মরাজের উৎসবও হয়। গ্রামের সর্বপ্রধান বারোয়ারী পূজাই এই ধর্মপূজা। পাশাপাশি গ্রামে প্রতিযোগিতা হয় ধর্মপূজার। গরুর গাড়ির উপর নানারকমের সব বিরাটাকার সং সাজিয়ে নিয়ে গ্রামপ্রদক্ষিণ করা হয়। বিচিত্র দৃশ্য, কদাচিৎ অন্য কোথাও দেখা যায়। প্রথমদিন শোভাযাত্রা হয় তাঁতিপাড়ার সং এর, দ্বিতীয় দিন হয় ধনকুনের। গ্রামের কৃষক মহিন্দররা শোভাযাত্রায় গরুর গাড়ি টানা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে। তাঁতিপাড়ার ধর্মরাজের দেয়াসী জাতিতে বণিক, ধনকুনের তন্তুবায়। ধর্মপূজায় এরকম সমারোহ বীরভূমের অন্য কোথাও বিশেষ হয় না। শুধু সং-এর জন্যই গ্রাম্য পূজায় প্রায় হাজার টাকার বেশি খরচা হয়।

খয়রাশোল থানার অধীন বাবুইজোড়, অরজরপুর, ব[illegible]লিয়ে, ভাদুলে প্রভৃতি স্থানে ধর্মপূজা হয়। গ্রামদেবতাই ধর্মরাজ ঠাকুর। খয়রাশোল থানায় কদমডাঙা গ্রামে এক বিচিত্র দেবতা আছেন, নাম 'মালঞ্চবুড়ি'। আরএক বুড়ি সিউড়ি শহরে বাউরিপাড়ায় আছেন, তিনি [illegible]পদেবতা, নাম 'ঝেঁটেনি-বুড়ি'। ভক্তের ঘাড়ে ভর করে তার মুখ দিয়ে তিনি যেকোনো লোকের ভূত ভবিষ্যৎ-বর্তমান বলিয়ে ছাড়েন। কিন্তু মালঞ্চবুড়ি সেরকম কিছু নন। সিঁদুর লেপা পাথরের গুঁড়িই তাঁর মূর্তি, থাকেন তিনি খোলা জায়গায় গাছতলায়। বাহন তাঁর বাঘ। পয়লা মাঘ তাঁর পূজা হয়। পূজায় পাঁঠাবলিও হয়, আবার হরির লুটও হয়। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি পিছু এক জোড়া করে মাটির ঘোড়া লাগে পূজায়। ধর্মরাজের উপকরণ ঘোড়া, বুড়ির বাহন বাঘ। চিন্তার খোরাক আছে অনেক।

'সিজেকড্‌ডাং' গ্রামের নাম। সংস্কৃত বা বাংলা অভিধানে এরকম কোনো কথা বা শব্দ নেই। কিন্তু এরকম অনেক নাম বীরভূমের গ্রামের আছে (বর্ধমান বাঁকুড়া

হুগলি মেদিনীপুরেও আছে যথেষ্ট) যা কোনো চলিত অভিধানে নেই। কোথায় কোন্ অষ্ট্রিক, কি দ্রাবিড ভাষার মূলে এইসব নামের উৎস লুকিয়ে আছে, তা খুঁজে বার করবার সাধ্য আমার নেই। ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধানীরা রাঢ়দেশের গ্রামের নামের উৎস নিয়ে অনুসন্ধান করলে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের একটা গুপ্ত ও লুপ্ত অধ্যায় রচনা করতে পারেন বলে মনে হয়। যাই হোক, সিজেকড্ডাং গ্রাম সিউড়ির মাইল পনের দক্ষিণে। ধর্মপূজা উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমার সময় দিনদুই যাবৎ বিরাট একটি মেলা হয় এই গ্রামে। মেলায় পাঁচ-ছয় হাজার লোকসমাগম হয়। এখানকার ধর্মরাজের আরও একটি কারণে বিশেষ খ্যাতি আছে। হাঁপানি রোগ তিনি সারিয়ে দেন। পাঁচসিকার কবচ ধর্মরাজের নামে বারোমাসই দেওয়া হয় এবং হাঁপানির কবচ নিতে প্রচুর হেঁপোরুগীর আমদানি হয় সেখানে।

আরএক ধর্মরাজ আছেন, তিনি বাতরোগের বিশেষজ্ঞ। তিনি বেলের ধর্মঠাকুর। বেলে গ্রাম সাঁইথিয়া থানায়। আহ্‌মদপুর স্টেশনের মাইল দেড়েক দূরে। বেলের ধমরাজ অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা বলে বীরভূমে তাঁর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। একডাকে সকলে তাঁকে চেনেন। ধর্মের দেয়াসীরা বাতের ওষুধ দেন। পূজারী ব্রাহ্মণ, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অন্য দেয়াসীরাও পূজা করেন। শোনা যায়, বেলের ধর্মরাজের বাতের ওষুধের নামডাক শুনে আগে নাকি বেতো সাহেবরাও আসতেন এখানে ওষুধ নিতে। পূজা হয় ধর্মরাজের বৈশাখী পূর্ণিমায়। পূজার দিন ধর্মরাজকে একটি কাঠের ঘোড়ার উপর চড়িয়ে নাচানো হয়। শেষরাত্রির দিকে ধর্মের মন্দিরের সামনে কতকগুলো আগাছা পুড়িয়ে তার উপর ভক্ত্যারা নাচে। তার নাম ফুলখেলা। পুজোর দিন সন্ধ্যায় বাণফোঁড়া হয়। প্রবাদ আছে যে, আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে (প্রথম দিনে নয়) বেলের ধর্মরাজের কাছ থেকে ওষুধ নিলে সারা বছর আর বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হতে হয় না। রবিবারটি কি ছুটির দিন বলে তার মাহাত্ম্য বেড়েছে? সেইজন্য প্রতি বছর আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে বেলে অভিমুখে যাত্রীদের স্রোত বইতে থাকে। দেয়াসীদের কাছ থেকে বাতের ওষুধ নিয়ে যাত্রীরা আবার ফিরে যান।

সাঁইথিয়া থানায় ঈশ্বরপুর গ্রামে 'সুন্দর রায়' নামে এক ধমরাজ ঠাকুর আছেন। তাঁর নামে কয়েকবিঘা লাখেরাজ জমিও আছে। আগে পূজারী ছিলেন গন্ধবণিক, এখন ব্রাহ্মণ। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে চারদিন ধরে মনসার গান হয়, কারণ ধর্মরাজের সঙ্গে মনসাদেবীও আছেন। ঈশ্বরপুরের ধর্মরাজ 'সুন্দর রায়ের' পূজায় এই মনসার গান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

'বড় সাংড়া'ও গ্রামের নাম, সিজেকড্‌ডাং-এর মতো। এ নামও কোনো আর্যভাষার অভিধানে নেই। আহমদপুর থানার মধ্যে গ্রামটি। ধর্মরাজের নাম পুরন্দর। বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজা হয়। ব্রাহ্মণে পূজা করেন। প্রথম দিন উপবাসের পর, সন্ধ্যার সময় পরম-ভক্ত্যার ভর হয়। ভর অবস্থায় তিনি পূজার অনুষ্ঠান সে-বছর কেমন যাবে, ক'টা পাঁঠা লাগবে, ক'দল বাজনা দরকার, সারা বছর কে কি অপরাধ করেছে—ইত্যাদি ধরনের নানাকথা বলেন। দ্বিতীয় দিন সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যার সময় ভক্ত্যারা 'বাণেশ্বরী'কে পুকুরঘাটে ধরাধরি করে নিয়ে যায়। 'বাণেশ্বরী' কোনো ব্যক্তি নয়। 'বাণেশ্বরী' হল লৌহশলাকাবিদ্ধ একটি কাঠের পাটাতন। সাধারণত সাতজন ভক্ত্যা ধরাধরি করে তাকে স্নান করাতে নিয়ে যায়। বাণেশ্বরীর সঙ্গে তারা পর-পর নয়বার স্নান করে, পরে নির্দিষ্ট স্থানে তারা বাণেশ্বরী স্থাপন করে। পূজার পর বাণেশ্বরীর উপর একজন ভক্ত্যা শুয়ে পড়ে এবং তাকে কাঁধে করে মন্দিরের মধ্যে আনা হয়। অন্যান্য ভক্ত্যারা স্নানান্তে নিজেদের দেহে বাণ ফোঁড়ে—পাঁজর-বাণ, জিহ্বা-বাণ ইত্যাদি। জিহ্বা-বাণের দু'পাশে এবং পাঁজর-বাণের সামনে কাপড় জড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর মধ্যে মধ্যে ধূপ-ধুনা ছিটিয়ে ঢাক-ঢোল বাজাতে বাজাতে ধর্মরাজের মন্দিরের কাছে ভক্ত্যারা আসে। মন্দিরের কাছে এসে বাণগুলি খুলে ফেলা হয়। একে 'মুক্তিস্নান' বলে। রাত প্রায় দেড়টা-দুটোর সময় ধর্মরাজকে কাঠের ঘোড়ার উপর বসিয়ে কয়েকজন ভক্ত্যা সেই ঘোড়া কাঁধে করে পাশের মালিগ্রামে যায়। বড় সাংড়ার ধর্মরাজ যাওয়ার পর মালিগ্রামের ধর্মরাজ বেরিয়ে আসেন। দুজন ধর্মরাজের মুখোমুখি দেখা হয়। অতঃপর বড় সাংড়ার ধর্মরাজ মালিগ্রাম থেকে শিববাটি গ্রামের ভিতর দিয়ে নিজের মন্দিরে ফিরে আসেন। এই অনুষ্ঠানটির নাম—'বন-বেড়া'। মনে হয় 'বনের মধ্যে বেড়ানো' থেকেই এই 'বনবেড়া' কথার প্রচলন হয়েছে। বনবেড়া অনুষ্ঠানের পর ভক্ত্যারা ফলজল খায়। তৃতীয় দিনও ভক্ত্যারা উপবাস করে থাকে। সকালে পুকুরঘাটে গিয়ে তারা ঘট ভরে। তারপর ঘট মাথায় নিয়ে এক-এক স্থানে দাঁড়ায়। ধূপের ধোঁয়া দিয়ে ও ঢাক পিটিয়ে ভক্ত্যাদের ক্রমে অচৈতন্য করে ফেলা হয়। ভক্ত্যাদের আত্মীয়স্বজনরা এসে অচৈতন্য অসাড় দেহগুলিকে তুলে দাঁড় করায় এবং ধর্মতলায় নিয়ে এসে মাথা থেকে ঘটগুলি নামিয়ে দেয়। তারপর ধর্মরাজের পূজা আরম্ভ হয়। পূজায় বলিদান হয় এবং পূজার পর ভক্ত্যারা বাইরে গিয়ে চড়ক অনুষ্ঠান করে। এছাড়া ইলামবাজার থানায় জয়দেব-কেঁদুলিতে, বোলপুর থানায় সুরুল ও অন্যান্য নানাস্থানে ধর্মপূজা হয়।

এককথায় যদি বলা যায় যে, ধর্মঠাকুরই বীরভূমের অন্যতম প্রধান 'গ্রামদেবতা' তাহলে ভুল হয় না। একই গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় একাধিক ধর্মঠাকুর আছেন, এরকম গ্রামের সংখ্যাও বীরভূমে কম নয়। পূর্বোক্ত বিবরণগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ধর্মপূজার মধ্যে বীরভূম জেলায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে যথেষ্ট। সিউড়ি তাঁতিপাড়া বেলে সিজেকড়ডাং বড-সাংডা ঈশ্বরপুর প্রভৃতি স্থানের ধর্মপূজার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথম লক্ষণীয় হল—ধর্মপূজা অব্রাহ্মণদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত, উৎসবটা প্রধানত তাঁদেরই। হাঁড়ি ডোম বাউরি জেলে প্রভৃতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তন্তুবায় বণিক কর্মকার প্রভৃতিদের মধ্যেও কম নয়। ক্রমে ব্রাহ্মণরা যে পূজারী হয়েছেন পরে, তাও অত্যন্ত স্পষ্ট। যেখানে পূজারী ব্রাহ্মণ হয়েছেন, সেখানে অব্রাহ্মণ কেউ সেবায়েত আছেন এখনও, দেয়াসী তো আছেনই। কোথাও বলিদান ও হরির লুট একসঙ্গেই হচ্ছে, কোথাও বলিদান বন্ধ হয়েছে। সংস্কৃতি-সংঘাত ও সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত এগুলি। দ্বিতীয় লক্ষণীয় হল—চড়ক গাজন বাণফোঁড়া ও সং ধর্মপূজানুষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ভর' নামার ব্যাপারও উপেক্ষণীয় নয়। তৃতীয় লক্ষণীয়—ঘোড়া পূজার অন্যতম উপকরণ। চতুর্থ লক্ষণীয়—ধর্মরাজ সাধারণত মনসা চণ্ডী বা কালী-সহ বিরাজ করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় সাধারণত পূজা হয়, প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শ্রাবণ-পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব বিস্তৃত হয়েছে। বীরভূমে প্রস্তরখণ্ডই ধর্মরাজ মনসা চণ্ডী ও কালী বলে পূজিত হন, কোনো মূর্তি বিশেষ নেই। কোনো কোনো জায়গায় ধর্মরাজের কূর্মমূর্তি আছে।

অনুসন্ধানীর কাছে ধর্মপূজানুষ্ঠানের এই উপাদানগুলির সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি। এই সব উপাদানের উৎস বৌদ্ধযুগ ছাড়িয়েও আরও অনেক পশ্চাতে খুঁজতে হয়। তারপর বৌদ্ধযুগেও যে এই উৎসবের প্রাধান্য ছিল, তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। পরবর্তীযুগে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব থেকেও ধর্মঠাকুর একেবারে যে মুক্ত হতে পারেননি তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

বাঁশপুত্রদের গ্রামে

গ্রাম সাহজাপুর, ডাকঘর সিয়ান, থানা বোলপুর। গ্রামে প্রায় ছয়শো লোকের বাস, তার মধ্যে তিনভাগের একভাগের মতো অনুচ্চবর্ণ ও তপশীলভুক্ত আদিবাসী! আদিবাসীদের মধ্যে বাঁশপুত্ররা অন্যতম, জাতিগত নাম 'মহলি'। ঝুড়িঝোড়া প্রভৃতি বাঁশের জিনিস তৈরি করে বলে নিজেদের বাঁশপুত্র বলে। বাঁশপুত্ররা সাঁওতাল পরগণার দুমকা অঞ্চল থেকে বীরভূমে এসেছে অনেকদিন আগে এবং এখানেই বসবাস করছে। বৃত্তি প্রধানত বাঁশশিল্পকর্ম, জীবিকার তাগিদে মধ্যে মধ্যে সুযোগ পেলে ক্ষেতমজুরের কাজ করে। অতি দরিদ্র এবং চোখেমুখে অনাহার-অপুষ্টির চিহ্ন। হার্বার্ট রিসলে বলেন, মহলি-বাঁশপুত্ররা সাঁওতালদেরই একটি প্রশাখা, যারা মূলজাতি থেকে ছিন্ন হয়ে এসেছে উপরের হিন্দুসমাজে প্রবেশের ইচ্ছায়, কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হয়নি. যেমন আরও অনেক উপজাতির হয়নি এবং তার ফলে হিন্দু-সাঁওতাল উভয় সমাজের প্রান্তে উপেক্ষিতজনের মতো অবস্থান করছে।[১] পঞ্চান্ন বছর বয়সের একজন প্রৌঢ় বাঁশপুত্র মহলির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের (১৯৭৫) বিবরণ এখানে দেওয়া হল :[২]

প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্নকর্তা আমরা। উত্তরদাতা প্রৌঢ় মহলি

এই গ্রামে কতদিন বাস করছ?

কুড়ি বছর হবে।

কাজকর্ম করে খেতে পাও?

আটমাসের মতো একবেলা খাই, চারমাস উপোস করি।

ছেলেপিলে আছে?

আছে। ছেলের নাম শ্রীধর মহলি, বয়স ২২ বছর!

ছেলে বিয়ে করেছে? এক-পরিবারে ছেলের সঙ্গে থাকো?

ছেলের বিয়ে হয়েছে। প্রথম বৌ পালিয়ে যায়, পরে স্যাঙ্গা (পুনর্বিবাহ) করে। থাকার জায়গা নেই। ঘর একটা তাই এক ঘরে থাকে। খায় পৃথক।[৩]

১ "Of these three castes (কোড়া কুর্মী মহলি) the Mahilis appear to have broken off most recently from the tribe (সাঁওতাল). They still worship some of the Santal gods in addition to the standard Hindu deities; they still eat food cooked by a Santal…they permit the marriage of adults and tolerate sexual intercourse before marriage within the limits of the caste…" Herbert Risley : The People of India ; London 1915, pp 97-98.

২ দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ-স্কলার প্রদীপকুমার বসুর সহযোগিতায় সংগৃহীত।

৩ একটি ঘর এবং তার সংলগ্ন একটি ছোট্ট বারান্দা। ঘরে বাবা, ছেলে মা-বৌ একত্রে থাকে, বারান্দায় আলাদা উনুনে-হাড়িতে রান্না হয়। মা-বাবার অন্ন না জুটলে উনুন জ্বলে না, উভয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকে, পাশেই হয়ত ছেলে-বৌ রান্না করে খায়। তেমনি উল্টোও হতে পারে, মা-বাবা খায়, ছেলে-বৌ খায় না।

কিভাবে তোমাদের বিয়ে হয়? বিয়ের নিয়ম কি?

ষোল বছর বয়সে ছেলেদের, বারো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু বিয়ের জন্যে টাকা-পয়সা দরকার, তাই বিয়ে হতে দেরী হয়। অনেক সময় তাই বিয়ের আগেই বৌ নিয়ে আসা হয়, দু-একটা ছেলেমেয়েও হয়ে যায়। তারপর যদি পয়সা হয় তাহলে বিয়ে হয় (আনুষ্ঠানিক)।

কত টাকা লাগে বিয়েতে?

কনের জন্যে ১৬ টাকা দিতে হয় (bride-price)+কাপড় ১+থালা ১+বাটি ১+বাজনা+জাতের খাওয়া+মদ। ছেলের বাবা হলে পাত্রকে ডবল টাকা (৩২ টাকা) দিতে হয়+আগের বৌয়ের ছেলেরা নতুন বৌকে 'মা' বলে ডাকবে বলে আরও ১০ টাকা বেশি লাগে। বৌ যদি স্বেচ্ছায় চলে যায় অথবা অন্য কারও সঙ্গে পালিয়ে যায় তাহলে বিয়ের জন্যে যে টাকা সে পায় সেটা ফেরত দিতে হয় এবং জাতের লোকজন ধরে এনে মদ খাওয়াতে হয়।

কোন্ দেবতার পুজো কর?

কালী আর সূর্য।

ভোটের সময় ভোট দাও কি? কাদের দাও?

বাবুরা এসে যাদের ভোট দিতে বলে তাদের দিই।

তোমাদের এই অভাব, এই দারিদ্র্য ঘোচাবার কোনো উপায় আছে কি?

কোনো উপায় নেই, মরণই ভাল।

কিষাণসভা বা অন্য কোনো সভাসমিতি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে?

না।

সরকার অথবা আর কেউ কোনো উপকার করতে পারে?

না।

বাঁশপুত্রদের গ্রাম থেকে অমৃতের পুত্রদের গ্রামে যাবার পথে প্রৌঢ় মহলির কথাগুলো মনে পড়ছিল। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের পরিবর্তনে (social change) বিশ্বাস করেন, এরা বিশ্বাস করে না। জন্মের পর মৃত্যুই এদের কাছে বড় পরিবর্তন।

বাঁ
ড়া
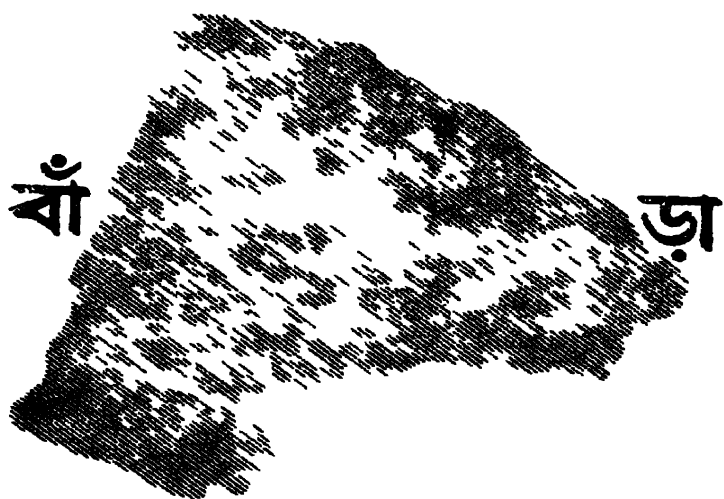
বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর বন-বিষ্ণুপুর রাঢ়দেশে। বাংলার বহু বিষ্ণুপুরের মধ্যে এই বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে অদ্বিতীয়। বীর্যবান পাণ্ডুনন্দন বিদেহ দেশে অবস্থান করে, ইন্দ্রপর্বত-সন্নিহিত কিরাত রাজাদের পরাজিত করেন। পরে সুহ্ম ও প্রসুহ্মদের যুদ্ধে জয় করে মগধের দিকে অভিযান করেন। মোদাগিরির রাজা, পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছের রাজা মহৌজাকে নির্জিত করে ভীম বঙ্গরাজ্যের দিকে ধাবমান হন। অতঃপর তাম্রলিপ্তপতি, কর্বটেশ্বর, সুহ্মরাজ ও সাগরবাসী ম্লেচ্ছদেরও তিনি জয় করেন। নীলকণ্ঠ বলেন মহাভারতের এই সুহ্মই রাঢ়া বা রাঢ়দেশ। রাঢ়দেশে বিষ্ণুপুর।

প্রাচীন জৈনসূত্রে রাঢ়দেশের বর্ণনা আছে। 'আচারাঙ্গসূত্রে' 'লাঢ' বা রাঢ়দেশকে বলা হয়েছে জনপথহীন বনভূমি। বিষ্ণুপুরকেও বন বিষ্ণুপুর বলা হয়। রাঢ়ের প্রাচীন অধিবাসীদের রূঢ় বর্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাঢ়ের দু'টি বিভাগের নাম বজ্জভূমি এবং সুহ্মভূমি। জৈন মহাবীর রাঢ়দেশে ভ্রমণকালে পদে-পদে বর্বর অধিবাসীদের সম্মুখীন হতেন এবং তারা ছু ছু করে তাঁর পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিত। অবশ্য খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহাবীর স্বয়ং রাঢ়দেশে ভ্রমণ করেছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে জৈনশ্রমণরা করেছিলেন মনে হয়। হয়ত তাঁদেরই ধর্মপ্রচার-পর্যটন স্মরণ করে সূত্রকাররা এই ধরনের কাহিনী রচনা করেছেন। 'মহাবংশে'ও রাঢ়দেশ সম্বন্ধে এই ধরনের কাহিনী আছে। রাঢ়দেশে বন্যজন্তু ও আদিম অধিবাসীরা বাস করত এবং প্রাচীন বঙ্গদেশের লোকেরাই এই রাঢ়দেশ উদ্ধার করেছিলেন।

কাহিনীটি এই : রাঢ়ের অরণ্যভূমির সিংহরাজা বঙ্গের রাজকন্যাকে জোর করে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করেন এবং তাঁদের মিলনের পর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই রাজকুমারই রাঢ়ের জঙ্গলে গ্রাম ও লোকালয় স্থাপন করেন। বঙ্গ থেকে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্যারাভান-পথের উপর রাঢ়দেশ অবস্থিত।

শুধু জৈনগ্রন্থে নয়, বৌদ্ধগ্রন্থেও সুহ্মদেশের কথা বলা হয়েছে। 'সংযুক্ত নিকায়' ও 'তেলপত্ত জাতকে' সুহ্মের অন্তর্গত দেশক বা শেতক অঞ্চলে স্বয়ং গৌতম বুদ্ধের ভ্রমণের বিবরণ আছে। মহাবীরের মতো গৌতম বুদ্ধেরও রাঢ়দেশে ভ্রমণ সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা কিছু বলা যায় না। হয়ত বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মরণ করেই কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু যাই হোক, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থের এই সব বর্ণনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাঢ়দেশে রূঢ় বর্বর লোকের বাস ছিল বেশি এবং দেশটি জনপথহীন গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। রূঢ় কর্কশ চোয়াড়দের দেশ বলেই বোধহয় লাঢ়-রাঢ় নাম হয়েছে। এদেশের আদিবাসীদেরই রূঢ় চোয়াড় বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাঢ়দেশ যে বাংলার আদিবাসীপ্রধান দেশ, এইটাই প্রধান কথা। দ্বিতীয় কথা হল, এই রাঢ়দেশে আর্যসভ্যতার প্রসার হয়েছে অনেক পরে, বাংলার অন্যান্য অঞ্চল আর্যীকরণের (উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ইত্যাদি) পরে। একথা এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক পটভূমিরূপে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, কারণ বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়া প্রাচীন সুহ্ম ও রাঢ়দেশেরই অন্তর্গত।

প্রাচীন রাঢ়ের ভৌগোলিক সীমানারও নানারকম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে তমলুক ও সুহ্ম বা রাঢ়দেশকে পৃথক করা হয়েছে, কিন্তু 'দশকুমারচরিতে' পরিষ্কার বলা হয়েছে—'সুহ্মেষু দামলিপ্তাহ্বয়স্য নগরস্য'। দামলিপ্তই তাম্রলিপ্ত। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে রাঢ়দেশের এই বর্ণনা পাওয়া যায়—

> গঙ্গাবীচিপ্লুত পরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
> বাস্যত্যুচ্চৈ স্তয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্ম দেশঃ।

ধোয়ী বলেছেন, 'যে-দেশের বিস্তীর্ণ অংশ গঙ্গাপ্রবাহের দ্বারা প্লাবিত হয়, যে দেশ সৌধশ্রেণীর দ্বারা অলঙ্কৃত, সেই রহস্যময় সুহ্মদেশ তোমার মনে বিশেষ বিস্ময় এনে দেবে'। রাজকবি রাজকীয় কল্পনায় রাঢ়দেশকে সৌধশ্রেণী-অলঙ্কৃত মনে করেছেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য হল যে, রাঢ়ের বিস্তীর্ণ অংশ তিনি গঙ্গাপ্লাবিত বলেছেন। পরবর্তীকালের 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' বলা হয়েছে—

> গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ।
> দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্মদেশঃ প্রকীর্তিতঃ॥
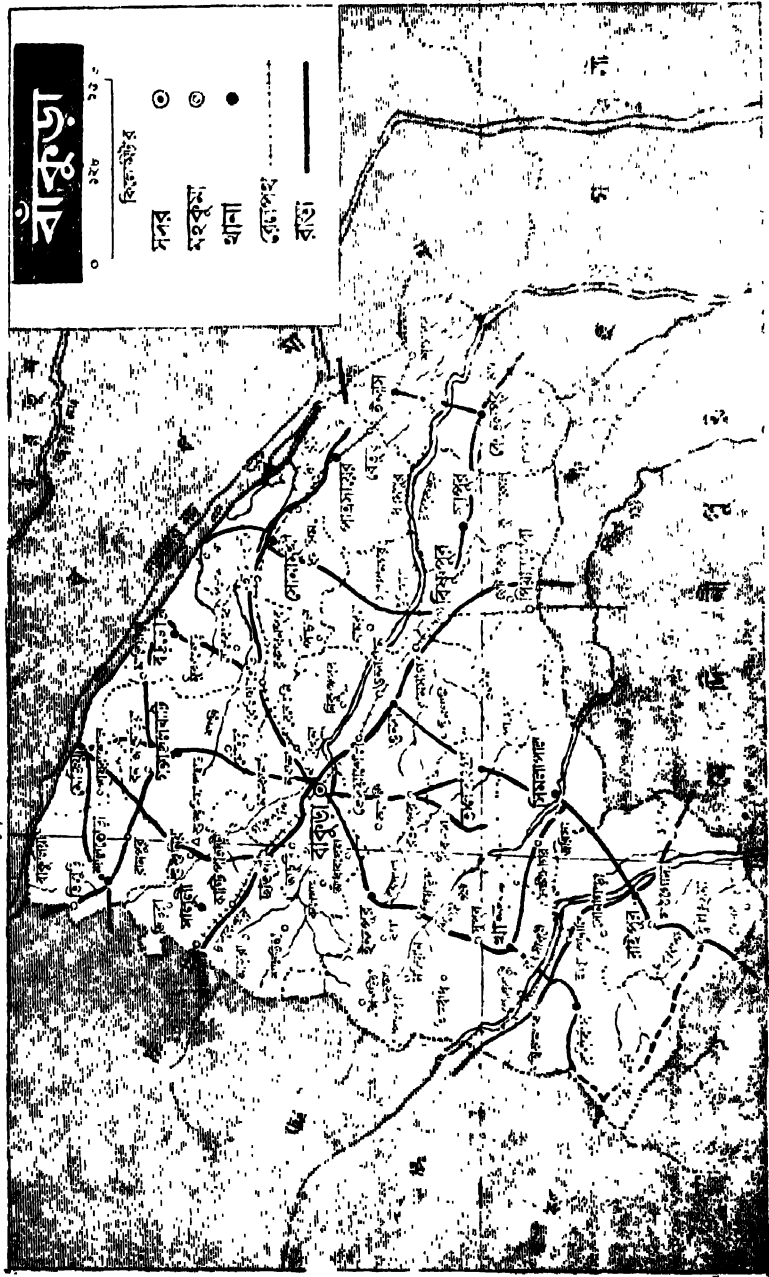
গৌড়দেশের পশ্চিম, বীরদেশের পূর্ব ও দামোদরের উত্তরপ্রদেশ সুহ্ম নামে কীর্তিত। সমস্ত বর্ণনার ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বর্তমান হুগলি জেলাকেই প্রাচীন সুহ্ম বা রাঢ়দেশের কেন্দ্রস্থল বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার সীমানা মেদিনীপুর থেকে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বীরভূমির 'বীর' কথা মুণ্ডারী কথা, অর্থ হল 'জঙ্গল'। বীরভূম মানে জঙ্গলভূম। ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলমহল ইত্যাদি নামের মধ্যেও জঙ্গলের ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। শ্রীচৈতন্য ছত্রভোগেব প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে পরামর্শ করে যে বনাকীর্ণ পথ ভেদ করে কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, 'শ্রীচৈতন্যচরি ামৃতে' তার এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা।
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা॥
নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
হস্তী ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিযা॥
পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডাব শূকবগণ।
তাব মধ্যে আবেশে প্রভু কবেন গমন॥
ময়ুবাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে 'কৃষ্ণ' বলে, নাচে মত্ত হৈয়া॥
'হবিবোল' বলি প্রভু কবে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি॥
ঝাবিখণ্ডে স্থাবব জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত॥

প্রভুর (শ্রীচৈতন্যের) আবেশমগ্ন কৃষ্ণনাম শুনে হাতি বাঘ গণ্ডাব শুয়োর সব পথ ছেড়ে দিচ্ছে, ময়ূরেরা পেখম তুলে নাচছে, মানসচক্ষে দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। মনে হয়, সুন্দরবন অঞ্চলে একালের হরেকৃষ্ণভক্তরা এবম্প্রকার রোমাঞ্চকর একটি দৃশ্য যদি রচনা করতে পারতেন! সে যাই হোক, ঝাডখণ্ড সিংহভূম মানভূম মল্লভূম সামন্তভূম বরাহভূম বীরভূম—পশ্চিমবাংলাব সীমান্ত অঞ্চল। একদিকে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণার পার্বত্যভূমি ও গভীর অরণ্য, অন্যদিকে শস্যশ্যামলা বাংলার সমতলভূমি—এই দুয়ের মধ্যে রাঢ়দেশ। রাঢ়দেশে তাহ্ আযপূর্ব নিষাদ (আদি-অস্ত্রালয়েড) ও দাস-দস্যুদের (দ্রাবিড়ভাষী) আধিপত্য। রাঢ়ের বা পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাই নিষাদ-দস্যু-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। উত্তরবঙ্গে যেমন কিরাত-সংস্কৃতির (ইন্দো-মোঙ্গলয়েড) সংমিশ্রণ ঘটেছে হিন্দু-সংস্কৃতিব সঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে

(রাঢ়ে) তেমনি তার সংমিশ্রণ ঘটেছে নিষাদ ও দাসদস্যু-সংস্কৃতির সঙ্গে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের অনুসন্ধানের বিশাল ক্ষেত্র হল রাঢ়দেশ।

বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর জেলে বাগদি বাউরি হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতির আধিপত্য এখনও বেশি পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে রাঢ়দেশে। এ আধিপত্য আগে আরও বেশি ছিল মনে হয়। সাম্প্রতিক লোকগণনাতেও দেখা গিয়েছে যে, এই সব জাতির আধিপত্য এখনও বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর অঞ্চলে (অর্থাৎ রাঢ়দেশে) প্রায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আদিমজাতির মধ্যে রাঢ়ে সাঁওতালরাই প্রধান। বর্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-পুরুলিয়া জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মোট সাঁওতালদের চার-ভাগের প্রায় তিন-ভাগ বসবাস করে।[1] 'জাতিপ্রাধান্য' অর্থে সব জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, তথাকথিত উচ্চবর্ণ-বহির্ভূত প্রধান জাতি।

নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে রাঢ়দেশের ব্যগ্রক্ষত্রিয় পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সাঁওতাল মাল-পাহাড়িয়া প্রভৃতির মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য আছে। সামান্য যে পার্থক্য দেখা যায়, তা বিভিন্ন জাতিগত সংমিশ্রণ, দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির জন্য হওয়া সম্ভব। শুধু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবের জন্যই অনেক শতকের মধ্যে যে একটি জাতির জাতিগত দৈহিক বিশিষ্টতার রীতিমতো পরিবর্তন হতে পারে, মাথা ও মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে যেতে পারে, একথা আজ নৃবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। সুতরাং দৈহিক মাপজোকের মধ্যে চুলচেরা সাদৃশ্য বিচার করা অর্থহীন। তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য তুলনামূলক সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ। যুগে যুগে আর্থিক শক্তির প্রভাবে বলিষ্ঠ জাতি যত দ্রুত ক্ষীণ দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়, তত দ্রুত কোনো ঐতিহাসিক শক্তির প্রভাবে কোনো জাতির মৌল সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির পরিবর্তন হয় না। লৌকিক সংস্কৃতির 'কঙ্কাল' দীর্ঘকালস্থায়ী, দৈহিক কঙ্কালের তুলনায়। পশ্চিমবঙ্গের জেলে-বাগ্‌দিদের স্ত্রী-পুরুষ-শিশুর চেহারা দেখলেই একথার তাৎপর্য বোঝা যায়। এদের দারিদ্র্য বর্ণনাতীত। একসময় যারা বাংলার যোদ্ধৃজাতি ছিল, আজ তারা দারিদ্র্যের চাপে প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কিন্তু তবু এদের পূজাপার্বণ আচার-অনুষ্ঠান ধ্যানধারণা-বিশ্বাস নিয়ে যে সংস্কৃতি, তা বহু যুগ উত্তীর্ণ হয়ে আজও প্রায় অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে বলা চলে।

বাংলার অনুচ্চবর্ণের মানুষের বাংলার লৌকিক সংস্কৃতিতে দান এত বেশি যে,

১ The Tribes and Castes of West Bengal : A. Mitra : W.B. Govt. 1953, p p 83-198.

তার বিচারবিশ্লেষণের অভাবে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। বাংলা দেশে জেলে বাগদি ডোমদের কেন্দ্র করে অসংখ্য কিংবদন্তী কাহিনী লোকপুরাণের সৃষ্টি হয়েছে। কত রাজবংশের উৎপত্তির কাহিনীর সঙ্গে যে বাংলার জেলেরা জড়িত তার ঠিক নেই। মল্লভূমের রাজাদের কাহিনীও তাই। যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্যবীরত্বের লোককথাও এই সমস্ত জাতির ঐতিহ্যমূল থেকে উৎসারিত। বাঙালীর সংস্কৃতির অনেকটা ক্ষেত্র এরাই অধিকার করে আছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরের গায়ে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অশ্বারোহী ধনুর্বাণধারী মল্লবীরদের চিত্র পোড়ামাটির ইঁটের গায়ে শিল্পীরা খোদাই করে রেখেছেন। বোঝা যায়, তখনও বাংলার স্থানীয় সামন্ত রাজাদের সিংহাসন ইংরেজদের কামান-বিস্ফোরণে টলমল করে ওঠেনি। তখনও অনুচ্চ সমাজের লোকেরা বীর যোদ্ধা ছিল, বাঙালীর গৌরব ছিল। ইতিহাসের কয়েকটি জীর্ণ ছিন্নপত্রের মতো বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি দেখতে দেখতে বাঙালীর অতীত দিনের এই সব স্মৃতি ভেসে উঠছিল চোখের সামনে।

দলমর্দন (দলমাদল) কামান এখন নিস্তব্ধ। ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্ধর্ষ মারাঠা-বাহিনীর বিরুদ্ধে দলমর্দন গর্জন করে উঠেছিল মল্লভূমির রাজধানী বিষ্ণুপুরের দুর্গ থেকে। মল্লভূমবাসীদের বিশ্বাস, রাজদেবতা মদনমোহন স্বহস্তে দলমাদল ধারণ করে বন-বিষ্ণুপুরের অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। বাংলার দলমাদলের গর্জনে মারাঠা দস্যুরা বিপর্যস্ত হয়ে অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। তারপর আরও অনেক কামান গর্জে উঠেছে মল্লভূমি থেকে, বিদেশী ব্রিটিশ দস্যুদের বিরুদ্ধে। প্রায় একশতাব্দী ধরে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র মল্লভূম বীরভূম ঝাড়খণ্ড সিংহভূম মানভূম অঞ্চলে হাজার হাজার চুয়াড় আদিবাসী সাধারণ চাষীরা গণবিদ্রোহে গর্জন করে উঠেছে ব্রিটিশরাজ ও তাদের অনুচরদের বিরুদ্ধে। আজ সব নিস্তব্ধ। দলমাদল ঐতিহাসিক কৌতূহলের বস্তুরূপে সংরক্ষিত, বাকি অধিকাংশই মল্লভূমের ভূগর্ভে সমাধিস্থ। তাই মনে হয় স্বাধীন বাংলার এক অতীত যুগের স্বপ্নপুরী বিষ্ণুপুর।

মধ্যরাত্রে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে গড়দরজার কাছে দেওয়ান-বাড়ি যাবার পথে বারবার আমার এই কথা মনে হচ্ছিল (১৯৫৩-৫৪)। বাংলার অন্যান্য মফঃস্বল শহরের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের একটা পার্থক্য আছে, প্রতি মুহূর্তে সেটা অনুভব করছিলাম। শহরের একাংশের নাম 'মারাঠা ছাউনি' এবং তারই দক্ষিণে 'বীর দরজা', প্রাচীন

দুর্গের প্রবেশদ্বার। মাঝরাতে সমস্ত শহর নিঝুম নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছিল যেন ঐতিহাসিক স্মৃতির স্বপ্ন দেখছে ঘুমন্ত বিষ্ণুপুর এবং সর্বাঙ্গ তার স্বপ্নস্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ইতিহাস অনেক সময় কাব্যের চেয়েও বেশি রোমান্টিক মনে হয়, অন্তত বিষ্ণুপুরে আমার তাই মনে হয়েছে। দেওয়ানবাড়ির অতিথি, সুতরাং গড়দরজার কাছে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক স্মৃতির ভগ্নস্তূপের কোলে আমি আশ্রয় নিয়েছি, রোমাঞ্চ হওয়া স্বাভাবিক। মা-দিদিমাদের কাছে বসে গল্প শুনেছি, অতীত দিনের নানারকমের টুকরো কথা—রাজার কথা, রাজকর্মচারীদের কথা, বিষ্ণুপুরের বিচিত্র সব উৎসবপার্বণের কথা, ছড়া প্রবাদ আচার-অনুষ্ঠানের কথা। যত শুনেছি দেখেছি তত মনে হয়েছে, বিষ্ণুপুরকে যাঁরা 'ইন্দ্রপুরী' বলে গিয়েছেন তাঁরা শুধু বড় বড় বাঁধ গড় দুর্গ মন্দির দেখে বলেননি, বিষ্ণুপুরবাসীর উৎসবপার্বণ শিল্পকলায় অপূর্ব মানৈশ্বর্যের বিকাশ দেখে বলেছিলেন। বড় বড় ইমারত অট্টালিকা, স্তূপীকৃত ইটের রুচিহীন প্রাসাদ বা গৃহ বিষ্ণুপুর শহরে বেশি নেই, বোধহয় অন্যান্য মফঃস্বল শহরের তুলনায় সবচেয়ে কম। মারওয়াড়ী বণিকরা অভিযান করলেও কদর্য ইটের স্তূপে বিষ্ণুপুর ছেয়ে যায়নি। এখনও বিষ্ণুপুরে ছবির মতো খড়ের বাঁকানো চালের ইটের ও মাটির ঘর (বাংলা ঘর) দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মনে হয় বিষ্ণুপুরে বাঙালী আজও বেঁচে আছে, অর্থের আভিজাত্যে তার রুচি বিকৃত হয়নি। বাংলার ঐতিহ্যের প্রতি বিষ্ণুপুরের যেন একটা নাড়ীর টান আছে বলে মনে হয়। শুধু বিষ্ণুপুরের লোকালয় নয়, দেবালয়গুলি দেখেও তাই মনে হয়। বর্তমানে অবশ্য ইটের কদর্যতা বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করছে।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে। 'নহ্যমূলাঃ জনশ্রুতিঃ"। জনশ্রুতির মূল একটা থাকে, কিন্তু কালক্রমে সেই মূল থেকে এত ডালপালা গজিয়ে ওঠে যে শেষ পর্যন্ত মূলটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছ থেকে হাণ্টার সাহেব রাজবংশের উৎপত্তির যে কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন ('স্ট্যাটিস্টিকাল অ্যাকাউণ্ট অফ্ বেঙ্গল' এবং 'অ্যানাল্স অফ্ রুর‍্যাল বেঙ্গল' গ্রন্থে) তার সঙ্গে 'গেজেটিয়ারে'র জন্য ও'মালী সংগৃহীত (রাজবংশের নথিপত্র থেকে) বিবরণের পার্থক্য আছে। বোঝা যায় যে প্রাচীন কিংবদন্তী ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মল্লরাজারা যখন সভাপণ্ডিতকে দিয়ে বংশবৃত্তান্ত রচনা করিয়েছেন, তখন ভিতর থেকে জেলে বা আদিবাসীদের সঙ্গে আদিমল্লের সম্পর্কের সমস্ত কাহিনী ছেঁটে ফেলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের কথা যোগ করেছেন এবং তাঁরা যে উত্তর ভারতের রাজপুত বংশজাত তাও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাংলার এই সব 'রাজবংশচরিত' ও

'কুলপঞ্জিকা'র একটা উপসর্গ মনোবিজ্ঞানীদের সহজেই নজরে পড়বে—সেটার নামকরণ করা যায় 'ক্ষত্রিয়-কম্‌প্লেক্স' এবং 'রাজপুত-কম্‌প্লেক্স'। হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্যের এটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অধিকাংশ ঐতিহাসিক সমাজতত্ত্ববিদ্ জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা এইসব বংশচরিত ও কুলপঞ্জীর ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন। এগুলির যে একেবারেই কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা নয়, যথেষ্ট মূল্য আছে, কারণ বংশোৎপত্তির পরস্পর-বিরোধী কাহিনীগুলি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে অনেক গোপন তথ্যের, অজানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আপাততঃ বিষ্ণুপুর রাজবংশ প্রসঙ্গে তা করবার প্রয়োজন নেই। একদল ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুরের রাজাদের স্থানীয় অধিবাসীদের বংশধর বলে মনে করেন। আমারও ব্যক্তিগত ধারণা তাই এবং তা নিয়ে বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বিষ্ণুপুরের রাজারা বাঙালী এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন বাঙালী সামন্ত রাজাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। অবশ্য 'একদা' ছিলেন, এখন 'রাজা' নামটি আছে, 'রাজত্ব' নামেও নেই।

বিষ্ণুপুরের রাজাদের শৌর্যবীর্যের কাহিনী, স্বাধীনতা-প্রীতির কাহিনী, সাংস্কৃতিক বদান্যতা, ধর্মানুরাগ ও উদারতার কাহিনী আজ রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এককালে ঐতিহাসিক সত্য ছিল। সুবিস্তৃত মল্লভূমের স্বাধীন রাজা ছিলেন তাঁরা, 'মল্লাবনীনাথ' বলে পরিচিত। মল্লভূমের সীমানা তখন উত্তরে সাঁওতাল-পরগণার দামিন-ই-কো, দক্ষিণে মেদিনীপুরের একাংশ, পূর্বে বর্ধমানের একাংশ এবং পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগপুরের অনেকটা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা যে মল্লবীর ছিলেন তা তাঁদের আদিমল্ল জয়মল্ল কালুমল্ল বীরহাম্বীর প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়। হিন্দুযুগে মল্লরাজাদের সঠিক কোনো ইতিহাস জানা যায় না। মনে হয়, বাংলার পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যান্য স্বাধীন স্থানীয় রাজাদের মতো তাঁরাও রাজত্ব করতেন এবং প্রতিবেশী দুর্বল রাজা, গোষ্ঠী ও কৌম (ট্রাইব্যাল) সর্দারদের পরাজিত করে ক্রমে রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছেন। সীমান্তের আদিবাসী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে মল্লরাজাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং সেইজন্য তাদেরই রাজা বলে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। বাংলার আদিবাসী, বাগদি ডোম প্রভৃতি জাতি বীর যোদ্ধার জাতি এবং বাঙালীর বীরত্বের কাহিনীর প্রধান নায়ক তারাই। আজও মধ্যে মধ্যে বীরভূম বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ডোমদের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে পথে বেরুতে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধযাত্রার চমৎকার বর্ণনা আছে। এইসব বর্ণনা থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী ও তারও

আগেকার যোদ্ধা বীর বাঙালীর ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মল্লভূমবাসী জনৈক ধর্মমঙ্গল রচয়িতার বর্ণনা থেকে এই বর্ণনা কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

গজপৃষ্ঠে ধাড ধাড বাজে ঘোড়া দামা
সাজিল ভূপতি রায় মাহুত্তার মামা।
আগে চলে বার ঘণ্টা পতাকা নিশান
ছাব্বিশ হাজার ঘোড়া চলে কানে কান।
সাজিল প্রধান ঢালি বুড়া কুম্ভকার
মত্ত · ধানুকি কলসার।...
বায়বাঁশ · · খণ্টল লথে লাথ
টমক ধামসা বাজে রণশিঙ্গা ঢাক।
তিন হাজার সেনা সঙ্গে হাথে ধনুঃশর
হাড়িগা চামর বান্ধা বাঁশের উপর।...
রাম বাগ চাষা সাজে সমরে প্রচণ্ড
যমকে নাশিতে পারে যুঝ্যা এক দণ্ড।...
ছ' বুড়ি মাদল বাজে তের পণ ঢোল
আগে ধায় বন্দুকি ধানুকি কত কোল।

এর মধ্যে প্রধান ঢালি বৃদ্ধ কুম্ভকার আছে, সাধারণ চাষী আছে, যে যমকে পর্যন্ত দু'দণ্ড যুঝতে পারে, বন্দুকি ধানুকি আদিবাসী কোল আছে, মাহুত্তার মামা ভূপতি রায় আছে, ছাব্বিশ হাজার অশ্বারোহী, তিনহাজার ধনুর্বাণধারী প্রভৃতি আছে। একেবারে আদর্শ জনসেনাবাহিনী। কোনো বিদেশী রাজা বা অপ্রিয় রাজার সাহস হত না এই রকম জনসেনা গঠন করতে। শুধু এই বর্ণনার মধ্যে নয়,

আগে ডোম বাগে ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
ঢাল মেঘর ঘাঘর বাজে

বাংলায় এই ধরনের জনপ্রিয় ছড়ার মধ্যেও সেকালের জনসেনার স্মৃতি সম্পূর্ণ অম্লান রয়েছে। এই সব ছড়ার উৎপত্তি অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে এবং মনে হয় মল্লভূম অঞ্চলে।

মল্লভূমের রাজাদের স্বাধীন রাজশক্তির আভাস পাওয়া যায় এইসব লোকপ্রবাদ কাহিনী ও ছড়ার মধ্যে। প্রবাদ আছে, রঘুনাথ সিংহ একবার মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে গিয়ে দেখেন যে, নবাবের একটি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ঘোড়াকে স্নান করাবার জন্য ষোলজন অশ্বারোহী ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে তিনি বিদ্রূপ করে বলেন : 'একটি

ঘোড়ার জন্য ষোলজন লোকের দরকার হল ?' নবাব তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। রঘুনাথ সিংহ অম্লানবদনে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আটদিনের পথ নয় ঘণ্টায় ঝড়ের বেগে ঘুরে এসে বলেন : 'এই নিন আপনার ঘোড়া, বেশ দৌড়য় ভাল!' বিষ্ণুপুরের রাজার রাজস্ব মকুব করে নবাব সসম্মানে তাঁকে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেন। কাহিনী হলেও এ-কাহিনীর বৈশিষ্ট্য আছে, বীরত্বের বৈশিষ্ট্য। মল্লভূম রাজবংশাশ্রিত অধিকাংশ কিংবদন্তী ও কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বোঝা যায়, স্বাধীন রাজার সুদীর্ঘ বীরত্বের ঐতিহ্য এর মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বীরহাম্বীরের রাজত্বকাল থেকে আমরা বিষ্ণুপুরের রাজাদের মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি। মোগল-পাঠানে যুদ্ধ চলছে তখন বাংলাদেশে। পাঠান আমলে এবং মোগল আমলেও দেখা যায়, মুসলমান শাসকেরা সীমান্তের হিন্দুরাজা বিষ্ণুপুর-রাজাদের আভ্যন্তরিক রাজ্যশাসন ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি। মুর্শিদকুলি খাঁ পর্যন্ত না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা করেছিলেন। ব্রিটিশ আমলে বর্ধিত রাজস্বের দায়ে, দুর্ভিক্ষের চাপে ও ঘরোয়া গোলযোগের মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজবংশের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। দুর্দিনের সময় অন্তর্দ্বন্দ্বও বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিষ্ণুপুরের রাজাদের চরম দুর্দিন দেখা দেয়। ১৮০৬ সালে বর্ধমানের মহারাজা নিলামে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধিকাংশ সম্পত্তি কিনে নেন। গবর্নমেন্টের সামান্য বৃত্তি ও দেবোত্তর সম্পত্তিটুকু শুধু সম্বল থাকে রাজাদের। তাই নিয়ে তাঁরা বিষ্ণুপুরে, ইন্দাসে, জামকুণ্ডী ও কুঁচিয়াকোলে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় জীবনযাপন করতে থাকেন। ইংরেজ আমলে বাংলার পশ্চিম-সীমান্তের অন্যতম স্বাধীন রাজবংশের রাজত্বের ইতিহাস এইভাবে শেষ হয়ে যায়। ইংরেজের কৃপাদৃষ্টিতে অবশেষে পত্তনিব্যবস্থার মাধ্যমে বর্ধমানের মহারাজার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের অধঃপতন এবং বর্ধমান রাজবংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় ইংরেজ শাসনকালে।

মল্লরাজ বীরহাম্বীরের রাজত্বকালে আর-একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে মল্লভূমের ইতিহাসে। শক্তির পূজারী মল্লভূমবাসীর রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিষ্ণুপুরের রাজারা পরম বৈষ্ণব হয়ে পড়েন এবং শুধু বৈষ্ণবধর্মের নয়, বৈষ্ণব-যুগের বাংলা সাহিত্যেরও তাঁরা বিশেষ পোষকতা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে এমন কবি অল্পই ছিলেন, মল্লরাজবংশের প্রশস্তি যাঁরা গাননি। মল্লরাজারা ও রাজান্তঃ-

পুরের মহিলারাও বৈষ্ণবশাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁরা নিজেরা অনেক বৈষ্ণব পদও রচনা করেছেন।

কিন্তু বাঙালীর অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভাবাতিশয্য। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে মল্লরাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে ক্রমে বৈষ্ণব আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে আবশ্যিক করলেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অত্যুগ্র বৈষ্ণবতা কিরকম হাস্যকর হয়েছিল তার একটু দৃষ্টান্ত রূপরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' থেকে দিচ্ছি :

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী,
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আদি থাকে উপবাসী।
চারা মানা হাথিকে ঘোড়াকে মানা ঘাস,
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।

কবি ইঙ্গিত করেছেন, একাদশীর দিনেও বিষ্ণুপুরের পোষা জন্তুদের খাদ্য দেওয়া হত না। 'গোপাল সিংহের বেগার' প্রবাদের মধ্যে এই উৎকট বৈষ্ণবতার ইঙ্গিত আছে। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজারা যেমন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ করেছেন, তেমনি ক্রমে তার উৎকট আতিশয্যের জন্য নিজেদের শক্তিক্ষয় নির্বীর্যায়ন এবং অধঃপতনের পথও সুগম করেছেন। শক্তি ও বলবীর্যের পূজারীরা অবশেষে রাজ সুদ্ধ একাদশী করে ও গোপাল সিংহের বেগার খেটে নির্বীর্য শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন। তারপর ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের ক্রমাগত ধাক্কায় তার ভিত্ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে দেরি হয়নি। বাংলার ঐতিহাসিক পশ্চিমপ্রান্তের বীর প্রহরী বিষ্ণুপুর রাজবংশের পতনের পর বাঙালীর স্বাধীন জীবনের সূর্য অস্ত গিয়েছে। বিষ্ণুপুরের দুর্গের দিকে চেয়ে, দলমাদল কামানের দিকে চেয়ে, কেবল এই কথাই মনে পড়ে।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়

আকবর বাদশাহের সমসাময়িক মল্লভূমের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বীরহাম্বীর। বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ মল্লভূমের রাজা হঠাৎ বন-বিষ্ণুপুরকে ইন্দ্রপুরীতে পরিণত করার স্বপ্ন দেখলেন কেন? শ্বেতপাথরের প্রাসাদ অট্টালিকাবহুল বিষ্ণুপুরের যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, আজ তার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না বিষ্ণুপুরের কোথাও। বিষ্ণুপুরের দুর্গের মধ্যে রাজবাড়ির যে ভগ্নস্তূপ আছে, তার ভিতর থেকে কোনো বিশাল রাজপ্রাসাদের শ্বেতপাথরের কঙ্কাল অত্যুগ্র কল্পনার জীবনকাঠির স্পর্শেও চোখের সামনে ভেসে ওঠে

না। সাধারণ মনুষ্যালয়ের মতো বিষ্ণুপুরের রাজাদের বসতবাড়ি, দোতলাও নয়, একতলা। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি দেখে। বাংলার যে-কোনো নগণ্য জমিদারের বাড়ির সঙ্গে তুলনা করলেও বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি মনেহয় যেন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। এ-সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে বিষ্ণুপুরে। কেউ বলেন, আসল রাজবাড়ি ভূগর্ভে প্রোথিত। কিন্তু তা কল্পনা করার কোনো কারণ নেই। কানিংহামের আমল থেকে একাধিক প্রত্নতাত্ত্বিক বিষ্ণুপুর এসেছেন, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় গৃহ-দেবালয়াদি পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু অতীতের কোনো বিশাল রাজপ্রাসাদের জীর্ণ বা লুপ্ত কঙ্কালের ইঙ্গিতও কেউ পাননি কোথাও। তাঁদের বিবরণীর মধ্যে তার আভাসও নেই। বিষ্ণুপুরের লোকসাধারণের বিশ্বাস, বিষ্ণুপুরের লোকপ্রিয় রাজারা সাধারণ বাসগৃহ ছেড়ে রাজপ্রাসাদে বাস করতে চাননি এবং দুর্গের ভিতরে বা বিষ্ণুপুরে, দেবালয় ছাড়িয়ে অন্য কোনো আলয়, রাজার বা প্রজার, সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়াক, এ তাঁদের কাম্য ছিল না। বিষ্ণুপুরের একাধিক লোককে প্রশ্ন করে এই উত্তর পেয়েছি। সাধারণের এই বিশ্বাসের মূলে কিছুটা ঐতিহাসিক সত্য থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলার দেবদেবালয়প্রধান স্থান বিষ্ণুপুর হল কি করে? মল্লরাজারা কিসের প্রেরণায় তাঁদের রাজধানীতে এত বিচিত্র দেবালয় নির্মাণ করলেন? বাংলার ভাস্কর স্থপতি সূত্রধর-শিল্পীদের বিস্ময়কর কলাকুশলতার কীর্তিনগরী বিষ্ণুপুর, কালের যাবতীয় ভাগ্যবিপর্যয় ও ঘটনাবর্তের মধ্যে অমর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মল্লরাজা বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। এসম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়দেশে একগাড়ি বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠাচ্ছিলেন, শ্রীনিবাস নরোত্তম ও শ্যামানন্দের তত্ত্বাবধানে। বনজঙ্গল পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে তাঁরা বন-বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছলেন—

এথা তো আচার্য ঠাকুর বনেতে ভ্রমিয়া
একদিন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল গিঞা।

পথে মল্লভূমের গোপালপুর গ্রামে দস্যুরা বৈষ্ণবগ্রন্থাদি লুঠ করে। শোনা যায়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেরও সদ্যোসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি তার মধ্যে ছিল। লুটের সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস সংজ্ঞা হারান এবং কেউ বলেন অল্পদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। যাই হোক, দস্যুদের হাতে নিগৃহীত হয়ে তাঁরা

বনপথে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হন। বিষ্ণুপুরের মধ্যে প্রায় দশদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শ্রীনিবাসাদি আচার্যরা একদিন পথের ধারে বৃক্ষতলে বসে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় একজন সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমারকে দেখে শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করেন :

কহ দেখি কেবা রাজা কি নাম হয়।
ধার্মিক কি অন্য মন তাহার আশায়॥
তিঁহো কহে রাজা হয় বড় দুরাচার।
দস্যুবৃত্তি করে সদা অত্যন্ত দুর্বার॥
ধরে কাটে ধন লুটে নাচলে ঘাট বাট।
বীর হাম্বীর নাম হয় রাজার মল্লপাট।

মল্লরাজা বীর হাম্বীর ও তাঁর পূর্বপুরুষদের আচার-ব্যবহারের ইঙ্গিত করা হয়েছে এর মধ্যে এবং ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরও উল্লেখযোগ্য, সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমারের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলানো হয়েছে। কোনো আর্যনন্দন যেন স্থানীয় অনার্য রাজার বর্বরাচার বর্ণনা করেছেন। এই বীরহাম্বীরকে শ্রীনিবাসাচার্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। লুণ্ঠিত পাণ্ডুলিপির সন্ধানে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি বীরহাম্বীরকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন যে মল্লরাজার তাতে ভাবান্তর হয়েছিল, কৃষ্ণনাম শুনে বনের হাতিবাঘভাল্লুক যেমন হত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বীর হাম্বীরের এই দীক্ষাগ্রহণ, মল্লভূমের নয় শুধু, বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

অথচ মল্লভূমে বিষ্ণুপূজার প্রচলন যে বীরহাম্বীর বা মল্লরাজাদের সময় থেকে হয়েছিল, তা নয়। রাঢ়ের স্বাধীন বাঙালী রাজাদের মধ্যে শুধু যে মল্লরাজাই ছিলেন, তাও নয়। তাঁদের পূর্বে অনেক শক্তিশালী স্বাধীন রাজার আবির্ভাব হয়েছিল রাঢ়দেশে। বাঁকুড়া শহরের প্রায় বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহাপ্রাচীরের একটি লিপিতে দেখা যায়, পুষ্করণার অধিপতি ছিলেন রাজা চন্দ্রবর্মা। শুশুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তর-পূর্বের পোখনা গ্রামটিকেই প্রত্নতত্ত্ববিদরা 'পুষ্করণা' বলে মনে করেন। রাজা চন্দ্রবর্মা ছিলেন চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক। সুতরাং বিষ্ণুর উপাসনা রাঢ়দেশে চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীস্টাব্দ থেকে যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা জানা যায়। তাহা ছাড়া বিষ্ণুমূর্তি এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে, চৈতন্যপূর্ব যুগেও যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবদের বেশ আধিপত্য ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায়। বিষ্ণুর শিলামূর্তি ও দশাবতারের পূজা আগে থেকেই বাংলা দেশে চলে আসছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁর শিষ্যরা গোপাল

মূর্তির পূজার প্রচলন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজার প্রবর্তন করেন। গৌর-নিতাই মূর্তিপূজার প্রচলন করেন প্রায় এইসময় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ও অম্বিকা-কালনার গৌরীদাস পণ্ডিত। এই পূজার প্রথম ব্যবস্থাপক হলেন অদ্বৈত আচার্য।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব দেবতা প্রতিষ্ঠিত, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, মদনমোহন, মদনগোপাল প্রভৃতি। বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পরই বিষ্ণুপুরের রাজারা এইসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং দেবালয়গুলির প্রাচীনত্বের সীমারেখা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত টানা যায়, তার আগে নয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রাও দেবালয়ের লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করে এবং অন্যান্য দিক থেকে বিচার করে তাই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু তার আগেও নিশ্চয় মল্লরাজারা দেবদেবীর পূজা করতেন এবং কোনোপ্রকারের ধর্মাচরণে বিশ্বাসীও ছিলেন। কি সেই ধর্ম? এককথায় বলা যায়, আজও সারা রাঢ়দেশ ও মল্লভূমের যা প্রধান লোকধর্ম শাক্ত-শৈবধর্ম এবং আদিম কৌমধর্ম, মল্লরাজারা প্রধানত তারই পোষকতা করতেন। রাজ্যের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবরা যে ছিলেন না (চৈতন্য-পূর্ব যুগের) তা নয়। ছিলেন, তবে তাঁরা প্রধানত সমাজের উচ্চবর্ণভুক্ত ছিলেন। মল্লভূমের সাধারণ লোকসমাজে শক্তিপূজার নানারকম লৌকিক রূপের প্রচলন ছিল সবচেয়ে বেশি। এত বেশি যে বিষ্ণুপুরের রাজাদের পরবর্তীকালের বৈষ্ণবভক্তির উৎকট আতিশয্য ও আবশ্যিক বিধিনিষেধের দৌরাত্ম্যেও তার প্রভাব লোকসমাজে বিশেষ কমেনি। আজও অনুচ্চবর্ণ পরিবেষ্টিত বিষ্ণুপুরে কালীপূজা মনসাপূজা ভৈরবপূজা বড়মপূজা ধর্মপূজা ইত্যাদির অত্যধিক প্রাধান্য রয়েছে দেখা যায় এবং এইসব উৎসবে তান্ত্রিকোচিত আচার-অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যই (মদ্যপান বলিদান ইত্যাদি) উল্লেখ্য। 'নরোত্তমবিলাসে'র বর্ণনার কথা মনে হয়:

> করয়ে কুক্রিয়া যত কে কহিতে পারে।
> ছাগ মেষ মহিষ শোণিত ঘর দ্বারে॥
> কেহ কেহ মানুষের কাটা মুণ্ড লৈয়া।
> খড়্গ করে করয় নর্তন মত্ত হৈয়া॥

যাঁরা বিশ্বাস করবেন না, তাঁরা পৌষসংক্রান্তির দিন বিষ্ণুপুরের বাউরিদের বড়মপূজার উৎসবটি দেখবেন। বরাহ-শিকার বলিদান ও মদ্যপানোৎসবের ভয়াবহ রূপ দেখলে 'নরোত্তমবিলাসে'র কথা মনে হবে। এরকম আরও অনেক উৎসব আছে এবং তারই সঙ্গে আছে রাসলীলা দোল ইত্যাদি। দুটি উৎসবের স্বতন্ত্র প্রতিপত্তির

ধারা বুঝতে কষ্ট হয় না। তাদের বিচিত্র মিলন-মিশ্রণও লক্ষণীয়। কিংবদন্তী হল বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর সামনে আগে নরবলি হত। খড়বাংলোর প্রাচীন মন্দিরে আজও চণ্ডী দুর্গা ইত্যাদি পূজিত হন। বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে আজও কর্মকার 'পণ্ডিত' পূজিত বুড়োধর্ম আছেন। শুধু ধর্মপূজা নয়, বিষ্ণুপুরের ভৈরবপূজাও উল্লেখযোগ্য। যে-সে ভৈরব নয়, ঝোপেঝাড়ের ভৈরব। এগুলি সব বৈষ্ণবপূর্ব যুগের বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মোৎসবের ধারা বহন করছে। বিষ্ণুপুরের উৎসব-পার্বণ প্রসঙ্গে পরে এবিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে, বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবপ্রধান দেবদেবী ও দেবালয়ের মধ্যেও এইসব দেবদেবীরা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসহ বিরাজ করছেন। তাঁরা অবশ্য অনেকেই আলয়হীন, কেবল বুড়ো ধর্ম চণ্ডী-দুর্গা ও মল্লেশ্বর শিবের একটি করে দেবালয় আছে।

অধিকাংশ দেবালয় আজ দেবতাশূন্য, বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরে। তার মধ্যে পাশাপাশি একজোড়া করে চারটি রেখদেউল এবং দুর্গের বাইরে 'রাসমঞ্চ' পরিচিত পিরামিডতুল্য গৃহটি দর্শনীয়। কানিংহামের আমলে ১৮৭২-৭৩ সালে বেগলার সাহেব যখন বিষ্ণুপুর গিয়েছিলেন (প্রায় একশো বছর আগে) তখন তিনিও এই রাসমঞ্চটি দেখে মন্তব্য করেছিলেন—'the very curious pyramidal structure known as the Rasmancha।' পিরামিডের পাদদেশে সারবন্দী বাংলা দোচালা ও চারচালা ঘর অলঙ্কাররূপে রূপায়িত করা। দুর্গের ভিতরের চারটি দেউলের কথা কেউ উল্লেখ করেননি এবং কেন করেননি জানি না। বরাকরের দেউল বা চব্বিশ-পরগণার জটার দেউলের মতো প্রাচীন নয়, মনে হয় দেউলগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরি, বিশেষ করে ছোট জীর্ণ দেউল দুটি। পঞ্চকোট-মানভূম থেকে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল পর্যন্ত এই দেউলাকার দেবালয়ের প্রাধান্য বেশি দেখা যায় বাংলা দেশে। বর্ধমান বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় দেউলাকার দেবালয় যে এককালে গঠিত হয়েছিল তাও কয়েকটির অস্তিত্ব থেকে বোঝা যায়। বরাকর বাহুলাড়া, ইছাইঘোষের ও জটার দেউলের মতো মনে হয় বিষ্ণুপুরের দুর্গাভ্যন্তরস্থ দেউলগুলিও বাংলার দেবালয়-স্থাপত্যের ইতিহাসের একটি অধুনালুপ্ত ধারার সাক্ষী দিচ্ছে।

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেবার আগে মল্লরাজরা প্রধানত শিবশক্তির পূজারী ছিলেন, একথা আগে বলেছি। ষোড়শ শতাব্দীর আগেই রাঢ়ের সর্বত্র তন্ত্রাচারের পূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। আদিম কৌমধর্ম ও লোকধর্ম তন্ত্রের প্রসারে ও লোক-

প্রিয়তায় সাহায্য করে। কামরূপের সঙ্গে রাঢ়ের প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক লেনদেনের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বৈষ্ণব দেবালয় নির্মাণের আগে মল্লভূমে শিবমন্দির ধর্মমন্দিব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বিষ্ণুপুরের মধ্যে তার নিদর্শন বিশেষ নেই, দু-একটি ছাড়া। বাইরে আছে। কিন্তু যেজন্যই হোক না কেন, বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে।

খড়বাংলোয় চণ্ডী ও দুর্গার ভাঙা মন্দিবটি ছাড়া মল্লেশ্বরের মন্দিরটি প্রাচীন শিবমন্দির। বিষ্ণুপুরের বর্তমান দেবালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন। মন্দিরগাত্রেব লিপি থেকেও তাই মনে হয়। লিপিটি এই ঃ

বস্তুকব নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতি ললিতং দেব কুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু॥

মল্লাব্দের সঙ্গে খ্রীস্টাব্দেব পার্থক্য প্রায় ৬৯৪ বছরের। এই হিসাবে দেখা যায়, মল্লেশ্বর মন্দিরেব নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬২১ খ্রীস্টাব্দ। 'শ্রীবীর সিংহেন' বলতে রঘুনাথ সিংহের পুত্র বীরসিংহকে নয়, রঘুনাথের পিতা বীরহাম্বীরকেই বোঝায়। অভয়পদ মল্লিক তাঁর 'History of Vishnupur Raj' গ্রন্থে এই বিষয়টি ঠিকই উল্লেখ করেছেন। ব্লক (Bloch) সাহেব তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টে (পূর্ববিভাগ, ১৯০৪-৫) নামের জন্য এ বিষয়ে গোঁজামিল দিতে বাধ্য হয়েছেন। হাম্বীরনন্দন রঘুনাথই প্রথম 'সিংহ' উপাধি পান মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছ থেকে এবং তিনিই বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয় বাঁধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেন। মল্লেশ্বর শিবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়াতে বীরহাম্বীরই নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেবার পর তিনি মন্দিরটি হয়ত অসম্পূর্ণ রেখে দেন। পুত্র রঘুনাথ সিংহ তাকে সম্পূর্ণ করেন এবং মন্দিরগাত্রের লিপিতে পিতার নামটি উৎকীর্ণ করার সময় 'বীরের' সঙ্গে নতুন 'সিংহ' উপাধিও যোগ করেন। রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ ৯৬২ মল্লাব্দে রাজত্ব করেন, সুতরাং তিনি মল্লেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন না। গড়নরীতির দিক দিয়ে মল্লেশ্বর মন্দির 'একক চতুষ্কোণ চূড়াবিশিষ্ট' (Single Square Tower)। বিষ্ণুপুরের অন্যান্য দেবালয়ের মতো বাংলার বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তা তার মধ্যে বিশেষ পরিস্ফুট নয়। কিন্তু চমৎকার হল মল্লেশ্বরের সামনের নন্দী বা বৃষভের মূর্তিটি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছি। মনেহয় যেন মন্থরগতিতে টহল দিয়ে এসে সবেমাত্র নিশ্চিন্তে শয়ন

করেছে। কুঁজ ও গলকম্বলে হাত বুলোতে বুলোতে 'মহানির্বাণতন্ত্রে'র একটি শ্লোকের কথা মনে হল :

দেব্যাগারে মহাসিংহং বৃষভং শঙ্করালয়ে।
গরুড়ং কেশবে গেহে প্রদদ্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥
মহানির্বাণতন্ত্র, ১৩।৩২

অর্থাৎ সাধকোত্তম যিনি তিনি দেবীর আগারে মহাসিংহ, শঙ্করালয়ে বৃষভ এবং কেশবগৃহে গরুড় প্রদান করেন। মল্লেশ্বর মন্দির শঙ্করালয়, তাই শঙ্করের বাহন বৃষভ তার সামনে বিরাজ করছে। মল্লেশ্বর-মন্দির দুর্গের বাইরে দূরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্গের বাইরে তার স্থান কেন? বৈষ্ণব রাজারা পরে শিবকে দুর্গবহির্ভূত করলেও, বর্জন করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, শিবের নামটিও 'মল্লেশ্বর'। দুর্গের বাইরে থাকলেও তিনিই মল্লভূমির মানুষের মানসলোকের অধীশ্বর বলে পরিচিত।

এবারে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করা যাক। দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে প্রথমেই মনে হয় যেন বাংলার দেবালয়ের ঐতিহাসিক জাদুঘরে এলাম। দুর্গটি যেন দেবালয়-সংরক্ষণের জন্যই তৈরি হয়েছিল। বাংলার দেবালয়ের নিজস্ব গড়ন-বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখে বিষ্ণুপুর দুর্গের দেবালয়গুলি বাংলা স্থপতি ও সূত্রধরদের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য ও স্বকীয়তার নিদর্শনস্বরূপ আজও যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার দেবালয়স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে, নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি, তিনি বাঙালী হয়েও বাংলার শিল্পকলার অমরাবতী-দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।

হাম্বীরনন্দন রঘুনাথ সিংহই বিষ্ণুপুর দুর্গের সবচেয়ে সুন্দর দেবালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালানুক্রমে দেবালয়গুলির উল্লেখ করছি। অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তার মধ্যে শ্যামরায়ের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি উল্লেখ্য। লিপি হল :

শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুদে শশাঙ্ক বেদাঙ্ক যুক্তে নব-রত্নরত্নম্।
শ্রীবীরহম্বীর নরেশ সূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ।

লিপি অনুসারে পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ৯৪৯ মল্লাব্দে (১৬৪৩ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। বোধ হয় বাংলাদেশের পঞ্চরত্ন মন্দিরের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন এই মন্দিরটি, বাকি অধিকাংশই যা দেখেছি অন্যান্য অঞ্চলে সব অষ্টাদশ শতাব্দীর। বাঁকানো চালাবিশিষ্ট চারচালা বাংলাঘরের চারকোণে চারটি খর্বাকৃতি 'দেউল', মধ্যে একটি।

লক্ষণীয় হল, 'দেউল' এখানে অলঙ্কার হয়ে উঠেছে। 'পঞ্চরত্নে'র পর উল্লেখ্য হল বিষ্ণুপুরের 'জোড়াবাংলা' মন্দির। লিপি হল :

শ্রীরাধাকৃষ্ণমুদে শুধাংশুরসাঙ্কেমে সৌধগৃহং শকেহদ্বে।
শ্রীবীরহম্বীর নরেশ সূনুর্দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ॥

লিপি অনুসারে 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি ৯৬১ মল্লাব্দে (১৬৫৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। দু খানি দো-চালা বাংলা ঘর পাশাপাশি জুড়ে দিলে যা হয়, 'জোড়বাংলা' মন্দিরটি তাই এবং নামও সেইজন্য 'জোড়বাংলা'। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই জোড়বাংলা মন্দির, বাঙালী সূত্রধরের অভিনব পরিকল্পনা ও স্বকীয়তার প্রমাণ। দেবদেবীকে বাঙালীর মতো পরমাত্মীয় করে এমন আপনজন আর কেউ করতে পারেনি, তাই বাঙালী শিল্পীরাও বাংলার সাধারণ লোকগৃহের সঙ্গে দেবগৃহের সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দেবতার সঙ্গে মানুষের, দেবালয়ের সঙ্গে মনুষ্যালয়ের এমন বিচিত্র আত্মীয়করণ বাংলা দেশের মতো ভারতের আর কোনো অঞ্চলে হয়েছে কিনা জানি না। দক্ষিণভারতে দ্রাবিড়দেশে 'বেসর' ও 'দ্রাবিড়' মন্দিরের গড়নের ক্রম বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ক্রমেই রাজৈশ্বর্যের সঙ্গে দেবৈশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পল্লব-চোল-পাণ্ডীয়-বিজয়নগর মাদুরা পর্যন্ত মন্দিরের সোপানস্তরিত পিরামিড-গঠন এবং অনুরূপ 'গোপুরমে'র উচ্চতা ও বিশালতার ক্রমিক বৃদ্ধি হয়েছে। শেষের দিকে গোপুরম দেবগৃহের ঊর্ধ্বে সদম্ভে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কল্পনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে শক্তির আড়ম্বর এর মধ্যে প্রকট। বাংলার দেবালয়ে বাঙালী রাজারা ও ভূস্বামীরা রাজশক্তির মহিমা প্রচার করতে চাননি। বাঙালী শিল্পীরা তাই লৌকিক আদর্শের ধারা সেখানে সার্থকভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। বাংলার স্থাপত্যের ও বাঙালী শিল্পীর এই এক আশ্চর্য বিশিষ্টতা।

বিষ্ণুপুর দুর্গের মধ্যে আর-একটি জোড়বাংলা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে, সংরক্ষিত নয় বলে বর্তমানে কাঁটাবনের মধ্যে সমাধিস্থ। কাঁটাবনের মধ্যে কোনরকমে ঢুকে কাছে গেলে দেখা যায়, মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজের দু-চারটি নিদর্শন এখনও রয়েছে। মন্দিরটি কেন পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কেন সংরক্ষিত হয়নি, কেউ বলতে পারলেন না। জোড়বাংলা ছাড়া রাধাশ্যামের মন্দির, কালাচাঁদের মন্দির ও মদন-মোহনের মন্দির উল্লেখযোগ্য। একরত্ন-বিশিষ্ট বাংলা চারচালা ঘরের মতো দেবালয়গুলির গড়ন, চালাগুলির বঙ্কিমরেখা অত্যন্ত স্পষ্ট। এছাড়া রঘুনাথনন্দন বীরসিংহ (৯৬৪ মল্লাব্দ, ১৬৫৮ খ্রীঃ) লালজীর মন্দির, তাঁর রানী শিরোমণি দেবী মুরলীমোহনের মন্দির (৯৭১ মল্লাব্দ, ১৬৬৫ খ্রীঃ) ও মদনগোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠা

করেন। রাজা দুর্জনসিংহ প্রতিষ্ঠা করেন মদনমোহনের বিখ্যাত মন্দির। লিপি হল:

শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেষুতৎ প্রীতয়ে।
মল্লাব্দে ফণীরাজ শীর্ষগণিতে মাসেশুচৌ নির্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্ধং স্বচেতাংশিনা।
শ্রীমদ্দুর্জনসিংহ ভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা।

বিষ্ণুপুরের দেবালয়গুলির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি মদনমোহনের মন্দিরটি। সত্যিই 'সুন্দর রত্নমন্দির'ই বটে। একরত্নবিশিষ্ট বড় একটি বাংলা চারচালা ঘরের মতো মন্দিরটি। মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির চিত্র অতুলনীয়। জোড়বাংলা মন্দির ও পঞ্চরত্নটি ছাড়া এরকম অপূর্ব পোড়ামাটির চিত্রাবলী বিষ্ণুপুরের অন্য দেবালয়গুলিতে দেখা যায় না। দেখে মনে হয়, একশো-দেড়শো বছরের মধ্যে এইসব বাঙালী শিল্পী কোথায় লুপ্ত হয়ে গেলেন? এবং কেন গেলেন?

ব্রিটিশ আমলে দেশীয় ভূস্বামীশ্রেণীর একটা বৈপ্লবিক গোত্রান্তর হল। নতুন যাঁরা রাজা-মহারাজা জমিদার হলেন, তারা কেবল অর্থের মালিক হলেন, সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হলেন না। দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করলেন না।

বিসদৃশ এক বিকৃত ইঙ্গ বঙ্গ কালচারের প্রবর্তক হয়ে তাঁরা কবিগান ও খেউড়-আখড়াই গানের আসর জমিয়ে তুললেন। বাইজীনাচ সাহেব-বিবির নাচ, বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর বারোইয়ারী পুজোয় সংস্কৃতিক্ষেত্র সরগরম হয়ে উঠলো। সমাজব্যবস্থার এই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, সংস্কৃতির এই মহাসঙ্কটের মধ্যে, জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে বাংলার সূত্রধর, ভাস্কর ও অন্যান্য লোকশিল্পীরা বিলুপ্ত হয়ে গেলেন। তাই দেখা যায় যে ব্রিটিশ আমলে অনেক দেবালয় তৈরি হলেও, সেখানে বাঙালী শিল্পীদের সেই কলাকুশল হাতের স্পর্শ নেই। বর্ধমানের মহারাজারা যেসব মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সাল তারিখ অনুসারে দেখা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর কোনো-কোনো মন্দিরে কারুকার্যের নিদর্শন কিছু কিছু আছে এবং ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সেগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তখন কেবল মন্দিরের সংখ্যা (যেমন ১০৮ মন্দির) ও চূড়া বেড়েছে, শিল্পৈশ্বর্য একেবারে লুপ্ত। ভূস্বামীদের মধ্যে সাবর্ণ চৌধুরীদের মতো দেবালয় প্রতিষ্ঠা বোধহয় আর কেউ করেননি। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক দেবালয়ে পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন রয়েছে দেখা যায়, যেমন হালিশহরের মন্দিরগুলিতে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা যায়,

মন্দিরের গায়ে বালির ও চুনের পলেস্তারা ছাড়া আর কিছু নেই, এমন কি কালীঘাটের মন্দিরেও নেই। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রানী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন তখন তিনি নিশ্চয় পোড়ামাটির কারুকাজের জন্য কোনো শিল্পীর খোঁজ পাননি। যদি পেতেন তাহলে তার সামান্য নিদর্শনও কোথাও থাকত। তখন বাংলার সূত্রধর-শিল্পীরা প্রায় নিখোঁজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছেন, অন্তত শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে।

বিষ্ণুপুর-রাজের দুর্গোৎসব

দেশাচার কুলাচার-ভেদে বাংলার দুর্গোৎসবের তারতম্য আছে। প্রসিদ্ধ পুরোহিতবংশের এক-এক দুর্গাপূজা-পদ্ধতির পুঁথি আছে। সেই পদ্ধতিতে পুরোহিত যজমানেরা পূজা করে থাকেন। বিভিন্ন রাজবংশেরও ভিন্ন ভিন্ন পূজাপদ্ধতি উৎসব-বৈচিত্র্য আছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবেরও বৈশিষ্ট্য আছে এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে (২৩ অধ্যায়) অর্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে দুর্গার স্তব করছেন এই বলে: "হে গোপেন্দ্রানুজে নন্দগোপকুলসম্ভবে কোক-মুখে! তুমি জম্বু, কতক ও চৈত্য বৃক্ষের কাছে নিরন্তর বিরাজ কর। হে কান্তারবাসিনি, তোমার প্রসাদে রণক্ষেত্রে আমরা যেন জয়লাভ করতে পারি।" দুর্গা কোকমুখা। 'কোক' অর্থে বন্যকুক্কুর বোঝায়। দুর্গার নাম 'শিবা', শিবা শব্দের অর্থে শৃগালী। দুর্গা থাকেন কোথায়? দুর্গার এক নাম 'বিন্ধ্যবাসিনী'। দুর্গা কান্তারবাসিনী। কান্তারে জম্বু, কতক ও চৈত্য বৃক্ষের সন্নিধানে দুর্গা বিরাজ করেন। জম্বু গাছ জামগাছ. 'কতক' হল অরিষ্ট, একরকম ফলের গাছ। চৈত্যবৃক্ষও গাছ, হয়ত অশ্বত্থ গাছ। বিন্ধ্যবাসিনী কান্তারবাসিনী দুর্গা পার্বত্য অঞ্চলে অরণ্যে বাস করেন এবং গাছে গাছে বিরাজ করেন। দুর্গা কোকমুখা ও শিবা। বৃক্ষ ও বন্যজন্তু, পর্বত ও অরণ্য দুর্গার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে জড়িত। কেন জড়িত? দুর্গার উৎপত্তি সেখান থেকে। আদিম অরণ্যবাসী ও পর্বতবাসীর ধ্যানের দেবতা দুর্গা। তাই তিনি বৃক্ষে বৃক্ষে বিরাজ করেন। তাই তিনি কোকমুখা ও শিবা। তাই তিনি বিন্ধ্যবাসিনী ও কান্তারবাসিনী। পরে, অনেক পরে দুর্গা সমগ্র বাঙালী জাতীর উপাস্য দেবী হয়েছেন। কান্তারবাসিনীর কথায় আমাদের 'বনদুর্গা'র কথা মনে পড়ে। বনদুর্গা বাঙালীর গৃহদুর্গায় পরিণত হয়েছেন। বনদুর্গা ও চণ্ডী হয়েছেন শিবের ঘরণী।

গৃহী ও গৃহিণীরা মনে করেন, পার্বতী উমা তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে এসেছেন। তিনদিন পরে আবার তিনি শ্বশুরালয়ে ফিরে যাবেন। গৃহিণী কন্যাকে 'নির্মঞ্চন' করেন, আমরা বলি 'বরণ'। অশ্রু ছল-ছল চক্ষে, রুদ্ধকণ্ঠে বলেন: 'আসছে বছর আবার এসো মা!' যিনি চণ্ডী, যিনি বনদুর্গা, তাঁকে বাঙালীরা শুধু ঘরের দেবতা নয়, একেবারে 'ঘরের মেয়ে'তে রূপান্তরিত করেছেন। এই পরমাত্মীয়করণই বাঙালীর প্রধান মানসিক বৈশিষ্ট্য।

দুর্গা কিন্তু আসলে কান্তারবাসিনী বিন্ধ্যাবাসিনী বনদুর্গা চণ্ডী কোকমুখা শিবা। বাঁকুড়া বাইপুরে দুর্গার কোকমুখা পাষাণমূর্তি আজও পূজিত হয় পূর্বে গাছতলায় হত, এখন মন্দিরে হয়। বাঁকুড়া পুরুলিয়া অঞ্চলে একাধিক কোকমুখা দুর্গার পূজার খবর পেয়েছি। মূর্তিপূজার বদলে ঘটপূজা ও পট-পূজার প্রথা আজও বাঁকুড়া বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আজও বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের পূজায় নবপত্রিকা'র পূজার বিশেষ গুরুত্ব আছে। বস্ত্রাচ্ছাদিত নবপত্রিকার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয় এবং নবপত্রিকা দুর্গারূপে পূজিত হয়। বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্যবাড়িতে ধাতুনির্মিত দশভুজা প্রতিমার উপর একটি মাটির নারীমুণ্ড স্থাপিত হয়, প্রতিমা ঢাকা থাকে। একে মুণ্ডপূজা বলে। জনশ্রুতি এই যে বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ী দেবীর সামনে মল্লরাজারা এককালে 'নরবলি' দিতেন। জনশ্রুতি মূলহীন বলে মনে হয় না মল্লরাজাদের পোষ্য ডাকাতের দল যে বীরহাম্বীরের সময় পর্যন্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডাকাতি ও শক্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে নরবলি একশতাব্দী আগেও হত আমাদের দেশে। যেখানে নরবলি পর্যন্ত হত, সেই বিষ্ণুপুরে আজ দুর্গোৎসবে পশুবলি একেবারে নিষিদ্ধ। বিস্ময়কর পরিবর্তন, বৈষ্ণবায়নের প্রতিফল। বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্ম বলে বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি-মহোৎসব আজ বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজার দুর্গোৎসবের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে কোনো বিশেষ 'সম্প্রদায়ে'র তেমন প্রভাব নেই। ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরের ধর্মাচরণ তার মধ্যে আজও প্রকট।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসব অনেক আগে থেকে আরম্ভ হয়। জিতাষ্টমীর পরের নবমীতে প্রথমে আসেন 'বড়ঠাকরুন'। রূপোর পাতে মহিষমর্দিনী মূর্তি, নাম বড়ঠাকরুন। রাজগৃহেই থাকেন এবং নবমীর দিন রাজার ঘর থেকে তাঁকে এনে কৃষ্ণবাঁধে স্নান করিয়ে, নবপত্রিকাসহ পুজো করে 'দুর্গা-মেলা'য় প্রতিষ্ঠা করা হয়। নবপত্রিকা হল—ধান্য মান রম্ভা কচু হরিদ্রা জয়ন্তী বিল্ব দাড়িম অশোক। নবপত্রিকা দুর্গার স্বরূপ বা নবদুর্গা। বড়ঠাকরুনকে এনে মৃন্ময়ীতলার সামনে শিরীষ গাছের

তলায় স্থাপন করে 'পাটে' পূজা করা হয়। পরে মেলার উপর পূজা হয়। তারপর থেকে প্রতিদিন নিত্যপূজা হতে থাকে। চতুর্থীর দিন আসেন 'মেজঠাকরুন', একটি 'ঘট' মাত্র। গোপালসায়র থেকে রাজ-পুরোহিত ঘটে জল ভরে নিয়ে আসেন। পরে পুজো হয় মেজঠাকরুনের। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর রাজ-পুরোহিত ক্ষীরকুলতলায় যান। ক্ষীরকুল একরকমের ফলের গাছ, রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। এই ক্ষীরকুলতলায় আগে বিষ্ণুপুরের রাজাদের অভিষেক হত। আজও অভিষেকের স্থানটি বাঁধানো আছে গাছতলায়। জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষীরকুলতলার দিকে চেয়ে বিষ্ণুপুর রাজবংশের অভিষেক-উৎসবের চিত্রটি আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সাঁওতাল জেলে বাউরি হাড়ি ডোম আদিবাসীদের বাদ্যভাণ্ডসহ নৃত্য-গীতোৎসবের কথা মনে হয়। এই ক্ষীরকুলতলায় রাজ-পুরোহিত ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর যান রাজা রানীকে দুর্গার পট দেখাতে। একে 'পটদর্শন' বলে। রাজবাড়ির পিছনেই ক্ষীরকুলতলা। ঘরের ভিতর থেকে খোপের ফাঁক দিয়ে রাজা ও রানী পটদর্শন করেন। তারপর দুর্গাপট নিয়ে রাজ-পুরোহিত বাদ্য-ভাণ্ডসহ ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্যামকুণ্ড পার হয়ে বিল্ববৃক্ষতলায় আসেন। বিল্ববৃক্ষতলায় বোধন হয়। পরে দুর্গাপটসহ দুর্গামেলায় এসে পট স্থাপন করা হয়। এই দুর্গাপটই হলেন 'ছোটঠাকরুন'। ছোটঠাকরুন এইভাবে দুর্গামেলায় প্রতিষ্ঠিত হন। বড়ঠাকরুন মহিষমর্দিনী, মেজঠাকরুন জলভরা ঘট এবং ছোটঠাকরুন দুর্গাপট। বিষ্ণুপুরের ফৌজদার-বংশের শিল্পীরা এই দুর্গাপট আঁকেন।

সপ্তমীর দিন রাজবাড়ির অন্দর থেকে দশভুজা মূর্তির 'স্বর্ণপট' বাইরে আনা হয়। স্বর্ণপটের এই দশভুজা মূর্তিকে বলা হয় পটেশ্বরী'। নবপত্রিকা ও দুর্গাপটসহ পটেশ্বরীকে কৃষ্ণবাঁধের ঘাটে নিয়ে গিয়ে পুজো করা হয়। পরে দুর্গামেলায় নিয়ে এসে প্রথমে নিচে মাটিতে রেখে 'পটে' পুজো হয়। তারপর উপরে তুলে যথারীতি বড়পুজো করা হয়।

মহাষ্টমীর দিন সকালে অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবী রাজবাড়ির অন্দর থেকে বেরিয়ে ঘরের মধ্যেই স্নান করেন, বাইরের কোনো সায়রে যান না। তারপর তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহাস্নানের পর পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর কিছুক্ষণ আগে রাজপোশাক পরে, তলোয়ার হাতে নিয়ে রাজা আসেন, এসে মহাপাত্রের (পুরোহিত) কাছা ধরে দাঁড়ান। মহাপাত্র পুষ্পাঞ্জলি দেন। দু'বার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হলে রাজা তোপধ্বনি করার হুকুম দেন। বংশানুক্রমে মাদোড়্যা তোপ দাগে এবং তার জন্য রাজবৃত্তি পায়। কামানের কাছে তারা তোপ দাগার

জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। রাজার আদেশ পেলেই তোপদাগা হয়। সমগ্র মল্লভূমের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এবং শোনা মাত্রই সর্বত্র মহিষমর্দিনীর মহাষ্টমীর পুজো আরম্ভ হয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবের এটা বংশানুক্রমিক রীতি। রাজৈশ্বর্য রাজত্ব আজ কিছুই নেই, তবু রীতিটি রয়েছে। সারা মল্লভূমব্যাপী লক্ষ লক্ষ লোক আজও মহাষ্টমীর দিন মল্লরাজাদের এই তোপধ্বনির সঙ্কেত শোনবার জন্য কান পেতে উৎসুক হয়ে থাকেন। তোপধ্বনির পর মহাষ্টমী পুজো আরম্ভ হয়, শুধু রাজবাড়িতে নয়, সারা মল্লভূমে। পূর্বে 'তামির' সঙ্কেতে মহাষ্টমী পুজোর তোপধ্বনি করা হত। বড় একটি জলভরা গামলায় তামার কুড়ি ভাসিয়ে দেওয়া হত এবং তাম্রকুড়িটি নাকি আপনা থেকেই ডুবে যেত জলে। ডোবার মুহূর্তে মহাষ্টমীপূজার শুভক্ষণ সূচিত হত এবং তোপধ্বনি করা হত সঙ্গে সঙ্গে। এখন ঘড়ি দেখে রাজার আদেশে করা হয়।

নবমীর দিন এক বিচিত্র পূজানুষ্ঠানের রীতি আছে বিষ্ণুপুরে। রাতভোর। রাত বারোটার পর) এক দেবীর পুজো হয়, দেবীর নাম 'খচ্চরবাহিনী' (সিংহবাহিনী নন)। ঘটেপটে খচ্চরবাহিনীর পুজো হয়, কিন্তু দুর্গার ধ্যানেই পুজো হয়। পুজোর পদ্ধতিটি বিচিত্র। ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে পুরোহিত পুজো করেন এবং পুজোর সময় কেবল দু'জন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ থাকেন না। কিংবদন্তী এই যে যিনি পুজো করেন তাঁর বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকে না।

দশমীর দিন সকালে রাজা দুর্গামেলায় আসেন, এসে নিজে হাতে ধরে 'নবপত্রিকা' বিসর্জন দেন। সন্ধ্যার পর রাজা রাজপোশাক পরে পাল্কি চড়ে ইঁদতলায় যান। ইন্দ্রপূজা বা ইঁদপরব যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই ইঁদতলা বলে। রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে ইঁদপরবের খানিকটা সম্পর্ক আছে, অভিষেক-উৎসবই বলা চলে। ক্ষীরকুলতলায় রাজা ও রানীর ষষ্ঠীর দিন 'পটদর্শন' এবং দশমীর দিন রাজার ইঁদতলায় অনুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রধানত নবপত্রিকা দিয়ে ইঁদতলায় একটি তোরণ তৈরি করা হয়, নাম 'সরকদরজা'। দরজার কাছে অনন্তদেবের পাষাণমূর্তি স্থাপন করা হয়। দরজার একদিকে রাজা দাঁড়ান, অন্যদিকে দাঁড়ান পুরোহিতরা। তারপর রাজা একে-একে এইগুলি দরজা পার করিয়ে দেন :

॥ এঁড়ে গরু। উত্থান থালা। তলোয়ার। ডোমদের ঢোল। ঢাল ॥

এপার থেকে রাজা হাতে ধরে দরজা পার করে দেন, ওপার থেকে পুরোহিতরা টেনে নেন। তারপর পাল্কি চড়ে রাজা বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে শাঁখারিবাজারে 'বুড়াধর্মতলায়' যান। বুড়াধর্ম বা 'বৃহদ্ধাক্ষ' বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্মরাজ ঠাকুর। বুড়াধর্মের

স্থান থেকে ঘুরে রাজার বাড়ি ফিরে যাওয়া অর্থহীন নয়। বাড়ি ফিরে গিয়ে ঢাল-তলোয়ার লাঠি নিয়ে রাজা নিজে ফৌজদার ও সেনাপতিদের সঙ্গে খেলা করেন, নৃত্যবাদ্যোৎসব হয়। অতঃপর রাজা তাঁর চৌকিতে এসে বসেন এবং ব্রাহ্মণরা তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

রাজবাড়ির বাইরে দশমীর দিন কুম্ভকর্ণ-বধের উৎসব হয়। দশমীর পরদিন হয় ইন্দ্রজিৎ-বধের উৎসব। দ্বাদশীর দিন রাবণ-কাটার উৎসব। বিসদৃশ বাঁদরের সং সেজে বাঁদরনৃত্য নেচে দলে-দলে লোকে ভিক্ষা করে বাড়ি বাড়ি।

বিচিত্র উৎসব নয় কি? বিষ্ণুপুর-রাজাদের এই দুর্গোৎসব? কত বিচিত্র পূজা-পার্বণের আচার-অনুষ্ঠান যে দুর্গোৎসবের মধ্যে মিলিত হয়েছে, তার ঠিক নেই। বড়ঠাকরুন মেজঠাকরুন ছোটঠাকরুন ঘট দুর্গাপট নবপত্রিকা মহিষমর্দিনী দশভুজা পটেশ্বরী, অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডী বিশালাক্ষী, সিংহবাহিনী খচ্চরবাহিনী অনন্তদেব, ধর্মঠাকুর এঁড়ে গরু, তলোয়ার, ডোমদের ঢোল, কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিৎ-রাবণ-বধ ইত্যাদি সমস্ত মল্লরাজাদের দুর্গোৎসবে মিলিত হয়েছে। এমন বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপকরণের সংমিশ্রণ একটি উৎসবে সচরাচর দেখা যায় না।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত

মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর সুরসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানরূপে পরিচিত। কেবল রাজদরবারে নয়, বাংলার রসিকসমাজেও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধকরা প্রায় তিনশতাব্দীকাল অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। নবযুগের রাজধানী কলকাতা শহরকেও যাঁরা সুরসাধনার মহাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যদের দানই বেশি। তখন কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রসঙ্গীত—উভয়ক্ষেত্রেই বিষ্ণুপুরের সাধনা বিস্ময়কর সার্থকতা লাভ করেছিল।

বিষ্ণুপুরের সুরসাধনার ইতিহাস দশ-বিশ-পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস নয়, কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের অনেক পর্ব আছে, অনেক অধ্যায় আছে। তার উৎস কোথায়, রাজদরবারে না সাধারণ লোকসভায়, তা বলা যায় না। তবু মনে হয়, লৌকিক উৎসব-পার্বণের বিস্তৃত ক্ষেত্র মল্লভূমে সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয় রাজসভার বাইরে বৃহত্তর জনসভায়। লোকসঙ্গীতের সেই ধারাতেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতানুরাগ পরিপুষ্ট হয়েছে এবং রাজদরবারের অনুশীলন সমৃদ্ধ হয়েছে। কবিগান যাত্রা পাঁচালি কথকতা ঝুমুর ইত্যাদির চর্চা মল্লভূমের লোকসমাজে অনেক

আগে থেকেই রীতিমতো চলে আসছিল মনে মনে হয়। পরবর্তীকালে নন্দলালের রামায়ণের দল, রামশরণ শর্মার যাত্রার দল, ব্রজনাথ রজকের যাত্রার দল, রজনী মাঝি ও কেশবলাল মাঝির তর্জার দল, বিষ্ণুপুরী সরোজনীর ঝুমুর গান ও নাচের দল ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করে। একাধিক কীর্তনীয়া দলেরও বিকাশ হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের কথকতার সুখ্যাতিও সর্বজনবিদিত। অনেক দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা কথকতা শিক্ষার জন্য বিষ্ণুপুরে আসতেন একসময়। কথকরা প্রায় প্রত্যেকেই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং সুকণ্ঠ গায়কও ছিলেন। রীতিমতো গুরুর কাছে থেকে সঙ্গীতের চর্চা করতে হত কথকদের। কথকদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীত শিক্ষা-কালে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত চর্চাতেই আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নাম বিশেষ স্মরণীয়। বিষ্ণুপুরের কথকরা কেউ ভুঁইফোঁড় ছিলেন না, কথকতাবৃত্তির জন্য তাঁদের বিশেষভাবে শাস্ত্রে ও সঙ্গীতে শিক্ষালাভ করতে হত। সেইজন্য বিষ্ণুপুরের কথকদের দেশজোড়া খ্যাতি ছিল এককালে। সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) কনিষ্ঠ খুল্লতাত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কথক ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বিষ্ণুপুরে কথকতার টোল খোলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ঈশ্বরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র) ছিলেন কথকচূড়ামণি। কথকতার সময় তিনি এমন ওস্তাদের মতো গান করতেন যে, শ্রোতারা তাঁর গান প্রসিদ্ধ খেয়াল গায়কের গানের মতো শুনতেন। বিষ্ণুপুরের কথকতার এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য উত্তরসাধকদের সঙ্গীতসাধনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

কবিগান পাঁচালি যাত্রা ঝুমুর কথকতা ইত্যাদি লৌকিক সঙ্গীতসাধনার অব্যাহত ধারার সঙ্গে সংযোগ রেখেই বিষ্ণুপুরে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতচর্চার সূত্রপাত হয় মোগলযুগে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আনুকূল্যে। লোকসঙ্গীতের ধারার পাশাপাশি বিষ্ণুপুরে দরবারী সঙ্গীতের নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন মল্লরাজারা মোগল বাদশাহের রাজধানী দিল্লী থেকে বিখ্যাত মুসলমান ওস্তাদদের উচ্চবেতন দিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসতেন সঙ্গীত শিক্ষার জন্য। দিল্লীর মুসলমান ওস্তাদদের মধ্যে যাঁরা বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গ-বিশারদ পীর বক্স অন্যতম। শোনা যায়, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ নাকি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন দিয়ে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁর প্রধান শাগরেদ ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী এবং এই চক্রবর্তী-বংশের নীলমাধব চক্রবর্তী ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতশিক্ষক।

ওস্তাদ পীরবক্স এসেছিলেন মৃদঙ্গবাদ্য শিক্ষা দিতে। সেইসময় উত্তরভারতে নাকি পীরবক্সের সমকক্ষ মৃদঙ্গবাদ্যবিশারদ আর কেউ ছিলেন না। বিষ্ণুপুরে মৃদঙ্গবাদ্যের যে বিশেষ চর্চা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তা প্রধানত তাঁরই শিষ্যদের শিক্ষার গুণে। শুধু সঙ্গীতাচার্যদের নয়, বিষ্ণুপুরের মৃদঙ্গাচার্যদেরও খ্যাতি দেশজোড়া। মৃদঙ্গের বোল যেন বিষ্ণুপুরী হাত ভিন্ন মুখর হয়ে উঠতে চায় না।

বিষ্ণুপুরের সার্থক সুরসাধকদের মধ্যে সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, রামকেশব ভট্টাচার্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুনাথ ভট্টাচার্য বা যদু ভট্ট, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র গোস্বামী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, হারাধন চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণনাথ ও নীলমাধব চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বা জ্ঞানগোঁসাই, হলধর গোস্বামী বা হলুগোঁসাই, নকুড়চন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের নাম স্মরণীয়। মৃদঙ্গবাদকদের মধ্যে মৃদঙ্গবিশারদ রামমোহন চক্রবর্তী, জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, মৃদঙ্গাচার্য শ্রীপতি অধিকারী, অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, গিরীশ চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব চক্রবর্তী প্রভৃতি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতসাধনা শুধু মল্লভূমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার সঙ্গীতসমাজে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যরা দীর্ঘকাল ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছেন। বাংলা দেশের ধনী রাজবংশ ও জমিদারবংশে প্রধানত তাঁরাই সঙ্গীতের সভাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেছেন এবং সঙ্গীতানুরাগীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সঙ্গীতাচার্য যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদু ভট্ট) বিভিন্ন রাজসভায় আচার্যের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মানভূম-পঞ্চকোটের রাজা তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরার মহারাজারা তাঁকে বলতেন 'তানরাজ'। ত্রিপুরার রাজসভায় তিনি দীর্ঘকাল সভাগায়ক ছিলেন। সঙ্গীতাচার্য দীনবন্ধু গোস্বামীর পুত্র গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ময়মনসিংহের মহারাজার সঙ্গীতপরিষদে আচার্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ধামার গানে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। মৃদঙ্গবিশারদ জগৎচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সঙ্গীতচর্চার জন্য এনেছিলেন এবং সঙ্গীতসমাজের আচার্যপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তারপর কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তাঁকে কাশীমবাজারে নিয়ে যান এবং তাঁর সঙ্গীতসভার আচার্যপদে নিযুক্ত করেন। তখন

বাংলা দেশের মানুষ রাধিকা গোঁসাইয়ের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। রাধিকা গোঁসাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (জ্ঞান গোঁসাই)।

সঙ্গীতবিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কুচিয়াকোলের রাজার সভাচার্যের পদে কিছুকাল নিযুক্ত থাকার পর, নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর রাজসভায় যোগ দেন। নাড়াজোলরাজের আগ্রহে ও উৎসাহে তিনি বিখ্যাত 'সঙ্গীত-মঞ্জরী' গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্গীতশিক্ষা করেন এবং তাঁদের সভায় তিনি দীর্ঘকাল আচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্‌যোগে ও অর্থব্যয়ে কলকাতা শহরে প্রথমে যে 'বঙ্গসঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, আচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই মহাবিদ্যালয়ের জন্য তিনি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহার জনসভায় আমন্ত্রিত হয়ে যান এবং পরে কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনিক ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের গৃহে (রামদুলাল দে-র দুই পুত্র) অবস্থান করেন। সঙ্গীতাচার্য কেশবলাল চক্রবর্তী কলকাতার বিখ্যাত ধনিক তারকনাথ প্রামাণিকের গৃহে সঙ্গীতগুরু ছিলেন। ছাতুবাবু-লাটুবাবুর বৈঠকখানার মতো কলকাতায় তখন যেসব ধনিক বাবুদের বৈঠকখানায় নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসত, তার মধ্যে তারকনাথ প্রামাণিকের বৈঠকখানা উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেও মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর গায়কপদে নিযুক্ত করেন মহারাজার মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদ গ্রহণ করেন।

এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এইটুকু পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলার সঙ্গীতসমাজে বিষ্ণুপুরের গায়করা একসময় রীতিমতো প্রভুত্ব করেছেন। কলকাতার ঠাকুর-পরিবার, অন্যান্য রাজবংশ ও ধনিক পরিবারে সঙ্গীত-শিক্ষক ও আচার্যের পদ তাঁরাই অলঙ্কৃত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের ধনিক পরিবারের আনুকূল্যে সঙ্গীতসাধনায় যে নতুন উদ্যম দেখা দেয়, প্রধানত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্যরাই তাকে সার্থক করে তোলেন। বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে নবজীবনের সূত্রপাত হয় বিষ্ণুপুরের সাধকরাই তার প্রেরণা যোগান। এইকারণে বাংলার সুরসাধনার ইতিহাসে বিষ্ণুপুরকে সুরতীর্থ বললে ভুল হয় না এবং সঙ্গীতের এই ইতিহাস বাদ দিলে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসও সম্পূর্ণ হয় না।

দশাবতার তাস

বিষ্ণুপুর লোকশিল্পের রত্নভাণ্ডার, যদিও তার অধিকাংশই আজ লুপ্ত ও দ্রুত বিলীয়মান। একদা তার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিস্ময়কর স্তরে পৌঁচেছিল। তার মধ্যে বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস একটি বিচিত্র নিদর্শন। দশাবতার তাসের বিশেষত্ব শুধু তাস খেলাতে নয়, তাসচিত্রণেও।

দশাবতার কল্পনা অনেক প্রাচীন, কিন্তু বিচিত্র রঙেরূপে রূপায়িত করে তাকে খেলার তাসে পরিণত করার পরিকল্পনা যে কতকালের প্রাচীন, তা আজও কোনো ঐতিহাসিক বলতে পারেন না। তার উৎপত্তি ও উদ্ভাবন আজও রহস্যাবৃত। দশজন অবতারের সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে, কিন্তু দশাবতার তাসের সঙ্গে বাংলা দেশে ক'জনের পরিচয় আছে? তাসখেলা বাঙালীর লোকপ্রিয় খেলা, কিন্তু রাজা-রানী আর সাহেব-বিবি-গোলামের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশি। এই সাহেব-বিবি-গোলামের তাসখেলার প্রবর্তন নিশ্চয় ব্রিটিশযুগে হয়েছে এবং গোলাম ভারতীয়রা। রাজা-রানীর প্রতাপ বেশি, সাহেব-বিবির আধিপত্য গোলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেশ বোঝা যায়, ব্রিটিশের কাছে আমাদের গোলামির ইতিহাসের কলঙ্ককথা এই সাহেব-বিবি গোলামের তাসখেলার মধ্যে খেলার ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু তাসখেলা ব্রিটিশযুগের চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। ব্রিটিশযুগে তার রূপ-প্রতীক বদলেছে। ব্রিটিশযুগের সাহেব-বিবি-গোলাম ব্রিটিশ-পূর্ব যুগে অন্য নামে পরিচিত ছিল। সেইসব নাম বা তখনকার তাসখেলার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। আগেকার সেই তাস ও তাসখেলা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। 'দশাবতার' তাসখেলার নাম দেখে বোঝা যায়, হিন্দু যুগের পরিকল্পনা। হিন্দুযুগের কোন্ সময়ের পরিকল্পনা, তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম (রঘুনাথ) ভৃগুরাম (পরশুরাম) বলরাম জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী—এই দশজন হলেন আমাদের পৌরাণিক অবতার। বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসখেলা এই দশজন অবতারকে নিয়েই পরিকল্পিত। দশজন অবতারের মূর্তি অঙ্কিত দশখানি তাস, প্রত্যেক অবতারের একজন করে। 'উজীরে'র চিত্রসহ আরও দশখানি তাস। এই অবতার ও উজীরদের অধীনে দশখানি করে তাস, সমাজের আরও দশজন বিভিন্ন লোকের মতো বিভিন্ন শ্রেণীর ও স্তরের এবং সেই অনুপাতে তাদের প্রভাবের তারতম্য—যেমন দশ নয় আট সাত ছক্কা পঞ্জা চৌকা তিরি দুরি টেক্কা। হঠাৎ মনেহয় পৌরাণিক যুগের সমাজের একটা চমৎকার প্রতিচ্ছবি যেন এই সচিত্র দশাবতার তাসের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পৌরাণিক

অবতারদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের প্রতিভূ হলেন 'উজীর'রা। সুতরাং তাঁদের প্রতাপও যথেষ্ট। তারপর সমাজের বাকি দশজন এবং সেখানেও শ্রেণীবিন্যাস সুপরিস্ফুট, দশ থেকে তিরি দুরি টেক্কা পর্যন্ত। অর্থাৎ আমীর-ওমরাহ, জমিদার-জায়গীরদার থেকে একেবারে পাইক-বরকন্দাজ পর্যন্ত। মনেহয় যেন সমাজে শ্রেণী-বিন্যাস রীতিমতো কায়েম হবার পরে কোনো একসময়ে সমাজের প্রতিচ্ছবিরূপে এই সচিত্র তাসখেলার প্রবর্তন হয়েছিল। যেমন দাবাখেলার মধ্যে রাজা-রাজড়াদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধযাত্রার ছবি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত, তাসখেলার মধ্যেও তেমনি সমাজবিন্যাসের ছবি পরিস্ফুট। খেলার অন্তরালে লুকিয়ে আছে অতীত সমাজের ইতিহাস।

বিভিন্ন অবতারের প্রতীক স্বতন্ত্র এবং প্রতীকগুলি তাসের উপর আঁকা। অবতার, উজীর ও দশখানি তাস নিয়ে বারোখানা তাস প্রত্যেক অবতারের। দশজন অবতারের একশো-কুড়িখানা তাস। অবতারদের প্রতীকগুলি এই:

রঘুনাথ (রাম)=তীর	জগন্নাথ (বুদ্ধ)=পদ্ম
বলরাম=গদা	বরাহ=শঙ্খ
ভৃগুরাম=টাঙ্গি বা কুঠার	মৎস্য=মৎস্য
নৃসিংহ=চক্র	কূর্ম=কূর্ম
বামন=কমণ্ডলু	কল্কী=খড়্গ

এইসব প্রতীক অঙ্কিত ১২০ খানা তাস নিয়ে দশাবতার তাসখেলা আরম্ভ হয়। অবতারদের মধ্যে পাঁচজন অবতারের আভিজাত্য বোধহয় বেশি, সেইজন্য তাঁদের অধীন বাকি দশজনের মর্যাদারও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই পাঁচজন অবতার হলেন—রঘুনাথ (রাম), বলরাম ভৃগুরাম জগন্নাথ (বুদ্ধ) ও কল্কী। এই পঞ্চ অবতার ও তাঁদের পঞ্চ উজীরের পরেই টেক্কার সর্বোচ্চ স্থান, তারপর যথাক্রমে দুরি তিরি চৌকা ইত্যাদির স্থান, দশের স্থান সকলের নিচে। বাকি পাঁচজন অবতার—মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন। এঁদের উজীরের পরেই 'দশ'-ই হল সম্মানিত কার্ড এবং যথাক্রমে টেক্কার মর্যাদা সবচেয়ে কম। শুধু তাই নয়। দিনের বেলা খেলা হলে রাম (রঘুনাথ) অবতার 'স্টার্টার' হন এবং রাতে খেলা হলে 'স্টার্টার' হন মৎস্য অবতার। এখানেও মনেহয় যেন রাতের অন্ধকার থেকে জীবজগতের বিকাশের সূচনা এবং দিনের আলোয় ধনুর্বাণধারী মানুষের বিকাশ। জীবজগৎ ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা মাইক্রোফিল্ম।

পাঁচজন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা চলে। খেলোয়াড়রা কেউ কারও 'পার্টনার' নয়। খেলার কোনো বাঁধাধরা নিয়মও নেই। ডান থেকে বামে অথবা বাম থেকে

ভানে, যেভাবে ইচ্ছা খেলা চলতে পারে। তাস বণ্টনের পর প্রত্যেকের ভাগে চব্বিশখানা করে তাস পড়ে। রাম অবতার যাঁর হাতে থাকবেন, তিনি দিনের বেলা খেলা হলে 'স্টার্ট' দেবেন। তাঁর হাতের অবতার উজীর ও অন্যান্য 'অনার্স কার্ডে'র পিঠ নিয়ে তিনি হাত ফেরাবার জন্য অন্যকে 'সেরোয়া' বা পাস দেবেন। তারপর অন্য খেলোয়াড়ও ঠিক ঐভাবে খেলবেন। খেলার সময় যখন একজন খেলোয়াড় অন্যজনকে 'সেরোয়া' বা পাস দেন, তখন যদি তাঁর বামদিকের খেলোয়াড় খেলা পান, তাহলে তাঁর প্রথম পিঠ 'টিপসহি' বলে অভিহিত হয়। তার মূল্য দুই পিঠের সমান। এইভাবে খেলা চলতে থাকে। খেলায় মোট চব্বিশটি পিঠ থাকে। খেলা শেষ হবার পর পিঠ গুণে হারজিত নির্ধারিত হয়। কমপক্ষে পাঁচটি পিঠ 'এক পয়েণ্ট' বলে গণ্য হয়। তার পরের প্রত্যেকটি বাড়্তি পিঠের মূল্য পাঁচ পয়েণ্ট করে। যেমন, কেউ যদি আট পিঠ পান, তাঁর পয়েণ্ট হবে 'প্লাস-ষোল'। প্রত্যেক কম্তি পিঠে পাঁচ পয়েণ্ট করে কমবে। কেউ যদি তিন পিঠ পান, তাঁর পয়েণ্ট হবে 'মাইনাস্ নয়'। পয়েণ্টের উপর বাজী রেখেও খেলা হয়।

বিষ্ণুপুরের কিংবদন্তী হল, মল্লরাজাদের সমৃদ্ধিকালে এই দশাবতার তাস খেলার প্রবর্তন হয়েছিল মল্লভূমে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির 'জার্নালে' বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাস খেলা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত 'নোট' লিখেছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ সম্পূর্ণ নয় এবং তাঁর বিবরণের সঙ্গে আমাদের বিবরণের পার্থক্য আছে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের স্থানীয় কর্মীদের সহযোগিতায়, প্রবীণ ও ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে এই বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছি। শাস্ত্রীমশায় তাসচিত্রণের পদ্ধতির কথা অথবা শিল্পী ফৌজদার ও সূত্রধরদের কথা কিছু বলেননি। যাই হোক্, দশাবতার তাসের ঐতিহাসিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীমশায় যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

> I fully believe that the game was invented about eleven or twelve hundred years before the present date.

প্রায় ১১০০।১২০০ বছর আগে এই তাসখেলার উৎপত্তি হয়েছিল বলে শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন। এই হিসেবে দশাবতার তাসের উৎপত্তিকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী হয়। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি এই যুক্তি দিয়েছেন। প্রথম কারণ হল, প্রচলিত

১ Notes on Vishnupur Circular Cards: By Haraprasad Sastri: Journal of Asiatic Society of Bengal. 1895

তাসের তালিকায় দেখা যায় যে, জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান 'নবম', কল্কীর আগে। কিন্তু তাসের অবতারবিন্যাসে জগন্নাথ বা বুদ্ধের স্থান হল 'পঞ্চম'। তাসের প্রচলিত ধারার প্রবর্তন হয়েছে দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবের কালে বা একাদশ শতাব্দীতে ক্ষেমেন্দ্রের কালে। আসল দশাবতার তাস তার চেয়েও প্রাচীন। মনেহয়, এমন একসময়ে দশাবতার তাসের প্রবর্তন হয়েছিল যখন অবতারদের মধ্যে বুদ্ধ পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হতেন। বুদ্ধের পঞ্চম অবতার বলে গণ্য হবার কারণও সঙ্গত। বুদ্ধের মূর্তি তাসে জগন্নাথের মূর্তি, কেবল মাথা ও হাতসহ দেহকাণ্ডের মূর্তি। সুতরাং নৃসিংহ (অর্ধনব ও পশু) এবং বামনের (পূর্ণ নর) মধ্যবর্তী স্থান তিনি অধিকার কবতে পারেন স্বচ্ছন্দে। সেইজন্য নিম্নতম জীব মৎস্য থেকে পূর্ণ মানব পর্যন্ত ক্রমবিকাশের স্তরে জগন্নাথমূর্তি বুদ্ধের স্থান পঞ্চম। খুব যুক্তিসঙ্গত স্থান। দ্বিতীয় কারণ, দশাবতার তাসে বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন পদ্মফুল। সুতবাং এমন একসময় দশাবতার তাসের বিকাশ হয়েছিল যখন বুদ্ধ 'পদ্মপাণি' নামে পরিচিত হয়েছিলেন। পদ্মই তাঁর প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সেটা হয়েছিল বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মেব আধিপত্যেব যুগে, ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, পাল-রাজাদের রাজত্বকালে অথবা তার কিছুকাল আগে।

এই হল শাস্ত্রীমশায়ের যুক্তি। অনেকে বলবেন, এ হল তাঁর বৌদ্ধবায়। বাঙালীর সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ প্রভাব কম নয়। অনার্য কৌম-সংস্কৃতির সঙ্গে এই বৌদ্ধ প্রভাব সর্বত্র মিলেমিশে রয়েছে বাঙালীর উৎসব-পার্বণে, লৌকিক খেলা-ধূলায়, দেবদেবীর পূজাপদ্ধতিতে ও মূর্তিতে। দশাবতার তাস পালযুগে উদ্ভাবিত হওয়া আদৌ আশ্চর্য নয়। মল্লরাজারা তখন মল্লভূমের অধীশ্বর হয়েছেন বিশেষ করে, দশাবতার তাসের চিত্র এবং সেই চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি দেখলে মনে ., পালযুগের সমৃদ্ধিকালেই এই খেলা, এই শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ হয়েছিল। তারই ঐতিহ্য বহন করছেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদার ও সূত্রধররা। আজ তাঁদের বংশ প্রায় লুপ্ত বলা চলে।

'সূত্রধর'রাই ছিলেন বাংলাব শিল্পী। 'কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র'—এই চারশ্রেণীর সূত্রধব বা শিল্পী ছিলেন। কাষ্ঠশিল্পীরা কাঠের কাজ করতেন, পাষাণশিল্পীরা ছিলেন ভাস্কর, মৃত্তিকাশিল্পীরা মাটির মূর্তি পুতুল পাত্র গড়তেন, আর চিত্রশিল্পীরা আঁকতেন চিত্র। সকলেই 'সূত্রধর' বলে পরিচিত ছিলেন তখন, কিন্তু এখন 'সূত্রধর' বলতে আমরা শুধু 'কাষ্ঠশিল্পী' বুঝি।

বিষ্ণুপুর-মল্লভূমেও যাঁরা শিল্পী ছিলেন তাঁরা 'সূত্রধর' বলেই পরিচিত, 'ফৌজদার'রা পরিচিত কেবল রাজোপাধিতে। মল্লভূমের মৃত্তিকাশিল্পী পাষাণশিল্পী কাষ্ঠশিল্পী ও

চিত্রশিল্পী অধিকাংশই 'সূত্রধর' ও 'ফৌজদার' বলে পরিচিত ('পাল'-ও আছেন)। মৃত্তিকাশিল্পীদের মধ্যে গদাধর ফৌজদার, সতীশ ফৌজদার, কেদার সূত্রধর প্রভৃতির যথেষ্ট সুনাম ছিল এবং দশাবতার তাসচিত্রণেও তাঁরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমানে (১৯৫৩-৫৪) যতীন ফৌজদার, সুধীর ফৌজদার, পটল ফৌজদার, ভানুপদ পাল, অনিল সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে সুপরিচিত। চিত্রবিদ্যার পারদর্শিতা ক্রমেই এঁদের কমে যাচ্ছে, কারণ বর্তমান সমাজে এঁদের চিত্র বা মূর্তির সমাদর নেই। জীবনসংগ্রামে এঁরা সকলেই প্রায় বিপর্যস্ত এবং বংশগত বিদ্যার চর্চাতেও উদাসীন। কিছুদিন পরে চিত্রবিদ্যার এই চর্চাই হয়ত লোপ পেয়ে যাবে।[২]

ফৌজদারবংশের বংশধরদের কাছ থেকে দশাবতার তাসচিত্রণের প্রণালী সম্বন্ধে যে বিবরণটুকু সংগ্রহ করেছি, তা এখানে সংক্ষেপে বলছি। দশাবতার তাস স্বচক্ষে না দেখলে তা তৈরি করার প্রণালীর মধ্যে বাস্তবিকই যে কতখানি চিন্তা ও উদ্ভাবন-শক্তির পরিচয় আছে, তা বোঝা যায় না। তাসগুলি বৃত্তাকার এবং বৃত্তব্যাস প্রায় চার ইঞ্চি হবে। রীতিমতো মজবুত শক্ত তাস, কারণ খেলার জন্য তাস তৈরি হয়, সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। তাস তৈরি করার প্রণালী এই : কাপড় তিনভাঁজ করে পর-পর সাজিয়ে আঠা দিয়ে সাঁটা হয়। আঠা হল তেঁতুলবীচির আঠা বা 'মাড়ি'। তেঁতুলবীচির মাড়ি দিয়ে বেশ ভাল করে সেঁটে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকাবার জন্য খাড়িমাটির প্রলেপ একাধিকবার দেওয়া হয়। পরে 'ঝামাপাথর' দিয়ে ঘষে উপরটা যতদূর সম্ভব মসৃণ করে নেওয়া হয়। একে বলে তাসের 'জমিন' প্রস্তুত করা। জমিন প্রস্তুত করতে বেশ সময় লাগে। জমিন তৈরি হবার পর চক্রাকারে সেগুলি কেটে ফেলা হয়। তাসের আকার অনুযায়ী কাটা হয়। তারপর আরম্ভ হয় চিত্রাঙ্কন। বিভিন্ন অবতার, তাদের উজীর ও প্রতীক-চিহ্নসহ দশ থেকে টেক্কা পর্যন্ত সমস্ত ছবি আঁকা হয়। নানারঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয় এবং তার কোনটাই বিদেশী রঙ নয়। আঁকা শেষ হবার পরে মেটে সিঁদুর ও গালা টেনে তাসের পিঠ তৈরি করা হয়। এই পিঠ তৈরি করার পদ্ধতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাসের একদিকে ছবি, আর-একদিকে এই মেটে সিঁদুর ও গালার প্রলেপ থাকে। তাসগুলিকে রঙের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিভিন্ন রঙের পটভূমিকায় বিচিত্র সব রঙের অদ্ভুত সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাসগুলি আঁকা হয়। দশাবতার তাসের এই রঙের সামঞ্জস্য ও নক্‌শা থেকে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত তাঁতশিল্পীরা

২ বর্তমানে (১৯৭০-৭১) শিল্পীদের একটি পরিবারই কোনরকমে বেঁচে রয়েছেন।—লেখক

কাপড়ের পাড তৈরি করতেন। দশাবতাব তাস সামনে রেখেই তাঁরা কাপড়ের আঁচলা ও পাড বুনতেন। পাটরাঙা নামে তন্তুবায় সম্প্রদায দেশীয় পদ্ধতিতে নানা-রকমের রঙও তৈরি কবতেন।

এখন বিষ্ণুপুরের সকল শ্রেণীব শিল্পীবাই প্রায় লোপ পেযে যাচ্ছেন। তাঁদের শিল্পকলার প্রাচীন ঐতিহ্যটুকুই কেবল আছে, ঐতিহাসিক স্মৃতিব মতো, শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই। দশাবতার তাসও আব কিছুদিনের মধ্যে একেবারে লোপ পেয়ে যাবে। কারণ তাস না আঁকতে পারলে খেলা বন্ধ হযে যাবে, এবং তাস যাঁরা আঁকবেন তাঁবা যদি অন্নেব জন্য বংশগত পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হন, তাহলে তাস আঁকা ও তাসখেলা দুই-ই লুপ্ত হযে যাওযা স্বাভাবিক।

বাহুলাড়া । এক্তেশ্বর

'বাহুলাড়া' সাধারণ গ্রামের লোকের কাছে 'বোলাঢ়া' বলে পরিচিত। 'লাঢ়া' বা 'রাঢ়া' হল রাঢ়দেশ। রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপির 'উত্তীরলাঢ়ম্' এবং 'তক্কণ-লাঢ়ম্' উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ় দেশকেই বোঝায়। এই লাঢ়-লাঢ়ম্-লাড়া নামই 'বোলাড়া' ও 'বাহুলাড়া' নামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত। বাঁকুড়া জেলায় আরও একাধিক গ্রামের নামান্তে 'লাড়া' আছে—যেমন 'বেলাড়া', 'কুলাড়া' ইত্যাদি (বাঁকুড়া জেলার সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক ১৯৬১, গ্রামের নাম দ্রষ্টব্য)। মনে হয় যেন লাড়দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি।

বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকুড়ার পথে 'ওন্দা গ্রাম' বা 'ওঁদা'। ওঁদা থেকে প্রায় তিনমাইল ভিতরে বাহুলাড়া গ্রাম, দ্বারকেশ্বর নদের তীরে। বহুদূর থেকে বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের চূড়ো দেখা যায়। উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদ ও কাঁটাবনি গ্রাম, দক্ষিণে মাকরকোল, পুবে হড়ড়া ও পশ্চিমে ছাপড়া, আরও দূরে বেলাড়া কুলাড়া ভেটাড়া প্রভৃতি গ্রাম, মধ্যে বাহুলাড়া। চারিদিকের গ্রামের নামের মধ্যে 'লাড়া' আর 'আড়া' শব্দের বিচিত্র ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সুউচ্চ শিখর পরিপার্শ্বকে আচ্ছন্ন করেছে। কতকাল ধরে করছে কেউ জানেন না, আজও কেউ সঠিকভাবে বলতে পারেন না। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বাহুলাড়ার এই বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর মন্দির নিয়ে আলোচনা করেছেন, অনেকে দেখেছেন, কিন্তু সকলের কাছেই বাহুলাড়ার ঐতিহাসিক বয়স এখনও রহস্যাবৃত হয়ে রয়েছে।

সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের বয়সটা নয়, বাহুলাড়ার বা বোলাড়ার বয়স। সিদ্ধেশ্বর মন্দির খাঁটি বাংলার মন্দির নয়, চমৎকার 'রেখ-দেউল'। বাংলা দেশে রেখ-দেউলের যে কয়েকটি নিদর্শন আছে তার মধ্যে বাহুলাড়ার দেউলটি সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে জমকাল। দুঃখের বিষয়, শিখর-শীর্ষের 'আমলক' ও 'কলসটি' নেই, ভেঙে পড়ে গিয়েছে। থাকলে ভুবনেশ্বরের রেখ-দেউলের অপূর্ব সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর-মন্দির আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত, বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলায়। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পূর্বাঞ্চলের বাৎসরিক রিপোর্টে (১৯২১-২২ ও ১৯২২-২৩ সাল) বাহুলাড়ার মন্দিরের বিবরণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন, মন্দিরটি পালযুগের তৈরি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন :

> The Siddhesvara temple at Bahulara in the Bankura district is probably the finest specimen of a brick-built *Rekha* temple of the mediaeval period now standing in Bengal. (Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures : p xvi).

আনন্দকুমারস্বামীও তাই বলেছেন এবং সিদ্ধেশ্বরের দেউলটি দশম খ্রীস্টাব্দে তৈরি বলে তিনি অনুমান করেন। কেউ মনে করেন যে আরও দু-এক শতাব্দী পরে তৈরি, অর্থাৎ একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে। কেউ দেউলের গড়ন ও অলঙ্করণ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মনে করেন, একাদশ শতাব্দীর। এই সময়কার কয়েকটি দেউলের নিদর্শন আজও বাংলা দেশে আছে, তার মধ্যে সুন্দরবনের 'জটার দেউল' একটি। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ রেখদেউল বাঁকুড়া জেলায় আরও আছে তার মধ্যে ষাঁড়েশ্বর ও শল্যেশ্বরের মন্দির অন্যতম। কিন্তু তার মধ্যও বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের গড়নের বিশেষত্ব আছে। মন্দিরের মধ্যস্থ তিন. বৃত্তাকার 'বন্ধনে'র বেষ্টন উড়িষ্যার মন্দিরের মতো। তা ছাড়া দেউলের শিখরের 'শুকনাসতুল্য' গড়নভঙ্গিও বাংলার অন্যান্য রেখদেউলের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে সংস্কার করা হলেও, মন্দিরের ইটের গায়ে বিচিত্র অলঙ্করণের ও মণ্ডনের ঐশ্বর্য বাংলার সূত্রধরদের দক্ষ কারিগরির সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বাহুলাড়ার এই মন্দির দেখে মনে হয় উত্তরভারতীয় শিখরযুক্ত 'নাগর' দেবালয়ের একটি প্রধান বিশিষ্ট ধারার বিকাশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে উড়িষ্যা ও বাংলার এই সীমানার মধ্যে হয়েছিল। 'দ্রাবিড় ও 'বেসর' দেবালয়ের গড়নরীতির সঙ্গে উত্তরভারতীয় নাগররীতির মিলন-মিশ্রণ ও লেনদেনও এই অঞ্চলে হয়েছে। রেখদেউল তারই এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি। উড়িষ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে

মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে একই সময়ে বা কিছু আগে-পরে রেখদেউলের বিকাশ হয়। মনেহয় অষ্টম থেকে একাদশ-দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। তারপর ক্রমে এই বিশেষ রীতি উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ হয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে এবং বাংলার শিল্পীরা আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়ে দেবালয়ের সঙ্গে লোকালয়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। বাংলা দোচালা ঘরের মতো তাঁরা মন্দির তৈরি করেন এবং পূর্বের রেখদেউলটির প্রতীক তখন 'রত্ন' বা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হয়। 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্ন' মন্দিরের রত্নগুলি রেখদেউলেরই প্রতীক ছাড়া কিছু নয়।

ব'হুলাড়ার মন্দির সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ ছাড়াও তিনটি বড় বড় পাষাণমূর্তি আছে। একটি গণেশের মূর্তি, মধ্যে জৈন পার্শ্বনাথের মূর্তি, পাশে সুন্দর একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি। শিব আশেপাশে আরও অনেক আছেন। পাঁচাল গ্রামে আছেন রত্নেশ্বর শিব, চুয়ামুসিনা গ্রামে আছেন দুগ্ধেশ্বর শিব। চৈত্রসংক্রান্তির সময় মহাসমারোহে শিবের গাজন হয় বাহুলাড়ায় এবং উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী মেলা হয়। আগেকার তুলনায় সমারোহ এখন কমে গেলেও, আজও মেলায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়। গাজনে আগে কয়েকশত 'ভক্ত' বা সন্ন্যাসী হত এবং পিঠফোঁড়া বাণ হত। চড়কগাছে পিঠে বাণ ফুঁড়ে ভক্তরা দে-পাক দে পাক করে পাক খেতেন। এখন ভক্তের সংখ্যা একশো-দেড়শো জন হয় এবং পিঠ-বাণ হয় না (১৯৫৩-৫৪)। তা না হলেও অন্যান্য বাণফোঁড়া এখনও হয় সিদ্ধেশ্বরের গাজনে। যেমন জিব-বাণ কপাল-বাণ ইত্যাদি। এখনও চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন পাটভক্ত্যা বা প্রধান ভক্ত্যা স্নান করে, লোহার কাঁটা-বেঁধা পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপর ব্রাহ্মণ পূজারীকে বসিয়ে, ঘাট থেকে গাজনতলায় আসেন। অন্যান্য ভক্তরা বেতের ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে, ব্যোম্ ব্যোম্ শিব শঙ্কর ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর অনুগমন করেন। বাহুলাড়ায় চাষী তিলি সদগোপ কায়স্থ ব্রাহ্মণ নায়েক খয়রা বাউরি জেলে প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের বাস থাকলেও, প্রধানত ভক্ত্যা হন নায়েক খয়রা বাউরি জেলে প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বেশি। উৎসবটাও প্রধানত তাঁদেরই। কাছাকাছি ধর্মঠাকুরও আছেন এবং তাঁরও গাজন-উৎসব হয়।

শিবপূজা ও শৈব-উৎসব ছাড়াও বাহুলাড়ার অন্য ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস অনেকদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত মনে হয়। আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বোলাড়ায়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কাছে গেলেই দেখা যায়, মন্দিরটি একটি উচ্চভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। চারপাশের জমি থেকে বেশ উঁচুতে,

অনেকটা জায়গা জুড়ে, মন্দিরের চৌহদ্দি। এই উঁচু চৌহদ্দির চারিদিকে অনেকগুলি ইটের স্তূপ আজও পরিষ্কার দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে প্রায় বছর ত্রিশ আগে মাটি খুঁড়ে এই স্তূপগুলি পাওয়া গিয়েছিল। প্রায় উনিশটি স্তূপ তখন পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে ষোলটি বৃত্তাকার স্তূপ। এই স্তূপই হল বৌদ্ধদের 'শারীরিক চেতিয়'। বৌদ্ধ শ্রমণদের মৃত্যুর পর তাঁদের দেহভস্মাবশেষ 'অস্থিকুম্ভে'র মধ্যে রেখে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করা হত এবং তার উপরে একটি বৃত্তাকার (সাধারণত) মাটির বা ইটের 'স্তূপ' (পালিতে 'থূপ', সিংহলী 'দাগোবা') নির্মাণ করা হত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বস্থ স্তূপগুলি দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনুমান করেন যে এইখানে আগে বৌদ্ধদের একটি কেন্দ্রও ছিল। এতগুলি স্তূপের এরকম একত্র সন্নিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত স্থানটি যত্ন করে খুঁড়ে দেখা হয়নি, কি পাওয়া যায় বা না যায়। খুঁড়ে দেখলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তারা লাভবান হতে পারেন। বাহুলাড়া ও সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের পরিবেশের মধ্যেই তার ইঙ্গিত রয়েছে। উচ্চভূমি, যেখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত, তার চারিদিকে বড় বড় দীঘি ছিল এবং পাশেই ছিল দ্বারকেশ্বর নদ। শৈবধর্মীদের প্রাধান্যের পূর্বে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মীরাও এখানে প্রভুত্ব করেছেন মনে হয়। সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আজও যে মূর্তি পূজিত হচ্ছে তা জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি। জৈনধর্মের প্রতিপত্তি খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে প্রায় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল বলা চলে।

তাই মনে হয়, বাহুলাড়া-বোলাড়ার 'লাড়া' এবং আশেপাশের কুলাড়া, বেলাড়া প্রভৃতির 'লাড়া' আর জৈনগ্রন্থের 'লাডা ও 'লাড' দেশের শব্দসাদৃশ্য কাল্পনিক নয়। বাহুলাড়া গ্রাম বাংলার ইতিহাসের একাধিক যুগ উত্তীর্ণ হয়েছে মনে হয়। ইতিহাসের অনেক পর্বান্তরের চিহ্ন এখনও ঐ উচ্চ ভূমির গর্ভে লুকিয়ে আছে, সিদ্ধেশ্বরের মন্দির যার উপর প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকের স্তূপগুলি বৌদ্ধদের স্তূপ বলেই মনে হয়, জৈনদেরও হতে পারে। জৈনরা যদিও স্তূপ-পূজা বিশেষ করতেন না, তবু কুষাণযুগে মথুরায় জৈনধর্মীদের মধ্যে স্তূপ-পূজার প্রচলন ছিল দেখা যায়। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের এই প্রাঙ্গণটিতে আজ শিবের গাজনের অনুষ্ঠান হলেও একসময় সম্ভবত জৈন ও বৌদ্ধদের স্তূপার্চনাও হত মনে হয়। তখনও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির তৈরি হয়নি, কেবল স্তূপবেষ্টিত উচ্চটিলার মতো ছিল স্থানটি। তার অনেক পরে ঐ 'স্তূপ' শিখরাকারে দেউল ও দেবালয়ের উপর গড়ে উঠেছে, অষ্টম-নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। বাহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বরের দেউলটিও তখন তৈরি হয়েছে, জৈন ও বৌদ্ধরা বাংলা দেশ থেকে যখন

প্রায় বিদায় নিয়েছেন। শৈব ও তান্ত্রিকরা তখন আধিপত্য বিস্তার করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁদেরই আধিপত্য বোলাড়ায় অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এক্তেশ্বর

এক্তেশ্বর গ্রাম বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে। গ্রামদেবতা এক্তেশ্বর শিবের নামে গ্রামের নাম। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরতীরস্থ গ্রাম। অধিষ্ঠিত দেবতা শিবের নাম থেকে গ্রামের নামকরণ হয়েছে, না গ্রামের নামে শিবের নামকরণ হয়েছে, সঠিক বলা যায় না। বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় এইরকম গ্রামদেবতা শিবের নামে একাধিক গ্রামের নাম আছে।

রাঢ়েশ্বর (রাঢ়ের ঈশ্বর), মল্লেশ্বর (মল্লভূমের ঈশ্বর), দেমুড়েশ্বর, মস্তেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ইত্যাদি শিবের শত শত নাম আছে বাংলা দেশে। শিব নেই ও শিবমন্দির নেই, এমন গ্রাম খুব অল্পই আছে। গ্রামদেবতা বা গ্রামের অধিষ্ঠিত ঈশ্বর বলে গ্রামের নামে তাঁর নাম এবং নামেরও সেইজন্য অন্ত নেই। বাংলার শিব আজ আর কেবল শৈব ও শাক্তদের দেবতা নন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব—সর্বধর্মাচারী ও সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা তিনি, বাংলার গ্রামদেবতা, বাঙালীর গৃহদেবতা। কিন্তু তাহলেও শিবের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি দেখে মনেহয় যেন একসময় বাংলার ঘরে ঘরে তন্ত্রোক্ত বাণী প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল এবং বাংলার জনমন তাতে সাড়া দিয়েছিল—

> আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃ পরং।
> অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ ॥
>
> —প্রাণতোষণী-উদ্ধৃত তোড়লতন্ত্রবচন

'আগে শিবপূজা করবে, পরে শক্তিপূজা করবে। অতএব মহেশানি! আগে শিবপূজা করবে।' এই তন্ত্রবচনের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল বাংলার লোকসমাজে যে বিষ্ণুপূজা বা শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রবল জোয়ারের মুখেও বাংলার শিব ও শক্তি ভেসে যাননি, তার সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছেন। শিবের এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কোথায়, বিশেষ করে বাংলার শিবের, তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত।

শিবমূর্তি বাংলায় আছে, তার চমৎকার বর্ণনাও আছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে। বাংলার জনসাধারণের মানবিক মূর্তির সঙ্গে বাংলার গণদেবতার দেবমূর্তির কোনো পার্থক্য নেই, এমনকি জীবনযাত্রা পেশা নেশা পর্যন্ত ভক্ত ও ভগবানের একই। কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে যে শিব দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কোনো মূর্তি নেই,

তিনি অনাদি লিঙ্গমূর্তি। বাংলার ঘরে ঘরে যে শিবমূর্তি গড়া হয়, তাও কোনো ভাস্করে গড়েন না, ঘরের মেয়েরা গড়ে, মাটির শিবলিঙ্গ। এই লিঙ্গরূপী শিবপূজা প্রবর্তনের কাহিনী লিঙ্গপুরাণ শিবপুরাণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি একাধিক পুরাণ ও উপপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই। কেবল লিঙ্গপুরাণের একটি উপাখ্যানের কথা বলছি:

প্রলয়ার্ণবমধ্যে তু রজসা বদ্ধবৈরয়োঃ।
এতস্মিন্নন্তরে লিঙ্গমভবচ্চাবয়োঃ সুরাঃ।
বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থঞ্চ ভাস্বরম্।
জ্বালামালাসহস্রাভং কালানলশতোপমম্॥

—লিঙ্গপুরাণ, ১৭ অঃ

'প্রলয়সমুদ্রের মধ্যে রজোগুণ-প্রভাবে আমাতে (ব্রহ্মাতে) ও বিষ্ণুতে বিরোধ হচ্ছিল। এমন সময় বিরোধভঞ্জন ও প্রবোধপ্রদানের জন্য শত শত কালাগ্নি-স্বরূপ ও সহস্র অগ্নিশিখাতুল্য দীপ্তিমান লিঙ্গ উৎপন্ন হল।' অর্থাৎ উপাখ্যানের মর্ম হল, একবার ব্রহ্মা বিষ্ণুতে ঘোরতর বিরোধ হয়। ব্রহ্মা বলেন,—'আমি বিশ্বের কর্তা,' বিষ্ণু বলেন,—'আমি বিশ্বের কর্তা'। বিরোধভঞ্জন করেন শিব, অগ্নিশিখাতুল্য লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়ে।

এরকম অজস্র উপাখ্যান ও কাহিনী আছে। কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিরোধের ইঙ্গিত আছে এবং শিবলিঙ্গের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবের উৎপত্তির কাহিনী ও মহান অগ্নি-শিখার মধ্যেও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। শিবের অনাদি রূপ মানবেতিহাসের কোন্ আদিম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত, তা নিয়ে পণ্ডিতসমাজে অনেক গবেষণা-আলোচনা হয়েছে। শিব নিয়ে এক সুবৃহৎ শিবায়নও রচনা করা যায়। বাংলায় একাধিক 'শিবায়ন' কাব্যও রচিত হয়েছে।

লিঙ্গরূপী শিব প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষের লিঙ্গোপাসনার কথা (Phallic worship)। তারপর মনে হয়, আদিম মানুষের শ্মশানে ও গোরস্থানে উন্নতশির শিলাস্তম্ভের কথা এবং সেই শিলাস্তম্ভ পূজার কথা। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা সমাধিক্ষেত্রে এই শিলাস্তম্ভকে 'মেনহির' (Menhir) বলেন। পূর্বভারতে ও দক্ষিণভারতে আদিম মানুষের অসংখ্য সমাধিক্ষেত্রে অজস্র 'মেনহির' দেখা যায় এবং সেই 'মেনহির' তারা নিয়মিত পূজা করে। সমাধিক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, অচ্ছেদিত

(undressed) রুক্ষ স্বাভাবিক সরল-রেখার শিলাস্তম্ভ বা 'মেনহির' ক্রমে ক্রমে ছেদিত খোদিত ও মার্জিত মেনহিরে পরিবর্তিত হয়ে শিবলিঙ্গের রূপ ধারণ করেছে এবং শৈব-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আদিমসমাজেও 'শিব' বলে পূজিত হচ্ছে (১৯১৫-১৬ সালের ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে—দক্ষিণভারতের—এ-সম্বন্ধে লঙহার্স্টের আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য)। বাংলার শিবের উৎপত্তির আভাস এর থেকেই পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার এবং বর্তমান বাংলার প্রতিবেশী (উত্তরে ও পশ্চিমে) আদিবাসিদের শ্মশানে শ্মশানে মেনহির পূজার নিদর্শন আজও যথেষ্ট আছে। শিবের সঙ্গে শ্মশানও যে কেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না।

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর-প্রসঙ্গে শিবের এই ভূমিকাটুকু আবশ্যক আছে। অনেকে হয়ত ভাবছেন, ধান ভানতে শিবের গীত কেন? যেদেশের মেয়েরা ধানভানার সময়েও শিবের গীত গান, সেদেশের অন্যতম শৈবতীর্থ এক্তেশ্বরের আলোচনাপ্রসঙ্গে শিবের কথা বলা নিতান্ত 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' নয়। এক্তেশ্বর যাওয়ার আগে বাঁকুড়া শহরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে, অন্যান্য নানাবিষয়ের আলোচনার সময় 'এক্তেশ্বর' সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলাম। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 'এক্তেশ্বর' হলেন 'একপাদেশ্বর'। বেদে 'একপাদেশ্বরে'র উল্লেখ আছে। এক্তেশ্বর গেলাম। মন্দিরের সামনে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এরকম নির্জন শান্ত পরিবেশের মধ্যে এমন বিচিত্র বিশাল মন্দির হঠাৎ দেখলে যে কেউ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মন্দিরের কথা পরে বলছি। বাইরে প্রচণ্ড রোদ, আলো ঝলমল করছে, একটুকরো মেঘেরও চিহ্ন নেই কোথাও। মন্দিরের ভিতরে দূর থেকে তাকিয়ে দেখলাম, গভীর অন্ধকার। কাছে গেলাম, আরও অন্ধকার মনে হল। প্রবেশদ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দিলাম, মনে হল যেন অন্ধকারের একটা অতলস্পর্শ সুড়ঙ্গ পাতাল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। পূজারীরা একজন বললেন—'চলুন, দর্শন করবেন'। কি দর্শন করব এবং কোথায়, কিছুই বুঝলাম না। প্রদীপ হাতে পূজারীর পিছু পিছু ধাপে ধাপে নামছি এবং প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে উপর ওঠার আর কোনো আশা নেই। কিছু বলতেও সাহস হয় না, কেবল নেমে গেলাম। এইরকম নেমে গিয়েছিলাম কামরূপের কামাখ্যা মন্দিরে, কিন্তু সেখানে পাণ্ডা ও যাত্রীদের ভিড়ে তলিয়ে যাবার কথা একবারও মনে হয়নি। এক্তেশ্বরে মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছি এমন এক জায়গায়, যার তলা বলে কোনো পদার্থ নেই। হঠাৎ পূজারী বললেন, বসুন এখানে। কোথায় বসব? একবার মনে হল, এক্তেশ্বর না

'একাকীশ্বর', না 'এককেশ্বর'? এরকম একাকীত্বের সঙ্গে যাঁরা এমন নিবিড় একাত্মতা, তিনি এককেশ্বর, না একেশ্বর? প্রদীপের টিমটিমে আলোয় পায়ের মতো কি একটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে, পাষাণের পা। লিঙ্গমূর্তির বদলে পা, না উপরে পা, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

শিবের বা রুদ্রের মূর্তিবৈচিত্র্যের অন্ত নেই। বিভিন্ন শাস্ত্রে নানারকম রুদ্রমূর্তির বর্ণনা দেওয়া আছে। 'বিশ্বকর্মশিল্প' ও 'রূপমণ্ডনে' বিভিন্ন রুদ্রমূর্তির পরিচয় আছে, তার মধ্যে বিরূপাক্ষ রেবত হর বহুরূপ ত্র্যম্বক সুরেশ্বর জয়ন্ত অপরাজিত প্রভৃতি রূপের সঙ্গে রুদ্রের 'একপাদ' রূপেরও বর্ণনা আছে। একপাদের বামহাতে খট্বাঙ্গ বাণ চক্র ডমরু মুদ্গর বরদ অক্ষমালা ও শূল এবং ডানহাতে ধনু ঘণ্ট কপাল কৌমুদী তর্জনী ঘট পরশু ও চক্র (শক্তি)? শিল্পশাস্ত্রবর্ণিত এই হল একপাদরূপী রুদ্রের মূর্তি (T. A. Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, Vol 2, Part 2, p. 388)।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতানুযায়ী একেশ্বর যদি একপাদেশ্বর হন, তাহলে মূর্তির মধ্যে তার পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একেশ্বরের মূর্তিতে এক-পাদরূপী রুদ্রমূর্তির কোনো লক্ষণই নেই। পূর্বে ছিল কিনা অবশ্য বলা যায় না, সুতরাং চূড়ান্ত মতামত দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো বিদ্যানিধি মহাশয়ের কথাই ঠিক, কারণ দেবালয় যখন একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে তখন আসল মূর্তি যে নষ্ট হয়নি বা স্থানান্তরিত হয়নি, তার কোনো প্রমাণ নেই। কিংবদন্তী হল, সামন্তভূমের রাজার সঙ্গে মল্লভূম-বিষ্ণুপুরের রাজার একবার প্রচণ্ড বিরোধ হয়, রাজ্যের সীমানা নিয়ে। বিরোধের মীমাংসা করেন স্বয়ং শিব এবং তখন উভয়ের নির্দিষ্ট সীমানার উপর একেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হন। 'একেশ্বর' কি তাহলে মল্লভূম ও সামন্তভূমের রাজাদের পরস্পরের রাজ্যের এক্তিয়ারের অভিভাবক ও ঈশ্বর বলে একেশ্বর? অর্থাৎ রাজ্যের রাজাদের এক্তিয়ারের ঈশ্বর, তাই একেশ্বর। কিংবদন্তীর অন্তরালে ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থাকলেও থাকতে পারে। রাজ্যের এক্তিয়ারের ঈশ্বর, তাই একেশ্বর।

একেশ্বর বেশ প্রাচীন শৈবতীর্থ। একেশ্বর শিবের গাজন ও মেলাও বহুকালের প্রাচীন। ও'মালি সাহেব যখন বাঁকুড়া জেলার গেজেটিয়ার সঙ্কলন করেন, বছর সত্তর আগে, তখন তদানীন্তন বাঁকুড়ার কলেক্টর কুমার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব তাঁকে একেশ্বর গাজনের একটি বিবরণ লিখে পাঠান। বিবরণটি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সত্তর বছর আগেও একেশ্বরে মহাসমারোহে শিবের গাজন ও মেলা হত। চড়ক-উৎসবে বিভিন্ন রকমের বাণফোঁড়া হত, তার মধ্যে পিঠবাণও

ছিল। ভক্ত্যারা পিঠে লোহার বড়শী বিঁধে শালের চড়কগাছে পাক খেতেন, আর নিচে থেকে শিবশঙ্কর ধ্বনি দিতেন অন্যান্য ভক্ত্যারা। আজকাল বেআইনি বলে পিঠে বাণ ফুঁড়ে উৎসব করা বন্ধ হয়েছে। আর-একটি বিচিত্র উৎসবের কথা রমেন্দ্রকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন। গাজনের দিন রাতে জলন্ত চিতার মতো আগুন জ্বালিয়ে ভক্ত্যারা উৎসব করত এক্তেশ্বরে। উৎসবের নাম 'সতীদাহ' উৎসব। সতীদাহের প্রচলন যে একসময় কি ব্যাপকভাবে হয়েছিল এ-অঞ্চলে, তা গাজনের উৎস.বর সঙ্গে 'সতীদাহ' উৎসবের এই অনুকরণ-অভিনয় দেখেই বোঝা যায়। বিচিত্র সংস্কৃতি-সংমিশ্রণের নিদর্শন।

এক্তেশ্বরের মন্দিরটি সবচেয়ে বিস্ময়কর। বাংলা দেশে ঠিক এই ধরনের মন্দির আর দ্বিতীয়টি আছে কি না, আমার জানা নেই। মনে হয় নেই। ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের রিপোর্টে বেগলার সাহেব এক্তেশ্বর মন্দির সম্পর্কে লেখেন :

> The temple is remarkable in its way ; the mouldings of the basement are the boldest and finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite· ·(Report of a tour through the Bengal Provinces : Beglar : A. S. I. Report, 1872-73).

প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বেগলার যখন বাংলা দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সন্ধানের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এক্তেশ্বর মন্দির দেখেছিলেন। মন্দিরটি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে অন্তত পূর্বে তিনবার মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরের শিখরের উর্ধ্বাংশ ভেঙে পড়ে গিয়েছে বলে তাঁর মনে হয়। আজও তাই মনে হয়। এরকম বিশাল স্তম্ভের মতো মন্দির বাংলায় দেখা যায় না। মন্দিরগাত্রের উদ্‌গত অংশগুলি দেখে মনে হয়, যখন সম্পূর্ণ শিখরটি ছিল, তখন মন্দিরটির উচ্চতাও ছিল যথেষ্ট। এক্তেশ্বর মন্দির 'বাংলা মন্দির' নয়। রেখদেউলের প্রতিটি অংশের বর্ধিত রূপ তার মধ্যে স্পষ্ট, কেবল শিখরশূন্য বলে রূপটি যেন অর্ধসমাপ্ত। মন্দিরের গায়ে কোনো কারুকাজ নেই, কিন্তু ছোট ছোট দেউলের মণ্ডিত রূপের নক্‌শা আছে। সংস্কারের সময় মন্দিরের আসল রূপটির দিকে যে বিশেষ নজর দেওয়া হয়নি, তারও প্রমাণ আছে। কিন্তু তাহলেও এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বিস্ময়কর, কারণ মন্দিরের এরকম ভারি নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা থেকে খোদাই করা শিলামন্দিরের মতো এক্তেশ্বরের মন্দিরটি বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে।

ছাতনা। ময়নাপুর

বাংলার কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে অনেক জটিল সমস্যা আছে। চণ্ডীদাস একজন, না দু'জন না বহুজন, তাই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বাগযুদ্ধ হয়েছে অনেক। অস্পষ্ট ইতিহাসের কুয়াশা ভেদ করে তিনজন 'চণ্ডীদাস' এখন আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুরের অধিবাসী ছিলেন, না বাঁকুড়া জেলায় ছাতনার অধিবাসী ছিলেন, না বর্ধমানের কেতুগ্রামের, তা নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। নতুন করে এখানে বাগযুদ্ধের অবতারণা করবার কোনো সার্থকতা নেই। অন্যান্য অনেক আলোচনার মতো ছাতনা ও নান্নুর সম্বন্ধে বর্তমান আলোচনায় যে মতামত ব্যক্ত হবে তা অভ্রান্ত মনে করবার, অথবা তা নিয়ে তর্ক করবারও প্রয়োজন নেই।

সর্বাগ্রে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। আমি নিজেও এই কথাটি মনে রেখে বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় এবং বীরভূম জেলার চণ্ডীদাস-নান্নুরে গিয়েছিলাম (১৯৫৩-৫৪)। ছাতনা ও নান্নুরের স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন চণ্ডীদাস-রহস্য সম্বন্ধে আমার নিজের কি মতামত। অর্থাৎ চণ্ডীদাস কি ছাতনার বাঁকুড়ার, না চণ্ডীদাস নান্নুরের-বীরভূমের। কারও কথার কোনো উত্তর দিইনি। কারণ গ্রাম্য ঐতিহ্য সম্বন্ধে গ্রামবাসীর ও স্থানীয় লোকের এত বেশি মমত্ববোধ যে, তাকে আঘাত করতে আমি কুণ্ঠিত। তবু অনুসন্ধানীদের অনেক সময়, অপ্রীতিকর হলেও, স্থানীয় কিংবদন্তী কেন্দ্রিক 'ঐতিহ্য'কে বর্জন করতেই হয়। ইতিহাসের বিবিধ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কেবল জনশ্রুতিকে অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকা যায় না। চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে ছাতনা ও নান্নুর উভয়েরই দাবির যৌক্তিকতা আছে। বাঁকুড়ার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় হলেন ছাতনার

চণ্ডীদাসের সমর্থক এবং বীরভূমের হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হলেন নান্নুরের চণ্ডীদাসের অন্যতম প্রধান অধিবক্তা।[১] দু'জনের সঙ্গেই সাক্ষাতে আলোচনা করেছি। বিদ্যানিধি মহাশয় ছাতনায় 'নান্নুর' বা নান্নুরের মাঠের সন্ধান পেয়েছেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ছাতনা অঞ্চলের বাঁশুলি দেবীর প্রাধান্যের কথাও উল্লেখ করলেন, যা নান্নুরে নেই। তিনি বললেন, নান্নুরের বাঁশুলি বাগীশ্বরী দেবী, বাঁশুলি নয়। তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই কথা শুনে এমন যুক্তির অবতারণা করলেন যে, চণ্ডীদাস আরও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন। নান্নুরে গিয়ে আরও অনেক কথা শুনে হয়েছে যা নান্নুর প্রসঙ্গে বলেছি। ছাতনার কথা বলি।

ছাতনা প্রাচীন সামন্তভূমের রাজধানী। 'সামন্তভূম' নাম থেকেই বোঝা যায়, সেকালের কোনো সামন্তরাজার শাসনাধীন ছিল সামন্তভূম এবং ছাতনা ছিল তার রাজধানী। অনেকে বলেন শঙ্খ রায় হলেন এই রাজবংশের আদিপুরুষ। তাঁর পৌত্রের নাম হামীর উত্তররায়। ছাতনায় এখনও রাজবাড়ি আছে, রাজবংশধর আছেন। তাঁদের সম্বন্ধে জনশ্রুতিও আছে অনেক। ছাতনার পুরাতন বাঁশুলি দেবীর মন্দিরের ইঁটে হামীর উত্তররায় ও উত্তররায় এই দুই নামই নাকি পাওয়া যায়। শোনা যায়. চণ্ডীদাস ও দেবীদাস নামে দুই ভাই অন্য কোনো স্থান থেকে এসে রাজা হামীর উত্তররায়ের আশ্রয়ে বাস করতেন। দেবীদাস বাঁশুলি দেবীর পূজারী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ছাতনাতেই তাঁর বিবাহ হয়েছিল। চণ্ডীদাস ছিলেন কবি। তাঁদের পিতার নাম ছিল নিত্যনিরঞ্জন। ছাতনা থেকে যে বাঁশুলি মাহাত্ম্য পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তাই থেকে এবং দেবীদাসের বংশধরদের পুরুষানুক্রমিক স্মৃতি ও শ্রুতি থেকে এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, ছাতনায় কোনো চণ্ডীদাস ছিলেন কি না এবং যদি থাকেন তাহলে তিনি কোন্ চণ্ডীদাস ?

এই প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যুত্তরে চণ্ডীদাস-সমস্যা ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। ষাট বছর আগেও চণ্ডীদাস নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না। ১৯১৬ সালে বাঁকুড়ার (বেলেতোড়) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় চণ্ডীদাসের অজ্ঞাতপূর্ব কৃষ্ণ-লীলাকাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' সম্পাদনা করেন। এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে তিনি এই প্রাচীন পুঁথিখানি আবিষ্কার করেছিলেন। পুঁথির সঙ্গে পাওয়া একটি আলগা কাগজের লেখা থেকে মনে হয়, পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তার নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'। পুঁথি সম্পাদনকালে বসন্তবাবু তার নামকরণ

১ বর্তমানে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বর্ধমানের 'কেতুগ্রাম' চণ্ডীদাসের আদিস্থান মনে করেন (বর্ধমান অংশে কেতুগ্রাম দ্রষ্টব্য)।

করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। পুঁথি আদ্যন্তখণ্ডিত, নাম বা লিপিকাল কিছুই জানবার উপায় নেই। তাহলেও তার ভাব ও ভাষা দুই-ই যে খুব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন : 'এত পুরানো হাতের লেখা বাংলা বই এবং এত পুরানো ধরনের বাংলা ভাষা—চর্যাগীতি ছাড়া—ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সুতরাং সংশয় জাগিল চণ্ডীদাসের একত্বে।' তার পরে মণীন্দ্রমোহন বসু ১৩৪১ সালে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশ করে 'একত্বে'র সংশয় আরও গভীর করে তুললেন। এক-চণ্ডীদাস তিন-চণ্ডীদাসে বিভক্ত হয়ে গেলেন—বড়ু, দ্বিজ ও দীন।

ছাতনায় কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন। কোন্ সময় ছিলেন? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভণিতাকে সুকুমারবাবু পাঁচভাগে ভাগ করেছেন, যেমন—

১. বাসলীব বন্দনা+বড়ু চণ্ডীদাস
২. বাসলীব বন্দনা+চণ্ডীদাস
৩. বড়ু চণ্ডীদাস
৪. চণ্ডীদাস
৫. অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস

এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ভণিতা—বাসলীর বন্দনা ও বড়ু চণ্ডীদাসই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভণিতা প্রায় সমান সমান। চতুর্থ শ্রেণীর ভণিতা 'চণ্ডীদাস' শুধু চারবার পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর ভণিতা পাওয়া গিয়েছে সাতবার, যেমন (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৩য় সং)—

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ (পৃঃ ২২।২)
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (২৪।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (২৫।১)
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল, (৮৪।১)
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (১২৭।২)
গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (১৩৩।১)
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (১৩৪।২)

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম, পৃ ১৭২)

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, অনন্ত নামে এক গায়েনের সাতটি পদ পুঁথির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। 'বড়ু চণ্ডীদাস' যে উপাধি হয়ে গিয়েছিল তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। নানা কবি সেই উপাধি গ্রহণ করে পদ রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনের

নাম অনন্ত ছিল। এ অনুমান খুবই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। ভণিতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবির আসল নাম অনন্ত, তাঁর কৌলিক উপাধি 'বড়ু' এবং চণ্ডীদাস তাঁর দীক্ষাগুরুর প্রদত্ত নাম। কিন্তু কবি কোন্ সময়ের কবি? তাঁর সঙ্গে সামন্তভূমের ছাতনারই বা সম্পর্ক কি?

লিপিতত্ত্ববিদ্‌রা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ১৩৮৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০০ পর্যন্ত অনুমান করেছেন। মাঝামাঝি ১৫০০ খ্রীস্টাব্দ যদি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ধরা যায়, তাহলে তার অন্তত একশো বছর আগে কবি জীবিত ছিলেন। এই হিসাব অনুসারে আনুমানিক ১৪০০ খ্রীস্টাব্দে কবি জীবিত ছিলেন দেখা যায়। এই অনুমানের সঙ্গে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রদত্ত ছাতনা রাজবংশপরিচয়ের কালের প্রায় মিল হয়ে যায়। ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়ে পাওয়া যায়—

মাসাব্ধি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামন্তভূমে
শিলামূর্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান।
পাষণ্ড দলন হেতু ভবাব্ধি তরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।
বিদ্যাপতি তদুত্তবে গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেম বসগীতি নাহি যার তুলা।
ব্রহ্মা কাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীর হাম্বির সে হামিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাহ্মণ।

"মাসাব্ধি বিশিখ" বা ১২৭৫ শকে বা ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দে হামির উত্তর ছাতনার রাজা হন। তিনি "ব্রহ্ম কাল কর্ণ অরি" অর্থাৎ ১৩২৬ শকাব্দে বা ১৪০৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন।

এই চণ্ডীদাস যে চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীতরস আস্বাদন করতেন। জয়ানন্দ তাঁর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখেছেন:

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ।

সনাতন গোস্বামী কাব্যপর্যায়ে গীতগোবিন্দের সঙ্গে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় নৌকাখণ্ড বা দানখণ্ডের কোনো পদ নেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে:

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত।—(আদি ১৩)
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥—(মধ্য ২)

এই সব সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বে 'চণ্ডীদাস' নামে একজন কবি জীবিত ছিলেন। তিনি বড়ু চণ্ডীদাস।

এইবার 'বাসলী দেবী'র কথা বলা যাক। 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতায় বাসলীর বন্দনা অনেক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং তিনি যে বাসলীর পূজক ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ছাতনায় যে বাসলী দেবী আছেন, তাঁর মূর্তি ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মূর্তির সঙ্গে তন্ত্রোক্ত বিশালাক্ষীর ধ্যান প্রায় মিলে যায়—

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বুনদ প্রভাম্।
দ্বিভুজাং অম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গ খেটক ধারিণীং ॥
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বর ধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং ॥
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং পীনোন্নত পয়ো নং।
শবোপরি মহাদেবীং জটা মুকুট মণ্ডিতাং ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্ট দায়িকাম্।
সর্ব সৌভাগ্য জননীং মহাসম্পৎ প্রদাং স্মরেৎ ॥

বিশালাক্ষীর এই ধ্যানমূর্তির সঙ্গে ছাতনার বাসলীর অনেকটা মিল আছে। তাছাড়া 'বাসলী' তন্ত্রসম্মত মহাবিদ্যা—

কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্র· াঃ ॥

নান্নুরের মূর্তি বাগীশ্বরী মূর্তি। বাগীশ্বরীও তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা—

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥

কিন্তু বাগীশ্বরীই কি 'বাসলী' নামে পরিচিত হয়েছেন? ভাষাতত্ত্ববিদরা বলেন—বাগীশ্বরী-বাইসরী-বাসরী-বাসলী—এইভাবে 'বাসলী' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের জটিল নিয়মে যাই হোক না কেন, 'বিশালাক্ষী' থেকে 'বাঁশুলী'-'বাসলী' হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক। ছাতনা অঞ্চলে অনুসন্ধান করে দেখেছি 'বাসলী' প্রায় গ্রামদেবতার মতো পূজিত হন। আরও উল্লেখযোগ্য হল, বিশালাক্ষী-বাসলী দেবীর পূজা ক্রমে এই অঞ্চল থেকে মেদিনীপুর হয়ে দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেছে। বর্ধমান ও হুগলি জেলাতেও বিশালাক্ষী আছেন, কিন্তু তেমন বিস্তৃত আধিপত্য আর নেই। এই কারণে মনে হয়, এই তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যার পূজা একসময় রাঢ়দেশের এই অঞ্চলেই ব্যাপক প্রসারলাভ করেছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিপালাক্ষী 'বাঁসলি' কি না?

কিছুদিন আগে বর্ধমানের চকদীঘির 'রাঢ় গ্রন্থাগার' থেকে একটি বৃহৎ মঙ্গল-কাব্যের পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পেয়েছেন। পুঁথিখানির নাম হল—'বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত'। পরিচয়সহ পুঁথিখানি সম্প্রতি 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় (৬০ ভাগ, ২য় সংখ্যা থেকে) ধারাবাহিকারে মুদ্রিত হয়েছে। পরে এটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। পুঁথিতে গ্রন্থকার ও রচনাকালের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হয়েছে:

সাকে রষ রথ বেদ সসাঙ্ক গণিতে।
বাসুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে॥

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীকাব্যেও' আছে—

বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান।

সুতরাং বিশালাক্ষী থেকেই যে বাশুলী-বাসলী হয়েছে, তাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নেই। তাই যদি হয় তাহলে ছাতনার বাসলীর পূজক যে একজন চণ্ডীদাস ছিলেন এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস, তাতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তাহলে বীরভূমের নান্নুরে কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন? ভাবে ও ভাষায় প্রচলিত চণ্ডীদাসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের চণ্ডীদাসের তফাৎ আকাশ-পাতাল। সেই লোকপ্রিয় দ্বিজ চণ্ডীদাসই কি নান্নুরে ছিলেন?

ময়নাপুর

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রাম বিচিত্র সব কিংবদন্তীতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। ধর্মমঙ্গল কাহিনীর রাজা লাউসেনের রাজধানী, 'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের গ্রাম ইত্যাদি জনশ্রুতিকে আশ্রয় করে ময়নাপুর নিজের অলিখিত ইতিহাস নিজেই রচনা করেছে। সাধারণ মানুষ আর যারই কাঙাল হোক, কল্পনার কাঙাল যে নয়, তার প্রমাণ বাংলার অন্যান্য গ্রামের মতো ময়নাপুরে এলেও বোঝা যায়। কিন্তু জনশ্রুতি যে কেবল শূন্যতায় বিচরণ করে, তার কোনো জটশিকড় নেই, তা সবসময় সত্য নয়। অলিখিত ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান কিংবদন্তীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে একথা আগেও বলেছি। তবে কিংবদন্তীর চোরাবালিতে ইতিহাস-সন্ধানীদের খুব সাবধানে চলতে হয়। এই কথা মনে করে বিষ্ণুপুর থেকে ময়নাপুর গিয়েছিলাম (১৯৫৩)। অনেকটা পথ, বিষ্ণুপুর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় বারো-চোদ্দ মাইল পথ হবে। সুবিস্তৃত শালবনের কোলঘেঁষা বাঁকুড়ার নীরস রুক্ষ মেঠে পথ, যেমন উগ্র তেমান কঠিন। বাহন দ্বিচক্রযান অর্থাৎ বাইসাইকেল।

ময়নাপুর পৌঁছে সবই দেখলাম, লাউসেনের রাজধানী ও 'শূন্যপুরাণ' রচয়িতার বাসস্থান হতে হলে যেসব ঐতিহাসিক স্মৃতির নিদর্শন থাকা দরকার তার প্রায় সবই ময়নাপুরে আছে। যেমন আছে মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে কিছু দূরে ময়নাগ্রামে। রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে নিয়ে ময়নাপুর (বাঁকুড়া) ও ময়নাগড়ে (মেদিনীপুর) যে দ্বন্দ্ব, সেই একই দ্বন্দ্ব কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে ছাতনা (বাঁকুড়া) ও নানুরের (বীরভূম) মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই বাদপ্রতিবাদ চলে আসছে। এখানে সেরকম কোনো বিতর্কের অবতারণা করবার ইচ্ছা নেই এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোরও সাধ্য নেই। মেদিনীপুর বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান ইত্যাদি জেলার মধ্যে এরকম আরও অনেক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কল্পিত বাদানুবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কোনো সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না।

ময়নাপুরের কথা বলি। ময়নাপুর পৌঁছবার পর গ্রামবাসীরা সব কিছু দেখালেন, আমিও দেখলাম। গ্রামে 'যাত্রাসিদ্ধি' ধর্মরাজ ঠাকুর আছেন এবং তাঁর 'পণ্ডিত' উপাধিধারী পূজারীরা রামাই পণ্ডিতের বংশধর বলে দাবি করেন। 'পণ্ডিত'দের বাড়ি দেখলাম, যাত্রাসিদ্ধি ধর্মশিলা দেখলাম, তাঁর মন্দিরের ভগ্নস্তূপ ও বর্তমান চালাঘরের মন্দিরও দেখলাম। রামাই পণ্ডিতের বংশধরদের সকলকে দেখলাম। একটি নাতিদীর্ঘ পুকুর দেখলাম, নাম 'হাকন্দ-দীঘি'। স্থানীয় লোক হাকন্দ-দীঘির

জল গঙ্গাজলের মতো পবিত্র মনে করেন। দীঘির পাড়ে পাথরখণ্ডের একটি মন্দির দেখলাম, নাম হাকন্দ মন্দির। হাকন্দ-পুকুরের মধ্যে দৃষ্টির অন্তরালে নাকি একটি মন্দির দীর্ঘকাল ধরে রয়েছে এবং সেখানে এক দেবী বিরাজ করেন। হাকন্দ-মন্দিরের মধ্যে একটি পাথর-চাপা গর্ত আছে, সেটি নাকি সুড়ঙ্গ এবং সেই সুড়ঙ্গপথে নাকি পুকুরের তলায় মন্দিরে যাওয়া যায়। এইরকমের সব 'নিদর্শন' দেখে বাঁকুড়া-নিবাসী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে বলেছিলেন: "এই সকল কারণে আমি মনে করি মল্লভূমই লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের দেশ ছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে ময়নাপুরই ময়নানগরের প্রাচীন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এটা আমার অনুমান মাত্র।" (শূন্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ৭৪)।

কেবল 'অনুমানের' উপর নির্ভর করে এই ধরনের বিষয়ে কোনো ঐতিহাসিক ইঙ্গিত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এককালে আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণা যখন বিশেষ প্রসারলাভ করেনি, তখন একদল 'পণ্ডিত' কুলজীগ্রন্থ ও কিংবদন্তীর দুই পক্ষবিস্তার করে বাংলা দেশের ইতিহাসের শূন্য ভিটের উপর যদৃচ্ছা উড়ে বেড়িয়েছেন। সরলবুদ্ধি গ্রাম্যলোকের সহজ কল্পনায় তাঁরা প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছেন এবং সেইজন্য একই স্মৃতিবিজড়িত একাধিক ঐতিহাসিক স্থানের আজ এদেশে অভাব নেই। কিন্তু অনুমান ইতিহাস নয়, রাজা-রাজড়াদের হুকুমে লিখিত কুলজীগ্রন্থও ইতিহাস নয়। কিংবদন্তীও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এসবের যে কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই তা নয়, বিচার-বিশ্লেষণে তার মূল্য যাচাই করা শ্রমসাধ্য ব্যাপার। ময়নাপুর প্রসঙ্গেও এই কথা মনে রাখা উচিত।

কিংবদন্তীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে ময়নাপুরের বাস্তব পরিবেশ থেকে তার ঐতিহাসিক ধারার কি ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই দেখা যাক। প্রথমত ময়নাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বদিকে মাইল পঁচিশ দূরে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা এবং দক্ষিণে মাত্র তিন-চার মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার সীমানা। ময়নাপুর কেন্দ্র করে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত টানলে যে অঞ্চলটি পাওয়া যায়, সেখানে ধর্মপূজার প্রচণ্ড প্রতিপত্তি অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে মেদিনীপুর গড়বেতা ঘাটাল অঞ্চলে, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অনেক স্থান পড়ে। 'কালচার-জোন' হিসাবে এই অঞ্চলটিকে ধর্মপূজার একটি অন্যতম 'জোন' (Zone) বলা যায়। উত্তরে বীরভূম থেকে বর্ধমান পর্যন্ত এরকম ধর্মপূজার নির্দিষ্ট 'অঞ্চল' আছে। লক্ষণীয় হল, ময়নাপুর-আরামবাগ-ঘাটাল কেন্দ্রের পর পুবে ও

দক্ষিণে ধর্মপুজার অবিমিশ্র রূপ ক্রমে মিশ্রিতরূপ ধারণ করে ধীরে ধীরে যেন ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এসে মিলিয়ে গিয়েছে। একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতিধারার প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস ক্রমে যেন বিলীন হয়েছে গঙ্গার বুকে। কোনো বিশেষ একটি কেন্দ্রকে বা স্থানকে এই ধারার উৎসরূপে নির্দেশ করা যুক্তিহীন। পরিষ্কার বোঝা যায়, রাঢ়দেশের সুদীর্ঘ পশ্চিম সীমান্ত, উত্তরের সাঁওতাল পরগণা থেকে দক্ষিণের ছোট-নাগপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অনার্য নিষাদ-সংস্কৃতির অন্যতম মহাকেন্দ্র থেকে, অজস্র শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে এই সংস্কৃতিধারার প্রবাহ পশ্চিম থেকে পুবে এসে ভাগীরথী-সঙ্গমে মিশে গিয়েছে। এই সংস্কৃতিধারার একটা নিটোল নিজস্ব রূপ আছে, যা বাংলার আর অন্য কোনো অঞ্চলে নেই। ব্রাহ্মণ্যধারার বা তথাকথিত আর্যধারার প্রাধান্য এখানে যে কত নগণ্য তা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে ঘুরলে বুঝতে পারা যায়। উপরতলার সংস্কৃতি যে প্রধানত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিকে যে পদে-পদে কিভাবে তথাকথিত অনার্য-সংস্কৃতির সঙ্গে আপস করতে হয়েছে, রাঢ়দেশ বোধহয় তার অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক সাক্ষী।

শুধু ময়নাপুরেই ধর্মঠাকুর অজস্র দেখা যায়। যাত্রাসিদ্ধি ধর্মশিলার সঙ্গে অনেক ধর্মশিলা একত্রে পূজিত হন। নানা নামে তাঁরা পরিচিত। বাঁকুড়া রায়, ক্ষুদি রায়, শীতলনারায়ণ, চাঁদ রায় ইত্যাদি। একসময় বিভিন্ন স্থানে তাঁদের পূজা হত। পূজারী অভাবে এখন সকলে ময়নাপুরের প্রধান ধর্মরাজ যাত্রাসিদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন। বাঁকুড়া রায়ের একটি স্বতন্ত্র সুন্দর ইটের কারুকাজ-করা মন্দিরও আছে, অন্তত শতাধিক বছরের প্রাচীন মন্দির। হয়ত ধর্মপূজার এই আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্যই এবং ময়নাপুরের ঐতিহাসিক নাম-সাদৃশ্যের জন্য ময়নাপুর গ্রামটিকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর রাজা লাউসেন ও শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের উপকথা রচিত হয়েছে। হওয়া আশ্চর্য নয়।

ধর্মের মূর্তিগুলি সবই কূর্মমূর্তি ও শিলামূর্তি। ছোট বড় মাঝারি নানারকমের মূর্তি যাত্রাসিদ্ধির কাছে আছে। তার মধ্যে একটি মূর্তি পূজারী পণ্ডিতরা পূজা করেন। মূর্তিটি গ্রাম থেকে কুড়িয়ে-পাওয়া একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি। শুনলাম, এরকম নাকি আরও বুদ্ধমূর্তি এখানে পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলি স্থানান্তরিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের অসংখ্য মূর্তির সঙ্গে ময়নাপুরের এই বুদ্ধমূর্তিগুলিই সবচেয়ে মূল্যবান ঐতিহাসিক সম্পদ বলে আমি মনে করি, অন্তত রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের কাহিনী-সম্পদের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এই বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে আরও যেসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব-পার্বণের নিদর্শন আছে ময়নাপুরে সেগুলি মিলিয়ে

দেখলে এই অঞ্চলের যে ঐতিহাসিক ধারার আভাস পাওয়া যায় তারও গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়।

ময়নাপুর গ্রাম অব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। গ্রামে বাগদি (তেঁতুলে, কাঁসাইকুলে ও মেটে), হাড়ি ডোম প্রভৃতিদের বাস অনেক আছে। গ্রাম-দেবতাদের মধ্যে মনসা চণ্ডী শীতলা কুদ্রা বড়ম্ ভৈরব প্রধান। গ্রামের মধ্যে গাছতলায় সবচেয়ে জাগ্রত দেবী চণ্ডী বিরাজ করেন। পাঁচমুড়োর (বাঁকুড়া) কুম্ভকারদের তৈরি মাটির হাতিঘোড়াই সর্বত্র চণ্ডী মনসা ভৈরবরূপে বিরাজমান। গ্রামের পশ্চিমদিকে যজ্ঞেশ্বর শিব ও রক্ষাকালী আছেন, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই উপাস্য দেবতা। শিবের কাছে চড়কের গাজন হয় ধুমধাম করে। দুর্গাপূজা কালীপূজাও সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য হল, কালীপূজার পর জেলেরা 'ডাকাতে কালী'র পূজা করে এবং কালীর প্রতিমূর্তি হল 'নরমুণ্ডের উপর প্রোথিত ত্রিশূল'। গ্রামের অন্যতম জমিদারবংশ মুখোপাধ্যায়দের গৃহের সংলগ্ন কালীঠাকুর ও তান্ত্রিক-সাধকের পঞ্চমুণ্ডির আসন আছে। এই বংশেরই পূর্বপুরুষ দেওয়ান চণ্ডীচরণ বহুদিন নিঃসন্তান থাকায় শ্মশানে কালীসাধনা করে 'কালীপ্রসাদ' নামে পুত্রলাভ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা। এই কালীপ্রসাদ বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। ময়নাপুরে কালীমন্দির এবং তারই পাশে দু'টি শিবলিঙ্গ 'কালীপতি' ও 'কালীগতি' নামে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। লোকে তাঁকে 'কালীরাজা' বলে ডাকত। কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের মতো তিনিও অনেক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন। শোনা যায়, 'কালীসুধাসিন্ধু' নামে একখানি তন্ত্রগ্রন্থও তিনি রচনা করেন এবং 'কুলবধূ ইব' (কুলবধূর মতো) অতি গোপনে সেটি রক্ষা করতে বলে যান।

ময়নাপুর গ্রামে বুদ্ধ ধর্ম ও তন্ত্রের এই বিকাশ থেকে একটি বিশেষ সংস্কৃতিধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ময়নাপুর বাঁকুড়া জেলার তথা মল্লভূমের একটি প্রাচীন সংস্কৃতিকেন্দ্র। কুদ্রা বড়ম ভৈরব ইত্যাদি অনার্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট নিদর্শন। বজ্রাসনে উপবিষ্ট একাধিক বুদ্ধমূর্তি এককালে এইস্থানে বজ্রযানের প্রাধান্যের সূচনা করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তান্ত্রিক ধর্মের প্রাধান্য এই ধারার স্বাভাবিক পরিণতি বলে মনে করা যেতে পারে। চণ্ডী কালী, আখড়া কালী, ডাকাতে কালী, পঞ্চমুণ্ডির আসনে সাধনা ইত্যাদি তার প্রমাণ এবং জেলে বাগদি থেকে মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত ময়নাপুরের সকলে উগ্র তান্ত্রিক উপাসক। নরমুণ্ডের উপর ত্রিশূল আজও কালীর প্রতীকস্বরূপ পূজিত হয়। শিব যেমন সর্বত্র থাকেন তেমনি আছেন, কিন্তু তাঁর পাশে রক্ষাকালী আছেন। এরই মধ্যে ধর্মপূজার প্রাধান্যও দুর্বোধ্য নয়। ইতিহাসের একটা

ধারাবাহিক উত্থান-পতনের চিহ্ন ময়নাপুরের এই সব নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে। তার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আছে। আধুনিক অনুসন্ধানীরা অনেকেই যখন রাজা লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতের ঐতিহাসিক অস্তিত্বেই সন্দেহ করেন এবং যাঁরা করেন না তাঁদের মধ্যেও যখন তাঁদের প্রকৃত সত্তা ও কালনির্ণয় নিয়ে মতভেদ আছে তখন ময়নাপুর প্রসঙ্গে তার গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে ময়নাপুরের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অন্যদিক দিয়ে যেভাবে নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি, মনে হয় তার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য থাকলেও থাকতে পারে। ময়নাপুরের ইতিহাস থেকে মনে হয়, বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম, ধর্মঠাকুর পূজা ও তান্ত্রিক ধর্ম, এই ত্রিধারার মধ্যে কোনো গভীর যোগসূত্র আছে।

ময়নাপুরের 'হাকন্দ মেলা', ধর্মোৎসব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কথিত 'হাকন্দ মন্দিরের' কাছে 'কৈলাসের' মৃন্ময়মূর্তিগুলি (পৌরাণিক) মৃৎশিল্পের চমৎকার নিদর্শন। মধ্যে মধ্যে মূর্তিগুলি নতুন করে তৈরি করা হয়। মৃৎশিল্পীর অভাবে ভবিষ্যতে আর হবে কি না বলা যায় না। মল্লভূমের সমৃদ্ধিকালে, বোঝা যায়, ময়নাপুর সেই সমৃদ্ধির অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মল্লভূম আজ অতীত ইতিহাসের অধ্যায় মাত্র, ময়নাপুরও তার একটি জীর্ণ পৃষ্ঠা ছাড়া কিছু নয়, যার পাঠোদ্ধার করা সত্যই কঠিন।[২]

২ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মেদিনীপুর জেলার 'ময়না' সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
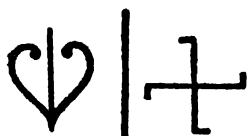
৩|২ মটগোদার শনিমেলা

মাঘমাসের শেষ শনিবারে প্রত্যেক বছর বাঁকুড়া জেলাব মটগোদা গ্রামে জাগ্রত গ্রামদেবতা ধর্মরাজের বিশেষ পূজা উপলক্ষে বেশ বড একটি মেলা হয়। শনিবারের মেলা বলেই বোধহয় শনিমেলা নাম, শনিঠাকুরের মেলা নয়। জাগ্রত, এবং অতি জাগ্রত ধর্মরাজঠাকুরের অভাব নেই রাঢ়দেশে, বাঁকুড়া বীরভূম বর্ধমান মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় তাঁদের সংখ্যাও অনেক। কিন্তু মটগোদার ধর্মরাজের বিশেষ পূজানুষ্ঠান উপলক্ষে মাঘমাসের শেষ শনিবারে এই মেলার সমাবেশের একটা বিশেষত্ব আছে। বৈশাখী পূর্ণিমা থেকে আরম্ভ করে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ পর্যন্ত ধর্মরাজের বাৎসরিক পূজানুষ্ঠান রাঢ়ের নানাস্থানে হয়, কিন্তু শীতকালে মাঘমাসে কোথাও হয় বলে এখনও জানি না। শনিবার দিনটিকে কোথাও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেও শুনিনি। মাসের 'শেষ' শনিবারও কৌতূহল উদ্রেক করে। তার উপর মেলাটিকে একটি সাঁওতাল-মেলা বললে ভুল হয় না। ১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, মাঘের শেষ শনিবার, বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ৪২ মাইল দক্ষিণে, রায়পুর থানার তিন মাইল দূরে মটগোদা গ্রামের এই মেলা দেখতে আমরা যাই। এর আগে যাইনি। অনেক মেলা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে দেখেছি, কিন্তু এরকম মেলা দেখিনি। জানি না, আটবছর আগে মেলার যে রূপ দেখেছিলাম, আজও তা অবিকৃত আছে কিনা! পরিপার্শ্বের চাপে না থাকারই কথা, যেমন অনেক মেলারই নেই।

মটগোদার ধর্মরাজ ও শনিমেলার একটু ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। শ্যামসুন্দরপুর ফুলকুসমা সিমলাপাল রায়পুর ভাতাইডিহি প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে রায়পুর থানার দক্ষিণাঞ্চল একদা 'রাজাগ্রাম' নামে পরিচিত ছিল। রাজাগ্রামের একজন সামন্তরাজা ছিলেন। কিংবদন্তী এই যে তিনি কোনো কারণে সপরিবারে আগুনে

ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার ফলে তাঁর বংশে রাজা হবার কেউ থাকে না। বহুকাল রাজাগ্রাম রাজশূন্য ছিল এবং ভয়ংকর সব ডাকাত ও বন্যজন্তুদের রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এমন সময় নকুড়তুঙ্গ নামে একজন ওড়িয়া এখানকার রাজ্য দখল করে রাজা হন। এই নকুড়তুঙ্গ সম্বন্ধে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তার মধ্যে ইতিহাস ও কিংবদন্তী দুয়েরই মিশ্রণ হয়েছে বোঝা যায়।

তুঙ্গদেও হলেন নকুড়তুঙ্গের প্রপিতামহ। গণ্ডকী নদীর তীরে কোথাও তিনি বাস করতেন। সেখান থেকে পুরীতে জগন্নাথজীউকে দর্শন করতে এসে তাঁর কৃপালাভ করেন। কৃপাবলে তুঙ্গদেও পুরীর রাজা হন। কিন্তু তুঙ্গদেও-এর পৌত্র গঙ্গাধরতুঙ্গকে জগন্নাথদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেন যে গঙ্গাধরের পর তাঁর বংশের কেউ পুরীর রাজা হবেন না, অতএব তাঁর পুত্রকে নাম পরিবর্তন করে অন্য কোনো দেশে গিয়ে রাজা হতে হবে। স্বপ্নাদেশ অনুসারে গঙ্গাধর তাঁর পুত্র নকুড়তুঙ্গকে সপরিবারে অন্যদেশে চলে যেতে বলেন। নকুড়তুঙ্গ ১২৭০ শকাব্দে (১৩৪৮ খ্রীস্টাব্দ) পুরীধাম ত্যাগ করে, প্রায় দশ বছর নানাস্থানে ঘুরে, অবশেষে বাঁকুড়া-রায়পুরের এই অঞ্চলে এসে শ্যামসুন্দরপুরের কাছে টিকারপুরে বসবাস করেন। স্থানীয় দস্যু ও বন্য জন্তুদের দমন করে তিনি ছত্রনারায়ণদেও নামগ্রহণ করে এখানকার রাজা হন এবং জগন্নাথদেবের নামে স্থানের নাম রাখেন জগন্নাথপুর। এই নকুড়তুঙ্গের নাম থেকেই এই অঞ্চল 'তুঙ্গভূম' নামে পরিচিত হয়। নকুড়তুঙ্গের সঙ্গে এসে ২৫২টি উৎকল ব্রাহ্মণ পরিবার এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। এই কারণে এখনও বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে উৎকল-ব্রাহ্মণদের বাস বেশি।

নকুড়তুঙ্গ তাঁর গুরু ও পরামর্শদাতা শ্রীপতি মহাপাত্র নামে এক উৎকল ব্রাহ্মণকে সিমলাপাল অঞ্চলের জমিদারী দান করেন এবং রায়পুর পরগণা দেন শিখর-রাজবংশকে। শিখরভূম নাম এই রাজবংশ থেকেই হয়েছে। রায়পুর গ্রামে শিখররাজাদের স্মৃতিনিদর্শন কিছু দেখা যায়। যেমন শিখরসায়র, শিখরগড় ও মীরণসাহের সমাধি। নকুড়তুঙ্গ-তথা-ছত্রনারায়ণের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের রাজত্বকালে তাঁর ভাই মুকুটনারায়ণ দেবের সঙ্গে বিরোধ হয় এবং রাজত্ব ভাগ হয়ে যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ পরগণা শ্যামসুন্দরপুরের এবং মুকুটনারায়ণ ফুলকুসমার রাজা (জমিদার) হন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে এঁদের বংশধর সুন্দরনারায়ণ ও দর্পনারায়ণের নামে যথাক্রমে দুই জমিদারীর পাকাপাকি পত্তন হয়। অল্পকালের মধ্যেই দেনার দায়ে দুই জমিদারীই লাটে ওঠে, প্রথমে ফুলকুসমা, পরে

শ্যামসুন্দরপুর। কিন্তু দুই বংশের নাম বড়তুঙ্গ ও ছোটতুঙ্গ (বড়তরফ ও ছোটতরফের মতো) আজও লোকের মুখে শোনা যায়।

বন্যজন্তু ও দস্যুদের দমন করে নকুড়তুঙ্গ রাজা হয়েছিলেন। বন্যজন্তুদের মধ্যে প্রধান হল ময়ুরভঞ্জের হাতি, প্রায় যারা দল বেঁধে এখানকার জঙ্গলে চলে আসত। আর দস্যুদের মধ্যে প্রধান হল স্থানীয় আদিবাসীরা, অর্থাৎ প্রধানত সাঁওতাল ও অনুচ্চবর্ণের লোকজন। তাদেরই 'দস্যু' বলা হত। বোঝা যায় উৎকলের ময়ুরভঞ্জের রাজবংশ অথবা অন্য কোনো রাজবংশ এই অঞ্চল দখল করেছিলেন, যেমন মেদিনীপুর, হুগলির কিয়দংশ দখল করে একদা তাঁরা রাজত্ব করেন। এইজন্য বাঁকুড়ার রায়পুর-শ্যামসুন্দরপুর, মেদিনীপুরের কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলে দেবালয় স্থাপত্য থেকে স্থানীয় লোকের (আদিবাসী ছাড়া) আকৃতি-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার-অভ্যাস, এমনকি ভাষাতে পর্যন্ত বঙ্গীয়-উৎকলীয় সাংস্কৃতিক উপাদানের বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। এরকম আর পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও দেখা যায় না।

শ্যামসুন্দরপুরের উৎকল-রাজাকে মটগোদার ধর্মরাজ এক রাত্রিকালে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন—"আমি কিছুকাল ধরে মটগোদা গ্রামের অমুক স্থানে মাটিচাপা পড়ে রয়েছি। আমাকে অবিলম্বে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা কর এবং লালগড়ের 'পণ্ডিত' উপাধিধারী জেলেদের কাউকে এনে আমার পূজার ব্যবস্থা কর। ব্রাহ্মণ দিয়ে আমার পূজা কর না।" স্বপ্নাদেশের তাৎপর্য পরিষ্কার। উৎকলরাজের অভিযানের ফলে যে দস্যুদমন হয়, তাতে স্থানীয় লোকের জীবন বিপর্যস্ত হয়। তাদের পূজ্য দেবতা মটগোদার ধর্মরাজকে ফেলে পলায়ন করতে হয়ত তারা বাধ্য হয়। অতঃপর মটগোদার ধর্মরাজ অর্থাৎ তাঁর পাথরের কচ্ছপমূর্তি, মাটিচাপা পড়ে। তাঁর সঙ্গে যেসব কামিন্যা ছিলেন তাঁরাও ভূগর্ভস্থ হন। স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হলে পুনরায় মটগোদার ধর্মরাজের পূজার প্রয়োজন হয়। তখন যথারীতি বিজয়ী রাজাকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে তিনি পুনরায় আবির্ভূত হন। মাটির তলা থেকে পুনরুত্থানের পর রাজবাড়িতে তিনদিন পূজা হয়, তারপর মটগোদায় আসার পর জেলে 'পণ্ডিত' পূজা আরম্ভ করে। মটগোদার ধর্মরাজ-মন্দিরে কূর্মমূর্তি ধর্ম, স্বরূপ নারায়ণ (বিষ্ণু) ছাড়া কালী, সর্বমঙ্গলা প্রভৃতি দেবীরাও আছেন। শ্যামসুন্দরপুরের রাজার দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকে পূজা ও বাৎসরিক শনিমেলার আয়োজন করা হয়। মাঘমাসে শনিবারে পূজার একটি কারণ নাকি রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় শনিবার রাতে এবং মাঘমাসে। তা নাও হতে পারে। কারণ স্বপ্নাদেশের যে-যুক্তি, সেই যুক্তিও মাঘমাস ও শনিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাহলে অন্য কি

কারণে ধর্মরাজের এই পূজা ও মেলার বিশেষ অনুষ্ঠান হয় মাঘমাসে? নানারকমের প্রশ্ন করেও স্থানীয় লোকের কাছ থেকে এবিষয়ে কিছু জানা সম্ভব হয়নি। আমার নিজের একটি কথা মনে হয়েছে, শনিমেলার সাঁওতালপ্রধান রূপ দেখে। সেটা অনুমান হলেও, বলা যেতে পারে।

মাঘমাসে সাঁওতালদের কয়েকটি পরব হয়। পৌষমাসেও হয়, মাঘমাসের পরবের মধ্যে একটি হল 'মাঘ সিম্ যম' পরব, অর্থাৎ মুর্গী খাওয়ার পরব উপলক্ষে মুর্গীর লড়াই হয়। মুর্গী খাওয়ার পরবে, খাওয়াটা বড় নয়, নৃত্যগীতবাদ্যের উৎসবই বড় এবং সাঁওতালী পরবের এইটাই বৈশিষ্ট্য। এইসময় মটগোদায় মুর্গীর লড়াই দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। স্থানীয় প্রবীণ লোকেরা বলেন, আগে মটগোদার শনিমেলায় চারিদিক থেকে সাঁওতাল মেয়েরা দলে দলে আসত এবং বেলা প্রায় দশটা-এগারটা থেকে রাত ন-দশটা পর্যন্ত মেলায় ঘুরে ঘুরে নাচগান করত। কয়েকবছর হল সাঁওতাল মেয়েদের এই নাচগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শুধু এখানে নয়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য মেলাতেও সাঁওতালদের নাচগান আর হয় না, যেখানে আগে সেইটাই ছিল অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমার বেশ মনে আছে, ১৯৫২-৫৩ সালে প্রথম ঝাড়গ্রাম অঞ্চল পরিভ্রমণকালে, যখন সাঁওতালী অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত উৎসব দেখার প্রস্তাব করি' তখন স্থানীয় একজন বিশেষ প্রভাবশালী সাঁওতাল মাঝির সাহায্যে আমাকে একলা (অন্য কোনো সঙ্গী থাকবে না এই শর্তে) সাঁওতাল-পল্লীতে গিয়ে তা দেখতে হয়েছিল। প্রতিপত্তিশালী সুশিক্ষিত স্থানীয় কোনো সাঁওতাল রাজনৈতিক নেতা আমাকে এব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন বলেই আমার পক্ষে সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যগীত-উৎসব দেখা সম্ভব হয়েছিল। এখানে এ কথা উল্লেখ করার কারণ হল, মটগোদার শনিমেলায় সাঁওতাল মেয়েদের নৃত্যগীত-উৎসব কেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তা বোঝাবার জন্য। এর বেশি কিছু বলা অনাবশ্যক।

মটগোদার শনিমেলায় বেলা দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সাঁওতাল মেয়েরা দলে দলে নাচগান আর করে না। ১৯৬৮ সালে আমরাও তা দেখিনি। দেখব বলে কোনো প্রত্যাশাও ছিল না, অন্তত আমার তো ছিলই না। কিন্তু তথাপি যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে, এই শনিমেলা সাঁওতালদেরই মেলা ও উৎসব। মেলায় যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে বঙ্গীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক বাবুজনগণের সংখ্যা শতকরা এক-দুইজন মাত্র এবং তাঁরা প্রায় সকলেই কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারী। এটা একটা বিশেষ উল্লেখ্য ব্যাপার। এইজন্য উল্লেখ্য যে ইদানীং এই ধরনের গ্রাম্যমেলায় লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগবশত এদেশী ও বিদেশী বাবুদের বেশ সমাগম হয়।

মটগোদায় তা হয়নি। তৎসত্ত্বেও সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা নাচগান করেনি প্রকাশ্য মেলায় এবং তা না করলেও শনিমেলাটা যে প্রায় তাদেরই মেলা তা মেলার মাঠে দেয়াতলায় পা দিলেই বোঝা যায়।

প্রচলিত প্রথা হল শনিমেলার দিন শ্যামসুন্দরপুরের রাজা নিজে এসে ধর্মরাজের পূজার আদেশ দেবেন, তারপর পূজা আরম্ভ হবে। একদা অনেক ধুমধাম সাজসজ্জা করে, হাতিতে অথবা সুশোভিত পাল্কিতে চড়ে, পূজার উপচারসহ তিনি রাজকীয় মর্যাদায় মেলায় আসতেন। অতীতের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের ঝলমলে দিনগুলো শেষ হবার প:, দ্বারভাঙার মহারাজা (যিনি এই অঞ্চলে প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক হন) হাতি পাল্কি দিয়ে কিছুদিন শ্যামসুন্দরপুরের রাজার মর্যাদা রক্ষা করেছেন, পরে রাজা প্রতিনিধির দ্বারা তাঁর প্রথাসম্মত কর্তব্য পালনে বাধ্য হয়েছেন। রায়পুর থানা থেকে দক্ষিণে মটগোদার পুবদিক দিয়ে ফুলকুসমা পর্যন্ত একটি বড় বাস-রাস্তা আছে। এই রাস্তা থেকে আবএকটি রাস্তা দেয়াতলা দিয়ে গ্রামেব সীমানা ছাড়িয়ে মটগোদার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছে। এই রাস্তার দু'ধারে দেয়াতলায় শনিমেলা বসে। এত বড় মেলা বাঁকুড়ার দক্ষিণাঞ্চলে আর কোথাও হয় না। মেলায় সিনেমা আসে, ডাইনামো-চালিত বিশাল নাগরদোলা ঘোরে, ভাল সার্কাস দেখানো হয়, ম্যাজিকও থাকে। গ্রাম্য কারিগরদের তৈরি পাথর-লোহা-কাঠের জিনিসপত্রের প্রচুর আমদানি হয়, কিন্তু লোকশিল্পের নিদর্শন বিশেষ উল্লেখ্য কিছু দেখিনি। ডোকরা কামারদের তৈরি সাধারণ স্থূল জিনিস কিছু ছিল। সাঁওতালদের অলঙ্কার ছিল অনেকরকমের। জামা-কাপড়ের দোকান, খাবারের দোকান, প্লাস্টিকের জিনিস, এসব তো ছিলই যা আজকাল সমস্ত মেলাতেই থাকে এবং না থাকলে মেলা জমে না। শনিমেলা ১৫ দিন ধরে চলে, গ্রাম্যমেলা সাধারণত এতদিন ধরে চলে না। কিন্তু মাঘের শেষ শনিবারের বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনই মেলায় লোকসমাবেশ হয় সবচেয়ে বেশি। লোক বলতে সাঁওতালরাই প্রধান এবং সাঁওতালদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

দুপুরের পর থেকে ভিড় জমতে থাকে। বিকেল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে জনস্রোত বেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। একটু দূরে কোনো উঁচু জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে জনতার যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা সত্যিই অপূর্ব। নানারকমের-ফুলগোঁজা সাঁওতালী খোপার ঢেউ, তার মধ্যে সাঁওতাল পুরুষরা এবং তার মধ্যে এখানে-সেখানে অ-সাঁওতাল কিছু লোক অথবা কয়েকজন ভদ্রলোক তৃণখণ্ডের মতো ভাসমান। অনর্গল কল্‌কল্‌ হাসির শব্দ, পাহাড়ী ঝরনার মতো, কৃত্রিম আমোদের নয়, স্বাভাবিক

আনন্দ-উচ্ছ্বাসের। মেলায় যেখানে যাও সেখানেই হাসির এই কলকলানি, সার্কাসে নাগরদোলায় ম্যাজিকঘরে, দোকানের কেনাবেচায়, সর্বত্র। এবং এই সাঁওতালী উচ্ছলতার অভিনব প্রকাশ সাঁওতালী যাত্রাগানের ও অভিনয়ের আসরে, যা আর কোথাও দেখিনি। একাধিক যাত্রার দল (সাতটি) এসেছে শনিমেলায়, সাঁওতালদের যাত্রার দল। এইটাই বোধহয় মটগোদার শনিমেলার শ্রেষ্ঠ ও অভিনব বিশেষত্ব। মাঘমাসের শীতের রাতে সাঁওতাল পুরুষ-রমণী তরুণ তরুণী বালক-বালিকারা বিশাল এক-একটা জমাটবাঁধা চাঙড়ের মতো জড়ো হয়ে, বসে-দাঁড়িয়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের নিজেদের যাত্রাভিনয় দেখছে এবং মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত বিমুগ্ধ বাহবার সাঁওতালী শব্দধ্বনি শোনা যাচ্ছে, হাসির কল্লোলের মধ্যে।

মণ্ডলকুলি। অম্বিকানগর। ধরাপাট

মণ্ডলকুলি অম্বিকানগর ধরাপাট বাঁকুড়ার তিনটি গ্রামের নাম, কিন্তু পাশাপাশি গ্রাম নয়, একই থানাধীন গ্রাম নয়, এক অঞ্চলেরও গ্রাম নয়। তথাপি এই অধ্যায়ের শিরোনামে এই গ্রাম তিনটির বিশেষ সন্নিবেশের একটা যুক্তি আছে। যুক্তি এই:

একসময় বাঁকুড়ায় জৈনধর্মের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল তার আভাস দেওয়া। পুরুলিয়ার জৈন পুরাকীর্তির কেন্দ্রগুলি থেকে বাঁকুড়ার এই কেন্দ্রগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে, এবং তার সঙ্গে রাঢ়ের অন্যান্য স্থানের জৈনকীর্তিগুলি পাশাপাশি বিচার করলে, পশ্চিমবঙ্গে জৈনধর্মের ঐতিহাসিক রূপটি অনেকটা স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে (মানচিত্র-সহ পুরুলিয়ার জৈনকীর্তিকেন্দ্রগুলির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। এই অধ্যায়ে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা করব না (এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে করা হবে), কেবল পশ্চাদভূমি রচনার জন্য এইদিক থেকে স্থানগুলির গুরুত্বের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

রায়পুর থানার মধ্যে মণ্ডলকুলি গ্রাম, অম্বিকানগর রানীবাঁধ থানায়, এবং বিষ্ণুপুর থানায় ধরাপাট। মণ্ডলকুলিতে (জে. এল. নম্বর ২৪১) প্রায় ২৫০০ লোকের বাস, তার মধ্যে অনুচ্চবর্ণ ও আদিবাসী লোকসংখ্যা প্রায় শতকরা ২০ জন। কিন্তু নির্ভেজাল উচ্চবর্ণের (ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ) আধিক্য নেই, প্রভাবও সীমাবদ্ধ। অম্বিকানগর (জে. এল. নম্বর ১৯) আরও ছোট গ্রাম, লোকসংখ্যা ১৮০০র মতো, তার মধ্যে অনুচ্চবর্ণ ও আদিবাসীদের মিলিত সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫০ জন। ধরাপাট খুবই ছোট গ্রাম (জে. এল. নম্বর ১০০), লোকসংখ্যা কমবেশি ৮০০ হবে, তার মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম অনুচ্চবর্ণ ও আদিবাসী। এই তিনটি গ্রামকেই

বাঁকুড়ায়, অন্যান্য আরও অনেক স্থানের মধ্যে, জৈনকীর্তির বেশ বড় কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করা যায়।

মণ্ডলকুলি গ্রামের কথা আজও কেউ জৈনকীর্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বলে জানি না। মটগোদার শনিমেলায় না গেলে এই গ্রামটির কথা আমরাও জানতে পারতাম না, দেখাও হত না হয়ত। মধ্যরাত পর্যন্ত মেলায় ঘুরে, সাঁওতালী যাত্রা শুনে, ক্লান্ত হয়ে খেয়েদেয়ে ঘুম দেবার পর, সকালে উঠে শোনা গেল মণ্ডলকুলির কথা, স্থানীয় লোকজনের মুখে। মণ্ডলকুলি গ্রামে নাকি অনেক পাথরের দেবদেবী আছে এবং গ্রামটি খুব দূরেও নয়। রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে একটা বড় মাঠ পেরুলেই গ্রাম। মাঠের কথা শুনে মনটা একটু ছ্যাঁক করে উঠলো, কারণ এরকম অনেক মাঠ পার হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা ১৯৫০-এর দশকে গ্রাম-পর্যটনের সময় হয়েছে। ১৯৬৮ সালের মধ্যে বয়সও আরও প্রায় পনের বছর বেড়েছে, সেরকম তাকতও নেই। তরুণ সঙ্গীদের উৎসাহ যথেষ্ট, কাজেই কোনরকমে সকালের চা-খাবার খেয়ে কয়েকজন মিলে মণ্ডলকুলির পথে যাত্রা করলাম। মাঠটি মোটেই ছোট নয়, বেশ বড় মাঠ এবং সেই মাঠ পার হয়ে মটগোদা থেকে মণ্ডলকুলি যাতায়াত (প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল) করতে আমার অন্তত বেশ শারীরিক কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কষ্ট অপ্রত্যাশিতভাবে সার্থক হয়েছিল, তাই ফেরার সময় বেশ চড়া রোদ উঠলেও ক্লান্তিবোধ করিনি।

গ্রামে আগেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল, আমরা যাব। প্রবীণ ও তরুণেরা সকলে যথাস্থানে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। গ্রামে পৌঁছতেই তাঁরা পুকুরপাড়ে একটি বড় গাছতলায় আমাদের নিয়ে গেলেন। দৃ দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল একটি অখ্যাত গ্রামে পুরাকীর্তির সংগ্রহশালা দেখছি। ১৯৫০-এর দশকে পর্যটনকালে বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড় জেলার নানাস্থানে মূর্তিসংগ্রহ দেখেছি, কিন্তু ঠিক এরকমটি দেখিনি। অনেকরকমের মূর্তি আছে, বিবিধ বিষ্ণু-মূর্তি, বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি, মনে হল কয়েকটি শৈব মূর্তিও। অনেক মূর্তি এমনভাবে ভেঙে বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে ঠিক চেনা যায় না। হয়ত মূর্তিতত্ত্ববিদদের পক্ষে চেনা সম্ভব হত, কিন্তু এবিষয়ে আমার যতটুকু বিদ্যা তাতে চেনা সম্ভব হয়নি। পুকুরপাড়ে গাছতলায় মূর্তিগুলি স্তূপাকার করা রয়েছে এবং গ্রামে যা হয়ে থাকে, সেগুলি নানা-রকমের গ্রাম্য দেবদেবীর নামে পূজিত হচ্ছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য হল, জৈনমূর্তির এরকম বিচিত্র সমাহার বাঁকুড়া জেলায় আর কোথাও আমার চোখে পড়েনি, অম্বিকানগরেও নয়, একমাত্র পুরুলিয়ায় ছাড়া। জৈন তীর্থংকরদের অনেক ভগ্নমূর্তি

ভাঙাচোরা দেবদেবীর মূর্তিস্তূপের মধ্যে তো আছেই, বড় বড় প্রায়-অবিকৃত মূর্তিও, চার-পাঁচফুট আকারের, মণ্ডলকুলিতে দেখেছি, অন্তত ছয়-সাতটি। এগুলি গাছতলাতে ছিল না, কাছাকাছি গ্রামবাসীদের ঘরের বারান্দায় বসানো ছিল। সবকিছু দেখেশুনে এই কথাই মনে হয় যে মণ্ডলকুলি ও তার পাশাপাশি অঞ্চল বৌদ্ধ-জৈনধর্মীদের একটি বড় কেন্দ্র ছিল, প্রধানত জৈনদের এবং পরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে বিষ্ণু-শিব ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীরা এই কেন্দ্রটিকে অধিকার করেন, বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবী-তীর্থংকররা তাঁদের মর্যাদার সিংহাসন থেকে অপসারিত হন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-রাঢ় অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি বৌদ্ধ-জৈন প্রভাবকেন্দ্রে এই ঘটনাই ঘটেছে, মণ্ডলকুলির গ্রামাঞ্চলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রানীবাঁধ থানার মধ্যে অম্বিকানগর এবং ঝিলিমিলি রানীবাঁধ অম্বিকানগর সবই পুরুলিয়ার সীমান্তে। এই অঞ্চলের নিসর্গের মনোহারী পাথুরে-আরণ্য রূপ অমানুষকেও অভিভূত করে। চোখে না দেখলে, সাহিত্যিক-কাব্যিক বর্ণনা তো বহুদূরের কথা, চলচ্চিত্র দেখেও তা অনুভব করা সম্ভব নয়। মটগোদা থেকে বেরিয়ে আমরা রানীবাঁধের বনবিভাগের বাংলোতে বিশ্রাম নিয়ে বাঁকুড়া শহরে ফিরে এসেছিলাম। রানীবাঁধ থেকে অম্বিকানগর বেশি দূরে নয়, পাঁচ-ছয় মাইলের মধ্যে, কাঁসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে। অম্বিকানগর চিৎগিরি বড়কোলা পরেশনাথ চিয়াদা কেন্দুয়া প্রভৃতি গ্রাম নিয়ে এখানে একদা বিশাল একটি জৈন-সংস্কৃতিকেন্দ্রের বিকাশ হয়েছিল, যার অবশেষ বর্তমানে কংসাবতী বাঁধের তলায় নিমজ্জিত। এখানকার জৈন মন্দির দেবদেবী প্রভৃতি লুপ্ত হয়ে যাবে এই আশংকায় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের শ্রীমতী দেবলা মিত্র ১৯৫৮ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে ("Some Jaina Antiquities from Bankura, West Bengal"—J. A. S. Letters, Vol XXIV, No. 2) একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিবরণই এখানকার জৈনকেন্দ্রের একমাত্র ঐতিহাসিক দলিল।

জৈনদেবী অম্বিকার নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে অম্বিকানগর। দেবী পরে ব্রাহ্মণ্য দেবীরূপে পূজিত এবং তাঁর বস্ত্রাচ্ছাদিত সিঁদুরলিপ্ত মূর্তিটিকে স্পষ্টভাবে দেখতে না পেয়েও শ্রীমতী মিত্র যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এইরকম :

> Lavishly bejewelled, the image seems to be two-armed, one hand broken and the other touching the head of a small figure. On either side is an attendant, the one on the right being pot-bellied. The mount below the feet looks like a

lion. The upper part of the back-slab is missing, but in the extant part are, in compartments, rows of figures in different poses, some dancing. The fragment of the right top corner of a sculpture...which now lies outside this temple, seems to have formed part of this image. In this piece (extant ht. 1′6″) is to be seen a portion ot the oval halo with branches of the mango-tree above, crowned by a group of musicians and dancers ; below the pendent mangoes are couples in two rows, some of them distinguished for their animal and bird-heads.

এই বর্ণনা দিয়ে শ্রীমতী মিত্র বলেছেন যে দেবী হলেন অম্বিকা, জৈন তীর্থংকর নেমিনাথের শাসন-দেবী। বর্ধমান জেলার 'অম্বিকা-কালনা' প্রসঙ্গে আগে অম্বিকা-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৩১ ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এরপর এখানকার মন্দির ও দেবদেবীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। মূর্তির মধ্যে ঋষভনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি দেখা যায়, ভাল ও ভাঙা মূর্তি মিলিয়ে সংখ্যায় অনেক। পাথরের রেখদেউলগুলি নানারূপের ও আকারের, সবই প্রায় ভগ্নাবস্থায় শ্রীমতী মিত্র দেখেছিলেন। এখন আর দেখার কিছুই নেই, কংসাবতীর মনোরম বাঁধ ও উপনিবেশ ছাড়া।

অম্বিকানগর-পরেশনাথ-কেন্দুয়া অঞ্চল জুড়ে কয়েকশত বছর আগে (আনুমানিক আট-নয়শত বছর মনে হয়) যে দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি উপনিবেশ বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তা এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা যায়। পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত জৈনধর্মীদের এরকম প্রভাবকেন্দ্র বেশ কয়েকটি দেখা যায়, এবং কাঁসাই নদীর কূল থেকে সেগুলি বেশি দূরে নয়। কাঁসাই নদীর কূল থেকে একাধিক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সভ্যতার পাথুরে হাতিয়ার-নিদর্শন অনেক পাওয়া গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধে পরে আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদিসহ আলোচনা করব (তৃতীয় খণ্ডে)। এখানে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে কাঁসাই নদীর কূল ধরে এই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের নিদর্শন যা পাওয়া গিয়েছে তার গুরুত্ব কম নয়। এই কাঁসাই নদীর কূল ধরেই দেখা যায়, জৈনধর্মীদের (প্রধানত দিগম্বর জৈনদের) কেন্দ্রগুলি একসময় গড়ে উঠেছিল। এই কাঁসাই নদীর কূল ধরে, পুরুলিয়া

থেকে বাঁকুড়া মেদিনীপুর পর্যন্ত দেখা যায়, প্রধানত আদিবাসী ও অনুচ্চবর্ণের (অর্থাৎ যারা আদিজনগোষ্ঠীরই প্রশাখা) লোকের বাস বেশি। একথাও আমরা জানি, এবং বর্ধমান প্রসঙ্গে বলেছি যে, মহাবীর এই রাঢ় অঞ্চলে জৈনধর্ম প্রচারের জন্য যখন পর্যটন করেন তখন 'রূঢ়' আদিবাসীরা তাঁকে দেখে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। যদি বলা যায় যে 'রূঢ়'-দের এই আধিপত্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গের এই ভৌগোলিক অঞ্চলের নাম হয়েছে 'রাঢ়', তাহলে 'ভাষাতত্ত্বে'র প্রতি বলাৎকারের অপরাধ বলে সেটা বোধহয় গণ্য হবে না। এখনও 'রেঢ়ো' কথাটা একটু রুক্ষ-প্রকৃতির চরিত্র বোঝাতেই আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু সে যাই হোক, রাঢ়ের বিশিষ্ট সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসে 'কাঁসাই কূলের সভ্যতা' যে একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হতে পারে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১]

ধরাপাট। কাঁসাই কূল থেকে অনেক দূরে ধরাপাট। তথাপি মণ্ডলকুলি অম্বিকানগরের সঙ্গে ধরাপাট এখানে সংযুক্ত করার কারণ হল, রাঢ় অঞ্চলে জৈন ধর্মীদের প্রসারের ব্যাপকতার আভাস দেওয়া। ১৯৫০-এর দশকে পর্যটনকালে ধরাপাট যাইনি। যদিও ধরাপাটের কাছে জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের শ্রীমানিকলাল সিংহ তখনও আমার পর্যটনের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। ১৯৭০-এ ধরাপাট যাই, মানিকলালের সঙ্গেই, এবং জয়কৃষ্ণপুরেও। ধরাপাট আদৌ গণমান্য গ্রাম নয়। বিষ্ণুপুর থেকে বেশি দূরেও নয়, চার মাইলের মধ্যে। গ্রামে গেলে একটি মন্দির প্রথম নজরে পড়ে, বাংলা মন্দির নয়, রেখ দেউল। লেটেরাইট পাথরের আসল মন্দিরের সৌন্দর্য পলেস্তারাবৃত হয়ে রীতিমতো কদর্য হয়েছে এবং সেটা কোনো ধর্মপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তির দেবালয়-সংস্কারের মানসিক তাড়না থেকে যে হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরকম তাড়নার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কত ঐতিহাসিক মন্দির যে সংস্কার-নির্যাতনে কদর্য হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অনুমতি ও তদারক ছাড়া যে-কোনো প্রাচীন দেবালয় সংস্কার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ইদানীং কোনো মহাধনিক ব্যক্তি মন্দির সংস্কারের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানের অনেক ঐতিহাসিক দেবালয়ের সর্বনাশ করেছেন। এবম্প্রকার মহাধনিকদের উচিত ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় এবং প্রয়োজনবোধে নতুন মন্দির প্রভৃতি স্থাপন করা,

১ বিষ্ণুপুরের শ্রীমানিকলাল সিংহ 'কাঁসাইকূলের সভ্যতা' নিয়ে অনেকদিন ধরে অনুসন্ধানে ব্রতী ছিলেন জানি। তাঁর কাজের সার্থক সমাপ্তি হলে পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি বড় শূন্যস্থান পূরণ হবে সন্দেহ নেই।—লেখক

(যা আমাদের দেশের শিল্পপতি ধনিকরা নিয়মিত করে থাকেন) এবং প্রাচীন দেবালয় সংস্কারের মহৎ কাজে আদৌ উদ্যোগী না হওয়া।

এই প্রসঙ্গান্তর এখানে প্রয়োজনীয় বলে মার্জনীয়। ধরাপাটের কথা বলি। দেউলের প্রবেশপথের উপর পাথরে উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে, অধুনা কিঞ্চিৎ বিকৃত। লিপি থেকে জানা যায়, ১৫২৫ শকাব্দে (১৬০৩ খ্রীস্টাব্দে) দেউলটি প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া লিপিতে কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যেমন: 'মল্ল মহীপাল শ্রীহম্বীর সিংহ' 'শ্রীমতী পুষ্প দে' 'শ্রীপরমানন্দশর্মা' 'শ্রীরাম দে কামিনা' 'শ্রীরাম বিসাস'। 'শ্রীহম্বীর সিংহ' হলেন মল্লভূম বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা, বীর হাম্বীর, লিপিতে বীরত্বব্যঞ্জক 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রাজত্বকাল মল্লাব্দ ৮৯৩ থেকে ৯২৬, খ্রীস্টাব্দ ১৫৮৭ থেকে ১৬২০। অতএব বীর হাম্বীরের সময়ে ধরাপাটের দেউলটি স্থাপিত হয়েছিল বোঝা যায়। কিন্তু শ্রীমতী পুষ্প দে নামে মহিলা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা কারা? হাম্বীরের সঙ্গে একই লিপিতে তাঁরা যুক্ত হলেন কি করে? কাছে জয়-কৃষ্ণপুর গ্রামে 'দে' উপাধিধারী এক প্রাচীন ভূস্বামীবংশ বাস করতেন, পরে নবাবী আমলে তাঁরা 'বিশ্বাস' উপাধি পান। এই বংশের কেউ শ্রীরাম দে বিশ্বাস, যাঁর 'কামিনা' বা কামিন্যা-কামিনী (পত্নী) শ্রীমতী পুষ্প দে। তাঁরা জৈনধর্মী ছিলেন না বোঝাই যায়। একটি বাসুদেব মন্দির এখানে স্থাপিত হয়, পরে শ্যামচাঁদের প্রতিষ্ঠা হয়। জৈন থেকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব, অতঃপর শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত ভাবাবেগোচ্ছল বৈষ্ণবধর্মের দিকে এই যাত্রার পথটি কণ্টকাকীর্ণ ছিল, না কুসুমাস্তৃত ছিল, বলা যায় না। রূঢ়দের-চোয়াড়দের দেশে এই যাত্রা যে মসৃণ হয়েছিল তা মনে হয় না। অর্ধবন্য কুকুরের দল নিয়ে যারা তীর্থংকর মহাবীরকে তাড়া করেছিল, শান্তিতে তাঁকে জৈন-ধর্মের বাণী প্রচার করতে দেয়নি, তারা বীর হাম্বীরকে, অথবা শ্রীরাম দে-বিশ্বাসের মতো তাঁর অধীন কোনো ভূস্বামীকে তো বটেই, সহজে তাদের নিজস্ব লোকধর্ম উৎপাটন করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করতে দিয়েছিল, এমন কথা ভাববার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ধরাপাটেই তার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত আছে, অন্যান্য বহু স্থানে তো আছেই।

বর্তমান দেউলের পাশে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটিও যে একটি দেউল ছিল তা ভগ্ন আমলকশিলা দেখে বোঝা যায়। সেখানেই ছিল ধরাপাটের প্রাচীন জৈন-দেউল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানকালে জৈনদের প্রভাব ম্লান হতে থাকে। সেই সময় জৈনদের দেউলটি ভেঙে ফেলে তারই পাথরখণ্ড দিয়ে পরবর্তী

দেউলটি নির্মাণ করা হয়, এরকম অনুমান অসঙ্গত নয়, পরিপার্শ্বের উপাদানের সাক্ষী থেকে। সেই মন্দিরে প্রথমে বাসুদেব, পরে হাম্বীরের বৈষ্ণবায়নের ফলে শ্যামচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হন। তস্করর। শ্যামচাঁদকে অপহরণ করার পর গর্ভগৃহ শূন্য থাকে। কিন্তু প্রাচীন জৈন দেউল ভাঙার পর তীর্থংকরদের অবস্থা কি হয়? অর্থাৎ জৈন তীর্থংকরদের মূর্তিগুলিকেও কি ভেঙে ফেলা হয়েছিল? তা হয়নি, সাধারণত তা হয় না। মূর্তিগুলিকে হিন্দু দেবদেবীর নামে পূজা করা হয়। এইটাই প্রচলিত রীতি এবং এই রীতি অনুসারে দেখা যায়, বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও নারায়ণ, কোথাও দুর্গা ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছেন। এটি কেবল বৌদ্ধ-জৈন দেবদেবীদের নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী (যাদের পৌরোহিত্য পেলে অর্থের দিক থেকে লাভবান হওয়া যায়) লোক-দেবতাদেরও, ব্রাহ্মণীকরণের (Brahminization) একটি বিশেষ রীতি (বর্ধমান অংশে 'জামালপুরের বুড়োরাজ' ১৪২-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ধরাপাটের কিছু বিশেষত্ব থাকলেও, এই রীতির ব্যতিক্রম এখানে হয়নি।

জৈন আমলের দেউলটিতে একাধিক তীর্থংকরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তার মধ্যে তিনটি সুন্দর মূর্তি ধরাপাটে এখনও আছে। দুটি মূর্তি বর্তমান বৈষ্ণব-দেউলের উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালে গ্রথিত, উত্তরে প্রায় পাঁচফুট উঁচু আদিনাথ, পশ্চিমে প্রায় তিনফুট উঁচু পার্শ্বনাথ। পুবের দেয়ালে স্থান পেয়েছেন তিনফুট উঁচু বাসুদেব। সবচেয়ে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হল, পাশের একটি সাধারণ দালান-মন্দিরে রক্ষিত প্রায় চারফুট উঁচু পার্শ্বনাথ তীর্থংকরের মূর্তিটি। একাধিক কারণে চমকপ্রদ। প্রথম কারণ, আদি মূর্তিটির পাথরের পশ্চাৎপটে ভাস্করদের দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, আধুনিক প্ল্যাস্টিক সার্জারির কৌশলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগানোর মতো। অর্থাৎ মূর্তির পশ্চাৎপট খোদাই করে গদাচক্রধারী অতিরিক্ত দুটিহাত (বিষ্ণু) এবং লক্ষ্মী-সরস্বতীর দুটি মূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। ভাস্করদের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে একটি দেবমূর্তিকে অন্য দেবতায় রূপান্তরিত করার এরকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত দুর্লভ। এটা বিষ্ণু-উপাসকদের কীর্তি। বিচিত্র নবকলেবর ধারণের পরে পার্শ্বনাথ কোনদিন বিষ্ণুরূপে পূজিত হয়েছিলেন কিনা জানি না। হয়ত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকদেবতার কাছে উচ্চশ্রেণীর দেবতা ও তাঁর উপাসকরা পরাজিত হয়েছেন। পার্শ্বনাথ বর্তমানে মনসাদেবীরূপে পূজিত, তিনি 'দেবতা' থেকে 'দেবী' হয়েছেন। তাতে জীববিজ্ঞানীরা কৌতূহলী হবেন না, সংস্কৃতিবিজ্ঞানীরা হবেন।

বিশ্বপদ্মের উপর কায়োৎসর্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান পার্শ্বনাথ তীর্থংকরের সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্পছত্রটি সহজেই তাঁকে মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করেছে। বাঁকুড়ায় লোকদেবী মনসার প্রতিপত্তি অখণ্ড অপ্রতিহত। কোনো দেবদেবীর সাধ্য নেই তাঁর প্রতিপত্তি খর্ব করার। পাঁচমুড়োর মৃৎশিল্পীদের মনসার বারি, ঝাঁপান উৎসব, তার প্রমাণ। গ্রামে গ্রামে মনসা, পথের ধারে গাছতলায় মনসা, সর্বত্র মা-মনসা বিরাজমান। শেষপর্যন্ত ধরাপাটে তাঁরই জয় হয়েছে। আধুনিক ভাষায় একে 'জনগণের জয়' (people's victory) বলা যায়। মনসাদেবী 'পার্শ্বনাথ' একথা ভেবে শান্তি পেতে পারেন যে তিনি যদি প্রথমে বিষ্ণু উপাসকদের খপ্পরে না পড়ে, জনসাধারণের দেবতা হতেন, তাহলে ভাস্করের বাটালির ঘায়ে সহিংসভাবে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত হতে হত না, তাঁর আদি-অকৃত্রিম সর্পফণাবিশিষ্ট মূর্তিতেই তিনি লোকপূজ্যা হতেন।
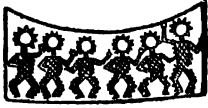
বেলিয়াতোড় । পাঁচাল । সোনামুখী

বেলিয়াতোড়-পাঁচাল-সোনামুখী—তিনটি রেখা টেনে যুক্ত করলে একটি ত্রিভুজের মতো দেখায়। বাঁকুড়া-দামোদর ছোট-রেলপথে বেলিয়াতোড় সোনামুখী যাওয়া যায়, পাঁচালে যাওয়া যায় না। বাস চলাচলের ভাল রাস্তাও আছে এবং বাঁকুড়া-সোনামুখীর পথের উপরে বেলিয়াতোড়। এদিকে দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার বাস-রাস্তার উপরেই বেলিয়াতোড় গ্রাম। পাঁচাল যেতে হলে বেলিয়াতোড়ের কাছ থেকে প্রায় সাত-আট মাইল ভিতরে যেতে হয়, ছোট ছোট শালবনের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য 'রাঙামাটি'র রাস্তা বেশ মনোরম। তিনটি গ্রামের তিনরকমের বিশেষত্ব, সোনামুখী যদিও ঠিক গ্রাম নয়, পৌরাঞ্চল। বেলিয়াতোড়ের ধর্মঠাকুরের গাজন, পাঁচালের শিবের গাজন এবং সোনামুখীর মন্দির, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, বাণিজ্যিক গুরুত্ব, বণিকদের সামাজিক প্রাধান্য, সূত্রধরশিল্পীদের কলাকুশলতা, মৃৎশিল্প, মনোহর দাস বাবাজীর আখড়া, তাঁর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রামনবমীর মেলা। সামাজিক বর্ণ-সংস্থানের দিক থেকেও তিনটি স্থানের পার্থক্য লক্ষণীয়। বেলিয়াতোড়ে বর্তমানে শতকরা দশজনের মতো অনুচ্চবর্ণের লোকের বাস, পাঁচালের প্রায় শতকরা ৪৫ জন অনুচ্চবর্ণভুক্ত এবং সোনামুখীতে তন্তুবণিক গন্ধবণিক সুবর্ণবণিকরাই সামাজিক ক্ষেত্রে প্রধান।

বেলিয়াতোড়

বড়জোড়া থানার মধ্যে বেলিয়াতোড় গ্রাম (জে. এল. নম্বর ১৩০) এবং খুব বড় না হলেও মাঝারি গ্রাম বলা যায়। বেশ সমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত গ্রাম বেলিয়াতোড়। দুর্গাপুর-বাঁকুড়ার বাসরাস্তার দু'পাশে গ্রামটি বিস্তৃত। গ্রামের সমৃদ্ধ পরিবারের মধ্যে বণিকরা অন্যতম এবং প্রধান হলেন স্থানীয় জমিদার রায়-পরিবার। এই রায় পরিবারের সন্তান বাংলার প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী যামিনী [রঞ্জন] রায়। এরা

প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতি : রাজা বসন্তরায়ের উত্তরপুরুষ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বসন্তরঞ্জন ও যামিনী রায় পরস্পর জ্ঞাতি ভ্রাতা। এই উভয় ভ্রাতার বাংলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে দান স্মরণীয়। আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে, ১৯৪৩ সালে, শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় বাগবাজারে তাঁর একতলা একটি ছোট বাসাবাড়িতে। এই বছর 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের শারদীয় সংখ্যা সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। রবিবারের সাময়িকী-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে এই শারদীয় সংখ্যা সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার উপর। যামিনী রায়ের একটি ছবি নির্বাচন করে শারদীয় সংখ্যায় ছাপার জন্য তাঁর স্টুডিওতে যাই। আমার বয়স তখন ২৬ বছর। সেইসময় নানাবিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারি যে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ের পটুয়া লোকশিল্পীরাই তাঁর চিত্রাঙ্কনরীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রেরণা দান করেছে। তখন কলকাতা শহরের বাইরে বাংলা দেশটা কিরকম সে সম্বন্ধে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। বাংলার গ্রামে গ্রামে অদূর ভবিষ্যতে একদিন নেশাখোরের মতো অনুসন্ধানের কাজে ঘুরে বেড়াব, এরকম কোনো সম্ভাবনাও তখন ছিল না। তথাপি তাঁর কথাবার্তায় মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিল—যদি একদিন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড় গ্রামটি দেখা যায় স্বচক্ষে তাহলে ভাল হয়।

দুর্গাপুরে নেমে বাসে বাঁকুড়া যাবার পথে একাধিকবার বেলিয়াতোড় গ্রামের উপর দিয়ে গিয়েছি, কিন্তু গ্রামটি দেখা হয়নি। ১৯৬৮ সালে জুলাই মাসে (৯ জুলাই) আষাঢ় পূর্ণিমায় ধর্মঠাকুরের গাজন ও মেলা দেখতে বেলিয়াতোড়ে যাই। সে-বছর পূর্ণিমার আগের দিন থেকে পর-দিন পর্যন্ত এমন মুষলধারে অবিরাম বর্ষণ হয়েছিল যা, হাওয়া-আফিসের মতে, তার আগে ৬১ বছরের মধ্যে নাকি হয়নি। হতাশ হয়ে গেলাম এই ভেবে যে এই প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেলিয়াতোড়ের গাজন ও মেলা দুই-ই পণ্ড হয়ে যাবে, আমাদের দেখা হবে না। সন্ধ্যার একটু আগে বৃষ্টি মাথায় করে বাঁকুড়া শহর থেকে বেলিয়াতোড় এসে পৌঁছলাম। গাজন ও মেলা কোনোটাই একেবারে পণ্ড হয়নি, তবে বৃষ্টির জন্য মেলা তেমন জমেনি। গাজনের সময় খুব বড় বড় তিনটি কাঠের ঘোড়ার পিঠে (প্রায় ছয়ফুট উঁচু) ধর্মরাজ, স্বরূপনারায়ণ ও মাদান—এই তিন দেবতাকে চড়িয়ে কাছে একটি পুকুরপাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গাজনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বাণফোঁড়া অন্যতম। হাতে বুকে ও জিবে বাণ ফোঁড়া হয়, কিন্তু লোহার বাণ নয়, বাঁশের চেঁচাড়ির বাণ। বাণফোঁড়া উৎসবে যারা

যোগদান করে তারা সকলেই প্রায় অনুচ্চবর্ণের বাউরি খয়রা লোহার প্রভৃতি, কিন্তু ভক্ত্যা যে-কোনো বর্ণের লোক হতে পারে। অশ্বপৃষ্ঠে দেবতাদের যাত্রা ছাড়া গাজনের অন্যান্য অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখ্য নয়।

বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রায় দু'শো বছর আগে স্থানীয় একজন তাম্বুলিবণিক একটি পাথরখণ্ড কুড়িয়ে পান এবং সেটি তিনি দাঁড়িপাল্লার বাটখারা হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। কিন্তু বাটখারার ওজন ঠিক থাকে না দেখে বেশ অবাক হয়ে যান। এমন সময় একদিন রাতে তি ন স্বপ্ন দেখেন যে পাথরখণ্ডটি বাটখারা নয়, স্বয়ং ধর্মরাজ ঐ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। জমিদার রায়-পরিবাবের কর্তাও ঐ একই স্বপ্ন দেখেন। তারপর ধর্ম-রাজের প্রতিষ্ঠা হয়। পুরোহিত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ, বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়-বংশীয়। ধর্মরাজের আবির্ভাব-কাহিনীর বিশেষত্ব, স্থানীয় তাম্বুলিবণিকেব কাছে ধর্মরাজের স্বপ্নে আবিভাব। দ্বিতীয় বিশেষত্ব, একই সময় স্থানীয় কায়স্থ জমিদার রায়-পরিবারের কর্তাও ঐ স্বপ্ন দেখেন। তৃতীয় বিশেষত্ব, পুরোহিত রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। উল্লেখ্য হল এই তিনটির একটিও কিন্তু ধর্মরাজের বিশেষত্ব নয়, বেলিয়াতোড়ের বিশেষত্ব। স্বপ্নদর্শন দু'শো বছর আগের কথা।

শিল্পী যামিনী রায়ের একমাত্র জীবিত ছোটবোন বেলিয়াতোড়বাসী শ্রীযুক্তা সুজনকুমারী মিত্র (জন্ম বাংলা ১৩০২ সন) আমাকে বলেছেন, প্রায় দু'শো বছর আগে রায়-বংশের পূর্বপুরুষ কচুরায় প্রথম জগন্নাথপুরে আসেন (জগন্নাথপুবেব চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনও বিখ্যাত), পরে সেখান থেকে বেলিয়াতোড়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কচুরায়ের তিন পুত্র আত্মারাম বাঞ্ছারাম ও পঞ্চানন, যথাক্রমে বড় রায়বংশ, মেজ রায়বংশ ও ছোট রায়বংশ বলে পরিচিত। ছোট রায়বংশের পঞ্চানন রায়েব প্রপৌত্র শিল্পী যামিনী রায়। কচুরায় থেকে ধরলে বর্তমানে যামিনী রায়ের পুত্রদেব কাল পর্যন্ত ছয় পুরুষ হয় এবং তাতে কচুরায়ের বেলিয়াতোড়বাস দু'শো বছর আগে হওয়াই সম্ভব। কচুরায়ের বেলিয়াতোড় আগমন এবং ধর্মরাজের স্বপ্নাদেশের কাল মিলে যায়। তাহলে স্বপ্নের তাৎপর্য কি হতে পারে?

তাৎপর্য এই: আনুমানিক দুশো বছর আগে জমিদার রায়বংশের পূর্বপুরুষ কচু-রায় যখন বেলিয়াতোড়ে আসেন, তখন বনজঙ্গলময় বেলিয়াতোড়ে অনুচ্চবর্ণের লোকজনেরই বাস ছিল, এবং তাদের মধ্যে বাউরিরাই প্রধান। বাঁকুড়া জেলার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে এখনও এই অনুচ্চবর্ণের লোকের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৩০ জন এবং তাদের মধ্যে বাউরিদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। যামিনী রায়ের বাংলাবাড়ির

দরজার পাশেই কেষ্টা-কুচি-ভোলাদের একটি বাউরি পরিবার থাকে এবং অদূরে আরও অনেক বাউরিদের বাস আছে। অনুচ্চবর্ণের মধ্যে সংখ্যায় আজও এরা বেশি। ধর্মরাজ এদেরই দেবতা এবং আদিকাল থেকেই গ্রামে তিনি গ্রামদেবতারূপে ছিলেন। বাউরি বাগদি ডোম প্রভৃতি অনুচ্চজনেরাই ধর্মরাজের পূজারী পুরোহিত। বাঁকুড়া জেলায় তাম্বুলিবণিক গন্ধবণিক প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষণীয়। বাণিজ্যসূত্রে বণিকরা এখানে আগেই আসেন এবং জমিদার রায়বংশের প্রতিষ্ঠার পর বণিকদের আগমন আরও বেশি হতে থাকে। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বেলিয়াতোড়ের সামাজিক সংস্থানের পবিবর্তন হতে থাকে। রায়বংশ ও বণিকবংশের বিস্তারের ফলে অনুচ্চজনেরা ক্রমে সরে যেতে থাকে এবং দিনমজুর ও দাসত্বের জীবনে স্থানান্তরিত হতে এমনিতেই কোনো বাধা নেই। আজ অনুচ্চবর্ণের সংখ্যা বেলিয়াতোড়ে এই কারণে অনেক কম, শতকরা দশ-পনের জনের বেশি নয়। কিন্তু সে যাই হোক, ধর্মরাজের স্বপ্নের কথা বলি। কচুরায় অথবা তাঁর পুত্রদের আমলে ধর্মরাজের এই স্বপ্নদর্শন ঘটে। স্বপ্ন যুগপৎ তাম্বুলিবণিক ও জমিদার রায়রা দেখেন। কুলীন ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে ধর্মরাজের পূজা আরম্ভ হয়। অর্থাৎ অনুচ্চবর্ণের লোকদেবতাকে উচ্চবর্ণভুক্ত দেবতার আসনে উন্নীত করা হয়। এটিও ব্রাহ্মণীকরণের (Brahminization) একটি রীতি, এক্ষেত্রে তার লক্ষ্য হল, জমিদার ও বণিকদের স্বার্থে স্থানীয় প্রজানুরঞ্জন। যেহেতু বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুচ্চজনস্তরে ব্যাপকভাবে ধর্মঠাকুরের গাজন অনুষ্ঠিত হয়, সেইহেতু উচ্চবর্ণের পোষকতায় পদোন্নত ধর্মরাজের গাজনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বেলিয়াতোড়ে তার অনুষ্ঠান হয় আষাঢ় পূর্ণিমায়। জমিদার ও ধনিক বণিকরা যেমন ঘোড়ায় চড়ে তখন চলাফেরা করতেন, তেমনি বেলিয়াতোড়ের ধর্মরাজও কাঠের ঘোড়ায় চড়ে জনে শোভাযাত্রা করেন। কাঠের ঘোড়ার জন্য বেলিয়াতোড়ে সূত্রধরদের আনা হয় এবং বাঁকুড়ার পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়ার মতো তাঁরা কাঠের ঘোড়া তৈরি করেন। সূত্রধরদের মধ্যে দিলীপ সূত্রধর (একমাত্র কারিগর) এখনও কাঠের ঘোড়া ও পুতুল তৈরি করেন। মেলার সময় বড় বড় কাঠের ঘোড়াও তৈরি করা হয়। এটি বেলিয়াতোড়ের লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত, যা অন্য কোথাও আমার নজরে পড়েনি, এমনকি সোনামুখীতে দু-একজন সুদক্ষ সূত্রধর যাঁদের দেখেছি তাঁরাও পাঁচমুড়ার মডেলে কাঠের ঘোড়া তৈরি করেন না।

বেলিয়াতোড়ের অন্যান্য উৎসবপার্বণের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করার মতো। শ্রাবণ-সংক্রান্তির মনসাপূজা উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের উৎসব, ভাদ্রসংক্রান্তির মনসাপূজা

অনুচ্চবর্ণের জনসাধারণের উৎসব, তার সঙ্গে ভাদু পূজা। ভাদুর নানারকমের মূর্তি তৈরি হয়, যেমন মেমসাহেব ভাদু, হারমোনিয়াম-বাজিয়ে ভাদু ইত্যাদি। এছাড়া পৌষসংক্রান্তির আগের দিন থেকে পয়লা মাঘ পর্যন্ত তিনদিন অনুচ্চজনসমাজের বেশ বড় উৎসব হয়। সংক্রান্তির আগের দিনের উৎসবকে বলে 'বাউড়ি'। দিনের বেল একটু ভালমন্দ রান্নাবান্নার সঙ্গে পিঠা তৈরি হয়। রাতে শোয়ার আগে চাল-মুড়ি তেল ইত্যাদি খাদ্য মাটির হাঁড়িতে খড় দিয়ে বাঁধা হয়। একেই বাউড়ি-বাঁধা বলে। পরদিন মকর-উৎসব। বাউড়ির খড় খুলে তেল মেখে স্নান করতে যাওয়া হয়। স্নান সেরে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরা হয়। তার পরদিন 'এখান পরব'। 'এখান' কথার অর্থ মাসের পয়লা দিন। পয়লা মাঘ এই পরব হয় বলে 'এখান পরব' বলে। আবার 'শিকার-পরব'ও বলা হয়। সকালে উঠে সকলে শিকার করতে বেরোয় এবং খরগোস পাখি শিয়াল সাপ, যা পায় তাই শিকার করে এনে সন্ধ্যার সময় একজায়গায় মিলিত হয়ে নাচগান করে। শিকারে খাদ্যোপযোগী জীব যা পাওয়া যায় সেগুলি সকলে মিলে খাওয়া হয়। এই উৎসবের মূলস্তর যে কতদূর অতীত পর্যন্ত বিস্তৃত তা সহজেই বোঝা যায়। আদি নিষাদজনগোষ্ঠীর উৎসব হিন্দুরূপধারণের মধ্যপথে এসে এক বিচিত্র মিশ্ররূপ ধারণ করেছে।

মনসাপূজায় একদা বেলিয়াতোড়ে ঝাঁপান উৎসব হত। বাঁকুড়ার অন্যান্যস্থানেও ঝাঁপান উৎসব হত। পরে এই উৎসব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শ্রীযুক্তা সুজনকুমারী মিত্র ২১ বছর বয়সে বিধবা হবার পর থেকে বেলিয়াতোড়ে বাস করছেন প্রায় ৬০ বছর। তিনি নিজে যা দেখেছেন শুনেছেন, আমার মনে হয়, বেলিয়াতোড়ের লোকসংস্কৃতির ইতিহাসের দিক থেকে তাই যথেষ্ট। ঝাঁপান উৎসব তিনি দেখেছেন এবং অনেক 'গুণী'র (সাপুড়ে) নাম করলেন যাদের অসাধারণ সাপ খেলানোর ক্ষমতা ছিল। মনোহর লোহারের জ্যাঠামশাই নিবারণ লোহার একজন বিখ্যাত গুণী। প্রকৃত গুণী যারা তারা নিজেদের দেহের সর্বত্র ১০৮টি সাপ জড়িয়ে-ঝুলিয়ে বাঁশের মাচায় উঠে দাঁড়াত। অনতিদূরে বিপরীত দিকের মাচায় দাঁড়াত প্রতিদ্বন্দ্বী গুণী। তারপর দুই গুণীর মধ্যে কৃতিত্বের লড়াই হত, মন্ত্র পড়ে কে কার সাপ উড়িয়ে দিতে পারে, কার সাপ বেশি বিষধর হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মৃত্যুদংশন দংশাতে পারে। ভয়াবহ উৎসব, কিন্তু গল্প নয়। বনজঙ্গলাকীর্ণ বিষধর সাপের দেশে যারা বাস করেছে একসময়, তাদের মধ্যে এরকম 'গুণী' থাকা আশ্চর্য নয়। এখনও নাকি এরকম গুণী দু'চারজন আছে যাদের দু'তিনদিনের মধ্যে খোঁজখবর করে ডেকে আনতে পারলে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তি বেঁচে ওঠে।

বেলিয়াতোড়ের অনুচ্চজনসমাজ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সুজনকুমারীর মতো দীর্ঘ সান্নিধ্যজাত জ্ঞান গ্রামের আর কারও নেই। ১৩ বছর বয়সে মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার অন্তর্গত পাকল গ্রামে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁর বড় পিসশাশুড়ীর নাতি বিপ্লবী খুদিরাম। একুশ বছর বয়সে বিধবা হ'য়ে তিনি বেলিয়াতোড়ে দাদা যামিনী রায়ের কাছে চলে আসেন, দাদার গলগ্রহ হয়ে থাকার জন্য নয়, কেবল একজন অভিভাবকের কাছে থাকার জন্য। গ্রামে এসে তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, ১৩২২-২৩ সনে। এই বিদ্যালয়টি এখনও বেলিয়াতোড়ে আছে, সুজনকুমারী আশিবছর বয়সেও তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং তাঁর স্বাধীন জীবিকার প্রধান অবলম্বন এই বিদ্যালয়। সুন্দর ঝক্‌ঝকে ঘষামাজা একটি ছোট্ট দু'কামরার কুটিরে তিনি আজও বাস করেন এবং নিজের প্রাত্যহিক কাজকর্মে এখনও প্রায় স্বাবলম্বী। প্রথমে নয়টি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বালিকা নিয়ে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন এবং করা মাত্রই বুঝতে পারেন যে অনুচ্চবর্ণের বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বেশি। তিনমাসের মধ্যে তিনি ১৭৫টি বাউরি, লোহার, খয়রা প্রভৃতি জাতির বালিকাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। গ্রামে গুঞ্জন ওঠে। একুশ-বাইশ বছরের বিধবা যুবতী, অতিশয় সুন্দরী, জমিদার রায়বংশের কন্যা, উচ্চবর্ণভুক্ত। বাউরি লোহারাদির জন্য তাঁর এত দরদ কেন? ষাট বছর আগের বেলিয়াতোড়, সেকথাও মনে রাখতে হবে। গুঞ্জন স্বভাবতঃই শ্রুতিরোচক অপবাদের কলরবে পরিণত হয়। সুজনকুমারীর জীবনে অনেকবার এরকম হয়েছে। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এই গ্রাম্য অপবাদের গুঞ্জন থেকে কলরব সবকিছুর মোকাবিলা করেছেন, গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাননি, যদিও খুব সহজেই যেতে পারতেন। প্রায় দু'ঘণ্টা কথাবার্তার পর উঠে আসার সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাউরিদের 'বাউরি' বলা হয় কেন? 'বাউরি' কথার কি কোনো বিশেষ অর্থ আছে? আমি জানতাম, যাঁকে এই প্রশ্ন করছি তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নন, তথাপি তাঁর সঙ্গে মা-সন্তানের মতো কথাবার্তায় আমার এইটাই মনে হয়েছিল যে তাঁর কথার গুরুত্ব আমার কাছে যে-কোনো তত্ত্ববিদের চাইতে কম নয়। একমিনিট দেরি না করে তিনি বললেন: "বাবা, 'বাউড়ে দেওয়া' বলে একটা কথা আছে, জান কি? 'বাউড়ে' দেওয়া মানে সমাজ থেকে বাইরে সরিয়ে দেওয়া। এই বাউড়ে থেকে 'বাউরি' হয়েছে, কারণ ওদের তো সমাজ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে, তাই।"

বোধহয় তাই হবে। 'বাউরি' কথার আভিধানিক অর্থ পাগল, কিন্তু 'বাউড়ে' থেকে 'বাউরি' খুব সহজেই হতে পারে, অর্থসঙ্গতির গুরুত্বও কম নয়। ভাষাতত্ত্বে তো কত কি হয়।

পাঁচাল

পাঁচালের পুরাকীর্তির গৌরব কিছু নেই। সাদামাটা পলেস্তারাবৃত একটি মন্দির আছে, খুব প্রাচীন নয়, উনিশ শতকের মন্দির। মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। শিবের প্রতাপ খুব এবং তার প্রকাশ হয় চৈত্রসংক্রান্তির গাজনে। বাঁকুড়া জেলায় শিবের গাজন নানাস্থানে হয়, কিন্তু এক্তেশ্বর বা পাঁচালের মতো গাজন বেশি হয় না। পাঁচালের গাজনের অন্যতম বিশেষত্ব হল, ভক্ত্যাদের বাণফোঁড়াদি দৈহিক নিগ্রহ। এরকম বাণফোঁড়ার অনুষ্ঠান অন্য কোনো গাজন-উৎসবে দেখিনি। ১৯৬৮ সালে এই উৎসব আমি দেখি।

পাঁচালের প্রায় চার হাজার অধিবাসীর মধ্যে অর্ধেকের মতো খয়রা বাগদি বাউরি নায়েক প্রভৃতি অনুচ্চবর্ণের লোক। স্থানীয় জমিদার কনৌজ ব্রাহ্মণবংশের মিশ্র-বাজপেয়ী, এছাড়া চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়রাও আছেন। খয়রা বাগদি বাউরি নায়েকরা প্রায় সকলে ভূমিহীন দিনমজুর, অত্যন্ত দরিদ্র। সংক্রান্তির আগের দিন বাণফোঁড়া উৎসব হয় এবং এটা পুরোপুরি অনুচ্চজনের উৎসব। খোলা জায়গায় শিবমন্দির, তার সামনে দু'পাশে সারবন্দী বাসগৃহের মাঝখান দিয়ে সরুপথ দূরে একটি পুকুর-পাড়ে শেষ হয়েছে। প্রত্যেক গৃহের বাইরে বারান্দা আছে, পরস্পর সংলগ্ন, এবং পথের দু'পাশের বারান্দাগুলিব মুখোমুখি সাজানো। পাঁচালের এই রৈখিক (linear) গৃহবিন্যাসের বৈশিষ্ট্য উড়িষ্যার গ্রামে দেখা যায়। দুদিকে সারিবন্দী ঘরের বারান্দাগুলি মুখোমুখি বিন্যস্ত, গ্রামের লোক একত্রে সামনা-সামনি বসে কথাবার্তা আলোচনা করতে পারে। পাঁচালে গাজনের ভক্ত্যারা পুকুরপাড় থেকে বাণফুঁড়ে নাচতে নাচতে এই পথের উপর দিয়ে যায়, সামনের খোলামাঠের শিবমন্দিরে এবং দু'পাশের সাববন্দী ঘরের বারান্দায় দর্শকরা দাঁড়িয়ে দেখে। দর্শকর মধ্যে অনুচ্চবর্ণের ও সাঁওতাল মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশি, বাইবেব মেলাতেও তাই। মেলার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তবু বেশ বড় একটি মেলা বসে বাইরে।

দেখলাম, একশো বছরের বৃদ্ধ জগু লায়েক (খয়রা) পুকুরপাড়ে বসে বাণফোঁড়ার তদারক করছে এবং তার সামনে ভক্ত্যাদের জিবে পিঠে গালে কানে পাঁজরায় লৌহ-বাণ বিদ্ধ করছে কর্মকার। সাধারণ বাণগুলি ১২।১৪ ফুট লোহার সরু রড এবং এগুলি ফুটিয়ে দেওয়া হয় সাধারণত জিবে, অথবা পিঠে পাঁজরায় গালে কানে। ফুটিয়ে দেওয়ার দৃশ্য সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি। একরকমের বাণ আছে যাকে 'চৌরঙ্গিবাণ' বলে—পাঁজরা পিঠ গাল ও কান, এই চার জায়গায় দুটো করে বাণ ফোঁড়া হয় একজন ভক্ত্যার দেহে। চৌরঙ্গিবাণ সকলের পক্ষে করা সম্ভব

হয় না, দু-একজন ভক্ত্যা করে। জিব-বাণই বেশি হয়। এছাড়া 'নলিবাণ' আছে। দু'পাশে দড়ি বাঁধা, আট আঙুল লম্বা লোহার নল ফুঁড়ে ভক্ত্যারা নাচতে নাচতে যায়। এরকম এক-একটি ভক্ত্যার দল বাণবিদ্ধ হয়ে পুকুরপাড় থেকে, দু'পাশের ঘরের বারান্দায় দাঁড়ানো হাজার হাজার দর্শকের মাঝখানের পথের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে শিবমন্দিরে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত এই দৃশ্যাভিনয় চলতে থাকে, ভক্ত্যার সংখ্যা বেশি হলে রাত ভোরও হয়ে যায়। আমরা সারারাত ধরে এই উৎসব দেখেছিলাম।

পরদিন সংক্রান্তিতে বিকেলে চড়ক হয়, ভক্ত্যারা পিঠ-বাণ করে (পিঠে লোহার হুঁক বিঁধিয়ে ঝোলে) ঘুরপাক খায়। শিবের পূজারী ব্রাহ্মণ। কিন্তু গাজনের দিন অনুচ্চবর্ণের ভক্ত্যাদের পুজো করে একশ্রেণীর অব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্মণ', যাদের 'ধামাত-কন্নী' বলা হয়। শিবের মাথায় কিন্তু মেয়েরা জল ঢালতে পারে না। এও এক বিচিত্র প্রথা। সমস্ত মিলিয়ে মনে হয়, পাঁচালের গাজন-উৎসব অনুচ্চ-উচ্চ উভয় বর্ণের ধর্মানুষ্ঠানের সহাবস্থানের (co-existence) একটি উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত, সংমিশ্রণ অথবা সমন্বয়ের নয়। ভক্ত্যাদের জাতিভেদ অনুযায়ী অনুষ্ঠানের অধিকার, ব্রাহ্মণের বর্ণভেদ এবং উৎসবের দিনভেদ থেকে তা বোঝা যায়।

সোনামুখী

স্থানীয় লোকশিল্প-শিল্পীদের অনুসন্ধানের কাজে প্রথম সোনামুখী যাই ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে, তার আগে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সপ্তদশ শতাব্দীর 'দেশাবলি-বিবৃতি' গ্রন্থে সোনামুখীকে তন্তুবণিকদের গ্রাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সোনামুখীর তাঁতশিল্পের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা মনে করলে দেশাবলিবিবৃতির গ্রাম-পরিচয় নির্ভুল বলা যায়। তবে কেবল তন্তুবণিক নয়, গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বণিকসম্প্রদায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তি সোনামুখীতে একদা যথেষ্ট ছিল, এখনও আছে। সোনামুখীর উৎসব-পার্বণ, দেব-দেবালয় ইত্যাদি অধিকাংশই বণিক সম্প্রদায়ের পোষকতায় পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত। সেকথা পরে বলব। সোনামুখী শহরের প্রায় মাঝখানে ইটের এক দালান-মন্দিরে দেবী সুবর্ণমুখীর সিঁদুরলিপ্ত একটি পাথরের মূর্তি পূজিত হয়। জনশ্রুতি হল, এই গ্রাম্য লোকদেবী সুবর্ণমুখীর নামে গ্রামের (বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল শহর) নাম হয়েছে সোনামুখী। মূর্তিটি ভাঙা, কাজেই সেটা যে কালাপাহাড়ের কুকীর্তি সে-বিষয়ে স্থানীয় লোক নিঃসন্দেহ, যেমন বাংলার আরও শত শত গ্রামের অধিবাসীরা নিঃসন্দেহ এরকম অসংখ্য বিকৃত

মূর্তি সম্পর্কে। কালাপাহাড়ের পর্যটনশক্তির কথা ভাবলে, গ্রামে গ্রামে, বিস্মিত হতে হয়। কালাপাহাড় কেন, শ্রীচৈতন্যের পর্যটনশক্তিও অসাধারণ ছিল, কারণ বাংলায় এমন গ্রাম অল্পই আছে যেখানকার গাছতলায় শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করেননি অথবা তাঁর পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে যাননি, ভক্তদের পূজার জন্য। আসলে এগুলি জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর পর্যটনশক্তি, কালাপাহাড় বা শ্রীচৈতন্য কারও নয়। কিংবদন্তীর এই ভ্রমণগতির মধ্যে ভূগোল বা যুক্তিবিদ্যার সমর্থন সাধারণত থাকে না, তথাপি এর আঞ্চলিক গতিপথ লক্ষ্য করলে অনেক সময় বিশেষ কোনো সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রসারক্ষেত্রের আভাস পাওয়া যায়।

সোনামুখীর তন্তুবণিক ও তন্তুজশিল্প সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ সোনামুখীর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়ের নায়ক তাঁরা। ব্রিটিশযুগের আগেই সম্ভবত ঢাকা শান্তিপুরের মতো সোনামুখীতে তাঁতশিল্পের একটি কেন্দ্র ও তন্তুবণিকদের বসতি ছিল। ব্রিটিশযুগে কোম্পানির আমলে বাংলার তন্তুবণিকদের উপর যে নির্মম শোষণ-পীড়ন চলেছিল, তা থেকে সোনামুখীর তন্তুবণিকরাও রেহাই পাননি। তার দু-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করছি। ১৭৮৭ সালে ঢাকা, সোনামুখী ও হরিয়ালের তন্তুশিল্পীরা বোর্ড অফ ট্রেডের কাছে একটি আরজি পেশ করে বলেন :

> The Mr. Glover by given less price and taken cloths as custom of the Mr. Barwell and Companys and others be always cheated to the your petitioners and hath arrested others advanced.—(Proceedings, Board of Trade, 14 March 1787)

আরজির ভাষায় ইংরেজি শব্দবিন্যাস ও ব্যাকরণের যে ত্রুটিই থাক, মূল অভিযোগটি—'cheated' ও 'arrested'—খুবই স্পষ্ট। তাদের প্রতারিত করা তো হতই, অভিযোগ বা প্রতিরোধ করলে বন্দীও করা হত। ১৭৮৯ সালে সোনামুখীর তাঁতশিল্পীরা অভিযোগ করেন এই মর্মে : 'এ দেশীয় গোমস্তা ও তাগাদগীরগণ (tagadgeers=বস্ত্র-সংগ্রহকারী, বস্ত্রের জন্য যারা তাগাদা দেয় তারা) তাঁদের কাছ জুলুম করে টাকা আদায় করেছেন, কাউকে ছাড়ছেন না, যারা কোম্পানির জন্য কাজ করেন (অর্থাৎ কোম্পানিকে বস্ত্র সরবরাহ করেন) তাঁদেরও না, স্বাধীন তাঁতিদেরও না। আমাদের অনুরোধ এই টাকা আমাদের ফেরত দেওয়া হোক, এবং এই জুলুম যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করা হোক (Procedings, Board of Trade, Dec. 1789)।' উল্লেখ্য হল, তাগাদগীররা সকলেই ব্রাহ্মণ। যখন

স্থানীয় এজেন্টকে কোম্পানির কর্তারা জিজ্ঞাসা করেন কেবল ব্রাহ্মণদের কেন একাজে নিয়োগ করা হয়েছে, তখন এজেন্ট বলেন যে এত অল্প বেতনে পিওন পাওয়াও মুশকিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা বুঝেছিলেন এসব কাজে বেতনটা আসল নয়, উপবিটাই আসল।

সোনামুখীতে সিল্কের নানারকমের কাপড় তৈরি হত, সুতির কাপড়ও তৈরি হত। সোনামুখীর সুতির কাপড় কতটা সরেস ছিল তা কয়েকটি কেন্দ্রের কাপড়ের মূল্য বিচার করলেই বোঝা যাবে (Procs. Board of Trade, 29 Nov. 1792):

ঢাকা	:	৪০,৫০০ পীস্	:	সিক্কা টাকা	৮,২৯,২২৪
মালদা	:	৬৫,৭০০ „	:	„	৫,৮৩,৩০৩
ক্ষীরপাই	:	২৬,০০০	:	„	৫,২৯,৬০১
শান্তিপুর	:	৫৩,৭০০ „		„	৪,০৫,১৫২
কাশিমবাজার	:	২৯,৩৪০ „	:	„	২,৯১,০২২
সোনামুখী	:	৫৯,৮০০ „	:	„	৩,২৩,৪৫৪

মূল্যতালিকা থেকে বোঝা যায়, একনম্বর সরেস কাপড় তৈরি হত পূর্ববঙ্গে ঢাকাতে এবং পশ্চিমবঙ্গে ক্ষীরপাইতে (মেদিনীপুর), প্রত্যেকটি সুতির কাপড়ের মূল্য প্রায় ২০ টাকা। মালদা শান্তিপুর কাশীমবাজারে প্রায় একরকমের কাপড় তৈরি হত, মূল্য ৮।৯।১০ টাকার মধ্যে। সোনামুখীর তাঁতের কাপড় সাড়ে পাঁচ টাকা। অর্থাৎ সোনামুখীর তাঁতিরা খুব সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনতেন না, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে তাঁদের কাপড় বুনতে হত। অর্থাৎ সোনামুখী যে শ বছর আগে তন্তুশিল্পীদের প্রধান বসতিকেন্দ্র ছিল এবং তাঁদের চরকা ও তাঁতের শব্দে গ্রামটি মুখর হয়ে থাকত, তাতে সন্দেহ নেই। বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে সোনামুখী-সমাজে এঁরাই ছিলেন প্রধান এবং এঁদের সঙ্গে অন্যান্য বণিকরাও নিজেদের কুলব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। বীরভূমের সুরুল-শ্রীনিকেতনের কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট বিখ্যাত চীপ সাহেবের (John Cheap) একটি কুঠি সোনামুখীতেও ছিল। তার বিশাল ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। কেবল বস্ত্র নয়, লাক্ষা নীল ইত্যাদি ব্যবসায়ের জন্য সাহেবরা এখানে বাণিজ্যের ঘাঁটি তৈরি করেন।

সোনামুখীর দেব-দেবালয় উৎসবাদি অধিকাংশই তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত দেখা যায়। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের গায়ে ফলকে প্রতিষ্ঠাতার কথা লেখা আছে বাংলা পদ্যে, যা সচরাচর দেখা যায় না। পদ্যটি এই :

সিদ্ধেশ্বর শিবালয় মধুতে সমাপ্ত হয় স্বগ্রামের লইয়া সাহায্য
গন্ধবণিক কুলবর শ্রীব্রজমোহন ঘর সম্পাদন করিলেন কার্য।

সংস্কৃত বচনটি হল :

নবাস্তে সপ্তমাঙ্কে ঋসেসিদ্ধেশ্বরায় নমঃ
স্বগ্রামীণ সহকারী ঘরাক্ষ ব্রজমোহন।

সনতারিখ ও কারিগরের নামসহ খোদিত পদ্য :

শকাব্দা সতের শত উননব্বুই পরিমিত
বারশত চুয়াত্তর সাল।
স্বর্ণমুখী গ্রামস্থিতি সূত্রধর বংশোৎপত্তি
কারিকর শ্রীরামগোপাল॥

তন্তুবণিক পরিবারের অন্যতম কীর্তি বাজারপাড়ার পঁচিশরত্ন (চূড়া) শ্রীধর মন্দির। গন্ধবণিক কুলবর ব্রজমোহনের সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের ২২ বছর আগে ১২৫২ সনে শ্রীধর মন্দির নির্মিত। লিপিতে উল্লেখ আছে—"কানাঞি রুদ্রদাসেন তন্তুবায়েন যত্নতঃ নির্মায়িতং" এবং "হরি সূত্রধরেণ বিনির্মিতং"। পোড়ামাটির ভাস্কর্যের এরকম বিস্ময়কর প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য, খুব কমই দেখা যায়, অথচ মাত্র ১৩০ বছর আগে মন্দিরটি নির্মিত। রামগোপাল সূত্রধর, হরি সূত্রধরদের নাম থেকে বোঝা যায়, সোনামুখীর সূত্রধরদের অসামান্য শিল্পকুলতা ছিল এবং এই অঞ্চলের অনেক মন্দিরের টেরাকোটার কাজ তাঁরাই করেছেন। খোঁজ করে বুড়োশিবতলায় পঞ্চানন সূত্রধরের কাছে গেলাম। তখন তিনি খুব অসুস্থ। তৎসত্ত্বেও পুরনো দু-একটি কাঠের মূর্তির ছাঁচ তাঁর কাছে দেখলাম, মন্দিরের ভাস্কর্য-অলংকরণে যে ছাঁচ ব্যবহার করা হত। কাঠখোদাইয়ের কি অপূর্ব নৈপুণ্য, দেখলে অবাক হতে হয়। আমার বিশেষ অনুরোধে পঞ্চানন সূত্রধর একখণ্ড কাঠের উপর প্রায় ১৮ ইঞ্চি একটি মহিষমর্দিনী মূর্তি আমাকে তৈরি করে দিয়েছেন, ধীরে ধীরে একবছর ধরে অসুস্থ অবস্থায় করেছেন, কিন্তু যা করেছেন তাতেই তাঁর কাঠখোদাইয়ের আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানে সোনামুখীতে এরকম কলাকুশলী সূত্রধর আর কেউ নেই।

সোনামুখীতে তন্তুবায়দের আর-একটি কীর্তি হল মনোহরদাস বাবাজীর আখড়া এবং রামনবমীর সময় (চৈত্রমাসে) তাঁর বাৎসরিক মেলা। মেলা উপলক্ষে কিছু বাউলদেরও সমাবেশ হয়। একটি দালান-মন্দিরে বাবাজীর একজোড়া খড়ম পূজিত হয়। বাবাজী সম্বন্ধে একাধিক কিংবদন্তী আছে। ও'ম্যালি সংগৃহীত (বাঁকুড়া জেলা

গেজেটিয়ার, ১৯০৮) কাহিনীটি এই: শ্রীরামদাস অধিকারী নামে সোনামুখীর জনৈক ধার্মিক ব্রাহ্মণ একদিন তাঁর শ্যামসুন্দর বিগ্রহের পূজার সময় হঠাৎ একটি সুন্দরী যুবতী গোয়ালিনীকে দেখে কামাবেগে অভিভূত হন। অতঃপর তিনি এই চিত্তচাঞ্চল্যের মনস্তাপে নিজের পুরুষাঙ্গটি ছেদন করে মৃত্যু বরণ করেন। ব্রাহ্মণের নাবালক একটি পুত্র ও কন্যা ছিল। রামদাসের মৃত্যুর দু'দিন পরে বৃন্দাবনযাত্রী মনোহরদাস সোনামুখীর শ্যামসুন্দর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন এবং সকলকে বলেন যে মৃত রামদাসের অনুরোধে তিনি তাঁর নাবালক ছেলেমেয়েদের অভিভাবক হয়ে এসেছেন। মেয়েটি বয়স্থা হলে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মনোহর তার বিবাহ দেন। এই ব্রাহ্মণবংশের পুরোহিত মনোহরদাস বাবাজীর আখড়ার পূজারী। বাবাজীর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ স্থানীয় তন্তুবায়রা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তন্তুবায়দের পূজ্য দেবতা বলে গণ্য হন। পরবর্তী একটি কিংবদন্তী থেকে ব্রাহ্মণ, কামাবেগজনিত চিত্তচাঞ্চল্য ইত্যাদি উপাদানগুলি বর্জিত হয়েছে এবং তার মার্জিত রূপটি হয়েছে এইরকম: জনৈক কৌপীনধারী এক সাধু একদা এক বিত্তবান তন্তুবণিকগৃহে এসে একখণ্ড বস্ত্র ভিক্ষা করে প্রত্যাখ্যাত হন। পরদিন সকালে সোনামুখীর সমস্ত তন্তুবণিকের তাঁতযন্ত্রপাতি সব বিকল ও অচল হয়ে যায়। তখন অনুতপ্ত তন্তুবায়রা সাধু মনোহরদাসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর মন্দির স্থাপন করে তাঁর পাদুকাসেবায় ব্রতী হন।

সোনামুখীর সূত্রধর শিল্পীদের কথা বলেছি। সোনামুখীর কুম্ভকারদের (খাঁ, দাস, প্রামাণিক, বারিক, সন্ন্যাসী, পাল, কুণ্ডু উপাধি) মৃৎশিল্পের একটি বিশিষ্ট রীতি (স্টাইল) আছে, ঠিক পাঁচমুড়ার মতো নয়। এঁদের তৈরি হাতিঘোড়া ছাড়াও নক্শা-করা চিত্রিত মাটির হাঁড়ি খুব সুন্দর। নানারকম শাস্ত্রীয় কাজকর্মে বিবাহাদিতে এই হাঁড়ি ব্যবহার করা হত। এখন আর তেমন হয় না। অনতিদূরে ধগড়িয়া রেলস্টেশনের কাছে, পাত্রসায়ের থানার হামিরপুর গ্রামের কুম্ভকারদের মৃৎশিল্পেরও বিশিষ্ট রীতি লক্ষণীয়। এবিষয়ে (পাঁচমুড়া, রাজগ্রাম, সোনামুখী, হামিরপুর প্রভৃতি মৃৎশিল্পকেন্দ্রের) সমগ্রভাবে আলোচনা আমরা করব বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পের রীতি ও সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে (এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে)।
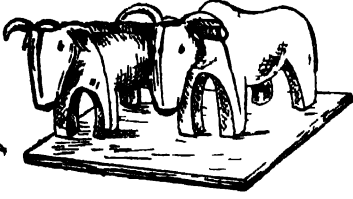
শুশুনিয়া । পোখরনা-পাখন্না

ছাতনা থানার মধ্যে, ছাতনা থেকে পাঁচ-ছয় মাইল দূরে, শুশুনিয়া পাহাড়। শুশুনিয়া নামে একাধিক গ্রাম আছে ছাতনা থানার মধ্যে এবং বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য থানাতেও। সেন্সাসের (১৯৬১) গ্রামতালিকায় যে-কয়েকটি নাম আমার চোখে পড়েছে তা এখানে উল্লেখ করছি :

রায়পুর থানা : জে. এল. ২৫২ : শুশুনিয়া
সিমলাপাল থানা : জে. এল. ১৬৫ : শুশিনিযা
জে. এল. ১১৪ : শুশুনিয়া
জে. এল. ১১৮ : শুশনিয়া
তালড্যাংরা থানা : জে. এল. ৪১ : শুশুনিয়া
রানীবাঁধ থানা : জে. এল ৭৭ : শুশুনিগেরিযা
খাতরা থানা : জে. এল. ১৭৮ : শুশ্না
ওন্দা থানা : জে এল. ১২৮ : শুশুনিযা-গোবিন্দপুর
বড়জোড়া থানা : জে এল. ৯৭ : শুশুনিয়া
ছাতনা থানা : জে. এল. ৮৯ : শুশুনিযা
জে এল. ৭৬ : শুশুনিয়া জামথোল
জে. এল. ৯২ : শুশুনিয়া পরাশিবন
জে. এল. ৮৮ : নাম-শুশুনিয়া
জে. এল. ৮৫ : শুশুনিয়া পাহাড়

লাড়-লাড়া, সোল, টাঁড, বন-বনি, অসুর-অসুরিয়া ইত্যাদি শব্দ বাঁকুড়ার অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে যুক্ত দেখা যায়। এগুলি অষ্ট্রিক ভাষা থেকে গৃহীত অথবা জাতি-বা-নিসর্গ-সূচক শব্দ (যেমন বনি বন অসুর অসুরিয়া)। শুশুনিয়া কি সেরকম অর্থবহ কোনো শব্দ ? হতে পারে, তবে 'সুশ্‌নি' বলতে এমনিতে একপ্রকার জলজ শাক বোঝায়। মনে হয় নিসর্গের কোনো উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্যসূচক শব্দ 'শুশুনিয়া'।

শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে পরিপার্শ্বের একাধিক গ্রাম পর্যটনের জন্য আমি প্রথম যাই ১৯৬৯ সালে। ১৯৫০-এর দশকে যাওয়া হয়নি। শুশুনিয়া পাহাড় প্রায় ১৫০০ ফুট উঁচু এবং পুবে-পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত। এই পাহাড় থেকে অনেক প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের আয়ুধ সংগৃহীত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করলে আরও অনেক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া শুশুনিয়া পাহাড়ের অন্যতম ঐতিহাসিক আকর্ষণ হল চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের একটি প্রাচীন গুহালিপি। লিপির পাঠ এই[১] :

পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ-শ্রীসিংহবর্ম্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ
চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রণতি স্বষ্টঃ

লিপির ভাষা সংস্কৃত, অক্ষর চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের ব্রাহ্মী (late Brahmi)। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পাঠ 'দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ'—'better সৃষ্টাঃ'—বলে শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার উল্লেখ করেছেন (পাদটীকা, পৃষ্ঠা ৩৫২)।

প্রথম-চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য স্থাপন করেন তখন বাংলা দেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অনেক স্বাধীন রাজাকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে এই রাজাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে চন্দ্রবর্মা, নাগদত্ত ও অন্যান্য রাজার নাম পাওয়া যায়। শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহালিপিতে পুষ্করণাধিপতি সিংহবর্মণের পুত্র বলে যে চন্দ্রবর্মণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে বর্ণিত রাজা চন্দ্রবর্মা। চন্দ্রবর্মার রাজত্ব বাঁকুড়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। ফরিদপুরে কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্মকোট-দুর্গ তাঁর নামেই স্থাপিত। সম্প্রতি উজানিনগর-কোগ্রাম (বর্ধমান) থেকে একটি পোড়ামাটির সীল পাওয়া গিয়েছে, যাতে নাগদত্তের নাম আছে এবং তাতে মনে হয় যে সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে বর্ণিত নাগদত্ত উজানিরাজ ছিলেন। সেকথা পরে বলছি।

১ D. C. Sircar : *Select Inscriptions*, 2nd Rev. ed, 1965, pp. 351-52.

চন্দ্রবর্মার রাজধানী ছিল বাঁকুড়ার পুষ্করণা-পোখরনা-পাখন্না গ্রামে এবং তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন, এবিষয়ে ঐতিহাসিকরা প্রায় নিঃসন্দেহ। চন্দ্রবর্মাকে (এবং নাগদত্তকেও) পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। বাংলার পূর্বভাগ সমতট সমুদ্রগুপ্তের অধীন করদরাজ্য ছিল, উত্তরভাগও সম্ভবত তাঁর অধীন ছিল, কারণ তাঁর লিপিতে কামরূপ গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত করদরাজ্য বলে বর্ণিত হয়েছে।

পোখরনা। পাখন্না

পুষ্করণা-পোখরনা থেকে পাখন্না এতদঞ্চলের জিহ্বার স্বাভাবিক টানে হয়েছে। গ্রামটি বড়জোড়া থানায়। ১৯২৭-২৮ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে শ্রীদীক্ষিত (K.N. Dikshit: A.S.I. Annual Report, 1927-28) পুষ্করণা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মর্ম এই: 'দামোদর নদের দক্ষিণতীরে, শুশুনিয়ার উত্তর-পুবে প্রায় ২৫ মাইল দূরে, পোখরণ নামে একটি গ্রাম আছে। বেশ বড় ও প্রাচীন গ্রাম যে তা অতীতের জীর্ণ বসতির চিহ্নগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। গ্রামের পশ্চিমে রাজগড় নামে একটি বড় ঢিবি আছে, তার চারিদিকে ভাঙা ইঁট ও মাটির বাসনকোসনের টুকরো ছড়ানো। কয়েকটি পাথরের টুকরোও ইতস্তত ছড়ানো দেখা যায়, মনে হয় কোনো প্রাচীন ইমারতের ভগ্নাবশেষ। গ্রামের পশ্চিমে একটি বড় দীঘির কাছে কয়েকটি ছোট ছোট পুকুর আছে। এই পুষ্করিণী-পুকুর থেকেই পোখরণ নাম হয়েছে মনে হয়। শুশুনিয়া-লিপিতে কথিত সিংহবর্মণের পুত্র চন্দ্রবর্মণের রাজধানী পুষ্করণা এই গ্রাম ও তার পরিপার্শ্ব বলে মনে হয়।' গুরুত্ববোধে মূল বিবরণটি উদ্ধৃত হল:

> At a distance of less than 25 miles to the north-east of Susunia is an ancient village named Pokharan on the south bank of the river Damodar. It is still a considerably large village and its antiquity is attested by the fact that the houses in several quarters of the village are built on the top of mounds, formed by the ruined heaps of older habitations, 3 to 5 feet higher than the level of the roads. In the western extremity of the village, exists a large mound called "the Rajghar" strewn over with broken bricks, pottery pieces and other antiquities. Several architectural stones are to be seen in the village, one of which measuring 2'—5" x 1'—3" appeared to be

a rough worked sandstone from the upper Damodar valley. Another stone kept in the open yard of a house shows the 'sow and ass' figure, familiar from its occurrence on land grants. There are several small tanks in the vicinity of a large tank (pokhar or pushkara) in the west of the village, and the name Pokharana or Pushkarana must doubtless be ultimately due to the presence of such a tank in ancient times. It is very likely that the place dates back from the early Gupta period and can thus be considered to be the Pushkarana of the Susunia inscription, the capital of King Chandravarman, son of Simhavarman, the extent of whose dominions may have been more or less coterminous with the ancient Radha country or south-West Bengal.

শ্রীদীক্ষিতের অনুমান সত্য বলে ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে অনুসন্ধানের ফলে এই গ্রাম থেকে পোড়ামাটির প্রাচীন তৈজসপত্র, ছাপমারা ছাঁচে-ঢালা প্রাচীন মুদ্রা, পোড়ামাটির বিবিধ মূর্তি প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ অনেক পাওয়া গিয়েছে (আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত)। শ্রীদীক্ষিত একথাও বলেছেন যে চক্রস্বামীর (বিষ্ণুর) উপাসক চন্দ্রবর্মণ দেবতার উপাসনার জন্য 'ধোসাগ্রাম' দান করেন।

উজানি-মঙ্গলকোটের নাগদত্ত

উজানি-মঙ্গলকোটের (বর্ধমান অংশে পৃষ্ঠা ১৯০-২১২ দ্রষ্টব্য) প্রাচীন ঢিবি খুঁড়ে কিছুদিন আগে পোড়ামাটির একটি সীল পাওয়া গিয়েছে।[২] সীলটি নানাকারণে ঐতিহাসিক কৌতূহল উদ্রেক করে। চার ইঞ্চি লম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া প্রায় আধ ইঞ্চি পুরু সীলটি পিরামিডের মতো। সীলটিতে আছে: ১ গদা গরু চক্র ও তার নিচে লেখা নাগদত্ত, ২. পাশে একটি ছুটন্ত মানুষ ৩ অন্যদিকে মুকুট ৪ শেষে শঙ্খের উপর পদ্ম। অক্ষর চতুর্থ খ্রীস্টাব্দের late Brahmi বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই নাগদত্ত সমুদ্রগুপ্তের স্তম্ভলিপিতে উল্লিখিত নাগদত্ত হতে পারেন। চন্দ্রবর্মণের মতো দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের তিনিও আর-একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং

২ মুহম্মদ আয়ুব হুসেন: 'উজানিরাজ নাগদত্ত'—পশ্চিমবঙ্গ, ৮ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৩।

তাঁর রাজধানী উজানি-মঙ্গলকোট অঞ্চলে ছিল। এখানকার একটি প্রাচীন ছড়ায় পোখরনা যাবার কথা বলা হয়েছে :

চার মাস বর্ষা, পোখরনা যায়
পোখরনা গিয়ে দেখি দুয়ারে মরাই
ছোট মরাইএ পা দিয়ে
বড় মরাইএ পা দিয়ে
রাই এস গো ঝলমলিয়ে

বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার শেষে গৃহে শুভাগমন কামনা করে এই ছড়া রচিত হয়েছে। পোখরনার সঙ্গে উজানির বাণিজ্যিক যোগ থাকা স্বাভাবিক এবং প্রসঙ্গত একথাও মনে রাখা উচিত যে বর্ধমান-বাঁকুড়া অঞ্চলে বণিকসম্প্রদায়ের বেশ প্রাধান্য আছে। নাগদত্তের 'দত্ত' উপাধি থেকে তাঁকে বণিকরাজ মনে করাও অসঙ্গত নয় এবং তিনিও যে চন্দ্রবর্মণের মতো বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন তা মাটির সীলের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম থেকে বোঝা যায়।

শুশুনিয়ার চারপাশের গ্রাম

শুশুনিয়ার চারপাশে কয়েকটি গ্রাম (সালতোড়া ও ছাতনা থানায়) পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল, ১৯৬৯ সালে, লোকশিল্পের বিশেষ অনুসন্ধানের কাজে। এই গ্রামগুলির মধ্যে নেতকামলা (সালতোড়া থানা, জে. এল নম্বর ১৫৬) ও বিন্ধ্যজাম (ছাতনা থানা, জে. এল. নম্বর ১৫৭) ডোকরাশিল্পীদের বাসের জন্য উল্লেখ্য। ডোকরাশিল্পের নিদর্শন তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু ডোকরাদের সামাজিক জীবনযাত্রার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ওই অঞ্চলে সাঁওতালদের বাস বেশি। শ্রীরামচন্দ্র হেমব্রম নামে একজন স্থানীয় শিক্ষিত সাঁওতাল-প্রধানের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাই। শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাঠের উপর দিয়ে কাঁচাপথে প্রায় একমাইল দূরে ভরতপুর গ্রাম। এই গ্রামে চিত্রকরদের (scroll-painters) বাস আছে শুনে দেখতে যাই। অতিদরিদ্র একজন চিত্রকর (জ্যোতিলাল চিত্রকর) সপরিবারে বাস করেন। জ্যোতিলাল যদিও এখনও পটচিত্র আঁকেন, তাহলেও আঁকার মতো তাঁর আর সঙ্গতি-সামর্থ্য নেই, প্রেরণা তো নেই-ই। ছাতনা ও সালতোড়া থানার অনেক গ্রামে এই চিত্রকরদের আত্মীয়-স্বজনের বাস আছে, কিন্তু তাদের অবস্থাও একরকম। ডোকরা-শিল্প ও পটচিত্র সম্বন্ধে সমগ্রভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে (তৃতীয় খণ্ডে) এইসব গ্রামের শিল্পীদের শিল্প, সমাজ ও জীবনের কথা সবিস্তারে বলব।

পু
য়া
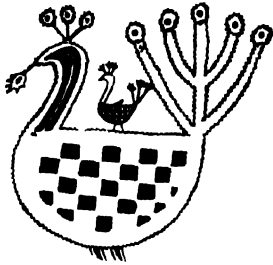
পুরুলিয়ার সংস্কৃতি

প্রকৃতি যতটা নিষ্করুণ নয় 'পুরুইল্যা' বা পুরুলিয়ায়, তার চেয়ে অনেক বেশি নির্মম নিষ্করুণ পুরুলিয়ার অকৃত্রিম অবিকৃত অধিকাংশ অধিবাসীর জীবনের একঘেয়ে দারিদ্র্য। ভয়ংকর দারিদ্র্য এবং তার কদর্য মূর্তি চামুণ্ডার মূর্তির চেয়েও ভয়ংকর। যদিও পুরুলিয়ার কাঁসাই নদীর কূলে জৈনধর্মীদের অনেক উপনিবেশ দেখা যায়, যা পশ্চিমবঙ্গের আর কোথায় দেখা যায় না, সংলগ্ন বাঁকুড়ায় ছাড়া, এবং শান্তি-মৈত্রী অহিংসার প্রতিমূর্তি জৈন তীর্থংকরদের নানা আকারের অগুনতি মূর্তি কাঁসাইকূলে বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত, ভগ্নজীর্ণাবস্থায় আজ উপেক্ষিত প্রস্তরমূর্তি -- তথাপি একথা অতিশয় সত্য যে পুরুলিয়ার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য ভয়ংকর এবং বাস্তবিকই চামুণ্ডার মূর্তির চেয়েও ভয়ংকর তার রুক্ষ নীরস পাথুরে মাঠ। গত ষাটের দশকে এবং সত্তরের গোড়ায় (১৯৬০-৭২ সাল) অন্তত দশবার পুরুলিয়া জেলার গ্রামে গ্রামে পর্যটনের সময় এই সত্যই আমার কাছে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং বাকি সমস্ত সত্যের ঔজ্জ্বল্য এই সত্যের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

দরিদ্রনারায়ণসেবকের চোখ দিয়ে দেখলে এই ভয়ংকর দারিদ্র্যের কিছুই বোঝা যায় না, জানা যায় না এবং অনন্তকালে এই অভিশাপ মোচনের জন্য কিছু করাও যায় না, করা সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। দারিদ্র্য বেড়েছে, পাঁচটাকা মহাজনী ঋণের চক্রবৃদ্ধিহারে পাঁচশো-পঞ্চান্ন টাকার মতো। প্রসঙ্গত বলছি, মহাজনী কারবারের

প্রসার পুরুলিয়ায় অত্যধিক। লোকসংস্কৃতির (folk culture) গবেষণার মনোহর মুলুক মানভূম-পুরুলিয়া। পুরুলিয়ার আদত প্রাকৃতজন যারা, সাঁওতাল বাউরি ভূমিজ মুণ্ডা ওঁরাও ভাঙি মহলি কর্মালি ঘাসী শবর গণ্ড প্রভৃতি, যারা এককালে জঙ্গল হাসিল করে, পাথুরে মাটির বুক চিরে ফসল ফলিয়ে পুরুলিয়ায় গ্রামবসতি স্থাপন করেছিল, তারা ক্রমে বাঘমুণ্ডির অযোধ্যা পাহাড়ের মতো আঁকাবাঁকা পার্বত্য-পথে দারিদ্র্যের চূড়ায় উঠেছে এবং সেখানে নৈরাশ্যের নিরেট অন্ধকারে নিরুপায় নিশ্চিহ্নতার জন্য অপেক্ষমান। অথচ পুরুলিয়ার সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু তাদেরই উৎসবপার্বণ ধ্যানধারণা ধর্মকর্ম নৃত্যগীতাদির বিচিত্র অনুষ্ঠানের রঙিন সুতো দিয়ে ঠাসবোনা একটি গালিচা বিশেষ। বিবিধ শাস্ত্রীয় সাহিত্যে এই প্রাকৃতজনদের পাষণ্ড দস্যু রূঢ় চোয়াড় ইত্যাদি সম্বোধনে উপহাস করা হয়েছে, যেহেতু মদ্যমাংস উপচারযোগে তারা বিচিত্র দেবদেবীর পুজো করে, ধামসা মাদল ঝাঁঝ শিঙা বাঁশি চ্যাড়পেটি মদনভেড়ি বাজায়, খোল বাজিয়ে কৃষ্ণরাধার নামকীর্তন করে না অথবা নিরামিষ নৈবেদ্য দিয়ে শ্যামাপূজা করে না। তার জন্যই পুরুলিয়া আজ গবেষক সংস্কৃতিসেবকেদের লীলাক্ষেত্র, যদিও যাদের সংস্কৃতি নিয়ে এত গবেষণা তারা কেউ কোনোদিন 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি' কথাগুলো কানে শোনেনি, মুখে উচ্চারণ করতে পারে না, মানে কি তাও জানে না।

এদিকে সমতলে যাঁরা বাগান সাজিয়ে ঘর গুছিয়ে বসেছেন তাঁরা অধিকাংশই দাণ্ডাজিনিক, কপটে. অর্থলাভার্থ দাণ্ডাজিনধারী বিভিন্ন জাতের ও শ্রেণীর বাবুজন, যাঁরা অধিকাংশই আধুনিককালের অমানুষ, যদ্যপি আচারব্যবহারে পোশাক-পরিচ্ছদে মার্জিত মানুষের মতো বটে। গ্রামে গ্রামে পর্যটনের সময় এই কথা আমার বহুবার মনে হয়েছে যে পুরুলিয়ায় প্রাকৃত-অপ্রাকৃতজনের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর, এবং দুস্তর। আমরা যারা কলকাতা ওয়াশিংটন লণ্ডন প্যারিসের মতো শহরের শৌখিন রঙ্গমঞ্চে পুরুলিয়ার ছৌনাচ দেখিয়ে সংস্কৃতির ঠিকেদারি করে বিচক্ষণ কৃষ্টিবিশারদের সুখ্যাতি অর্জন করি, তারা পুরুলিয়ার প্রাকৃতজনের কাছে হারমোদ বোম্বেটেদের মতোই বিকট ভয়াবহ জীব বিশেষ, যদিও তাদের আতিথ্যে অভ্যর্থনায় কদাচ তা প্রকাশ পায় না। বাবুরা গ্রামে এলে তারা কৃতার্থ। বাবুরা তাদের নাচগান কলানিদর্শন দেখে বাহবা দিলে তারা বিমূঢ়। শহরের শামিয়ানার তলায় লোকসংস্কৃতির উৎসবে বাবুরা তাদের নিয়ে গেলে তারা আনন্দে আত্মহারা। তারপর যথাপূর্বম্। লোক-সংস্কৃতির ব্যবসায়ে বাবুদের যত উন্নতি হয় গাণিতিক হারে, তাদের তত অবনতি হয় জ্যামিতিক হারে। এ দৃশ্য ১৯৭০-এর দশকেও দেখেছি, অনেক বছর ধরে

সাঁওতাল পরগণা
ধা ন বা দ
পুরুলিয়া
সিং ভূ ম
পুরুলিয়া
সদর
মহকুমা
থানা
রাস্তা
রেলপথ
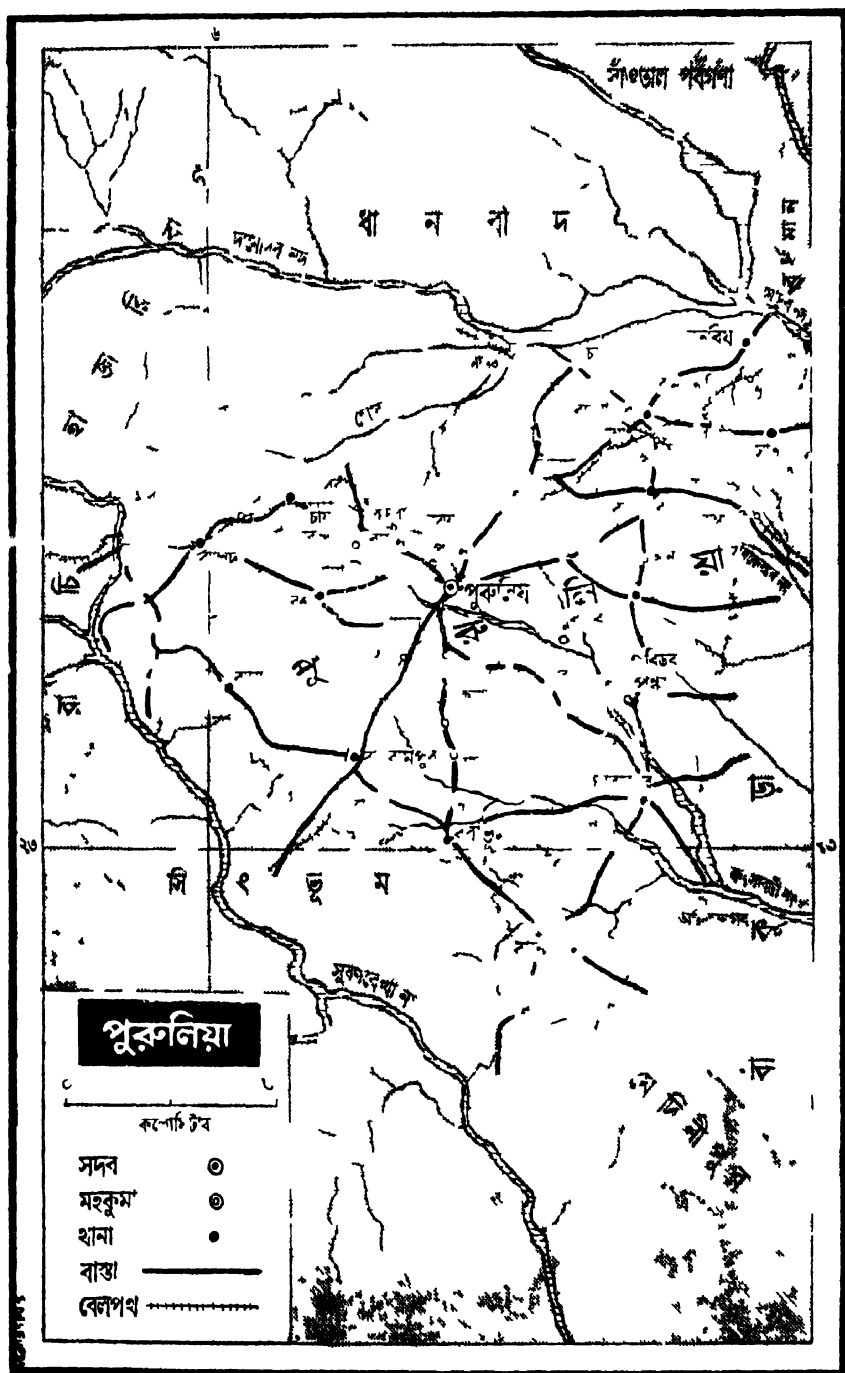
কলকাতার শামিয়ানাতলে ও চৌরঙ্গির দোকানে লোকসংস্কৃতির শহুরে পোষকতার পরেও, বাঁকুড়ার মৃৎশিল্পী ও ডোকরা-শিল্পীদের একাধিক গ্রামে, পুরুলিয়ার ছৌশিল্পী গম্ভীর সিং-দের চোড়দা গ্রামে, গড়-জয়পুরে মধু রায় গোকুল রায়দের ডুমরদি গ্রামে। বাঘমুণ্ডি থেকে অযোধ্যা পাহাড়ে উঠে অপরপ্রান্তে সিরকাবাদ হয়ে নেমে আরশার ভিতর দিয়ে পুরুলিয়া শহরে ফিরে আসার পথে অনেক দুস্থিতজনের গ্রামে, প্রধানত সাঁওতাল বা ওরাওঁদের, এই এককথাই মনে হয়েছে বারংবার। ব্যবধান বিস্তর—আমাদের সঙ্গে তাদের—এবং দুস্তর।

পুরুলিয়া থেকে ঝালদা হয়ে তুলিন। দীর্ঘ পথের দুদিকে অনেক গ্রাম, বিচিত্র নিসর্গ। তুলিনের সুন্দর সরকারি বাংলো আরামবিরামের মনোহর স্থান। ওপারে মুরি স্টেশন, কাছেই রাঁচি। ঝালদার পাহাড়ের কোলে দ্বিজ টিমার ঝুমুর গান আরও সুন্দর :

পড়লি ভাদর মাস
পিয়া পরদেশে
পি কত দূরা ডাকে রহি হাম কাছে
ও মন রহলি উদাসে গো
মদন প্রকাশে।
কোকিলা কে কু কু স্বরে
মরম বিদরে
না আওল বাঁকা শ্যাম
করম একাদশে
শরতে শারদা শশী উদিল আকাশে।
গাঁথি কুসুমমালা
সে বঁধুয়ার আশে গো
মদন প্রকাশে।
আগাম দরিয়ার মাঝে
দ্বিজ টিমা ভাসে
এ বিরহে কৃষ্ণ ছাড়া
ভুজঙ্গিনী দংশে গো
মদন প্রকাশে।

শৃঙ্গার-রসের বহুলতা, মধুজাত সুরার মতো মৃদুতা এবং বর্ণাদির অনিয়ম হল ঝুমুরের

লক্ষণ। প্রাচীন খোষড়ার একটি উপধারা ঝুমুর। পদাবলীতে আছে, 'ঝুমরী গাহিছে শ্যাম, বাঁশি বাজাইয়া'। কৃষ্ণকীর্তন ঝুমুরের ধারায় রচিত। ঝুমুর গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, দুই দলে সম্পর্ক পাতিয়ে গান আরম্ভ করা। কৃষ্ণকীর্তনে প্রথমদিকে রাধিকা মামী হয়ে ভাগনে কৃষ্ণকে চাপান দি্য়েছেন, দ্বিতীয়দিকে কৃষ্ণ ভাগনে হয়ে মামী রাধাকে উত্তর দিয়েছেন। রাধা এবং কৃষ্ণ পরস্পরকে যা-খুশি বলেছেন। নিজের রূপের কথা বলা, মনের অবস্থা জানানো, ঝুমুরের লক্ষণ। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে :

তিরিবধিয়া কাহ্নাঞিঁল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো।
মোরে নাহি ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসী যা।
অঘোর পাপে তোর বেআপিল গা॥

ঝুমুর গান নয় শুধু, এর মধ্যে ঝুমুরনাচের ছন্দও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত ঝুমুর, সাধারণ মানুষ এবং সামন্ত-ভূস্বামীদের পোষকতায় সমৃদ্ধ। সমস্ত জাতি-বর্ণের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ঝুমুর-গানের কবি অনেক আছেন এবং তাঁদের সংগ্রহ থেকে ভাল ঝুমুরগানের সংকলনও করা যায়।

ঝালদা থেকে তুলিন যাবার পথে এবং সেখান থেকে আবার ঝালদা হয়ে দশবারো মাইল দূরে অতিদুর্গম পথে জঙ্গল ভেঙে জীপে করে প্রায় হাজারিবাগের প্রান্তে একটি দুর্ভেদ্য গ্রামে স্থানীয় এক ভূস্বামীর খামারবাড়িতে যেতে যেতে দ্বিজ টিমার ঝুমুর কানে ঝংকৃত হচ্ছিল : 'পড়লি ভাদর মাস, পিয়া পরদেশে, মদন প্রকাশে'। নাচনি-নাচ আর ঝুমুরগানের আসর বসবে সেখানে, তারই আমন্ত্রণ। গভীর রাতভোর নাচনি-নাচ আর ঝুমুরগান, দ্বিজ টিমার ঝুমুর

দিদি দাঁড়া গো টুকু শুনে লে
কোথা যাবি তুই একাই
মনের অশান্তি করিলে
দিদি তুই শান্তি পাবি নাই
দিদি দাঁড়া গো টুকু শুনে লে
কোথা যাবি তুই একাই—

খড়ছাওয়া গোলঘরে (আদিবাসী চেঞ্চুদের মতো) রাতের অবসাদ কাটাতে কাটাতে এই কথাই বারংবার মনে হয়েছে যে পুরুলিয়ায় বিকৃতজনের সংখ্যা ক্রমে যত বাড়ছে, তাদের গতিকগাতাক ক্রমেই যত উদ্ধত হচ্ছে, তত বেশি পুরুলিয়ার প্রাকৃতজনদের

সামনে দারিদ্র্যের গহ্বর বিকটতর গভীরতর হচ্ছে এবং হতাশার অতলস্পর্শ অন্ধকারে তারা নিমজ্জিত হচ্ছে। রাজার মতো ভূস্বামীর খামারবাড়িতে নাচনিনাচের নর্তকীদের জীবনের এমন সব বিচিত্র কাহিনী শুনেছি যা কলকাতার মতো মহাশহরে পতিতাদের অথবা তাদের ভর্তাদের মুখে শুনিনি কখনও এবং শুনব বলেও মনে হয় না। দ্বিজ টিমার ঝুমুরের কথা মনে হয়—পড়লি ভাদর মাস, পিয়া পরদেশে, মদন প্রকাশে।

পুরুলিয়ার আরও অনেক লোকগীতে ঝুমুরের এই ভঙ্গি দেখা যায়, চাপান আর উত্তরের ভঙ্গি। যেমন অহিরা বা গোজাগরণ গীতে—

অহিরে—কোথায় আছে ভালা কচি কচি ঘাস রে
(বাবু হো)
কেহত চরায় ধেনু গাই রে!
কেহ দুহেন ভালা কেহ মহেন রে
কেহত দধি বেচি যায় রে—
অহি রে—নদীর ধারে ধারে কচি কচি ঘাস রে
(বাবু হো)
কৃষ্ণ ত চরায় ধেনু গাই রে।
নন্দ দুহেন ভালা যশোদা মহেন রে
রাধিকা ত দধি বেচি যায় রে।

টুসুগানেও এই একই ঝুমুরের সুর :

বাড়ি নামর জোড় গাছটি পাত লিহ লিহ করে গো
তার তলাতে কাল কিষ্ট লিত্তি খেলা করে গো—

ঝুমুর অহিরা জাওয়া টুসু মনসা দাঁড়শ্যালা ট্যাঁড় এবং নানারকমের লোকগীত, অসুখবিসুখে সাপেকাটায় সব ঝাড়ফুঁক :

গরুড় গরুড় মুহ পূজন্তি
কহত বাপা বসতি কোথায়
শিমূলের আগে ডংকা
কাঁপে ঝুপে সর্বাঙ্গের বিষ
থরথরি কাঁপে
কার দোহায় বিষহরির দোহাই
কাউর কামাখ্যার দোহাই—

নাচ নিনাচ লাটানাচ কাঠিনাচ ছৌনাচ, করম টুসু ছাতা ইদ বাঁধনা পরব, ধানসিং-মানসিং মারাংবুরু সিঙবোঙা ইদাবোঙা চকাদিদি বুড়াবুড়ি প্রভৃতি লোকদেবতা গৃহদেবতা কুলদেবতা, জন্ম মৃত্যু-বিবাহের সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান, প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট আনন্দ নিয়ে পুরুলিয়ার সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য সম্পত্তি।[১] সতরঞ্চির বুননিরও বৈশিষ্ট্য আছে, সুতোর গাঢ় ফিকে বহুবর্ণের বৈচিত্র্য তো আছেই। বুননির প্যাটার্ন বা ডিজাইন বর্ণনা করতে হলে এইভাবে বলা যায়, কোথাও check-এর মতো, কোথাও twilled, কোথাও wrapped, কোথাও twined, কোথাও wrapped-twined বা lattice-twined, কোথাও hexagonal। মূল টানাসুতোটি কিন্তু নিষাদ সংস্কৃতির। স্তরিত শিলার সঙ্গে যদি পুরুলিয়ার সংস্কৃতির তুলনা করা যায় তা হলে বলা যায় যে সুদূর গভীরে প্রস্তুত তার মূলস্তরটি আদি-অস্ট্রাল নিষাদ-সংস্কৃতির স্তর এবং তার উপর অনেক স্তরের বিন্যাস, প্রধানত আর্য হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির, তার সঙ্গে জৈন সংস্কৃতির, অনেক পরে বৈষ্ণব সংস্কৃতির। আর্যীকরণের (Aryanization) প্রথম প্রচেষ্টা এই অঞ্চলে জৈনরাই করেন, হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের অনেক আগে। পুরুলিয়ায় জৈন সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচুর্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নিদর্শনও পুরুলিয়ায় অনেক আছে এবং সেগুলি যে জৈনদের পরবর্তী স্তরে প্রক্ষিপ্ত তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। আরও পরবর্তীকালে বৈষ্ণবদের প্রবেশ ঘটেছে, হিন্দুসংস্কৃতির স্তরে এটিকে একটি উপস্তর বলা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই বৈষ্ণব উপস্তর পুরুলিয়ার প্রাকৃতজনের মানসিক স্তরে অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত। তার সম্ভাব্য কারণ মনে হয়, এ অঞ্চলে একদা-প্রবল জৈনধর্মের এবং বৈষ্ণবধর্মের আনুকম্প্য, তদুপরি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রবল লোকচিত্তহরণশক্তি। তাই দেখা যায় পুরুলিয়ার লোকগীতে কেষ্টরাধার বেশ অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং 'কৃষ্ণ ত চরায় ধেনু গাই রে—রাধিকা ত দধি বেচি যায় রে'—'তার তলাতে কালো কিষ্ট পিত্তি খেলা করে গো'—'এ বিরহে কৃষ্ণ ছাড়া ভুজঙ্গিনী দংশে গো, মদন প্রকাশে' প্রভৃতি গানের কলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুলিয়ার আদিবাসী সর্দারদের মধ্যে কেউ কেউ পরে 'রাজা' হয়েছেন। কেবল পুরুলিয়ায় নয়, ছোটনাগপুর অঞ্চলে আদিবাসীদের দলপতি গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে এরকম অনেকে 'রাজা' হয়েছেন। বেশির ভাগই এই রাজসম্মান পেয়েছেন ব্রিটিশ শাসনকালে, দু একজন হয়ত তার আগে মুসলমান শাসনকালে। প্রধানত শাসকদের

---

১ পুরুলিয়ার উৎসবপার্বণ নৃত্যগীত লোকশিল্প প্রভৃতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থের 'তৃতীয় খণ্ডে' বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

তোষণ-লেহন করে, খুঁটকাটি গ্রামের আদিবাসিন্দাদের উৎখাত করে, তাদের ভূমিহীন নিঃস্ব দিনমজুরে পরিণত করে, অথবা এই অঞ্চলের বিদ্রোহী প্রজাদমনে শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাঁরা রাজার সম্মান লাভ করেছেন। কিন্তু রাজসম্মান লাভের পর তাঁদের গোত্রান্তরিত হওয়াটাই স্থানীয় ইতিহাসের দিক থেকে কৌতুককর ব্যাপার। 'রাজা' হবার পর তাঁরা নিজেদের বংশপরিচয় বর্জন করে, নতুন কুরচিনামা তৈরি করে, সকলেই 'রাজপুত' হয়েছেন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা। রাজপুত হবার পর তাঁদের অনেকেরই শিঙ গজিয়েছে, অর্থাৎ উপাধি হয়েছে 'সিং' (সিংহ)। পশ্চিমবঙ্গে এরকম গোত্রান্তরিত বেশ কয়েকজন রাজপুত 'রাজা' দেখা যায়, যদিও বর্ধমান হুগলি প্রভৃতি জেলায় কয়েকজন প্রকৃত রাজপুতবংশের রাজা আছেন (যেমন বর্ধমানের চকদীঘির সিংহরায়রা), যাঁরা সম্পূর্ণ বঙ্গীকৃত (Bengaliized) হলেও, রাজপুত আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। কিন্তু জঙ্গলমহলের রাজপুত রাজাদের ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র। রিস্‌লে এই রাজপুত রাজাদের সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা অনুধাবনযোগ্য (H. H. Risley: The Tribes and Castes of Bengal, Vol I. 1891):

> The leading men of an aboriginal tribe, having somehow got on in the world and become independent landed proprietors, manage to enrol themselves in one of the leading castes. They usually set up as Rajputs; their first step being to start a Brahmin priest, who invents for them a mythical ancestor, supplies them with a family miracle connected with the locality where there tribes are settled, and discovers that they belong to some hitherto unheard-of clan of the great Rajput community. In the earlier stages of their advancement they generally find great difficulty in getting their daughters married, as they will not marry within their own tribe, and Rajputs of their adopted caste will, of course, not intermarry with them. But after a generation or two their persistency obtains its reward, and they intermarry, if not with pure Rajputs, at least with a superior order of manufactured Rajput, whose promotion into the Brahmanical system dates far enough back for the steps by which it was gained to have been forgotten.

রিস্‌লের উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। রিস্‌লের বই ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হলেও প্রায় একশো বছর আগে তিনি জঙ্গলমহলের 'রাজপুত রাজদের' গোত্রান্তরের এই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং শাসকশ্রেণীভুক্ত একজন বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তির অসাধারণত্ব অনস্বীকার্য।

বংশপরিচয় বাতিল করে, সামাজিক মর্যাদার সিঁড়ি বেয়ে, জঙ্গলমহলে 'রাজপুত রাজা'দের উদ্ভবের ফলে, আর্থনীতিক-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও যা হয়েছে পুরুলিয়া অঞ্চলে, তার গুরুত্বও কম নয়। যথা খাসমহল ও হিকমালী গ্রামের (রাজার আত্মীয়দের খোরপোশের জন্য প্রদত্ত গ্রাম) সংখ্যা পুরুলিয়ায় অনেক বেড়েছে এবং যারা অমানুষিক খাটনি খেটে, পাথুরে মাটি চিরে ফসল ফলিয়ে, খাটচিরির মতো (খাটনি আর পাথুরে মাটি চিরে ফসল ফলানো থেকে 'খাটচিরি' নাম) গ্রাম পত্তন করেছে, তারা আজ ভূমিহীন গৃহহীন চাষী দিনমজুর। অথচ জঙ্গলের আদিবাসী রাজারা কেবল 'রাজা' নন, 'রাজপুত' রাজা। তাঁদের উপাধি 'সিং'। এই সিং-বিশিষ্ট রাজারা সম্ভবত অবহিত নন যে কুলপরিচয় অস্বীকার করে তাঁরা রাজপুত হলেও, নৃতত্ত্ববিদ্যার (Ethnology) কোনো মানদণ্ডেই তাঁরা 'রাজপুত' নন। তাঁদের ঝামাপাথরের মতো কালো চামড়ার রং, পুরুনাক, তেএঁটে মাথা, হাবভাব চালচলন সবই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে যে তাঁরা আদি মানবজাতির অন্যতম শাখা নিষাদকুলোদ্ভব। এইটাই তাঁদের গর্বের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। পরিতাপের বিষয়, তা হয়নি। সেটা আমাদের সভ্যতার অভিশাপ। মার্জিত ভদ্র-সমাজে, অবশ্যই উচ্চবর্ণের, এমন দৃষ্টান্ত কি দেখা যায় না যে ধনিক অভিজাত আত্মীয় তাঁর দরিদ্র আত্মীয়দের আত্মীয়তাকেই অস্বীকার করার জন্য আকুল? অনেক দেখা যায়। সামাজিক মই আরোহণে পারদর্শী পুত্র যদি দরিদ্র কেরানী পিতার পিতৃত্ব গোপন করতে চায়, তাহলে জঙ্গলমহলে রাজা হবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা যে তাঁদের নিজেদের কুলপরিচয় অস্বীকার করে রাজপুত-কুলের কপিকলে চড়ে উপরে উঠতে চাইবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। মর্যাদালাভের এই প্রণালীকে 'সংস্কৃতায়নে'র (Sanskritization) মতো আমরা 'রাজপুতায়ন' (Rajputi-zation) বলতে পারি। পুরুলিয়ার সামাজিক ইতিহাসে এই রাজপুতায়নের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখনীয় ব্যাপার হল, পুরুলিয়ার (এবং অন্যান্য স্থানের) এই রাজপুত রাজারা নিজেদের লোকসংস্কার (folkways) সব বর্জন করতে পারেননি, কিন্তু সকলে খুব সাগ্রহে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছেন। শাক্ত নয়, শৈব নয়, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁদের

এই বিশেষ অনুরাগ প্রকাশের কারণ কি, যুক্তি কি? তাঁদের এই রাজপুতায়নের সঙ্গে বৈষ্ণবায়নের একটা অদ্ভুত অনুবন্ধনও (correlation) লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতিবিজ্ঞানের দিক থেকে রাজপুত-বৈষ্ণবের এই অনুবন্ধন বিচার করলে দেখা যায়, অহিংসা প্রেমভক্তি প্রভৃতি চারিত্রগুণ অনুশীলনের প্রশস্ত সুযোগ বৈষ্ণবধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে যতটা আছে, শাক্ত-তান্ত্রিক অথবা শৈবধর্মের মধ্যে তা নেই। জঙ্গলমহলের রাজপুত রাজাদের শ্রেণীস্বার্থের দিক দিয়ে বৈষ্ণব চারিত্রগুণের মাহাত্ম্য প্রচারের প্রয়োজন আছে। ঘন ঘন বিদ্রোহী প্রজাদের প্রেমাবেশে অবশ করা, ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাসের পথে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ পরিচালিত করা, এগুলির প্রয়োজন রাজাদের ছাড়া আর কার বেশি থাকতে পারে? বাংলা দেশে তাই অধিকাংশ ভূস্বামীকে দেখা যায় বৈষ্ণবধর্মাচারী এবং বৈষ্ণব 'মচ্ছব' (মহোৎসব) অনুষ্ঠানে তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করেন।

রাজধর্ম ধীরে ধীরে প্রজারা গ্রহণ করে, যদিও পূর্বপুরুষদের লোকাচার লোকসংস্কার তারা সহজে ছাড়তে পারে না। পুরুলিয়ার সিং রাজাদের বৈষ্ণবধর্মের পোষকতার ফলে তার প্রভাব সাধারণ জনসমাজেও বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রভাব পুরুলিয়ার লোকসঙ্গীতে লোকোৎসবে বৈষ্ণব উপাদানের মিশ্রণে দেখা যায়। সেকথা আগে বলেছি। তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল সাঁওতাল মুণ্ডা ওরাঁও ভূমিজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মাবতাররূপী মুক্তি আন্দোলনের (Messianic movements) আবির্ভাব। যেমন টানা ভগৎ, বাচ্চিদান (বাছুরদান) ভগৎ, কবীরপন্থ, শ্রীনাথ গোঁসাই প্রভৃতি ধর্মীয় আন্দোলন। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে যাঁরা বৈষ্ণবধর্মী হলেন তাঁরা এইকথা ভেবে গর্ববোধ করতে লাগলেন যে তাঁদের জাতের অনুন্নত সাধারণজনের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি সভ্য উন্নত ও মার্জিত। তাই দেখা যায়, 'রাজপুত' রাজাদের পোষকতা এবং ধর্মাবতাররূপী মুক্তি-আন্দোলনের প্রভাবে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে বৈষ্ণব উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু তা ঘটলেও আদি-অষ্ট্রাল সাংস্কৃতিক স্তরের গভীরতা ও দৃঢ়তা পুরুলিয়ায় অনেক বেশি এবং সতর্ক অনুসন্ধানীর চোখে তা সহজেই ধরা পড়ে।

ভূমিজ

পুরুলিয়ার হিন্দুজনসমাজের সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ্য বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। অন্যান্য স্থানের হিন্দুদের উৎসবপার্বণের সঙ্গে তার সাদৃশ্যই বেশি দেখা যায়। কিন্তু অধুনা 'হিন্দু' বলে কথিত ও বর্ণিত এমন কয়েকটি জনগোষ্ঠী পুরুলিয়ায় আছে যাদের লোকাচার লোকসংস্কার প্রভৃতির মধ্যে অহিন্দু আদিজন-স্তরের অনেক সাংস্কৃতিক উপাদানের উদ্বর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমিজরা অন্যতম। আদিজনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুলিয়ার সাঁওতালরাই প্রধান, প্রায় দু'লক্ষের মতো, তারপরে বাউরির, দেড় লক্ষের কিছু কম। ভূমিজদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মতো। সাঁওতাল, এমন কি বাউরিদের কথাও, এখানে আপাতত বলার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য জেলার বিবিধ বিষয়প্রসঙ্গে এদের কথা বলা হয়েছে এবং পরে মেদিনীপুর প্রসঙ্গে আরও বলা হবে (দ্বিতীয় খণ্ডে)। কিন্তু ভূমিজদের একটি বিশিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ পুরুলিয়ায় আছে বলে এখানে তাঁদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা প্রয়োজন।

ড্যাল্টন ও রিজলে উভয়েরই মতে ভূমিজরা মুণ্ডাদেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁদেরই একটি শাখা। ছোটনাগপুরে নিজেদের বাসভূমি থেকে মুণ্ডারা যত পূর্বদিকে যাত্রা করে হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসেছেন, তত তাঁরা মূলজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। ড্যাল্টন এই কথা বলেছেন (Descriptive Ethnology of Bengal, 1872)। মানভূম অঞ্চলে, ড্যাল্টন বলেন, 'মুণ্ডা' কথাটি 'মুড়া' উচ্চারিত হয়। একথা ঠিক,

কারণ ১৯৬৯-৭০ সালে পুরুলিয়ায় গ্রাম-পর্যটনের সময় যে কয়েকজন স্থানীয় ভূমিজের সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে আমার সাক্ষাৎ-আলোচনা হয়, তাঁরা অধিকাংশই শিক্ষিত, স্কুলের শিক্ষক, কিন্তু উপাধি প্রায় সকলেরই 'মুড়া'। 'মুড়া' যে 'মুণ্ডা' শব্দেরই ভিন্নরূপ, একথাও তাঁরা বলেন। 'ভূমিজ' কথার অর্থ ভূমিজাত অর্থাৎ 'যারা মাটির সন্তান' ('the children of the soil')। এই অঞ্চলের আদিমতম অধিবাসী বলে মুণ্ডা-ভূমিজরা এই নামে পরিচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নিজেদের 'সর্দার' বলেন। ধলভূম ও সিংভূমের কোলরা ভূমিজদের 'পাতকুম' বলে। ড্যাল্টন বলেন:

> The Bhumij are, no doubt, the original inhabitants of Dhal-bhum, Barabhum, Patkum, Bagmundi, and still form the bulk of the population in those and adjoining estates. They may be described roughly as being chiefly located in the country between the Kasai and Subarnarekha rivers. They had formerly large settlements to the north of the former river, but they were dislodged by Aryans, who as Hindus of the Kurmi caste now occupy their old village sites. The Bhumij have no traditions of their own origin, generally asserting that they were produced where they are found; but some who dwell in the vicinity of old Jain temples declare that the founders of the temples preceded them; though they can tell us nothing of those founders, nor of the architects of the ruined and deserted Hindu temples existing as additional marks of a prior occupation of the country by a more civilized people.

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৩)

ড্যাল্টনের বক্তব্যের মর্ম এই: ভূমিজরা ধলভূম বরাভূম পাতকুম বাঘমুণ্ডি ও তার পাশাপাশি অঞ্চলের আদি বাসিন্দা এবং প্রধান বাসিন্দা। কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটাকেই ভূমিজদের বাসস্থান বলা চলে। কাঁসাই নদীর উত্তরে এককালে ভূমিজদের বেশ বড় বড় বসতি ছিল। এই সমস্ত বসতি থেকে ভূমিজরা পরে আর্য-হিন্দু কুর্মিজাতির লোকদের দ্বারা উৎখাত হয়। নিজেদের জাতিগত উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূমিজদের মধ্যে ঐতিহ্যজড়িত কোনো কাহিনী শোনা যায় না। যাঁরা পুরনো জৈন মন্দিরের কাছে বাস করেন তাঁরা বলেন যে জৈনরা তাঁদের আগে এইসব

অঞ্চলে এসেছেন, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অথবা হিন্দুদের সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছু বলতে পারেন না।

ড্যাল্টনের আরও প্রায় কুড়ি বছর পরে রিস্‌লে তাঁর The Tribes and Castes of Bengal গ্রন্থে (প্রথম খণ্ড, ১৮৯১, পৃষ্ঠা ১১৬-২৬) ভূমিজদের সম্বন্ধে বলেছেন যে মুণ্ডাদের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, সম্ভবত মুণ্ডা আর ভূমিজ একই জনগোষ্ঠী। যাঁরা ছোটনাগপুর ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করেন তাঁরা মুণ্ডাদের সঙ্গে তাঁদের নিকট-সম্পর্ক স্বীকার করেন, এমনকি ভূমিজ ও মুণ্ডাদের মধ্যে এখানে বিবাহেরও প্রচলন আছে। কিন্তু আরও পুবদিকে অগ্রসর হলে দেখা যায়, ভূমিজরা অনেক বেশি হিন্দুভাবাপন্ন (Hinduized) হয়ে গিয়েছেন। ধলভূম অঞ্চলের ভূমিজরা নিজেদের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী মনে করেন, সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি কোনো জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন না। রিসলে আরও একটি বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন যার গুরুত্ব অত্যধিক। তিনি বলেছেন:

> It is pretty certain that the *zamindars* of all the estates are of the same race as their people, though the only man among them whom I found sensible enough to acknowledge this was the Raja of Baghmundi; the others all call themselves Kshattriyas or Rajputs, but they are not acknowledged as such by any true section of that illustrious stock

প্রায় নব্বুই বছর আগে রিসলের কাছে বাঘমুণ্ডির 'রাজা' যা স্বীকার করেছিলেন, ১৩৬৯-৭০ সালে আমার কাছে বাঘমুণ্ডির কেন, পুরুলিয়ার কোনো স্থানীয় 'রাজা' তা স্বীকার করেননি। এই রাজাদের রাজপুতায়ন' সম্বন্ধে আগে বলেছি। যাই হোক, রাজাদের কথা নয়, ভূমিজদের কথা বলছি।[১]

ভূমিজদের জাতীয় ঐতিহ্য

ভূমিজ-রাজারা কেন রাজপুত-রাজা বলে নিজেদের পরিচয় দেন, সেটা শুধু মনোবিজ্ঞান নয়, সমাজবিজ্ঞানেরও অনুসন্ধানের বিষয়। তার প্রধান কারণ,

১। নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র সিংহ (বর্তমানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য) ভূমিজদের সম্বন্ধে উল্লেখ্য গবেষণা করেছেন। Man in India 1953, J.A.S.B. vol 23, Bulletin of the Dept. of Anthropology, 1959 পত্রিকায় এ বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

নিজেদের জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধের অভাব এবং সেটা নিদারুণ অজ্ঞতাপ্রসূত। রাজারা জানেন না যে সাঁওতাল মুণ্ডা ভূমিজ প্রভৃতি জনগোষ্ঠী আদি-অকৃত্রিম অষ্ট্রিক বা নিষাদজনেরই শাখা-প্রশাখা। নৃবিজ্ঞান তাই বলে। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এই নিষাদজনের দান অমূল্য অপরিমিত। সংস্কৃতি-বিজ্ঞান তাই বলে। ইতিহাস বলে হিন্দুদের চেয়ে নিষাদজনেরা অনেক বেশি প্রাচীন এবং 'হিন্দু' ধর্মসূচক নাম, কোনো আদিজনসূচক নাম নয়। তৎসত্ত্বেও পুরুলিয়ার ভূমিজ রাজাদের কুলপরিচয় দিতে কেন এই হীনতাভাব (inferiority complex) তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বোঝা যায়, সমাজের কৃত্রিম মর্যাদার মানদণ্ডগুলিকে তাঁরা জীবনের বড় সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচারে, যার গৌরব অনেক বেশি, এগুলি বড় সত্য নয়, এমন কি ছোট সত্যও নয়। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, আমি যদি সাঁওতাল মুণ্ডা ভূমিজ বা যেকোনো আদিজনগোষ্ঠীর একজন বলে নিজের পরিচয় দিতে পারতাম, তাহলে বর্তমান পরিচয়ের চেয়ে অনেক বেশি গৌরববোধ করতাম। অবশ্য জানি না, 'রাজা' হলে এই বোধ আমার থাকত কিনা। 'রাজা' হওয়া একটা 'ভয়ানক' ব্যাপার, বিশেষ করে আমাদের দেশে, কারণ গ্রাম পর্যটনের সময় দেখেছি প্রায় গ্রামে-গ্রামে 'রাজা', এবং যে কোনো মাটির ঢিবি বা ভগ্ন বাড়ি সেই 'এক-যে-ছিল-রাজার' লুপ্ত প্রাসাদের ও অস্তিত্বের নিদর্শন। রাজ-মহিমা বোঝা ভার। যাই হোক, পুরুলিয়ার কমবেশি আধলক্ষ ভূমিজরা সকলে যে 'রাজা' হননি, এইটাই সান্ত্বনা, কারণ তাহলে তাঁদের 'ভূমিজ' পরিচয়টি হয়ত লুপ্ত হয়ে যেত।

ভূমিজদের আঞ্চলিক অবস্থানকেন্দ্র বরাভূম ধলভূম সিংভূম মানভূম পুরুলিয়া বাঁকুড়া জুড়ে বিস্তৃত। বরাভূমের পশ্চিমে পাতকুম, দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, দক্ষিণে ধলভূম, পুবে কৈলাপাল ও মানভূম (যার একাংশ বর্তমান পুরুলিয়া) এবং উত্তরে পঞ্চকোট ও বাঘমুণ্ডি (পুরুলিয়া)। এখানকার অধিবাসী অধিকাংশই ভূমিজ, তার সঙ্গে কিছু কুর্মি ও সাঁওতাল আছেন এবং খুব সামান্য উচ্চবর্ণের হিন্দু, বেনিয়া ও মুসলমান। ছোটনাগপুর-জঙ্গলমহলের ব্রিটিশ শাসকদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আঠার শতকের শেষদিক থেকেই ভূমিজরা বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার সঙ্গে কিছু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানও। ভূমিজদের আঞ্চলিক নেতাকে 'সর্দার ঘাটওয়াল' বলা হত। সর্দারদের অধীনে সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী থাকত (ভূমিজ)। তাঁরা এক-একটা অঞ্চল দখল করে, বনজঙ্গল হাসিল করে, বসতি ও চাষবাসের

উপযোগী করে নিতেন এবং পরে শাসকদের কাছ থেকে নামমাত্র খাজনায় জায়গীর পেতেন। এঁরাই পরে রাজা হয়েছেন এবং পাতকুম বরাভূমের সর্দাররা রাজা হয়ে নিজেদের বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলে ঘোষণা করেছেন। বরাভূমের রাজা (ভূমিজ-রাজপুত) বিবেকনারায়ণের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধের ফলে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনাথ নারায়ণকে রাজ্যভার অর্পণ করতে বাধ্য হন। কিন্তু রঘুনাথ বয়সে বড় হলেও ছোটরানীর ছেলে বলে পাটরানীর ছেলে লছমন সিং-এর রাজ্যলাভের দাবি ভূমিজরা সমর্থন করেন। রঘুনাথের সমর্থক ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভূমিজরা বিদ্রোহ করেন লছমন সিং মেদিনীপুর জেলে বন্দী অবস্থায় মারা যান। পরে তাঁর পুত্র গঙ্গানারায়ণ ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী ভূমিজ বিদ্রোহের (১৮৩২-৩৩) নেতা হন। এই বিদ্রোহ 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' নামেও পরিচিত

ধলভূমের ধল-রাজারাও ভূমিজ, পরে ব্রাহ্মণদের দিয়ে নতুন কুরচিনামা লিখিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন J Reid তাঁর ১৯১২ সালের Dhalbhum Settlement Report-এ বলেছেন, "it is tolerably certain that the founder of the dynasty was a member of the primitive Bhumij race of the country" ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই বিদ্রোহী হন এবং কর দিতে সম্মত হন না সাধারণ ভূমিজদের ও তাঁদের সর্দারদের সমর্থনের জন্যই ধলভূম রাজের পক্ষে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল এই সময় জামপাড়া (বরাভূমের সীমান্তে, মেদিনীপুরের প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে ভূমিজ সদারঘাটওয়াল বৈজনাথের বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১৮০০-১৮১০)। বৈজনাথকে দমন করা ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, কারণ বৈজনাথের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিজ সদাররা এবং ভূমিজরা ব্যাপকভাবে ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের চুয়াড়বিদ্রোহও (১৭৯৯) এই ভূমিজ-বিদ্রোহেরই একটি ধারা। মেদিনীপুর তখন জঙ্গলমহলসহ এই অঞ্চলের প্রধান ব্রিটিশ শাসনকেন্দ্র। বৈজনাথের মৃত্যু হয় জেলে বন্দী অবস্থায় তার পরেও এই গণবিদ্রোহ দীর্ঘকাল থামেনি, চলতে থাকে।

বরাভূমের উত্তরে পঞ্চকোট ও কাঁসাই নদী। পঞ্চকোট পাহাড় প্রায় তিন মাইল লম্বা, ১৬০০ ফুট উঁচু। ব্রিটিশ শাসকরা এই পাহাড়টিকে 'mountains, rocks, fastnesses and jungles'-এর একটি বিচিত্র জড়পিণ্ড বলে বর্ণনা করে দুঃখ করেছেন। দুঃখ করার কারণ, সর্বপ্রকারের দুর্বৃত্তের শাসকবিরোধী প্রতিরোধ-

সংগ্রামের অথবা বিদ্রোহের ঘাঁটি হবার মতো একটি আদর্শ স্থান পঞ্চকোট পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম থেকেই অঞ্চলের নাম হয়েছে 'পঞ্চকোট' বা 'পাঁচেট'। বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী পঞ্চকোট পরগণাতে ভূমিজরাই সর্বপ্রধান বাসিন্দা। অষ্টাদশ শতকের শেষে রাজ্যের ভিতর দিয়ে বারাণসী সড়ক তৈরি হবার আগে পর্যন্ত এখানে কোনো অ-ভূমিজ ভাগ্যান্বেষী বা ব্যবসায়ী মহাজনাদির পক্ষে পদার্পণ করা সম্ভব হয়নি। পঞ্চকোটের রাজাও ভূমিজ, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে তাঁরা 'হিন্দু' হয়ে উজ্জয়িনীর রাজবংশের সঙ্গে নিজেরা যুক্ত হয়েছেন এবং পরে বিভিন্ন রাজপুত পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তার সম্পর্কও স্থাপন করেছেন। পঞ্চকোটের রাজার অধীন বারোটি ছোট ছোট জমিদারী (রাজ্য ছিল)– বাঘমুণ্ডি বগনকোদর জয়পুর মুকুন্দপুর হাসলা তোড়াং কাত্রাস নওগড় ঝরিয়া টুণ্ডি পাণ্ডা ও ঝালদা। ব্রিটিশ শাসকরা যখন থেকে (১৭৬০-এর দশক থেকে) জঙ্গলমহলে তাঁদের কর্তৃত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে, নতুন রকমের রাজস্বব্যবস্থা, পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রবর্তন করে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন থেকেই স্থানীয় রাজা, সর্দার-ঘাটওয়াল ও ভূমিজরা প্রতিরোধ করতে থাকেন। প্রতিরোধ প্রকাশ্য বিদ্রোহ থেকে মধ্যে মধ্যে ব্যাপক গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে, বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে। রাজস্ব বাকি পড়ার জন্য পঞ্চকোটের জমিদারী নিলেম হতে থাকে এবং এইসময় ব্রিটিশরাজপুষ্ট ভাগ্যান্বেষী কিছু উচ্চবর্ণের বঙ্গসন্তান এইসব জমিদারী কিনতে থাকেন। তাঁদেব মধ্যে এই জেলার ব্রিটিশ সরকারের দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র অন্যতম। মিত্র মহাশয় ব্রিটিশের দেওয়ান, ফন্দিফিকিরে অদ্বিতীয়, অসাধারণ কূটবুদ্ধি, কাজেই স্বনামে বেনামে, অনুচরদের নামে তিনি জমিদারী কিনতে আরম্ভ করেন। নিজের চারপুত্র নীলাম্বর মিত্র, ভগবতীচরণ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, ভৈরব মিত্র এবং বসম্বদ অনুচর রাধানাথ রায়, নীলাম্বর বসু, জানকীরাম চট্টোপাধ্যায়, ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকনাথ, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের নামে তিনি পঞ্চকোটের প্রচুর জমিদারী নিলেমে কিনে ফেলেন। তাছাড়া চতুর 'মিত্তির' মশায় প্রায় ৪০,০০০ টাকা উৎকোচ আদায় কবেন রামগড়ের বাজার কাছ থেকে, ৬২,০০০ টাকা পঞ্চকোটের রাজার কাছ থেকে, এবং রামগডের সাহেব কলেক্টরের জন্য ৫০০০ টাকার ভেট। ভূমিজরা, তাদের সর্দার-ঘাটওয়ালরা এবং রাজারা হতভম্ব হয়ে দুর্গম জঙ্গলমহলের রঙ্গমঞ্চে এই বিচিত্র দৃশ্যাভিনয় দেখতে দেখতে অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর প্রচণ্ড ভূমিজ-বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। স্থানীয় ইংরেজ শাসকরা ব্যাটালিয়নের পর ব্যাটালিয়ন সৈন্য চেয়ে পাঠান, কিছুতেই কিছু হয় না। সাহেব কলেক্টর থরহরিকম্পমান অবস্থায় দেখেন, বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী ভূমিজরা একদিক

থেকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছে বঙ্গীয় বাবুদের এবং তাঁদের পোষ্য অস্ত্রধারী ও লেঠেল হিন্দুস্থানীদের ("to kill all the Bengalees and disarm and strip the Hindoostanies")। প্রসঙ্গত সাঁওতাল-বিদ্রোহের অনুরূপ ঐতিহাসিক সামাজিক পটভূমির কথা মনে হয়। এটা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৭৯৮ সালের ঘটনা। পঞ্চকোটের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের অধীন সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যের রাজা-জমিদার, সর্দার-ঘাটওয়ালরা এবং ভূমিজ জনসাধারণ একমন-একপ্রাণ হয়ে বিদ্রোহে যোগদান করেন। তাঁদের নিজেদের স্বাধীনতাবোধ ছাড়াও তাঁরা একথা বুঝেছিলেন যে পঞ্চকোটের রাজার আধিপত্য খর্বিত হলে, তাঁর রাজকীয় গৌরব ম্লান হলে, তাঁদের মতো ছোট ছোট রাজ্য জমিদারীর 'রাজা' বা সর্দারদের অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই পঞ্চকোটের অধীন পূর্বোক্ত ১২টি ছোট রাজ্য-জমিদারী ছাড়াও তার আশপাশের কাশীপুর পাতকুম বাঘমুণ্ডি মানভূম অম্বিকানগর (বাঁকুড়া) কৈলাপাল (বরাভূমের একটি ছোট জায়গীর, শতকরা ৯০ জনের বেশি ভূমিজ), শ্যামসুন্দরপুর ও ফুলকুসমা (বাঁকুড়া), রায়পুর (বাঁকুড়া), ছাতনা (বাঁকুড়া), সমস্ত অঞ্চলের জায়গীরদার-জমিদার-সর্দাররা বিদ্রোহে যোগদান করেন। শ্যামসুন্দরপুরের জমিদার সুন্দরনারায়ণ এবং ফুলকুসমার দর্পনারায়ণ ১৭৯৯ সালের চুয়াড়-বিদ্রোহে মেদিনীপুরের রানী ও রায়পুরের দুর্জন সিং-কে অস্ত্রশস্ত্র লোকজন দিয়ে সাহায্য করেন। ১৭৬০-এর দশক থেকে ১৮৩০-এর দশকে 'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা' পর্যন্ত, জঙ্গলমহলের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে, ছোটনাগপুর মানভূম-পুরুলিয়া থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত, এই ব্যাপক গণবিদ্রোহের (প্রধানত ভূমিজ বিদ্রোহ) ইতিহাস আজ পর্যন্ত যথাযথরূপে লেখা হয়নি।[২] যেদিন লেখা হবে, সেদিন ভূমিজরা তো বটেই, তাঁদের 'রাজপুত' রাজারাও নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরববোধ করবেন এবং 'ভূমিজ' বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। অবশ্য বিদ্রোহী 'রাজা-জমিদার-সর্দাররা' সকলেই পরে ব্রিটিশের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছিলেন, যখন তাঁদের কাছে 'শ্রেণীস্বার্থ' স্বজাতিগৌরবের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান মনে হয়েছিল। কিন্তু পুরুলিয়ার গ্রাম থেকে গ্রামে পর্যটনকালে, ভূমিজদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও কথোপকথনের সময় আমি খুব সজাগ হয়ে লক্ষ্য করেছি যে তাঁরা ভূমিজ এবং মুণ্ডাদের শাখা-জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে

২ Bengal Revenue Consultations এবং Bengal Criminal Judicial Consultations (১৭৬০-১৮৩৫)-এর মধ্যে জঙ্গলমহলের বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ-সংগ্রামের প্রচুর উপকরণ আছে। সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীজগদীশচন্দ্র ঝা ১৮৩২-৩৩ সালের ভূমিজ-বিদ্রোহ নিয়ে ভাল গবেষণা করেছেন (The Bhumij Revolt, 1832-33, Delhi 1967)।

আদৌ কুণ্ঠিত নন, এমনকি যাঁরা সুশিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন তাঁরাও। ভূমিজ-সাধারণের এই আত্মজনগৌরববোধ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

পঞ্চকোটে মাইকেল মধুসূদন : ১৮৭২-৭৩

পঞ্চকোট প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ে। ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে তিনি কোনো মামলা উপলক্ষে প্রথম পুরুলিয়ায় যান। সেখানকার খ্রীস্টীয় মণ্ডলী তাঁকে স্থানীয় মিশন হাউসে অভ্যর্থনা জানান। এই উপলক্ষে তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করে তাঁদের উপহার দেন। তার প্রথম আট লাইন—

পাষাণময় যে, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল ধনে ধনী করিয়া অনিলে !

পুরুলিয়ায় একজন খ্রীস্টান কাঙ্গালীচরণ সিংহের পুত্রের খ্রস্টধর্মে দীক্ষাকালে মধুসূদন তার ধর্মপিতার কাজ করেন। সেই উপলক্ষেও তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতা লেখেন। দীক্ষিত কাঙ্গালীপুত্রের নাম দেন খ্রীস্টদাস সিংহ। এর কিছুদিন পরেই তিনি পঞ্চকোটের রাজার এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। পঞ্চকোটের প্রাসাদ গড় পরিখা মঠ মন্দির তখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রাজ্যের শ্রী প্রায় লুপ্ত। মধুসূদন যতদূর সম্ভব রাজ্যশ্রী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু নানাকারণে সাত-আটমাসের বেশি এই কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার অন্যতম কারণ মনে হয় তাঁর অসুস্থতা। ১৮৭২-এর সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পুনরায় ব্যারিস্টারি করবেন মনস্থ করেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যে (২৯ জুন ১৮৭৩) তাঁর মৃত্যু হয়। পঞ্চকোটের রাজকার্য তাঁর ইহজীবনের শেষ কর্ম। পঞ্চকোট থেকে বিদায় নেবার সময় মধুসূদন তিনটি কবিতা রচনা করেন—'পঞ্চকোট গিরি' 'পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী' এবং 'পঞ্চকোট-গিরি বিদায়-সঙ্গীত'। এগুলি তাঁর শেষ-

জীবনের কবিতা (নগেন্দ্রনাথ সোম-এর 'মধু-স্মৃতি' গ্রন্থে মুদ্রিত)। তৃতীয় কবিতাটি উদ্ধৃত করছি :

হেরেছিনু, গিরিবর। নিশার স্বপনে,
অদ্ভুত দর্শন।
হাঁটু গাড়ি হাতি দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে,
কনক-আসন এক, দীপ্ত বত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন।
সেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,
সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন।
হে সখে। পাষাণ তুমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর। রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়, ধনুর্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

কবি মাইকেলের বাসনা ছিল পঞ্চকোট-রাজার জলশূন্য পরিখা জলপূর্ণ করে ভাঙা গড় নতুন করে গড়াবেন এবং দ্বারীরা ধনুর্বাণ ধরে আবার প্রাসাদের দ্বার রক্ষা করবে।[৩] কিন্তু কবির কল্পনা বাস্তব সত্য হয়নি, যেহেতু ইতিহাস অতীতের দিকে পিছিয়ে চলে না, সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

ভূমিজদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

ভূমিজদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি-নিষাদ-জনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। একথা আগে বলেছি। পুরুলিয়া-মানভূমের ভূমিজরা এখন প্রধানত বাংলাভাষী ও হিন্দুভাবাপন্ন হলেও, তাঁদের নানাবিধ লোকাচার লোক-সংস্কার প্রভৃতির মধ্যে নৃতত্ত্ববিদরা অতীতের অনেক আচার-অনুষ্ঠানের, ধ্যান-

৩ মাইকেল মধুসূদনের পঞ্চকোট থাকাকালে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ পঞ্চকোটের রাজপ্রাসাদ, গড়, পরিখাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন (১৮৭২-সালের রিপোর্টে)।

ধারণার উদ্‌বর্তন লক্ষ্য করতে পারেন। প্রথমে ভূমিজদের বিবাহের কয়েকটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করব, যেগুলি রিসলে ভূমিজদের বিবাহপ্রথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেননি।

ভূমিজদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ, 'সাঙ্গা' (পুনর্বিবাহ), বিধবাবিবাহ ইত্যাদির প্রচলন আছে, কিন্তু হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে এগুলির প্রচলন অনেককাল ধরেই ছিল, বর্তমানে উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছে। এগুলির কোনো গুরুত্ব বা বিশেষত্ব নেই। ভূমিজ কন্যাদের বিবাহের বয়স আগেকার ১৫-১৭ বছর থেকে এখন যে ১০-১৩ বছরে নেমে এসেছে, সেটা প্রত্যক্ষ হিন্দুপ্রভাবের নিদর্শন। কিন্তু বিবাহ উপলক্ষে 'গণাপড়া' (শুভক্ষণ গণনা, ঠিকুজি দেখা নয়), 'জোম্‌মাড়ি' (বিবাহের আগে পানভোজনের আপ্যায়ন), শালপাতা ও ছাগলের নাদি পণরূপে (dowry) ব্যবহার, বিবাহের দিন সিদা ও মহুল গাছের ডাল পোঁতা, শালপাতার ছাউনির ('ছামড়া') নিচে বিবাহ, এই লোকাচারগুলির সঙ্গে হিন্দুত্বের সম্পর্ক খুব সামান্যই আছে। বিবাহের পর বর-কনে নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে গ্রামদেবতার স্থানে যায় এবং দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে গ্রামের প্রান্তে যাত্রা করে। গ্রামের সীমান্তে একজন ভূমিজ 'গ্রামবৃদ্ধ' তাদের আগমন প্রতীক্ষা করেন এবং যখন তারা সেখানে পৌঁছয় তখন তাদের আশীর্বাদ করে, বরের হাতে একটি 'তীর' (arrow) দিয়ে বলেন: "তুমি গ্রামের যে মেয়েটিকে বিবাহ করলে, মনে রেখো, কেবল তার মাংস (দেহ) ভোগ করার অধিকার তোমার থাকবে, কিন্তু হাড় বা অস্থি নয়। মেয়ের মৃত্যুর পর তার অস্থি এই গ্রামে তার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তা না দাও তাহলে এই তীর তোমার বুকে বিঁধবে (অর্থাৎ তোমাকে তীরবিদ্ধ করা হবে"।) গ্রামবৃদ্ধের এই সতর্কবাণীর গুরুত্ব অনুধাবনীয়। বিবাহিত ছেলেটিকে ভূমিজদের আসল 'মেগালিথিক' সমাধিপ্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, যে-প্রথা পালন করতে সে বাধ্য এবং অবাধ্য হলে তীরবিদ্ধ করে তাকে বধ করা হবে, তাই গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার আগে তার হাতে তীর গুঁজে দেওয়া হল।

ভূমিজদের লোকাচারের আর-একটি উল্লেখ্য সুপ্রাচীন নিদর্শন বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানটি হয় 'অষ্টমঙ্গলের' দিন, বিবাহের পর অষ্টম দিনে। এইদিন 'স্বামী' পুকুরে অনুষ্ঠানাদি সেরে তীরধনুক নিয়ে একজায়গায় এসে দাঁড়ায়। সেখানে তার নববিবাহিত 'স্ত্রী' ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত থাকে। সকলের সামনে নতুন বর তীরধনুক নিয়ে কিছু লক্ষ্য করতে থাকে শিকারের উদ্দেশ্যে এবং তিনবার তীর ছোড়ে। স্বভাবতঃই অনুষ্ঠানটি যেখানে হয় সেটা শিকারক্ষেত্র নয়,

জঙ্গলও নয়। সেইজন্য তৃতীয় তীরটি ছোঁড়ার পর তার 'স্ত্রী' সেটি কুড়িয়ে আনে এবং 'স্বামী' তাকে জিজ্ঞাসা করে 'কি শিকার করেছি?' উত্তরে কনে বলে পাখি বা খরগোস বা যে-কোনো জন্তুর নাম। তখন বর বলে—'ঐ জন্তুর মাংস তোমার, হাড় আমার'। এটি যে শিকারের একটি অনুষ্ঠানিক অভিনয় মাত্র, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। একদা ভূমিজদের পূর্বপুরুষরা (অর্থাৎ মুণ্ডারা) এই অঞ্চলের বনেজঙ্গলে যে প্রধানত শিকারী ছিল, তারই স্মৃতি এই অনুষ্ঠানটি।

ভূমিজদের সঙ্গে মুণ্ডাদের সমাধিপ্রথার সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মৃতের অস্থি তার পূর্বপুরুষদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করতে হবে, এই ছিল আদি প্রথা। পূর্বপুরুষদের গ্রাম বলতে প্রথমে জঙ্গল হাসিল করে তারা যে গ্রাম পত্তন করেছিল সেই গ্রাম বোঝায়। রিসলে দেখেছেন, মেদিনীপুরের 'তামারিয়া ভূমিজরা' মৃতের অস্থি নিয়ে সমাধিস্থ করতে যেত লোহারদাগার তামার পরগণায় মুণ্ডাদের চোকাহাটু সমাধিক্ষেত্রে। মেদিনীপুরের 'দেশী ভূমিজরা' মৃতের অস্থি সমাধিস্থ করতে যেত সিংভূমের কচঙে এবং সিংভূমের ভূমিজরা আসত বাঘমুণ্ডির সুইসাতে।[৪] এখন আর তা করা হয় না। ভূমিজদের বসতি অঞ্চলের কাছেই এখন সমাধিক্ষেত্র থাকে। মৃতের অস্থি সেখানে সমাধিস্থ করা হয় এবং সমাধির উপর একটি পাথরের খণ্ড স্থাপন করা হয়। অতীতে সামাজিক পদমর্যাদা অনুযায়ী সমাধিতে পাথর-স্থাপনের রীতি ছিল। যেমন একটি অনুভূমিক (horizontal) পাথরখণ্ডের উপর আর-একটি খাড়াই পাথর দেওয়া হত সর্দার-ঘাটওয়ালদের সমাধিতে। এখন আর এসব করা হয় না। সাধারণত একটি খাড়াই পাথরখণ্ড প্রত্যেকের সমাধির উপর দেওয়া হয়। এগুলিকে 'menhir' বলে। এরকম সমাধিক্ষেত্র পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় একাধিক দেখা যায়। অনেক পাথরখণ্ডের উপর নানাধরনের বীরমূর্তি খোদাই করা থাকে, স্থানীয় লোকেরা এগুলিকে তাই 'বীরস্তম্ভ' বলে। কিন্তু এগুলি যে এইসব অঞ্চলের ভূমিজদের মুণ্ডা-সমাধিপ্রথার অর্থাৎ মেগালিথিক সংস্কৃতির নিদর্শন

---

৪ সুইসার ভূমিজ-সমাধিক্ষেত্র সম্বন্ধে ১৮৭২-৭৩ সালের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বিবরণ: "Here, under a bar or bat tree, are collected numerous statues, found, it is said, in the jangal when the place was cleared, but chiefly in a spot 100 yards off, which is, and must long have been, a burial place of the Bhumij or aborigines; this cemetry is, full of tombs, consisting of rude slabs of stone, raised from 1 to 4 feet above ground on four rude longish blocks of stone which serve for pillars; people say that when digging for fresh tombs they often come upon the slabs of old tombs now buried; and from the profusion of tombs in all stages of freshness and decay there can be no doubt it has long been a chosen cemetry for the aborigines, the Bhumij......" (পৃষ্ঠা ১৯০)।

তাতে কোনো সন্দেহ নেই (বাঁকুড়া জেলায় 'ছাতনার' বিবরণ দ্রষ্টব্য)। মেদিনীপুর জেলা প্রসঙ্গেও এবিষয়ে আলোচনা করব।

ভূমিজদের পূজিত গ্রামদেবতারাও তাদের আদি-নিষাদসংস্কৃতির নির্ভরযোগ্য সাক্ষীস্বরূপ গ্রামে গ্রামে বিরাজ করছেন। 'বুড়া-বুড়ি' হলেন গৃহদেবতা, পরিবারের পূর্বপুরুষ-পূজার (ancestor worship) প্রতীক। 'শিলফোঁড' ও 'বুরু' পর্বতের দেবতা। 'বাঘুত' (বাঘ-ভূত) জঙ্গলের বাঘের দেবতা। 'জাহির-বুরু' জঙ্গলের দেবতা। 'গ্রামদেবতা' গ্রামের দেবতা, ফসলেরও দেবতা। এই দেবতাকে 'দেওশ লি'-ও বলা হয় এবং এই পূজাকে বলা হয় 'গাবাম-পূজা' বা গ্রামের পূজা। আষাঢ় মাসে ফসল চাষের সময় এঁর পূজা হয়। মাটির ঢিবি অথবা একখণ্ড পাথর গ্রামদেবতার মূর্তি। পুরোহিতদের 'লায়া' বলে। 'কাড়াকাটা' (কাড়া মানে মহিষ) শস্যদেবতা, বর্ষার আগে মহিষ-ছাগল বলি দিয়ে তাঁর পূজা হয়। এরকম আরও অনেক গ্রামদেবতা আছেন যাঁরা আজও ভূমিজ-সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন।
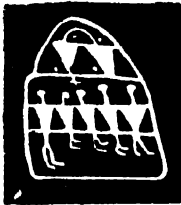
গ্রাম থেকে গ্রামে

গড়-পঞ্চকোট থেকে কাশীপুর, বাঘমুণ্ডি থেকে ঝালদা, এবং পুরুলিয়ার আরও অনেক স্থানে ভগ্নজীর্ণ রাজবাড়ি গড় পরিখা দেব-দেউলাদির যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তার উপর ইতিহাসের পদচিহ্নগুলি স্পষ্ট চেনা যায়, যদিও কয়েকটি স্থানে এই চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্ট স্থানের শূন্যতা ঐতিহাসিকের দূর দৃষ্টি দিয়ে পূরণ করা যায়, অন্তত খানিকটা, কিন্তু কাব্যিক কল্পনা দিয়ে নয়। সুদূর অতীতের সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ থেকে জৈন বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক উপাদান ও নিদর্শনের এরকম স্তরবিন্যাস, পুরুলিয়া ও তার সংলগ্ন বাঁকুড়া 'মহকুমা' ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের আর কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে দেখা যায় না। নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ উভয়ের যুক্ত অভিযানে এই স্তরগুলির ঐতিহাসিক ঐশ্বর্য উন্মোচিত হতে পারে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র স্থানের বিবরণ দেব এবং সমগ্র পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এরকম স্থানই নির্বাচন করব।

সুইসা

বাঘমুণ্ডি থানায় সুইসা গ্রাম (জে. এল নং ৮), কিঞ্চিদধিক একহাজার লোকের বাস। ছোটনাগপুর ও সুবর্ণরেখা নদী থেকে খুব দূরে নয়। ১৮৭২-৭৩ সালে এই গ্রাম পরিভ্রমণকালে বেগলার অনেক পাথরের মূর্তি দেখেছিলেন। মূর্তিগুলি একটি

গাছতলায় জমা করা ছিল। মূর্তিগুলিকে তিনি জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষাতেই মূর্তিগুলির পরিচয় দিচ্ছি :

Monsa, a naked Jain figure with snake symbol.
Siva, a naked Jain figure with the bull symbol.
Siva, a votive Chaitya with four naked figures on the four sides, evidently Jain.
Sankhachakra, a figure of Vishnu Chaturbhuj.
Parvati, a female seated on a lion.

Besides this, there are two small Jain figures naked—a female under a tree which I take to represent Maya Devi under the sal tree ; another female under a tree, with five Buddhist or Jain figures seated round her head on branches of the tree ; on each side are four rows of two each of elephant and horse-faced men. Bunches of flowers and fruit hang round the the female figure (A. S. I Report 1872-73, p. 19)

বেগলার সাহেবের এই বিবরণ থেকে বোঝা যায়, মূর্তিগুলি অধিকাংশই জৈন দেবদেবীর মূর্তি, দু-একটি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি। যেমন বেশ বড় চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ বিষ্ণুমূর্তিটি, যদিও পাদপীঠে বাহন গুরুড় নেই। কিন্তু মনসা বা শিব বলে যেসব মূর্তির পূজা করা হত, সেগুলি সবই জৈনমূর্তি। একাধিক জৈন তীর্থংকরের মূর্তি, জৈন দেবী অম্বিকার মূর্তি, সুইসা গ্রামে আছে। স্থানীয় লোকেরা বেগলারকে বলেন যে এখানকার জঙ্গল হাসিল করে গ্রামপত্তনের সময় এই মূর্তিগুলি নাকি পাওয়া যায়। সবচেয়ে উল্লেখ্য হল, এর কাছেই ভূমিজদের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রটি। প্রাচীন এইজন্য যে এই সমাধিক্ষেত্রেই ভূগর্ভের স্তরে স্তরে আরও অনেক প্রাচীন সমাধি আছে দেখা যায়। প্রসঙ্গত একথাও উল্লেখযোগ্য যে জৈনধর্মী সরাকরা তাদের আগেই এই অঞ্চলে এসেছে ('ভূমিজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আদি জৈনধর্মীদের সঙ্গে সরাকদের পার্থক্য অনেক। তথাপি ভূমিজদের এই বিশ্বাসের কোনো মূল নেই বলে মনে হয় না। উত্তররাঢ় অঞ্চলে আর্যীকরণের প্রথম দূত হিসেবে জৈনরা আসেন, সেকথা আগে বলেছি। তাঁরা যাদের আর্যীকৃত-তথা জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন, তারা

আদিজনগোষ্ঠী, অর্থাৎ ভূমিজদেরই পূর্বপুরুষ। পরে ভূমিজরা মূল-জনগোষ্ঠীর শাখারূপে এ-অঞ্চলে বিভিন্নস্থানে যখন ছড়িয়ে পড়েছেন, তখন তাঁরা আদিজৈনদের বংশধরদের এবং তাদের দেবদেউলও দেখেছেন। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই কথাই ভূমিজরা শুনে এসেছেন বলে তাঁদের এই বিশ্বাস। এইরকম কোনো ঐতিহাসিক যুক্তি ছাড়া ভূমিজদের এই ধারণা ব্যাখ্যা করা যায় না।

স্বর্ণরেখা নদীর তীরে দুলমি, দেউলি প্রভৃতি গ্রামে দেউল এবং জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি অনেক দেখা যায়। বেগলার এইসব গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে বলেছেন যে জৈন-বৌদ্ধদের পরে হিন্দুদের আধিপত্য যে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এখানে ভূমিজদের বীরস্তম্ভ-প্রোথিত সমাধিক্ষেত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন।

পলমা । পাড়া । ছরড়া

পুরুলিয়া স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে কাঁসাইনদীর কূলে 'পলমা'। ড্যাল্টন তাঁর ১৮৬৪-৬৫ সালের মানভূম ভ্রমণবৃত্তান্তে পলমার দেবদেউল সম্বন্ধে লিখেছেন:

> The principal temple is on a mound covered with stone and brick, the debris of buildings, through which fine pepul trees have pierced, and under their spreading branches the gods of the fallen temple have found shelter. In different places are sculptures of perfectly nude male figures . . . I have now seen several of these figures and there can, I think, be no doubt that they are images of the Tirthankaras of the Jains. (Journal of the Asiatic Society, Part I, 1866)

পলমার দেউল্ ও কিছু জৈন মূর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে, কিন্তু অনেক ভাল ভাল মূর্তি স্থানান্তরিত হয়েছে, সম্ভবত পুরাকীর্তির ব্যবসায়ীদের কৃপায়। 'পাড়া' গ্রামের অবস্থাও প্রায় তাই। আনাড়ার (আলাড়া ?) পশ্চিমে চার মাইল দূরে পাড়া গ্রাম। একশো বছর আগে বেগলার এই গ্রামে দুটি মন্দির (একটি পাথরের, একটি ইটের) দেখেছিলেন। মন্দির দুটি আছে জীর্ণ অবস্থায়, কিন্তু মূর্তি কিছুই নেই, কিছু পাথরের টুকরো আছে মাত্র, যেগুলি গ্রামবাসীরা দেবতা বলে পূজা করে। পাড়া হল বাউরি-প্রধান গ্রাম।

রঘুনাথপুর-পুরুলিয়া বড় রাস্তার উপর, পুরুলিয়া শহর-সীমানা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে 'ছররা' গ্রাম। গ্রামটিকে কেউ ছররা, কেউ ছড়রা বলেন, কিন্তু উত্তর-রাঢ় অঞ্চলে 'ড়া' 'লাড়া' দিয়ে গ্রামের নাম বেশি বলে আমি 'ছরড়া' বলছি (যেমন আনাড়া মনে হয় আলাড়া)। ছরড়া গ্রামটিকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রদর্শশালা মনে হয়। ড্যাল্টন ও বেগলার আট-দশ বছরের ব্যবধানে (১৮৬৪-৬৫ থেকে ১৮৭২-৭৩) ছরড়া গ্রামে যা দেখেছিলেন, ১৯৬৯-৭০ সালে আমি তা দেখতে পাইনি। ড্যাল্টন দুটি খুব প্রাচীন পাথরের দেউল দেখেছিলেন, এবং তিনি লিখেছিলেন :

> ...there were originally seven of these Deols. Five have fallen and the fragments have been used in building houses in the village.

আমি একটিমাত্র দেউল দেখেছি, দ্বিতীয় যেটি ড্যাল্টন দেখেছিলেন, সেটি সম্ভবত এই একশো বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। বেগলার অনেক মূর্তি দেখেছিলেন এবং সেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ-জৈন মূর্তি ছাড়াও অনেক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন :

> ...numerous votive chaityas with mutilated figures, either of Buddha or of one of the Jain hierachs, lie in the village, but the greater number were, judging from the remains in sculpture lying about, Brahmanical, and principally Vaishnavic.

বেগলার-বর্ণিত ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব দেবদেবীর মূর্তি আমি বিশেষ কিছু দেখিনি। আমি দেখেছি অধিকাংশই জৈনমূর্তি এবং দু-একটি বুদ্ধমূর্তি। গ্রামের শিব-দুর্গার সাধারণ দেবালয়ের ('মন্দির' নয়) গায়ে বেশ কয়েকটি ভাল জৈনমূর্তি গেঁথে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম গ্রামের মধ্যে একটি কুড়েঘরে নানাকারের জৈনমূর্তির বিচিত্র সংগ্রহ দেখে। মনে হয় যেন একটি 'mini museum' গ্রামবাসীরা করেছেন।[১] ছরড়ার ডোমপাড়ায় একটি ধর্মঠাকুরের স্থান আছে গাছতলায়, তার পাশেই এই সংগ্রহশালা। ভগ্নমূর্তির সংখ্যাই বেশি, তাহলেও মূর্তিগুলি চিনতে কোনো অসুবিধা হয় না, অধিকাংশই জৈনমূর্তি, চৌমুখ, ভাঙা দেউলের টুকরো ইত্যাদি। লক্ষ্য করলাম, গ্রামের অন্যান্য লোকজনের চাইতে ডোম বাউরি প্রভৃতি অনুচ্চবর্ণের গ্রাম-

১ District Census Handbook : Purulia (1961) : Benoy Ghose : 'Cultural Profile of Purulia', pp. 8-14.

বাসীদেরই সংগ্রহশালার প্রতি আগ্রহ বেশি। প্রধানত তারাই এই স্থানটিতে সকলে দাঁড়াল, আমাদের কথাবার্তার উত্তর দিল এবং আমরা যখন যে-কোনো একটি ছোটখাটো মূর্তি উপহার চাইলাম তখন তারা সবিনয়ে বলল যে, একটি টুকরোও তারা দিতে পারবে না, কারণ প্রতিটি পাথরের টুকরো ধর্মঠাকুরের মতো সাক্ষাৎ দেবতা এবং আমরা যদি একটি টুকরোও নিয়ে আসি তাহলে গ্রামের অমঙ্গল হবে। সমবেত সকলের মুখের দিকে চেয়ে এর পর আমার মূর্তিসংগ্রহের আগ্রহ যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনি থপ্ করে নিভে গেল। বলা চলে, একেবারে নির্বাক হয়ে গেলাম। কী অসাধারণ 'সারল্য' এবং কী বিস্ময়কর 'বিশ্বাস'! আমার সঙ্গী সহযাত্রীরা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। বোবার মতো ছররা ছেড়ে আমরা চলে এলাম।

বোড়াম (দেউলঘাটা)

'বোড়াম' উত্তররাঢ়ের অন্যতম গ্রামদেবতা। এই গ্রামদেবতার নামেই গ্রামের নাম মনে হয়, পরে লোকমুখে 'দেউলঘাটা' হয়েছে, নদীর তীরে বা ঘাটে অবস্থিত এখানকার দেউলগুলির জন্য। এরকম 'দেউল' দিয়ে অনেক গ্রামের নাম পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ও অন্যান্য অঞ্চলে আছে। 'দেউলি' নামেও অনেক গ্রাম আছে পুরুলিয়ায়। জয়পুর থেকে চার-পাঁচ মাইল দক্ষিণে, কাঁসাই নদীর দক্ষিণপাড়ে বোড়াম গ্রাম। ড্যাল্টন ও বেগলার উভয়েই এই গ্রামে গিয়েছিলেন, একশতাধিক বছর আগে। তাঁরা যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন তখন এখানে দেখেছিলেন, তা সবই প্রায় আছে (১৯৬৯-৭০)। ড্যাল্টনের বিবরণের (১৮৬৪-৬৫) গুরুত্ব বেশি, এবং সবচেয়ে প্রাচীন বলে তার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করা হল :

> Some four miles south of the town of Jaipore···near the village Boram, are three very imposing looking brick temples rising amidst heaps of debris of other ruins, roughly cut and uncut stones and bricks . . . The most southern of the three temples is the largest···The bricks of which these temples are composed, some of them eighteen inches by twelve, and only two inches thick, look as if they were machine-made, so sharp are the edges, so smooth their surface, and so perfect

their shape. They are very carefully laid throughout the masonry, so closely fitting that it would be difficult to insert at the junction the blade of a knife···The bricks used for ornamental friezes and cornices appear to have been carefully moulded for the purpose before they were burned ; and the design···is, though very elaborate, wonderfully perfect and elegant as a whole···The only animals I could discern in the ornamentation were geese,···the goose is a Buddhist emblem.

ভ্যাল্টনের ইঁটের বর্ণনা থেকে, বিশেষ করে অলংকরণের ইঁটগুলি "carefully moulded for the purpose before they were burned"—এই মন্তব্য থেকে সুরুল গ্রামের (বীরভূম 'সুরুল' দ্রষ্টব্য) মন্দিরে সূত্রধরশিল্পীর (master-builder) ইঁটের গায়ে খোদিত নির্দেশের কথা মনে পড়ে। দেউলগুলির প্রতিষ্ঠাকাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকেও হতে পারে।

পাথরের দেবদেবীর মূর্তি অনেক আছে বোড়ামে, মহিষমর্দিনী গণেশ দুর্গা শিব বিষ্ণু প্রভৃতি। মূর্তিগুলির মধ্যে মহিষমর্দিনী মূর্তিটিকে বেগলার "the finest piece of sculpture in the place" বলেছেন। বাস্তবিকই তাই, এরকম মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। মূর্তির অলংকরণ ও সাজসজ্জার বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়, আঞ্চলিক লোকসজ্জার প্রভাব বেশ স্পষ্ট বলে মনে হয়। মূর্তির চারপাশে এবং স্তম্ভের গায়ে খোদিত মূর্তিগুলি 'দশমহাবিদ্যার' মূর্তি। পাদপীঠে 'হংস' দেখে বৌদ্ধ প্রতীকের কথা মনে হয়। এছাড়া অন্যান্য দেবীমূর্তি, শিবলিঙ্গ প্রভৃতিও আছে। বেগলার বোড়ামের মন্দির মূর্তি দেখে মন্তব্য করেছিলেন :

All the temples appear to have been Saivic ; there is no Vaishnavic or other sculpture at all in the whole place ; there must, therefore, have been a large and rich, and probably intolerant, Saivic establishment here.

বেগলার কেন এই স্থানটিকে শৈবধর্মীদের কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন বোঝা যায় না। তা ছাড়া 'বৃহৎ' 'সঙ্গতিপন্ন' 'অসহিষ্ণু'—এই তিনটি বিশেষণও তিনি এখানকার শৈবদের প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ পরিষ্কার নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাহুলাড়ার (বাঁকুড়া) মূর্তি-মন্দিরাদি দেখেও বেগলার এই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন ("I con-

clude, therefore, that the temple was originally Saivic".)। কিন্তু বাহুলাড়া সম্বন্ধে তা বলা যায় না (বাঁকুড়ার 'বাহুলাড়া' দ্রষ্টব্য), বোড়াম সম্বন্ধেও নয়। এই প্রসঙ্গে ড্যাল্টনের উক্তি অনুধাবনীয় :

> These three temples are all of the same type and are no doubt correctly ascribed by the people to the 'Srawaks' or Jains. I found indeed no Jain images, but about a mile to the south, the remains of a Hindoo temple in a grove was pointed out to me, and all the images from all the temples was dedicated to Siva, but amongst the images were several nude figures···that were in probability the 'Jinas' of the brick temple.

ড্যাল্টনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোড়াম-দেউলঘাটার প্রাচীন ইতিহাসের ধারা এইরকম মনে হয় :

প্রথম পর্ব আদিজনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ভূমিজরা প্রধানত যাদের শাখা-জন। দ্বিতীয় পর্ব জৈন ও বৌদ্ধদের ইতিহাস এবং সরাকরা জৈনদের অপজাত বংশধর। তৃতীয় পর্ব হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার ইতিহাস এবং এই পর্বে কয়েকটি শিবলিঙ্গ দেখে শৈবধর্মের প্রাধান্য বোড়ামে ছিল, এরকম অনুমান করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া, একথাও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে শিব আদি-অকৃত্রিম প্রাগার্য ও অনার্য দেবতা, যিনি খুব সহজে আমাদের দেশে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর লোকদেবতায় পরিণত হয়েছেন। বোড়ামের (অথবা বাহুলাড়ার) জনপরিবেশে জৈন-বৌদ্ধদের পরে শিবের প্রতিষ্ঠা অর্জন স্বাভাবিক। দুর্গা চণ্ডী মহিষমর্দিনী কেউ তো আর্যদেবতা নন, দশমহাবিদ্যার একটি মহাবিদ্যার মধ্যেও কোনো আর্যস্পর্শ নেই। শিব তো অনার্য দেবতা।

বুধপুর। পাকবিরড়া

বুধপুর (বুদ্ধপুর?) মানবাজার থানার মধ্যে, পাকবিরড়া (পুঞ্চা থানায় যেতে প্রায় সাত-আট মাইল দক্ষিণে। বুদ্ধেশ্বর শিবের জন্যই নাম বুদ্ধপুর বুধপুর। কিন্তু শিবের নাম 'বুদ্ধেশ্বর' পশ্চিমবঙ্গে বিরল, এমন কি আছে কি

সন্দেহ। ঋষভনাথেশ্বর, পার্শ্বনাথেশ্বর নামে কোনো শিব আছে বলে জানি না, যিনি জৈন তীর্থংকরদের নাম পর্যন্ত আত্মসাৎ করে শিব হয়ে বসেছেন। বুদ্ধকে আত্মসাৎ করে 'বুদ্ধেশ্বর' হয়েছেন, এরকম শিবও দেখা যায় না। বুধপুর সম্বন্ধে প্রথমেই আমার এইকথা মনে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বুধপুরে বৌদ্ধ নিদর্শনের মধ্যে স্তম্ভগাত্রে খোদিত বুদ্ধমূর্তি ছাড়া কিছু নেই। মূর্তি-মন্দিরের একটি ভগ্নস্তূপ বুধপুর এবং সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বর্তমানে বিবাজ কবছেন বিষ্ণু ও গণেশ (১৯৬৯)। গণেশ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। এবকম 'সুপুরুষ' গণেশ দেখিনি কখনও। একটি নয়, দুটি গণেশ। একজন দণ্ডায়মান, আর-একজন ললিতাসনে অথবা মহারাজলীলা ভঙ্গিতে উপবিষ্ট গণেশ। বেগলাব বলেছেন, এই গণেশমূর্তি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ডেভিড ম্যাক্‌কাচন (David McCutchion) গণেশমূর্তিতে ওড়িয়া ভাস্কর্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন (District Census Handbook, Purulia, 1961)। আমি এসব কিছুই লক্ষ্য করিনি, কারণ মূর্তিবিদ্যা (Iconography) সম্বন্ধে আমার যে সামান্য জ্ঞান তাতে এসব (অর্থাৎ স্টাইলের প্রভাব অথবা কালের বৈশিষ্ট্য) লক্ষ্য কবার মতো চোখও আমাব নেই। বস্তুত, 'বিশারদ' হবার মতো অফুরন্ত অবকাশও আমার নেই। আমি কেবল 'গণেশ' সম্বন্ধে ভেবেছি। কে এই গণেশ? কয়েক হাজাব 'ওড়িয়া' পূজারী কলকাতার মতো শহরে কয়েক লক্ষ ছোট-বড়-মাঝারি ব্যবসায়ীর শুভকামনা করে একমিনিটে যে-গণেশের পূজা করে পাঁচপয়সা দক্ষিণা নিয়ে চলে যায়, সেই গণেশ দেবতামণ্ডলীর মধ্যে কে বটে! কে এই গণেশ?

বুধপুরে এইকথাই আমাব বারংবাব মনে হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গণেশমূর্তি শুধু কলকাতা শহরেই বিক্রি হয় বাংলা নববর্ষের দিনে, সাবা বাংলায় অন্তত কয়েক কোটি। প্রায় জনসংখ্যাব কাছাকাছি গণেশমূর্তি বিক্রি হয়। কয়েক কোটি হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে আর কোনো দেবী বা দেবতা নেই যিনি গণেশের মতো লোকপ্রিয়তা দাবি করতে পারেন। অবশ্য গণেশের পূজাবী অধিকাংশই 'ওডিয়া' বলে যে গণেশমূর্তিতে ওড়িয়া 'স্টাইলে'র প্রভাব থাকবে, তা নয়। তথাপি মনে হয়, এবং বুধপুরে বহুবার মনে হয়েছে, কে এই গণেশ?

কে এই গণেশ? 'গণেশ' মানে তো 'গণে'র ঈশ্বর। তাব মানে কি? হিমালয়বাসী শিব-পার্বতীর দুই পুত্র গণেশ ও কার্তিক, এবং দুই কন্যা লক্ষ্মী ও সরস্বতী। জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশের 'গ্রহের দোষে' একটি দুর্ঘটনায় মুণ্ডটি কাটা ;ড় তৎকালে মুণ্ড কাটা গেলেও কেবল ধড় নিয়ে বাঁচা যেত, অন্তত দেবতারা

বাঁচতেন। এইসময় একটি হাতি উত্তরদিকে মাথা করে ঘুমুচ্ছে দেখে শিব তার মুণ্ডটি ছিন্ন করে পুত্র গণেশের স্কন্ধে বসিয়ে দেন (উত্তরদিকে মাথা করে শোয়া এইজন্য নিষেধ)। হাতির মুণ্ড বসিয়েও শিবের গভীর অনুকম্পা হয় গণেশের বিসদৃশ মূর্তি দেখে, তাই তিনি উচ্চমর্যাদা দিয়ে পুত্রের কুরূপের ক্ষতিপূরণ করেন। গণেশকে শিব 'গণে'র অধীশ্বর করেন। এই 'গণ' হল মহাদেব-শিবের ভূত-প্রেতপিশাচাদি অনুচরবর্গ। বেদের দাস-দস্যু যারা, রামায়ণ-মহাভারতের বানর-অসুর-রাক্ষস যারা, তারাই শিব-পুরাণের ভূতপ্রেতপিশাচ. এবং তারাই হল ব্রিটিশ শাসকদের যুগে বিদ্রোহী চুয়াড়, বর্তমানে তপশীলভুক্ত আদিজন অথবা বর্ণ। গণেশ এঁদের অধীশ্বর। তিনি কেবল বণিকের মুনাফার অধীশ্বর নন, সকল রকমের কাজ-কর্মের সাফল্যের অধীশ্বর। বণিকদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘনিষ্ঠ, অতএব সরাক-বণিকরা জৈন হলেও তাঁকে ভক্তিভরে বন্দনা করতে পারেন, এবং পিতা শিব যেখানে 'বুদ্ধেশ্বর', সেই বুধপুরে পিতার অনুচরবর্গ গণের অধীশ্বররূপে তিনি সগর্বে বিরাজ করতে পারেন। অবশ্য বুধপুর একটি বাউরি-প্রধান গ্রাম।

পা ক বি র ড়া। বাগদা-পুঞ্চা থেকে কাছে, পুবে মাইলখানেকের মধ্যে পাকবিরড়া। বাগদায় মুখোপাধ্যায়দের অতিথি, কাজেই সারাদিন পাকবিরড়ায় ঘুরে বেড়ানোর কোনো অসুবিধা ছিল না (জানুয়ারি ১৯৬৯)। জৈন 'কালচার-কমপ্লেক্স'-এর এরকম বিশাল কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও নেই, একথা প্রায় নিঃসংশয়ে বলা চলে। বিশালতার দিক থেকে হয়ত অম্বিকানগর অঞ্চল (বাঁকুড়ার) অথবা পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার আরও দু-তিনটি অঞ্চলের উল্লেখ করা যায়, কিন্তু একস্থানে এরকম সুসংবদ্ধ জৈন সংস্কৃতিকেন্দ্র পাকবিরড়ার মতো কোথাও দেখা যায় না। প্রায় একশো বছর আগে (১৮৭২-৭৩) পাকবিরড়ায় বেগলার যা দেখেছিলেন, প্রথমে তার বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করছি :

> পাকবিরড়ায় মন্দির ও ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে আছে। বড় একটি আচ্ছাদনের তলায় অনেক পাথরের মূর্তি আছে। এখানে একটি বৃহদায়তনের দেউল ছিল বোঝা যায়, কারণ তার ভিত্ এখনও আছে। বিশাল একটি নগ্ন জৈন-মূর্তি, প্রায় ৭½ ফুট উঁচু, প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মূর্তিটির পাদপীঠে পদ্মের প্রতীক। দেওয়ালের পাশে সাজানো আরো অনেক মূর্তি আছে, তার মধ্যে দুটি মূর্তি ছোট, পাদপীঠে ষাঁড়, আর-একটির প্রতীক পদ্ম, একটি ছোট চৈত্যের চারদিকে সিংহ, হরিণ, ষাঁড় ও মেষশাবক। মানুষের মূর্তির মাথায়

ফুলের মালা নিয়ে হাঁস (?)। এরকম চৈত্য আরও অনেক আছে। যে দেউলে বিশালকায় জৈন-মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার মুখ ছিল পশ্চিমে। দেউলটি, অন্যান্য কক্ষাদিসহ যে বিরাট ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একটি বড় ইটের পুবমুখী মন্দির এখনও আছে, ইটগুলি কাদা দিয়ে গাঁথা, ভিতরে বাইরে পলেস্তারা করা। মন্দিরের মধ্যে কোনো বিগ্রহ নেই। এর উত্তরে চারটি পাথরের মন্দির ছিল, তিনটি ভেঙে গিয়েছে, একটি আছে। আরও উত্তরে একসঙ্গে পাঁচটি মন্দির দেখা যায়, দুটি পাথরের, তিনটি ইটের। ইটের মন্দিরগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, পাথরের মন্দির একটিমাত্র আছে। এর উত্তরে আরও চারটি মন্দির দেখা যায়, তিনটি পাথরের, একটি ইটের, কিন্তু সবকয়টি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পুবে দুটি ঢিবি দেখে বোঝা যায়, এখানে দুটি ইটের মন্দির ছিল। এর দক্ষিণে ছিল আরও তিনটি পাথরের মন্দির, সব ভেঙে গিয়েছে। দেউল-মন্দিরের এই সমাবেশ দেখে বোঝা যায়—"the temples all stood on a large stone-paved platform, as on excavating near the foot of one I came upon stone pavement ; the whole group occupies the surface of a piece of rising ground 300 to 350 feet square." মন্দিরগুলির কাছে ছিল একাধিক পুষ্করিণী, তার মধ্যে একটি বেশ বড পুষ্করিণীতে পাথর দিয়ে বাঁধানো ধাপযুক্ত ঘাট ছিল, এখন একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

বেগলারের এই বিবরণ পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, পাকবিরড়ায় বেশ সুপরিকল্পিত একটি জৈন সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবদেউলের পরিকল্পনাটি অনেকটা এইরকম :

৩০০।৩৫০ বর্গফুট পাথরের উঁচু প্রতিষ্ঠাভূমি
মধ্যে পশ্চিমমুখী বড় দেউল, তার মধ্যে ৭½ ফুট উঁচু তীর্থংকরমূর্তি
বড একটি পুবমুখী ইটের দেউল
উত্তরে চারটি পাথরের দেউল
তার উত্তরে দুটি পাথরের, তিনটি ইটের দেউল
আরও উত্তরে তিনটি পাথরের, একটি ইটের দেউল
পুবে দু'টি ইটের দেউল
দক্ষিণে তিনটি পাথরের দেউল
কয়েকটি পুষ্করিণী, একটি বড় শানবাঁধানো ঘাটসহ

বৃহত্তম দেউলটি নিয়ে ছোটবড় ইট-পাথরের কুড়িটি দেউল ছিল এবং প্রত্যেক দেউলে জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, একটি বা একাধিক। ঋষভনাথ শান্তিনাথ পার্শ্বনাথ মহাবীর প্রমুখ সকল তীর্থংকরের মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বলে মনে হয়। এখন অবশ্য দেউল-মন্দির নেই বললেই হয়, কিন্তু জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি অনেক আছে, আশেপাশে এক-একস্থানে সংগ্রহ করা। ভাঙা দেউলের টুকরোর অভাব নেই, আমলক, কলস, চৈত্যও আছে অনেক। বৃহদাকার জৈন তীর্থংকর (পদ্মপ্রভ ?) বর্তমানে 'ভৈরব' বলে পূজিত।

পাকবিরড়া ও বারমাসিয়ার মধ্যে একটি টিলার কাছে (ডোঙ্গরি বলে) 'বীরস্থান' বলে কথিত একটি জায়গায় অনেক ছোট ছোট চৈত্য ও পাথরের কাটাখণ্ড দেখা যায়। স্থানটি ভূমিজদের সমাধিক্ষেত্র এবং পাথরের চৈত্য ও খণ্ডগুলি সমাধির উপর বীরস্তম্ভ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি যদি পাকবিরড়া থেকে না আনা হয়ে থাকে, তাহলে এই স্থানটিতেও একটি বড় দেউল ছিল মনে হয়, যার ধ্বংসাবশেষ ভূমিজদের সমাধির কাজে লেগেছে। প্রসঙ্গত বেগলার প্রতীক-চৈত্যগুলি সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "Tradition calls the votive chaityas, which in form……resemble the native dhole or drums, petrified dhols, and relates that on a certain occasion, musicians and their instruments, while celebrating a wedding, were converted into stone……" ছোট ছোট পাথরের চৈত্যগুলি দেখতে আমাদের এদেশীয় ঢোলের মতো। সেইজন্য স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই কিংবদন্তী প্রচলিত যে একবার একটি বিবাহ উপলক্ষে গায়করা এখানে গানবাজনা করতে করতে হঠাৎ পাথর হয়ে যায়। চৈত্যগুলি তাদের ঢোলের পাথুরে রূপ। কিন্তু গায়কদের পাথরের মূর্তিগুলি কোথায় গেল সে-সম্বন্ধে তারা কিছু বলে না। এরকম চমকপ্রদ কিংবদন্তী সচরাচর শোনা যায় না।

তেলকুপী। চেলিয়ামা

তেলকুপী "containing, perhaps, the finest and largest number of temples within a small space", বেগলারের মতে, বাংলা দেশের "Chutia Nagpur Circle"-এর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। একদা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তেলকুপীর পুরাকীর্তিকেন্দ্রের অধিকাংশই পাঁচেট জলাধারে (দামোদরের) সমাধিস্থ।

বেগলার তিনটি স্থানে এখানে দেবালয়-সমাবেশ দেখেছিলেন। প্রথম স্থানটি দামোদরের তীরে, গ্রামের উত্তরে। এখানে তিনটি বড় এবং দশটি ছোট, মোট ১৩টি মন্দির ছিল, তার মধ্যে কয়েকটি শতবর্ষ আগেই নদীগর্ভে লুপ্ত হয়ে যায়। তিনটি বড় মন্দিরের মধ্যে একটি বেশ প্রাচীন, সম্ভবত দশম শতাব্দীর। অবশ্য দশম শতাব্দীর দেবালয়, ইঁটের বা পাথরের, বাংলার ভূপৃষ্ঠে কোথাও নেই। তবে বাংলাব মাটি, বাংলার জল বলতে যা বোঝায়, তেলকুপী পঞ্চকোটের মাটি-জল সেরকম নয়। কিন্তু দামোদর এখানে বর্ষাকালে ভয়াবহ বন্য রূপ ধারণ করে এবং তখন ফুলে-ফেঁপে দেবালয় মনুষ্যালয় ইত্যাদি গ্রাস করে ফেলা তাব পক্ষে খুবই সহজ। বাংলা-বিহাব উড়িষ্যার প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল এই নদীপথ, তাই কিংবদন্তী হল, কোনো রাজা-মহারাজার পোষকতায় এই দেবালয়কেন্দ্রটি গড়ে ওঠেনি, প্রধানত বণিকদের আনুকূল্যেই গড়ে উঠেছিল। আরও দুটি স্থানে অনেক মন্দিব ছিল, কিন্তু ১৯০২ সালে ব্লক (Bloch) এখানে দশটি মাত্র দেবালয় দেখতে পান, বাকি মন্দিরগুলি দামোদর-গর্ভে লুপ্ত হয়ে যায়। এখন তিনটি মন্দির দেখা যায়, তার মধ্যে একটি অর্ধ-জলমগ্ন (Debala Mitra : Telkupi—a submerged temple-site in West Bengal—দ্রষ্টব্য)। ভৈরবথানে ভৈরবনাথ আছেন, কালী গণেশ বিষ্ণু আছেন, পালাক্রমে মিশ্র, বন্দ্যোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়, মঘেয়া ও দেওঘরিয়া ব্রাহ্মণবা তাঁদের পূজা করেন। শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর আধিক্য দেখে তেল-কুপীকে ব্রাহ্মণ্যধর্মেব একটি বৃহৎ কেন্দ্র বলে অনেকে মনে কবেন। কিন্তু জৈন-বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শনও এখানে ছিল। একাধিক বড বড ঢিবির তলায় এবং নদীগর্ভে হয়ত সেগুলি সমাধিস্থ হয়েছে। এখন তেলকুপী ও তাব পবিপার্শ্ব যদি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ থেকে খনন করা করা হয়, তাহলে বিস্ময়কর ঐতিহাসিক নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বর দিক থেকে কেবল তেলকুপী নয়, পুরুলিয়ার একাধিক স্থান যে অবশ্য-খননীয়, সেকথা যেকোনো ঐতিহাসিক স্বীকার করবেন। পুরুলিয়ার অন্যান্য আরও অনেক স্থানের মতো তেলকুপীতেও, আমাব মনে হয়, জৈন-বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক প্রতিপত্তি-পর্বের পরে হিন্দুধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার ব্যতিক্রম হয়নি, হবার কথা নয়। অন্তত প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ভূগর্ভে পরিচালিত হবার আগে এবিষয়ে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র।

চেলিয়ামা থেকে তেলকুপী বেশি দূর নয়, উত্তরপুবে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে হবে। চেলিয়ামার রাধাবিনোদ মন্দির বেশ প্রাচীন, ১৬১৯ শকাব্দে (১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে)

স্থাপিত। মন্দিরের গায়ে সুন্দর পোড়ামাটির কারুকার্য আছে, যা এখনও বিকৃত হয়নি। কারুকার্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলার নানারকম দৃশ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধ, মাতৃকাদের নিয়ে চণ্ডীদেবীর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের অভিযান, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-রূপ ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকার্যের সঙ্গে বিষয়গত মিল দেখে মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে চেলিয়ামা, তথা রঘুনাথপুর অঞ্চলে, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। এখান থেকেও পুরুলিয়ার ঐতিহাসিক পরিক্রমের আভাস পাওয়া যায়। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী যদি জৈন-ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসানকাল ধরা যায়, তাহলে তারপর তিন-চার শতাব্দী ধরে হিন্দুধর্মের প্রভাব এই অঞ্চলে বিস্তৃত হতে থাকে বলা যায়, এবং ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা (অর্থাৎ দেবালয়-বিগ্রহাদির) হতে থাকে।

সরাকদের কথা

মানভূম অঞ্চলে অন্তত হাজার বছরের প্রাচীন (তার বেশি হবার কথা) জৈন ধর্মীদের বর্তমান 'মনুষ্যাবশেষ' (human relics) বলে সরাকদের চিহ্নিত করা যায়। নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় ('মানভূম জেলায় সাহিত্য সেবা ও গবেষণার উপাদান'—প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪২) বলেন : "বর্তমান কালে মানভূম জেলার উত্তরপূর্বে রঘুনাথপুর, পাড়া ও গৌরাঙ্গডি থানার এলাকায় 'সরাক'দের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আর দক্ষিণে ও পশ্চিমে চাণ্ডিল ও চাস থানার এলাকাতেও কতক সরাকের বাস এখনও আছে। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের আদমসুমারীতে এই জেলায় প্রায় সাড়ে-দশ হাজার সরাকের বাস ছিল।" একসময় মানভূম জেলার উত্তর দক্ষিণ পুব-পশ্চিম সবদিকেই সরাকদের বসতি ছিল। ড্যাল্টন বেগলার প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানকালে, শতাধিক বছর আগে, সরাকদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা তাঁরা শুনেছেন এবং স্থানীয় লোকজন বলেছেন যে মানভূমের অধিকাংশ দেবদেউল, বিশেষ করে যেগুলি সবচেয়ে প্রাচীন, সরাকদেরই প্রতিষ্ঠিত। ভূমিজদেরও অভিমত যে সরাকরা তাঁদের আগে মানভূম-পুরুলিয়ায় এসেছেন। এই বিষয়ে ড্যাল্টনের বক্তব্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বলে তা এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> The tradition of the Bhoomij and their kindred tribe, the Ho or Lurka Coles of Singhbhoom, that the Sarwaks occupied this country first, shows that the Jains are a very ancient

sect. Their antiquity has been doubted in consequence of the modern appearance of their known temples, but those I have been describing as existing in Maunbhoom, are doubtless of great antiquity. In the regions that I have shown were at one time a great seat of this sect, some colonies still remain. In 1863 I halted at a place called Jumpra, 12 miles from Poorulea and was visited by some villagers who struck me as having a very respectable and intelligent appearance. They called themselves Sarawaks, they prided themselves on the fact that under our government not one of their community had ever been convicted of heinous crime. They are represented as having great scruples against taking life. They must not eat till they have seen the sun, and they venerate Parswanath. There are several colonies of the same people in Chota-Nagpore proper, but they have not been there for more than seven generations, and they all say they originally came from Pachete. Contrasted with the Moondah or Cole race, they are distinguished by their fairer complexions, regular features and a peculiarity of wearing the hair in knob rather high on the back of the head. They are enterprising, and generally manage to combine trade with agricultural pursuits, doing business both as farmers and money-lenders.

আজ থেকে ১১২-১১৩ বছর আগে ড্যাল্টন সরাকদের দেখে যে বর্ণনা দিয়েছেন, ঐতিহাসিকতা ও প্রাচীনতার দিক থেকে এবং পর্যবেক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তা অতুলনীয়। সরাকদের যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির কথা ড্যাল্টন উল্লেখ করেছেন তা এই :

১. মুণ্ডা কোল্ প্রভৃতি আদিজনগোষ্ঠীর চেহারার সঙ্গে সরাকদের চেহারার পার্থক্য লক্ষণীয়। সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা সরাকদের এবং মাথার চুল তারা পিছন দিক থেকে উঁচু করে গুলি পাকিয়ে বাঁধে।

২. ব্রিটিশ আমলে কোনো অপরাধের জন্য তারা শাস্তি পায়নি বলে বেশ গর্বিত।

৩. প্রাণীহত্যা তারা করে না।

৪. সূর্যোদয় না হলে খায় না।

৫. পার্শ্বনাথকে পূজা করে।

৬. ছোটনাগপুরে সরাকদের অনেক বসতি আছে, কিন্তু মানভূমের সরাকরা প্রায় সাতপুরুষ ধরে এখানে বাস করছে।

৭. সরাকদের ধারণা তারা পঞ্চকোটের।

৮. সরাকরা চাষবাস করে, ব্যবসা-বাণিজ্যও করে এবং তার সঙ্গে 'মহাজনী' কারবারেও বেশ দক্ষ।

১৮৬৩ সালে ড্যাল্টনের পর্যবেক্ষণকালে, মানভূমের সরাকরা যদি সেখানকার সাত-পুরুষের বাসিন্দা হন, তাহলে বলতে হয় যে ১৫০০। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে-কোনো সময় সরাকরা মানভূম অঞ্চলে এসেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অষ্টাদশ শতকের শেষে পঞ্চকোটের ভিতর দিয়ে বারাণসী সড়ক তৈরি হবার পরে এই অঞ্চলে বাইরে থেকে লোকজন নানা কাজকর্মে আসতে থাকে। সরাকদের উক্তি থেকে মনে হয়, প্রথমে তাঁরা পঞ্চকোট অঞ্চলে এসেছেন, প্রধানত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, দামোদর পার হয়ে, বিহারের ধানবাদ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে। তারপর মানভূমের অন্যান্য অঞ্চলে তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন। মাজি সিং খাঁ প্রভৃতি সরাকদের উপাধিগুলি এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় হল, সরাকদের বর্তমান বসতিগুলি—রঘুনাথপুর পাড়া কাশীপুর নেতুড়িয়া সাঁতুড়ি থানার অন্তর্গত—পঞ্চকোট থেকে দূরে নয়। পঞ্চকোট কেন্দ্র করে বিভিন্ন ব্যাসার্ধের মধ্যে এগুলি অবস্থিত। ড্যাল্টনের ঝাপড়া গ্রাম পাড়া থানার মধ্যে। ঝাপড়ার সরাকরা কেন ড্যাল্টনকে বলেছিলেন যে তাঁদের আদিবাস পঞ্চকোটে, তা তাঁদের বর্তমান বসতিকেন্দ্রের আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা থেকেও বোঝা যায়। পঞ্চকোটের রাজারা তাঁদের এনেছিলেন, অথবা পঞ্চকোট রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখে তাঁরাই উৎসাহিত হয়ে বাণিজ্য ও মহাজনী ব্যবসার জন্য এসেছিলেন, এই কথাই মনে হয়। দরিদ্র আদিজনপ্রধান দেশ মানভূমে, অন্য ব্যবসায়ের সুযোগ যাই থাক, মহাজনী কারবারের অর্থাৎ সুদে টাকা খাটাবার ব্যবসার সুযোগ তৎকালে ছিল, একালেও আছে। এবং বিহার কেন, সুদূর আজমীর-মারওয়াড় অঞ্চল থেকেও জৈনধর্মী মারওয়াড়ীরা যে-কোনো বাণিজ্যের জন্য ভারতের যে-কোনো

স্থানে তীর্থযাত্রীর মতো গিয়েছেন, একথাও ঐতিহাসিক সত্য। মানভূমের সরাকরা ঋণ-সুদের কারবারে, এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেছেন। সেই বিত্তের একাংশ তাঁরা নিজেদের জৈনধর্মের পোষকতা ও প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছেন, এবং মানভূম-পুরুলিয়ায় তাই জৈন পুরাকীর্তির এই ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য।

মন্দির-মূর্তি-সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিক আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে পুরুলিয়ার পাখিদের কথা বলে শেষ করি। বর্ধমান বীরভূম বাঁকুড়া প্রসঙ্গে একটি পাখিরও নাম করিনি, হয়ত পরে অন্যান্য জেলা প্রসঙ্গে করা হবে না। লেখা শেষ করছি এমন সময় হঠাৎ একটি পতঙ্গ বাগান থেকে উড়ে এসে আমার স্টাডিতে ঢুকে চরকির মতো ঘুরপাক খেতে খেতে, একবার আলোর টিউবে, একবার ঘুরন্ত পাখায় ধাক্কা খেয়ে, অবশেষে পাণ্ডুলিপির উপর আছড়ে পড়ে ধীরে ধীরে নিস্পন্দ হয়ে গেল। তাই মনে পড়ল পুরুলিয়ার পাখির কথা, যদিও পাখি আর পতঙ্গ এক নয়, যেমন পতঙ্গ আর মানুষ এক নয়। পুরুলিয়ায় এইকথাটাই কেবল মনে হয়। ভাবানুষঙ্গের কেরামতি অনেক সময় অলৌকিক রূপ ধরে। অবশ্য পাখি যদি টোটেম হয়, এবং সহজেই হতে পারে, তাহলে পাখিও সংস্কৃতির বিষয় হতে পারে। লেভি-স্ট্রাউজ তাঁর 'টোটেমিক অপারেটর'-এ ঈগল পাখির কথা বলেছেন।

গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণকালে পুরুলিয়ার মনোহর নিসর্গের মধ্যে অনেক পাখি দেখেছি, অনেক পাখির ডাক শুনেছি, কিন্তু মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে শেষে অমানুষের মতো পাখির কথা ভুলে গিয়েছি। পতঙ্গের পতন ও মৃত্যু দেখে মনে পড়ল তাই বলছি। তিতির আছে ঝালদা পাহাড়ে। দোয়েলের ডাক শোনা যায় পুরুলিয়ায়। কুরর মাছকোরাল পানকৌড়ি শঙ্খচিল গাইবক কাঁকবক পুরুলিয়ায় অনেক আছে, সাহেববাঁধে মাছ শিকার করে খায় আর পরমানন্দে থাকে। নিশীথ রাতে মধ্যে মধ্যে ওয়াকবকগুলো বিকট ওয়াক্-ওয়াক্ শব্দ করে পুরুলিয়ার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত চকিত করে তোলে। ডাক শুনে ভয় হয়। মধ্যে মধ্যে অনেক রাতে ভয় হয়েছে।

ঘুঘু আছে অনেক পুরুলিয়ায়। পাখির কথা বলছি, মানুষের কথা নয়। মানভূমের ভাষায় বলে পাঁড়কি বা পাঁড়ুক। বাংলার 'তিলে ঘুঘু', যাকে বিহঙ্গবিদরা Turtur Suratensis বলেন, পুরুলিয়ায় অনেক আছে। আর আছে শকুন, সংখ্যায়

খুব বেশি। তার মধ্যে একজাতের শকুন আছে যাদের অন্যত্র দেখা যায় না বিশেষ, রাজশকুন বলে, পক্ষিবিদ্‌রা Otogyps.Calvus বলেন। দেখতে মসৃণ কালো, মাথা-ঘাড়ের লোমহীন চামড়া রক্তবর্ণ, পা-দুটোও লাল, মনেহয় যেন তাদের খাদ্য-পানীয় রক্তের অভাব নেই পুরুলিয়ায়। দ্বিতীয় জাতের শকুন সাধারণ শকুন, Pseudogyps bengalensis, পিঠ সাদা। এদের সংখ্যাও পুরুলিয়ায় অনেক। তৃতীয় জাতের শকুনগুলো দেখতে ছোট, গায়ের রং সাদা, ডানা কালচে, ঘাড়ের লম্বা লম্বা লোম লালচে। এরা শবভুক এবং আবর্জনাভুক। শব আর আবর্জনার সন্ধানে পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে এরা ঘুরে বেড়ায়। আবর্জনা এবং শব কোনোটারই অভাব নেই পুরুলিয়ায়। একরকমের নয়, তিনরকমের শকুন দেখা যায় পুরুলিয়ায়।

টুনটুনিও আছে, ঝালদার ঘন জঙ্গলে, পাহাড়ের নিচে।

স্থান-নির্দেশিকা